সমরেশ মজুমদার

পাঁচটি রহস্য উপন্যাস

পত্র ভারতী
৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯
ফোন ২২৪১ ১১৭৫ ফ্যাক্স ২৩৫৪ ০৪৬২
ই-মেল : patrabha@vsnl.net

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি -২০০৪

PANCHTI RAHASYA UPANYAS
by
Samaresh Majumdar

ISBN No. 81-86986-94-4

প্রচ্ছদ
অমিতাভ চন্দ্র

অঙ্গসজ্জা
·বিজন কর্মকার

মূল্য
১২০.০০

Publisher
PATRA BHARATI
3/1 College Row, Kolkata 700 009
Phone 2241 1175 Fax 2354 0462
e-mail : patrabha@vsnl.net
Price Rs. 120.00

পত্র ভারতী'র পক্ষে ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ও হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

পাঁচটি রহস্য উপন্যাস যদি পঞ্চ ব্যঞ্জন হয় তাহলে তার স্বাদ গ্রহণে মজা থাকেই। ভ্রাতৃপ্রতিম ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়ের এই উদ্যোগ পাঠকপাঠিকাদের প্রীত করলে আমার ভালো লাগবে।

সমরেশ মজুমদার

শ্রীযুক্ত প্রণব চক্রবর্তী

খোলামেলা মানুষেরাই সবচেয়ে রহস্যময় হয়

এই বইটি সেই কারণে

তাঁর জন্যে

পাঁচটি রহস্য উপন্যাস

ফেরারি	৯
কালোচিতার ফটোগ্রাফ	৮১
মানবপুত্র	১৭৫
উনিশ-বিশ	২২৩
বিষয়	২৭৯

ফেরারি

লিফটের সামনে বিরাট লাইন। পাশাপাশি দুটো লিফট, কিন্তু একটার বুকে আউট অব অর্ডার-এর নোটিশ ঝোলানো। ফলে লাইন লম্বা হয়েছে। স্বপ্নেন্দু রুমালে মুখ মুছতে-মুছতে গেট পেরিয়ে থমকে দাঁড়াল। যাঃ শালা।

এখন ঘড়িতে এগারোটা বাজতে দশ। পৌনে এগারোটায় মিসেস বক্সী দেখা করতে বলেছেন। অলরেডি পাঁচ মিনিট লেট। যেভাবে বাসে ঝুলে আসতে হয়েছে তাতে আটতলায় হেঁটে ওঠা অসম্ভব ব্যাপার। সে চোখ বুলিয়ে লাইনের লোক গুনতে লাগল। আটজনের বেশি যদি না নেয় তা হলে তার সুযোগ আসবে চতুর্থ দলে। কী করা যায় বুঝে উঠছিল না স্বপ্নেন্দু। এই সময় তার সমস্ত ইন্দ্রিয় লাফিয়ে উঠল। হেনা সেন! মুহূর্তেই এই একঘেয়েমি যেন বিয়েবাড়ি হয়ে গেল। হেনা সেন ধীরেসুস্থে লাইনের শেষে দাঁড়াতেই স্বপ্নেন্দু চট করে তার পিছনে দাঁড়াল।

হেনা সেন এই আটতলা অফিসের সবচেয়ে সুন্দরী মহিলা। সুন্দরী বললে কম বলা হবে, মহিলার শরীরে যেন ঈশ্বর মেপে-মেপে জাদু মাখিয়ে দিয়েছেন। অমন সুন্দর গড়নের বুক এবং নিতম্ব এবং তার সঙ্গে মেলানো অনেকটা উন্মুক্ত কোমর দেখলেই কলজেটা স্থির হয়ে যায়। মহিলা যখন কথা বলেন তখন আফসোস হয়, কেন শেষ হল। হেনা সেনের সঙ্গে স্বপ্নেন্দুর আলাপ নেই। এতদিন হেনা বসতেন তিনতলায়। সেখানকার বড় অফিসারের সঙ্গে কী একটা গোলমাল হয়ে যাওয়ায় ট্রান্সফার নিয়ে গত পরশু আটতলায় এসেছেন। পদমর্যাদায় স্বপ্নেন্দু অনেক ওপরে, কিন্তু এই বাড়িতে হেনাকে চেনে না এমন কেউ নেই। কিন্তু তাকে?

স্বপ্নেন্দু বাতাসে অসম্ভব মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছিল। সেটা যে সামনের শরীরটা থেকে আসছে তা অন্ধও বলে দিতে পারবে। সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে জামার কলার ঠিক করল। মুখটা অকারণে রুমালে মুছল। যদিও হেনা সেনের চোখ এখন লিফটের দিকে তবু সে নিজেকে স্মার্ট করার চেষ্টা চালাচ্ছিল। মহিলার মাখনরঙা ভরাট পিঠ আর ঘাড় দেখে স্বপ্নেন্দুর মনে হল ওর শরীরে যেন অজস্র যশ চাপ বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দুর্ধর্ষ! লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন না ফুলের বাগানে—ভঙ্গি দেখলে ঠাওর করা মুশকিল। এখনও পর্যন্ত এই অফিসের কোনও রাঘব বোয়াল ওঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। মহিলার নাকি আত্মসম্মানবোধ খুব।

স্বপ্নেন্দু মিসেস বক্সীর মুখটা মনে করল। আর ঠিক চিবিয়ে খাবেন তাকে। আটতলার সুপ্রিম বস মিসেস বক্সী। পাঁচ ফুটি ফুটবল। গায়ের রঙ অসম্ভব ফরসা কিন্তু শরীরে কোনও খাঁজ নেই, মুখটা বাতাবি লেবুর কাছাকাছি। সেই মুখে সিগারেট গুঁজে ইংরেজিতে ধমকান। জরুরি মিটিং ছিল। হেনা সেনের কোমরের দিকে তাকিয়ে স্বপ্নেন্দু বলল, থাক মিটিং। লিফটে লাইন পড়লে সে কী করবে। সঙ্গে-সঙ্গে তার খেয়াল হল, মিসেস বক্সী ইচ্ছে করলে তাকে বদলি করে দিতে পারেন।

স্বপ্নেন্দু ঠোঁট কামড়াল। ঠিক সেইসময় হেনা সেন পিছন ফিরে তাকালেন। স্বপ্নেন্দু

হাসবার চেষ্টা করল। আহা, কী বুক। হেনা সেন জিগ্যেস করলেন, 'আপনি কি কিছু বললেন?'

'আমি? না তো।' কলজেটা যেন এক লাফে গলায় উঠে এসেছে।

'মনে হল!' হেনা সেন মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিলেন।

'না! মনে এই লাইনটার কথা ভাবছিলাম।' স্বপ্নেন্দুর খেয়াল হল মিসেস বক্সীর বিরুদ্ধে জেহাদটা বোধহয় কিছুটা ঠোঁট ফসকে বেরিয়েছে।

'লাইন? লাইনের কথা কেউ আবার শব্দ করে ভাবে নাকি?' হেনা সেন ততক্ষণে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। স্বপ্নেন্দুর খুব ইচ্ছে করছিল কথা বলতে। তার পিছনে এখন আরও দশ-বারো জন দাঁড়িয়ে গিয়েছে।

সে বলল, 'আপনি তো আটতলায় এসেছেন।'

'হ্যাঁ।'

'আমি ওখানকার ডি. ও.। আমার নাম স্বপ্নেন্দু সোম।'

'স্বপ্নেন্দু? বেশ সুন্দর নাম তো?'

কথাগুলো তার মুখের দিকে না তাকিয়ে বলা। তবু স্বপ্নেন্দুর মনে হল তার নামটাকে এমন সুন্দর করে আজ পর্যন্ত কেউ উচ্চারণ করেনি। লাইনটা টুকটুক করে এগোচ্ছিল মাঝে-মাঝে। এবারে ওদের সুযোগ এসে গেল। হেনা সেনের হাঁটা দেখে স্বপ্নেন্দুর মনে হল দুটো জমাট ঢেউ পাশাপাশি দুলে গেল। লিফটে জায়গা ভরাট। হেনা সেন ওঠার পর লিফটম্যান দরজা বন্ধ করে দিতে যাচ্ছে দেখে স্বপ্নেন্দু এক চিলতে জায়গায় পা রেখে শরীরকে সেঁধিয়ে দিল। ফলে তাকে এমনভাবে দাঁড়াতে হল যে হেনা সেনের শরীরের অনেকটাই তার শরীরে ঠেকেছে। এত নরম আর এত মধুর কিন্তু এত তার দাহিকাশক্তি যে স্বপ্নেন্দুর মনে হল সে মরে যাবে। আর এই লিফটটা যদি অনন্তকাল চলত। যদি আটতলা ছাড়িয়ে একশো আটতলায় উঠে যেত। কিংবা এই মুহূর্তে লোডশেডিং-ও তো হতে পারত। মাঝামাঝি একটা জায়গায় লিফটটাকে বেশ কয়েক ঘণ্টা আটকে থাকতে হতো তাহলে। কিন্তু এসব কিছুই হল না। বিভিন্ন তলায় যত লোক নামছে তত হেনা সেনের সঙ্গে তার দূরত্ব কমছে। সাততলায় যখন লিফট তখন একহাত ব্যবধান।

স্বপ্নেন্দুর মনে হল তার শরীরে যেন হেনা সেনের বিলিতি গন্ধ কিছুটা মাখামাখি হয়েছে। সে গাঢ় গলায় বলল, 'যদি কোনও প্রয়োজন হয় তাহলে আমাকে বলবেন মিস সেন।'

'ওমা আমাকে আপনি জানেন?'

'চিনি কিন্তু জানি না।' কথাটা খুব নাটকীয় ভঙ্গিতে বলতেই লিফটের দরজা খুলে গেল। হেনা সেন এমন অপাঙ্গে তাকালেন যে স্বপ্নেন্দু রুমাল মুখে তুলল।

দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসতেই হরিমাধব ছুটে এল, 'আপনাকে ম্যাডাম আধঘণ্টা ধরে খুঁজছেন। খুব খেপে গেছেন।'

'খেপে গেছেন?'

'হ্যাঁ। ইংরেজিতে গালাগাল দিচ্ছিলেন একা বসে।'

স্বপ্নেন্দু দেখল চলে যেতে-যেতে হেনা সেন আবার অপাঙ্গে তাকালেন। কিন্তু এবার ওঁর ঠোঁটে যে হাসি ঝোলানো তার মানেটা বড় স্পষ্ট। মনে-মনে হরিমাধবের

ওপর প্রচণ্ড চটে গেল স্বপ্নেন্দু। একদম রেসপিক্ট পাচার করে দিল বুড়োটা। সে গম্ভীরমুখে নিজের ঘরে এসে বসল।

এই অফিসে সে দুই নম্বর। তার নিচে অন্তত আশিজন কর্মচারী। কিন্তু সবচেয়ে খারাপ অবস্থা তার। ওপরওলা কারণে-অকারণে তাকে ধমকাচ্ছে। আবার নিচের তলার লোকজন সুযোগ পেলেই চোখ রাঙিয়ে যায়। নিচের তলায় কর্মচারীদের ইউনিয়ন আছে। সে না ঘাঁটাবে না ঘাঁটাবে। হরিমাধবকে ডেকে এক গ্লাস জল দিতে বলে স্বপ্নেন্দু ট্রান্সফার আর পোস্টিং-এর ফাইলটা খুলে বসল। হেনা সেনকে দেওয়া হয়েছে স্ট্যাটিসটিকে। আজ কোনও কাজ নেই সেখানে। মাসে দুবার রিপোর্ট পাঠালেই চলে। তা ছাড়া, বুড়ো হালদার আছে চার্জে। লোকটা কাজপাগলা মানুষ। ওর সেকশনের সবাই ওর কাঁধে কাজ চাপিয়ে ঘুরে বেড়ায়। এই অফিসে একটা কথা চালু আছে, স্ট্যাটিসটিক হল পানিশমেন্ট সেল। কোনও পার্টি ওই টেবিলে কোনওদিন যাবে না। সবাই পোস্টিং চায় সেকশনে। হেনা সেনকে ইচ্ছে করেই স্ট্যাটিসটিকে দেওয়া হয়েছে। মিসেস বক্সীর কাণ্ড এটা। এইসময় টেলিফোন বাজল।

'সোম স্পিকিং।'

'হোয়াট ডু য়ু ওয়ান্ট?' মিসেস বক্সীর গলা।

'মানে?'

'কাম শার্প। এক্ষুনি চলে আসুন।'

জলটা খেয়ে তড়াক করে উঠে দাঁড়াল স্বপ্নেন্দু। পকেট থেকে চিরুনি বের করে চুলে বুলিয়ে নিল। তারপর দ্রুত পায়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। মিসেস বক্সীর ঘরটা বিশাল। কার্পেট মোড়া। ঘোরানো চেয়ার এবং টেবিল ছাড়াও এক কোণে কালো ডেকচেয়ার রয়েছে বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে। দরজা খুলে ভিতরে পা দিতেই মিসেস বক্সীর মুখের সিগারেট দুলতে লাগল, 'এইরকম দায়িত্বজ্ঞানহীন অফিসার পেলে আপনি কী করবেন?'

'মানে?'

'আপনার কটায় আসার কথা ছিল?'

'ট্রাফিক জ্যাম ছিল ম্যাডাম। তার ওপর লিফট খারাপ।'

'এইসব সিলি বাহানা কেরানিরা দেয়। আপনি কি ডিমোশন চান।'

স্বপ্নেন্দু মাথা নিচু করল, 'সরি, কিন্তু এটা অনিচ্ছাকৃত।'

'আই অ্যাম ফেড আপ। আপনারা কী ভেবেছেন? এটা অফিস না অন্য কিছু? দশটার অ্যাটেন্ডেন্স। আমি সাড়ে দশটা পর্যন্ত প্রত্যেককে গ্রেস দিয়েছি। কিন্তু এগারোটায় অ্যাটেন্ডেন্স টোয়েন্টি পার্সেন্ট। আপনি ডি. ও. হয়েও ঠিক সময়ে আসছেন না। এক্সপ্লেইন।'

'আমি দুঃখিত।'

'দ্যাটস দি অনলি ওয়ার্ড য়ু নো। দিস ইজ লাস্ট ওয়ার্নিং।' সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে মিসেস বক্সী বললেন, 'বসুন।'

চেয়ারটা টেনে সন্তর্পণে বসল স্বপ্নেন্দু। মহিলা চেয়ারে এমন ডুবে গেছেন যে শুধু মুখ আর বুকের অর্ধাংশ টেবিলের ওপর দৃশ্যমান। বুকের কোনও আদল নেই, যেন দুটো মাংসের তাল এক করে রাখা। স্বপ্নেন্দুর মনে চট করে হেনা সেনের

শরীর ভেসে উঠল।

মিসেস বক্সী এবার একটা ফাইল খুললেন, 'আমার কাছে ক্রমাগত কমপ্লেন আসছে। এই অফিসে এখন ঘুষের ফেস্টিভ্যাল চলছে।'

'ফেস্টিভ্যাল?'

'ইয়েস। প্রকাশ্যে যখন ঘুষ নেওয়া হচ্ছে তখন ফেস্টিভ্যাল ছাড়া আর কী বলব? ডি. ও. হয়ে আপনি সেসব খবর জানেন?'

'অনুমান করতে পারি।'

'কোনও স্টেপ নিয়েছেন?'

'স্পেসিফিক কমপ্লেন না থাকলে স্টেপ নেওয়া মুশকিল।'

'বাট আই ওয়ান্ট টু স্টপ ইট। তোমরা চাই-চাই বলে ইউনিয়ন করবে আবার ঘুষ ছাড়া কোনও কাজ করবে না, এটা হতে পারে না। কীভাবে স্টপ করা যায়?'

এটা খুব জটিল ব্যাপার। এই অফিস ব্যবসায়ীদের জরুরি ব্যাপার নিয়ে কাজ করে। বিভিন্ন সেকশনে তাদের আসতে হয়। দ্রুত কাজ কিংবা কিছু বিপদমুক্ত হওয়ার জন্য তারা পয়সা খরচ করে। কেরানিদের যেটা হাতে নেই তার জন্যে অফিসাররা আছেন। দশজন অফিসার। তারা যেসব কেস নিয়ে ডিল করেন সেখানে মোটা টাকার ব্যাপার। বেশ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান আছে এ ব্যাপারে। অফিসাররা কখনও কমপ্লেন করেন তাঁর অধস্তন কেরানি ঘুষ নিচ্ছে। এটা এখন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে সবার ধারণা যে কোনও কাজ করলেই পার্টিরা টাকা দিতে বাধ্য। এমনকী তার রুটিন ডিউটি করলেও।

স্বপ্নেন্দু ডি. ও.। অফিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, মাইনেপত্র এবং রিপোর্টস সঠিক রাখার দায়িত্ব তার ওপর। পার্টিদের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই। সে লক্ষ করেছে হরিমাধব তার পিওন হওয়ায় খুব অখুশি। প্রায় সে অনুরোধ করে বদলির জন্য। তার সমান মাইনের অফিসাররা গাড়িতে অফিসে আসেন, প্লেন ছাড়া বেড়াতে যান না। মনে-মনে বেশ ঈর্ষা বোধ করে স্বপ্নেন্দু। কিন্তু এসব বন্ধ করা যায় কী করে?

'বোবা হয়ে থাকবেন না। ব্যাচেলাররা যে এমন—!' কাঁধ নাচালেন মিসেস বক্সী। 'কিছু বলুন।'

'দেখুন।' একটু কাশল স্বপ্নেন্দু। 'এটা খুব জটিল ব্যাপার। অভ্যাসটা নিচ থেকে ওপরে সর্বত্র। কাকে বাদ দিয়ে কাকে ধরবেন?'

'ওপরে মানে?'

'আমি শুনেছি অফিসাররাও একই দোষে দোষী।'

'দ্যাটস নট আওয়ার বিজনেস। ওদের জন্যে আরও ওপরতলার লোক আছেন। কিন্তু দশ-পাঁচ-একশো টাকার হরির লুট বন্ধ করা ডি. ও. হিসেবে আপনার কর্তব্য।'

'আমার?'

'হ্যাঁ। আপনি অফিস বস।'

'বলুন, কী করতে হবে?'

'আপনি ট্রান্সফার করুন। আজকেই একটা লিস্ট এনে দিন আমাকে। একটা সেকশনে যে ছমাস আছে তাকে স্ট্যাটিস্টিক কিংবা এস্টাব্লিশমেন্টে পাঠিয়ে দিন। আর নোটিশবোর্ডে ঝুলিয়ে দিন কোনও পার্টি অফিসের ভেতর ঢুকতে পারবে না। তাদের যদি

কোনও প্রয়োজন থাকে তাহলে রেসপেকটিভ অফিসারের সঙ্গে যেন দেখা করে। প্রথমে এটা করুন তারপর দেখা যাবে।' মিসেস বক্সী আবার সিগারেট ধরালেন।

স্বপ্নেন্দু তখনও ইতস্তত করছিল, 'এ নিয়ে খুব ঝামেলা হবে।'

'ঝামেলা? চাকরিতে ঢোকার সময় তাদের কি বলা হয়েছিল যে যত ইচ্ছে ঘুষ নিতে পারবে? তা ছাড়া, আপনি ব্যাচেলার মানুষ, আপনার ভয় কীসের? বোল্ড হন স্পষ্ট, চিরকাল মিনমিন করে গেলে কোনও লাভ হবে না।'

নিজের ঘরে ফিরে এল স্বপ্নেন্দু। ব্যবস্থাটা তার ভালো লাগছিল না। সে নিজে কখনও ঘুষ নেয়নি। হয়তো ঘুষ নেওয়ার বড় সুযোগ তার আসেনি বলে নেয়নি কিংবা এখনও মনে কিছু রুচি এবং নীতিবোধ কটকট করে বলে নেওয়ার প্রবৃত্তি হয়নি। কিন্তু এই হুকুমটা কার্যকর করতে গেলে ভিমরুলের চাকে ঘা পড়বে। তা ছাড়া, কেরানিদের চোখ রাঙাব আর অফিসারদের আদর করব, এ কেমন কথা।

ঠিক তখনই টেলিফোনটা শব্দ করল। ওপাশে তিন নম্বর অ্যাসেসমেন্ট অফিসার মুখার্জি, 'সোম। বক্সীর বাক্সের চাবিকাঠি তোমার হাতে, আমাকে উদ্ধার করো ভাই।'

'কী হয়েছে?'

'একটা মোর দ্যান লাখ কেসে ওঁর অ্যাপ্রুভাল দরকার ছিল। ফাইলটা চেপে রেখেছেন। একবার বলেছিলাম, কোনও কাজ হয়নি। পার্টি বলল, উনি পঞ্চাশ চেয়েছেন। আমি অ্যাসেসমেন্ট অফিসার, কষ্ট করে মাছ জালে ঢোকালাম উনি তার ঝোল খাবেন। বোঝো!'

'দেখি।' বলে রিসিভার নামিয়ে রাখল স্বপ্নেন্দু। মিসেস বক্সীর বিরুদ্ধে মাঝে-মাঝে এ ধরনের অভিযোগ হাওয়ায় ভাসে। পাঁচশো-হাজার নয়, বিশ-পঁচিশের কারবারি উনি। পঞ্চাশ এই প্রথম শুনল স্বপ্নেন্দু। এখন সেই মহিলা তাকে নির্দেশ দিচ্ছেন দশ টাকা, বিশ টাকা যারা নেয় তাদের থামাতে হবে।

হরিমাধবকে হুকুম করল সে, 'বড়বাবুকে পাঠিয়ে দাও।'

বড়বাবু চাকলাদার খুব ভালো মানুষ। সাতে-পাঁচে থাকেন না। আর মাত্র তিনমাস বাকি আছে অবসরের। স্বপ্নেন্দুর ধারণা, লোকটা সৎ।

ঘরে ঢোকামাত্র সে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি ঘুষ নেন?'

হাঁ হয়ে গেলেন চাকলাদার। তারপর কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, 'নিতাম। কিন্তু এখন নিই না।'

'কেন নিতেন, কেন নেন না?'

চাকলাদার নুইয়ে পড়লেন, 'তখন অভাবের তাড়নায় না নিয়ে পারিনি। কিন্তু ভিক্ষে নিচ্ছি বলে মনে হয়। তাছাড়া আজ বাদে কাল চলে যাব, এখন আর নোংরা হওয়ার প্রবৃত্তি হয় না।'

স্বপ্নেন্দু লোকটিকে দেখল। মনে হল মিথ্যে বলছেন না। তারপর নিচু গলায় বলল, 'এই অফিসের যে সমস্ত কেরানিরা ঘুষ নেয় তাদের ট্রান্সফার করতে হবে। ম্যাডামের অর্ডার। আপনি লিস্ট করুন।'

'সে তো ঠেশ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে।'

'হোক।'

'আর তিন মাস আছি। কেন আমাকে বিপদে ফেলছেন স্যার।'

'কেউ জানবে না। খুব গোপনে করুন। অর্ডারটা আমি এখানে টাইপ করাব না। যান।'

চাকলাদার চলে যেতে স্বপ্নেন্দু চোখ বন্ধ করল। আর সঙ্গে-সঙ্গে হেনা সেনের শরীরটা ভেসে উঠল। সে বিয়ে-থা করেনি। মাত্র তিরিশ বছর বয়স। সরাসরি অফিসার হয়ে ঢুকেছে পরীক্ষা দিয়ে। সামনে ব্রাইট ক্যারিয়ার। কিন্তু হেনা সেন তাকে গুলিয়ে দিল। মহিলার মধ্যে অদ্ভুত মাদকতা আছে। কিছুক্ষণ ইতস্তত করে সে আবার হরিমাধবকে ডাকল, 'শোনো স্ট্যাটিস্টিক থেকে মিস সেনকে ডেকে আনো।'

'উনি এখন অফিসে নেই স্যার।'

'নেই? তুমি জানলে কী করে?'

'উনি যে এসেই ক্যান্টিনে যান বিশ্রাম করতে।'

স্বপ্নেন্দু অবাক হয়ে গেল। আচ্ছা ফাঁকিবাজ মহিলা তো। সে বিরক্ত গলায় বলল, 'ক্যান্টিন তো এই বাড়িতেই। সেখান থেকে ডেকে নিয়ে এসো।'

হরিমাধব চলে যাওয়ার পর স্বপ্নেন্দুর মনে হল না ডাকলেই হতো।

হয়তো মহিলা অসুস্থ, বাইরে থেকে ঠাওর করা যায় না। তাছাড়া ওরকম সুন্দরী মহিলাদের একটু-আধটু সুবিধা দেওয়া দরকার। দশটা-পাঁচটা কলম পিষলে কি ওই শরীর থাকবে? কিন্তু সেই সঙ্গে স্বপ্নেন্দুর ভেতরটা খুব চঞ্চল হয়ে উঠল। সে চট করে চুলটা আঁচড়ে রুমালে মুখ ঘষে নিল। কাল থেকে দুটো রুমাল নিয়ে বেরোতে হবে। একটা খুব দ্রুত ময়লা হয়ে যায়।

আবার টেলিফোন বাজল। ওপাশে সুজিত। ফিল্মে অভিনয় করে বেশ পরিচিত হয়েছে। একসঙ্গে কলেজে পড়ত এবং যোগাযোগ আছে। সুজিত জিজ্ঞেস করল, 'কাল বিকেলে কী করছ?'

'কিছুই না।'

'চলে এসো আমার বাড়িতে সন্ধে সাতটায়। ফিল্মের কিছু মানুষ আসবে। একটা গোপন খবর ঘোষণা করব।'

'কী খবর?'

'উঁহু এখন বলব না। ওটা সারপ্রাইজ থাক। এসো কিন্তু। শুধু বলছি আমি বিয়ে করছি। দারুণ, দারুণ এক মহিলাকে।'

কট করে লাইনটা কেটে দিল সুজিত। রিসিভারটার দিকে তাকিয়ে কেমন যেন ঈর্ষাবোধ করল সে। এমন কিছু ভালো দেখতে নয় কিন্তু সুজিত আজ বিখ্যাত। প্রচুর টাকা পাচ্ছে এবং সেইসঙ্গে দারুণ মহিলাকে বিয়ে করছে। আর সে একটা স্টুডেন্ট হয়েও কলা চুষছে। রাস্তাঘাটে কোনও মেয়ে তার দিকে তেমনভাবে তাকায় না। কলেজ লাইফে সুজিতের থেকে তার সম্ভাবনা অনেক বেশি ছিল।

এই সময় দরজায় শব্দ হতেই মুখ তুলে তাকাল স্বপ্নেন্দু। মনে হল দম বন্ধ হয়ে যাবে তার। হেনা সেনের মুখ থমথমে, 'ডেকেছেন।'

উঠে দাঁড়াতে গিয়ে খেয়াল হল সে অফিসার। হাত বাড়িয়ে চেয়ারটা দেখিয়ে বলল, 'বসুন। আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে।'

হেনা সেন এগিয়ে এলেন রাজহাঁসের ভঙ্গিতে। 'কী ব্যাপার?'

'আগে বসুন, দাঁড়িয়ে কথা বলা শোভন নয়।'

ব্যাপারটা যেন হেনা সেনের মনঃপূত হচ্ছিল না। তবু চেয়ারখানা সামান্য টেনে নিয়ে থমথমে মুখে তিনি বসলেন। স্বপ্নেন্দু সেটা লক্ষ করল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'এই অফিসের পরিবেশ আপনার কেমন লাগছে?'

'ভালোই।'

'কিন্তু আমার ওপরওয়ালা মনে করেন পরিবেশ আদৌ ভালো নয়। তিনি চান অবস্থার উন্নতি করতে। আপনি সেকশনে আসতে চান?'

'সেকশনে? না-না। ওখানে অনেক ঝামেলা। আমি বেশ আছি।'

'কিন্তু মিসেস বক্সী আপনাকে সেকশনে পাঠাতে বলেছেন।'

এবার হাসলেন হেনা সেন, 'উনি আমাকে সহ্য করতে পারেন না। আপনি নিশ্চয়ই কারণটা বুঝতে পারছেন। সেকশনে যাওয়ায় যাদের ইন্টারেস্ট আছে তাদের পাঠান। আমি চলি।'

'একটু বসুন।' স্বপ্নেন্দু খুব অসহায় বোধ করছিল, 'একটা কথা, এইসব আলোচনার কথা অফিসে গিয়ে বলবেন না।'

'কেন?'

'এটা টপ সিক্রেট।'

'তাহলে আমাকে জানালেন কেন?'

ঠোঁট কামড়াল স্বপ্নেন্দু, 'আমার মনে হয়েছিল আপনাকে বিশ্বাস করা যায়।'

'ধন্যবাদ।' হেনা সেন সামান্য মাথা দুলিয়ে ঘর ছেড়ে চলে যেতে-যেতে ঘুরে দাঁড়ালেন, 'আমি ভেবেছিলাম আপনি আমাকে এক্সপ্লেনই করতে বলবেন কেন আমি অফিসে এসেই ক্যান্টিনে যাই।'

'আপনি জানেন আমি সেটা পারি না।'

'আমি জানি?'

'জানা উচিত।'

এবার হাসিটা আরও মিষ্টি হল। তারপর বেরিয়ে গেলেন হেনা সেন। কয়েক মুহূর্ত বাদে স্বপ্নেন্দুর খেয়াল হল, এ কী করল সে। একজন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে চরম অন্যায় হয়ে গেল। শুধু একজন সুন্দরী মহিলার শরীর দেখে সে মাথা খারাপ করে ফেলল? এখন উনি যদি অফিসে বলে বেড়ান তাহলে ম্যাডাম তাকে চিবিয়ে খাবেন। অথচ এখন আর কিছু করার নেই।

বিকেলে অফিসে হইচই পড়ে গেল। হেনা সেন নয়, কী করে যে খবর ফাঁস হয়ে গেছে তা কেউ জানে না। হয়তো হরিমাধব কিংবা বক্সীর বেয়ারা অথবা বড়বাবু, সোর্সটা বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু অফিসের সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গেল। ঝেঁটিয়ে ট্রান্সফার হচ্ছে এই খবরটা আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ল; বিকেল চারটেয় জানতে পারল স্বপ্নেন্দু। একজন বাহান্ন বছরের প্রৌঢ় এসে হাত জোড় করে দাঁড়ালেন, 'স্যার, আমাকে ধনে-প্রাণে মারবেন না।'

'কী হয়েছে?'

'আমার তিনটে মেয়ে। সেকশন থেকে সরিয়ে দিলে ওদের বিয়ে দিতে পারব না। একদম ভরাডুবি হয়ে যাবে স্যার।' কেঁদে ফেললেন ভদ্রলোক।

'আপনি জানলেন কী করে?' স্বপ্নেন্দু সোজা হয়ে বসল।

'সবাই জানে স্যার।'

তারপর একটার পর একটা অনুরোধ। কারও মেয়ের বিয়ে হয় না, কারও সংসার চলবে না। অফিস থেকে চিৎকার চেঁচামেচি ভেসে আসছিল। স্বপ্নেন্দু টেলিফোন করল মিসেস বক্সীকে। বেজে গেল টেলিফোন। হরিমাধব খোঁজ নিয়ে জানাল ম্যাডাম ঘন্টাখানেক আগে অফিস থেকে বেরিয়ে গেছেন।

স্বপ্নেন্দুর মাথায় কিছুতেই ঢুকছিল না কী করে খবরটা ফাঁস হয়ে গেল।

সে চাকলাদারকে ডেকে পাঠাল, 'আপনি স্টাফদের বলেছেন?'

'না স্যার। তবে শুনেছি ম্যাডাম নাকি ওঁর পিওনকে বলেছেন।'

'ম্যাডাম?' স্বপ্নেন্দু হাঁ হয়ে গেল। ঠিক সেইসময় দল বেঁধে স্টাফরা তার ঘরে প্রবেশ করল। একসঙ্গে চিৎকার চেঁচামেচি অভিযোগ এবং গালাগালের বন্যা বয়ে যেতে লাগল। তাকে ঘিরে অনেকগুলো উত্তেজিত মুখ। স্বপ্নেন্দু বলার চেষ্টা করল, 'আপনারা আমার কাছে এসেছেন কেন? মিসেস বক্সীর কাছে যান। তিনিই অল ইন অল।'

একজন বলল, 'সে শালী পালিয়েছে।'

'ঠিক আছে, একজন বলুন। এনি অফ ইউ।'

'শুনুন। অ্যাদ্দিন ধরে আমরা সেকশনে কাজ করছি, এখন এককথায় সরাতে পারেন না। এতগুলো লোকের ভাতে হাত দেবার কোনও রাইট আপনার নেই।'

'ভাতে হাত।'

'নিশ্চয়ই।'

'কিন্তু এটাতো বেআইনি।'

সঙ্গে-সঙ্গে চিৎকার উঠল। অজস্র অশ্লীল শব্দ। একজন চেঁচিয়ে বলল, 'অফিসাররা যখন মাল কামান তখন বুঝি আইন থাকে?'

এই যুক্তিটার কাছে নরম হতেই হয়। স্বপ্নেন্দু মিসেস বক্সীকে একথাই সকালে বলেছিল। সে বলল, 'আমি বুঝতে পারছি। বিশ্বাস করুন আমি এসব কিছু জানি না। মিসেস বক্সী এলে আমি নিশ্চয়ই আলোচনা করব।'

'আপনি জানেন না?'

'না।' স্বপ্নেন্দু স্রেফ অস্বীকার করল।

'মিথ্যে কথা। তাহলে স্ট্যাটিস্টিক থেকে মিস সেনকে ডেকে পাঠালেন কেন? মিস সেনকে কোন সেকশনে দিতে চান?'

'মিস সেন?' ধক করে উঠল স্বপ্নেন্দুর বুক। মহিলা বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন নাকি? ওফ, কী বোকামিই না করেছিল সে। একটা মেয়েছেলের সুন্দর চেহারা দেখে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

'কী, চুপ করে আছেন কেন?'

'ওর সঙ্গে আমার কী কথা হয়েছে আপনারা জানেন?' শেষ চেষ্টা করল সে। সঙ্গে-সঙ্গে চিৎকারটা বাড়ল। কেউ একজন ছুটল হেনা সেনকে ডেকে আনতে। তারা

সামনাসামনি ভজিয়ে নিতে চায়। স্বপ্নেন্দু ঘামতে লাগল। এই লোকগুলোকে তার ক্ষিপ্ত নেকড়ের মতো মনে হচ্ছিল। তার ঘরে হামলা হচ্ছে অথচ কোনও অফিসার এগিয়ে আসছেন না তাকে উদ্ধারের জন্যে।

কিছুক্ষণের মধ্যে মিস সেনের আবির্ভাব হল। ঘরে ঢুকে বললেন, 'কী ব্যাপার? আমায় কেন?' যেন তিনি কিছু জানেন না।

নেতা গোছের একজন প্রশ্ন করল, 'মিস সেন, আজ সকালে উনি কি ট্রান্সফার পোস্টিং নিয়ে কিছু বলেছিলেন আপনাকে?'

ধীরে-ধীরে মাথা নাড়লেন হেনা সেন। হ্যাঁ।

আর গলা শুকিয়ে গেল স্বপ্নেন্দুর। নিজেকে চড় মারতে ইচ্ছে করছিল তাঁর। সঙ্গে-সঙ্গে উত্তেজনা বাড়ল। মিথ্যুক, লায়ার।

'কী বলেছিলেন?'

'আমি অফিসে এসে রেস্ট নিতে ক্যান্টিনে যাই বলে উনি আমাকে বলেছিলেন এটা নাকি অন্যায়, প্রয়োজন হলে আমাকে ট্রান্সফার করে দেবেন। আমার আবার একটু রেস্ট না নিলে চলে না।'

হেনা সেন হাসলেন।

আর স্বপ্নেন্দুর মনে হল সে গভীর কুয়োর তলা থেকে ভুস করে ওপরে উঠে এল। স্পষ্টতই আক্রমণকারীদের মুখে এখন হতাশা। কেউ-কেউ হেনা সেনের দিকে অবিশ্বাসী চোখে তাকাচ্ছে। এবার হেনা সেন জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি জানতে পারি কি কেন এঁদের ট্রান্সফার করা হচ্ছে?'

'আমি জানি না, মিসেস বক্সী বলতে পারবেন।'

'এদের বিরুদ্ধে কি প্রমাণ আছে যে এরা পার্টির কাছে ঘুষ নেন? যদি না থাকে তাহলে এরকম অ্যাকশান নেওয়া মানে এদের অপমান করা। অনুমানের ভিত্তিতে আপনারা কিছুই করতে পারেন না।'

হেনা সেন হেসে-হেসে কথাগুলো বলতেই সোচ্চারে তাঁকে সমর্থন করল সবাই।

যাওয়ার আগে স্টাফরা বলে গেল যদি এইরকম অর্ডার বের হয়ে তাহলে কাল থেকে কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। ঘর ফাঁকা হয়ে গেলে রুমালে মুখ মুছল স্বপ্নেন্দু। খুব জোর বেঁচে গেল সে আজ। হেনা সেন তাকে বাঁচিয়ে দিলেন। মহিলা তাকে নাও বাঁচাতে পারতেন! সঙ্গে-সঙ্গে আর-একটা চিন্তা মাথায় আসামাত্র উৎফুল্ল হল সে। মেয়েরা যাকে একটু নরম চোখে দ্যাখে, তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করে, কোথায় যেন পড়েছিল সে, এত ঝামেলার মধ্যেও এটুকু ভাবতে পেরে মনটা প্রশান্তিতে ভরে গেল তার। খুব ইচ্ছে করছিল হেনা সেনকে ডেকে কৃতজ্ঞতা জানায়। কিন্তু সাহস হল না তার। সঙ্গে-সঙ্গে স্টাফদের মনে অন্যরকম প্রতিক্রিয়া হতে পারে। তবে মহিলা খুবই বুদ্ধিমতী। তাকেও যেমন বাঁচালেন তেমনি স্টাফদেরও চটালেন না। চমৎকার।

স্বপ্নেন্দু ঠিক করল মিসেস বক্সীর ওপর ব্যাপারটা ছেড়ে দেবে। তিনি যা করেন তাই হবে। সে আর এই ব্যাপারে থাকবে না। যদি মিসেস বক্সী চোখ রাঙান তাহলে হেড অফিসে বিস্তারিত জানাবে।

ছুটির পর বেরিয়ে এসে বাসস্ট্যান্ডে কিছুক্ষণ দাঁড়াল স্বপ্নেন্দু। এই সময়টায় তার

কিছুই করার থাকে না। মা মারা যাওয়ার পর থেকে বাড়ির কোনও আকর্ষণ তার কাছে নেই। হাঁটতে-হাঁটতে ধর্মতলায় চলে এল সে। আর তখনই আত্রেয়ী তাকে ডাকল, 'কী ব্যাপার, কেমন আছ?'

স্বপ্নেন্দু মাথা নাড়ল, 'ভালো। তুমি?'

'আর থাকা। তুমি তো কোনও খোঁজখবর নাও না।'

'কী হবে নিয়ে। তাছাড়া তোমার স্বামী তো সেটা পছন্দ করেন না।'

'ওঃ স্বপ্নেন্দু! এই কথাটা শুনতে-শুনতে আমি পাগল হয়ে গেলাম। আমার সব কাজেই যদি ওর মতামত নিতে হয় তাহলে—!' বলতে-বলতে কথা ঘোরাল সে, 'কোথায় যাচ্ছ?'

'কোথাও না। বেকার মানুষ।'

'তুমি আবার বেকার। এখনও বান্ধবী পাওনি?'

'সে কপাল কোথায়?'

'চলো, আমাদের ওখানে চলো।'

'মাথা খারাপ। স্ত্রীর বন্ধুকে দেখলে কোনও স্বামী সুখী হয় না।'

'আমি আর পারছি না স্বপ্নেন্দু। এই লোকটার সঙ্গে একসঙ্গে বাস করা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

স্বপ্নেন্দু রাস্তাটার দিকে তাকাল। অজস্র মানুষ এই সন্ধেবেলায় যাওয়া-আসা করছে। অথচ আত্রেয়ী এই পরিবেশকে ভুলে গিয়ে নিজের মনের কথা স্বচ্ছন্দে বলে যাচ্ছে। স্বপ্নেন্দু তবু বোঝাবার চেষ্টা করল, 'এভাবে বলো না, তুমি নিজে পছন্দ করে বিয়ে করেছ। অতীতটাকে ভুলে যেও না।'

'ভুল করেছিলাম।' তারপরেই যেন খেয়াল হল আত্রেয়ীর, 'কোথাও বসবে?'

'তোমার দেরি হয়ে যাবে না?'

'আই ডোন্ট কেয়ার। তোমাকে এতদিন বাদে দেখলাম। তোমার অফিসের টেলিফোন নাম্বারটা যে কাগজে ছিল সেটাও ছিঁড়ে ফেলেছে, কীরকম ক্রুট।'

'আজ নয় আত্রেয়ী। আমার মন ভালো নেই।'

'একদিন কিন্তু আমার কাছে এলে তোমার মন ভালো হয়ে যেত।'

'সে অনেকদিন আগের কথা। তখন আমরা ছাত্র—।'

'তোমার নাম্বারটা দাও তাহলে।'

স্বপ্নেন্দু টেলিফোন নাম্বারটা বলতে আত্রেয়ী সেটাকে তিন চারবার নানান রকম করে মনে গেঁথে রাখল তারপর জিগ্যেস করল, 'তুমি এখনও সেই পুরোনো বাড়িতেই আছ?'

'আর কোথায় যাব? মা চলে যাওয়ার পর আমি আগলাচ্ছি।'

হঠাৎ ব্যাগ খুলল আত্রেয়ী। তারপর কী ভেবে সেটা বন্ধ করে বলল, 'তুমি হয়তো আমার কথা আজকাল আর ভাব না, কিন্তু আমার বড্ড মনে পড়ে তোমাকে। আমি ভুল করেছি স্বপ্নেন্দু, বিরাট ভুল।'

আত্রেয়ী চলে গেলে আরও আনমনা হয়ে গেল সে। ছাত্রজীবনে কি তার সঙ্গে আত্রেয়ীর প্রেম হয়েছিল? না, ঠিক প্রেম বলে না ওটাকে। তবে আত্রেয়ীর কাছে যেতে

ভালো লাগত তার। আর আত্রেয়ীর নজর ছিল আরও ওপরের দিকে। ভালো চাকুরে, প্রচুর পয়সা এবং ক্ষমতাবান মানুষের জন্যে তার লোভ ছিল। তাই সেই বয়সে ওইরকম একটা মানুষকে পেয়ে সে স্বচ্ছন্দে স্বপ্নেন্দুদের ভুলে যেতে পেরেছিল। কষ্ট হয়েছিল অবশ্যই, কিন্তু সেটা ভুলে যেতে সময় লাগেনি। প্রেম হলে কি তা সম্ভব হতো! আর আজকের আত্রেয়ী তো মধ্যবয়সের এক মহিলা। শরীরে যৌবন নেই। সেই চাপল্য নেই, আকর্ষণ করার ক্ষমতা লোপ পেয়েছে। এই আত্রেয়ীর সঙ্গে নবীন প্রেম হয় না, পুরোনো বন্ধুত্ব রাখা যায় মাত্র। কথাটা মনে হওয়ামাত্র হেনা সেনের শরীরটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। আর সঙ্গে-সঙ্গে দম বন্ধ হয়ে গেল তার। হেনা সেনকে কৃতজ্ঞতা জানানো হল না। কাল এবং পরশু ছুটি। সোমবার ঘরে ডেকে ওটা জানাতে গেলে হয়তো নানান কথা উঠবে। তা ছাড়া, সেদিন অফিসের আবহাওয়া কীরকম থাকবে তাও সে জানে না।

আত্রেয়ীর সঙ্গে দেখা না হলে হয়তো বুকের ভেতর হেনা সেনের জন্যে এতটা আনচান শুরু হতো না। আত্রেয়ী যন্ত্রণাটা যেন তার মনে ছুঁইয়ে চলে গেল। স্বপ্নেন্দুর মনে হল হেনা সেনের বাড়িতে গিয়ে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এলে কেমন হয়? অফিস থেকে বের হওয়ার আগে সে ওর ফাইল থেকে বাড়ির ঠিকানাটা জেনে এসেছে।

পরমুহূর্তেই চিন্তাটাকে বাতিল করল সে। হেনা সেনের বাড়িতে যাওয়া একজন অফিসারের পক্ষে সম্মানজনক হবে না। হেনা যদি বিরক্ত হয় তাহলে অফিসে ঢিঢি পড়ে যাবে। স্টাফরা তো বটেই, মিসেস বক্সীও খড়্গহস্ত হবেন। তা ছাড়া, হয়তো গিয়ে দেখবে ওর কোনও সহকর্মী সেখানে বসে আছে। তাহলে? বেইজ্জতের একশেষ। না, এটা অত্যন্ত ঝুঁকি নেওয়া হয়ে যাবে।

এক কাপ চা খেয়ে হাঁটছিল স্বপ্নেন্দু। এই সময় বাচ্চা ছেলেটা পেছনে লাগল। ধর্মতলায় এদের প্রায়ই চোখে পড়ে। একগাদা টাটকা ফুল নিয়ে এরা অনুনয় করে কিনতে। স্বপ্নেন্দু শুনেছে এই সব ফুলের অতীত নাকি ভালো নয়। কবরস্থান থেকে তুলে নিয়ে এসে নাকি বিক্রি করা হয়। তাছাড়া ফুল নিয়ে সে কী করবে? বাড়িতে যার ফুলদানি নেই তার ফুলের কী প্রয়োজন। ছেলেটাকে হাটিয়ে দিলেও সে পিছু ছাড়ছিল না। ফুলগুলোর প্রশস্তি করতে-করতে আকুতি জানাচ্ছিল কেনবার জন্যে। প্রায় বাধ্য হয়ে স্বপ্নেন্দু এবার ফুলগুলোর দিকে তাকাল। আর তখনই তার নজরে পড়ল একটা আধফোঁটা বড় রক্তগোলাপ কীরকম নরম সতেজ চেহারা নিয়ে তাকিয়ে আছে। পুরো ফোটেনি ফুলটা কিন্তু এমন ডাঁটো এবং উদ্ধত ভঙ্গি, পাপড়ির গায়ে জলের ফোঁটা যে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। সে ছেলেটাকে বলল, 'ওই ফুলটার দাম কত?'

'আট আনা সাব।' হাত বাড়িয়ে তুলে দিল সে গোলাপটাকে। লম্বা ডাঁটি এবং তাতে দুটো পাতা। দর করল না স্বপ্নেন্দু। দাম মিটিয়ে দিয়ে নাকের সামনে ধরতেই অদ্ভুত জোরালো অথচ মায়াবী গন্ধ পেল। এবং তখনই মনে হল এই গন্ধটা তার খুব চেনা। চোখ বন্ধ করতেই হেনা সেনের শরীর ভেসে উঠল। আজ সকালে লিফটে হেনা সেনের শরীর থেকে সে এই রকম গন্ধ পেয়েছিল। আদুরে চোখে ফুলটাকে দেখল স্বপ্নেন্দু। আর তারপরেই মনে হল হেনা সেনের শরীরের সঙ্গেও এই ফুলের মিল আছে। এইরকম তাজা, উদ্ধত, অহঙ্কারী এবং মহিমাময়। শেষ শব্দটা

ভাবতে পেরে খুব ভালো লাগল তার। মহিমাময়।

ফুলটার দিকে তাকিয়ে স্বপ্নেন্দুর দ্বিতীয়বার মনে হল তার উচিত একবার হেনা সেনের বাড়িতে যাওয়া। সে তো কখনও ফুল কেনেনি। কোনও ফুলওয়ালা তার পিছনে জোটেনি কোনওদিন। আজ কেন হল?

আর ওই ছেলেটার কাছে এই ফুলটাই বা থাকবে কেন যা দেখলে হেনা সেনকে মনে পড়ায়! হেনা সেন থাকে ফুলবাগানের সরকারি ফ্ল্যাটে। তেমন বুঝলে একটা মিথ্যে ওজর দিতে অসুবিধে হবে না। তা ছাড়া, যে মেয়ে তাকে বাঁচাতে অতগুলো সহকর্মীর সামনে কথা সাজাল সে নিশ্চয়ই অফিসে গিয়ে নালিশ করবে না।

এইসব ভেবে স্বপ্নেন্দু একটা ট্যাক্সি ধরল। পারতপক্ষে শেয়ারে ছাড়া সে ট্যাক্সিতে চড়ে না। কিন্তু আজ মনে হল এই ফুলটাকে নিয়ে বাসে ওঠা যায় না। ভেতরে-ভেতরে খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল সে। ঘাম জমছিল কপালে।

সরকারি ফ্ল্যাটের কাছে এসে ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে স্বপ্নেন্দুর মনে হল, এই লাল গোলাপটাকে হাতে ধরে পথ হাঁটা উচিত হবে না। এটাকে দেখলে মানুষের কৌতূহল হবেই। অথচ পকেটে রাখলে ফুলটা নষ্ট হয়ে যাবে। শেষপর্যন্ত সে রুমাল বের করে সযত্নে তাতে ফুলটাকে ঢেকে ঝুলিয়ে নিল এমন করে যে কেউ দেখলে চট করে বুঝতে পারবে না।

নম্বর খুঁজে-খুঁজে ফ্ল্যাটটা পেতে মিনিট পনেরো লাগল। তিনতলায় দরজায় গায়ে লেখা আছে মিস্টার এস. কে. সেন। এই লোকটা কে হতে পারে? হেনার বাবা? মেয়ের অফিসার বাড়িতে এসেছেন শুনলে ভদ্রলোক কী মনে করবেন? কিন্তু এখন ফিরে যাওয়ার কোনও মানে হয় না। একটু মরিয়া ভাব এসে গেলে স্বপ্নেন্দু কলিং বেলে আঙুল রাখল। আর আশ্চর্য, দরজা খুলল হেনা নিজে।

'ওমা, আপনি?' খুব অবাক গলায় প্রশ্ন করল হেনা।

স্বপ্নেন্দু দেখল লাল শাড়ি লাল ব্লাউজে হেনাকে ঠিক রক্তগোলাপটার মতো দেখাচ্ছে। অফিস থেকে ফিরে স্নান করেছে নিশ্চয়ই কারণ লাবণ্য ঢলঢল করছে সারা অঙ্গে। স্বপ্নেন্দু কোনওরকমে বলতে পারল, 'এলাম।'

'হ্যাঁ আসুন।' হেনা সরে দাঁড়াতে স্বপ্নেন্দু ঘরে ঢুকল। সুন্দর সাজানো আধুনিক ঘর। দরজাটা ভেজিয়ে হেনা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী ব্যাপার বলুন তো?'

স্বপ্নেন্দুর খেয়াল হল রুমালটার কথা। ওটা এখনও হাতে ঝোলানো। যতটা সম্ভব ওটাকে আড়াল করে সে কথা বলল, 'আমি না এসে পারলাম না। আজ আপনি আমাকে অফিসে বাঁচিয়েছেন। আমি যে কী বলে আপনাকে—'

শব্দ করে হেসে উঠলেন হেনা সেন। তাঁর শরীরে পুরীর ঢেউগুলোকে চকিতে দেখতে পেল স্বপ্নেন্দু। হেনা সেন হাসতে-হাসতে বললেন, 'বলিহারি আপনি! ওই জন্যে বাড়ি বয়ে ধন্যবাদ জানাতে এলেন! এখন যদি খবরটা অফিসে জানাজানি হয়ে যায়? আরে মুখটা অমন করছেন কেন? বসুন-বসুন।'

স্বপ্নেন্দু মাথা নাড়ল, 'না বসব না। রাতও তো হল।'

'রাত এমন কিছু হয়নি। দাঁড়ান, আমার মায়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।' কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়ে হেনা সেন ভেতরে চলে গেলেন। স্বপ্নেন্দু আড়ষ্ট হয়ে বসল।

রুমালটাকে সে সন্তর্পণে সোফার ওপর রেখে দিল। তিনঘরের ফ্ল্যাট। অথচ অন্য মানুষের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে না।

একটু বাদেই এক প্রৌঢ়াকে নিয়ে হেনা সেন ফিরে এলেন, 'আমার মা।'

স্বপ্নেন্দুর ইচ্ছে করছিল না প্রণাম করতে কিন্তু সেটা বাড়াবাড়ি হবে মনে হওয়ায় নমস্কার করল সে। মহিলা বললেন, 'বসুন।'

'আমাদের অফিসার। খুব জাঁদরেল লোক।' হেনা সেন জানালেন।

মহিলা বললেন, 'আপনি কি এদিকেই থাকেন?'

'না। মানে আমার এক বন্ধুর কাছে এসেছিলাম, ভাবলাম দেখা করে যাই।'

'ওর পুরোনো অফিসের পরিবেশ ভালো ছিল না। একজন তো খুব বিরক্ত করতেন। শেষ পর্যন্ত আমি তাঁকে নিষেধ করলাম বাড়িতে আসতে। আসলে বাবা, এখানে কোনও পুরুষমানুষ যদি ঘনঘন আসে তাহলে নানান কুকথা উঠবে। আমরা মায়ে-মেয়েতে থাকি তো।'

'সে তো নিশ্চয়ই।' স্বপ্নেন্দু ঢোক গিলল।

'ওর বাবা যা রেখে গিয়েছেন তাতে মেয়ের চাকরি করার দরকার হয় না। কিন্তু মেয়ে সে কথা শুনলে তো! এখন একটা ভালো ছেলে পেলে বেঁচে যাই।'

হেনা চাপা গলায় বললেন, 'আঃ মা! তুমি আবার আরম্ভ করলে!'

প্রৌঢ়া স্বপ্নেন্দুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওই দ্যাখো, বলতেই আপত্তি। কিন্তু—।'

'কোনও কিন্তু নয়। এখন ভেতরে গিয়ে রামের মাকে বলো কফি করতে।'

কিন্তু স্বপ্নেন্দু উঠে দাঁড়াল, 'মাফ করবেন। আমি কফি খাব না। মানে একটু আগে চা খেয়েছি তো।'

'ও অন্য জায়গায় চা খেয়ে আমার কাছে এসেছেন?'

'না। মানে, ঠিক আছে, আর একদিন খাব।'

'আর একদিন খাবেন মানে? শুনলেন না মা একটু আগে কি বলল। ঘনঘন এ-বাড়িতে এলে পাঁচজনে কুকথা বলবে।' হেনা সেন আবার হাসিতে ভেঙে পড়লেন। স্বপ্নেন্দু ঠোঁট কামড়াল। তাকে স্পষ্ট বলে দেওয়া হচ্ছে আর কখনও এই বাড়িতে এসো না।

প্রৌঢ়া অবশ্য বলে উঠলেন, 'ছি, এভাবে ঠাট্টা করতে হয়!'

হেনা সেন বললেন, 'আমি যে ঠাট্টা করলাম তা উনি বুঝতে পেরেছেন। সত্যি চা-কফি খাবেন না?'

স্বপ্নেন্দু মাথা নাড়ল, 'চলি। আবার দেখা হবে।'

হেনা সেন বলে উঠলেন, 'আপনার রুমাল পড়ে রইল ওখানে।'

স্বপ্নেন্দুর খেয়াল হল। সে কয়েক পা ফিরে এসে রুমালটাকে তুলে নিল। এতসব সত্ত্বেও তার খুব ইচ্ছে করছিল হেনা সেনের হাতে টাটকা লাল গোলাপটা তুলে দিতে। কিন্তু এইসব কথাবার্তা আর প্রৌঢ়া মহিলার সামনে সেটা দেওয়া অসম্ভব। ওঁরা দরজা পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দিলেন। সিঁড়িতে পা দেওয়ার আগে স্বপ্নেন্দু শুনল হেনা বলছেন, 'ঝামেলাটা নিজের কাঁধে না রেখে দিলেন বস্তির ওপর চাপিয়ে দিন। আপনার কী দরকার মেয়ে অপ্রিয় হওয়ার।'

নির্জন রাস্তা দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে স্বপ্নেন্দু উদাস হল। হেনা সেন তার সঙ্গে যতই

রসিকতা করুন না কেন শেষ সময়ে যে কথাটা বললেন তাতে স্পষ্ট বোঝা যায় ওর প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি আছে। কোনও-কোনও মানুষের এটা বাহ্যিক স্বভাব থাকে পরিহাস করার, কিন্তু ভেতরের আন্তরিকতা যখন বেরিয়ে আসে তখন বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না। হেনা সেই রকমের মেয়ে।

বুঁদ হয়ে হাঁটছিল স্বপ্নেন্দু। লাল জামা লাল শাড়ি সাদা নিটোল ডানার মতো কাঁধ থেকে হাত নেমে এসেছে যার সেই মেয়ে তার চোখের সামনে ভেসে বেড়াচ্ছিল। রুমালটাকে নাকের নিচে নিয়ে আসায় সে আবার হেনা সেনের শরীরের ঘ্রাণ আকণ্ঠ নিতে পারল।

বাড়ি ফিরে স্বপ্নেন্দুর খেয়াল হল আজ রান্না-বান্না বন্ধ। ওর রাতদিনের কাজ করে যে লোকটা সে দেশে গেছে কার অসুখের খবর পেয়ে। সামনে দুদিন ছুটি বলে স্বপ্নেন্দু আপত্তি করেনি। সন্ধেটা এমন ঘোরে কেটে গেল যে এসব কথা মনেও আসেনি। এখন রাত্রে হরিমটর।

দরজা খুলে সে শোওয়ার ঘরে এল। একটা ফুলদানি নেই যেখানে গোলাপটাকে রাখা যায়। টেবিলে একটা সুন্দর কাচের বাটি ছিল, স্বপ্নেন্দু তার মধ্যে ফুলটাকে বসিয়ে দিল। একটুও টসকায়নি সেটা, তেমনি উদ্ধত এবং আদুরে। আর কী টকটকে লাল। কী খেয়াল হতে বাটিটাকে উলটো করে বসিয়ে দিতে স্বপ্নেন্দু আবিষ্কার করল ফুলের রং কাচের আবরণ ভেদ করে বেরিয়ে আসছে। আরও রহস্যময় দেখাচ্ছে। সামান্য দূরে সরে কাচ-চাপা ফুলটাকে দেখল সে। ঠিক মধ্যিখানে গর্বিত ভঙ্গিতে ফুলটা রয়েছে।

এক কাপ কফি আর কয়েকটা বিস্কুট খেয়ে শুয়ে পড়ল স্বপ্নেন্দু। আজ সারাদিনে অনেক ঘটনা ঘটে গেল। চারদিকে শুধুই নোংরামো, একমাত্র ব্যতিক্রম হেনা সেন। কিন্তু তাঁর কাছে আগের অফিসের কোনও অফিসার প্রায়ই যেত! লোকটাও কি হেনার প্রেমে পড়েছিল? মনে-মনে খুব জেলাস হয়ে উঠল সে। হেনা লোকটাকে বাড়িতে আসাতে আপত্তি করতেন কেন? হেনারও কি দুর্বলতা ছিল? স্বপ্নেন্দুর অস্বস্তি শুরু হল। তার খেয়াল হল হেনা স্বইচ্ছায় ট্রান্সফার চেয়ে এই অফিসে এসেছেন। দুর্বলতা থাকলে নিশ্চয়ই তা করতেন না।

কিন্তু অফিসের পরিবেশটা জঘন্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর চেয়েও কোনও কলেজে মাস্টারি নিলে অনেক বেশি আরামে থাকা যেত। আসলে এখন মানুষের লোভের কোনও সীমা নেই। চাই আরও চাই। যেমন আত্রেয়ী। একসময় যেটাকে সুখ বলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এখন সেটা থেকে মুক্ত হতে চাইছে। সে সুখের মালা যেন ফাঁস হয়ে বসেছে গলায়। আসলে সেখানেও একটা অতৃপ্তি, যা অন্য লোক থেকে মনে জন্মেছে। স্বপ্নেন্দু শুয়ে-শুয়ে হাসল। আজ পৃথিবীর সমস্ত মানুষ কোনও-না-কোনও লোভের শিকার। কাকে দোষ দেবে। এই নিয়ে মানিয়ে-গুছিয়ে জীবনটা কাটিয়ে দিতে হবে। সে নিজেও তো লোভার্ত হয়ে হেনা সেনের বাড়িতে ছুটে গিয়েছিল। অথচ যাওয়ার আগে কতকগুলো বাহানা তৈরি করতে হয়েছিল নিজের কাছে কৈফিয়ত দিতে। নিশ্বাস ফেলেছিল মৃদু তালে স্বপ্নেন্দু। তার তিনতলার ঘরে অল্প-অল্প হাওয়া আসছে। মাথার ওপর ফ্যানটা ঘুরছে না। কলকাতা শহর কখন যে বিদ্যুৎহীন হয়ে গেছে তা টের পায়নি। স্বপ্নেন্দুর চোখের সামনে লাল শাড়ি লাল জামা। শিশুর মতো ঘুমিয়ে পড়ল তাই নিয়ে।

সেই মধ্যরাতে কলকাতার বায়ুমণ্ডলে গুরুতর প্রতিক্রিয়া শুরু হল। কোন হঠাৎ সরে আসা নক্ষত্রের আকর্ষণে পৃথিবীর এই বিশেষ শহরটি উত্তপ্ত হয়ে উঠল। সামান্য ভূমিকম্প অনুভূত হওয়ায় কলকাতার মানুষের ঘুম ভেঙে গেল। স্বপ্নেন্দু লাফিয়ে বিছানায় উঠে বসে দেখল জানলা দিয়ে প্রচণ্ড তপ্ত বাতাস ঘরে ঢুকছে। এত তার তাপ যে গায়ে ফোস্কা পড়ে যাচ্ছে। এবং সমস্ত শহর জুড়ে মানুষের চিৎকার শুরু হয়েছে। যারা ভয় পেয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল তারা আবার একটা আচ্ছাদন খুঁজছে। মানুষের আর্তনাদে শহরটা উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। টলতে-টলতে জানলা বন্ধ করে দিতে যেটুকু সময় তাতেই সমস্ত শরীর ঝলসে গেল স্বপ্নেন্দুর। চিৎকার করে উঠল সে। মনে হচ্ছিল অন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বন্ধ ঘরেও উত্তাপ কমছিল না। স্বপ্নেন্দু হাত-মুখ ঘষতেই অনুভব করল চামড়া উঠে আসছে। উন্মাদের মতো সে বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। বিছানাটা গরম। কিন্তু আশ্চর্য, পোড়েনি।

জ্ঞান ফেরার পর স্বপ্নেন্দুর প্রথম খেয়াল হল সে বেঁচে আছে। আর আশ্চর্য, তার শরীরে সেই প্রচণ্ড জ্বলুনিটা নেই। প্রথমে মনে হল কাল রাত্রে সে একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছিল। যা শুনেছিল, তা স্বপ্নে! হাতটা মুখে ঘষতে গিয়ে সে চমকে উঠল। স্পর্শ পাচ্ছে না। হাড়ে-হাড়ে যেন সামান্য শব্দ হল। তড়াক করে লাফিয়ে উঠল স্বপ্নেন্দু। লাফাতে গিয়ে শরীরটাকে এতটা হালকা লাগল যে পড়ে যেতে-যেতে সামলে নিল। তারপর নিজেকে দেখে চিৎকার করে উঠল। রাত্রে পাজামা পরে শুয়েছিল স্বপ্নেন্দু। এখন উঠে দাঁড়াতেই সেটা খুলে পড়ে গেল। স্বপ্নেন্দুর গলা থেকে একটা জান্তব শব্দ বেরিয়ে এল। পাগলের মতো সে ছুটে গেল বিশাল আয়নার সামনে। তারপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল মাটিতে। পড়ে স্থির হয়ে গেল।

চেতনা ফিরতে স্বপ্নেন্দু আবার উঠে বসল। তার শরীরে কোথাও মাংস নেই, রক্ত নেই, চামড়া নেই। এমনকী শিরা-উপশিরা পর্যন্ত নেই। শুধু শরীরের খাঁচাটা আস্ত রয়েছে। আর শুনছে হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ। ঘড়ির মতো শব্দ করে চলছে সেটা। স্বপ্নেন্দুর মনে হল সে দুঃস্বপ্নটা এখনও দেখে যাচ্ছে। একটু-একটু করে উঠে দাঁড়িয়ে সে চলে এল আয়নার সামনে। মেডিক্যাল কলেজে এইরকম কঙ্কাল দেখেছে সে। আয়নায় একটা কঙ্কালের ছবি ফুটে উঠেছে। ঘাড় ঘুরিয়ে এপাশ-ওপাশ দেখছে কঙ্কালটা। আবার ঠিক কঙ্কালও না! কারণ বুকের খাঁচার মধ্যে ওটা কী। কালচে মতন একটা হৃৎপিণ্ড দেখতে পেল সে। সে দেখতে পাচ্ছে কিন্তু তার চোখ নেই। ডান হাতটাকে ধীরে-ধীরে ওপরে তুলে হৃৎপিণ্ডটাকে ছুঁতে যেতে সেটা শব্দ করে উঠল। সন্তর্পণে হাত বুলিয়ে বোঝা গেল কালচে হৃৎপিণ্ডটাকে একটা অদৃশ্য শক্ত বস্তু ঘিরে রেখেছে। নিরেট অথচ অদৃশ্য গোলকটির শরীরে আঘাত করল সে কিন্তু একটুও ব্যথা লাগল না। আয়নার খুব কাছে চলে এল স্বপ্নেন্দু। একটি পাঁচ ফুট নয় ইঞ্চির কঙ্কাল তার সামনে দাঁড়িয়ে। তার কোথাও-কোথাও কালচে চামড়া আটকে আছে। কিন্তু সামান্য রক্তমাংসের চিহ্নও নেই।

চোখের গর্তে গর্ত আছে, কিন্তু চোখ নেই। অথচ দেখতে সামান্য অসুবিধে হচ্ছে। সোজাসুজি ছাড়া বাকিটা অদৃশ্য থেকে যাচ্ছে। ডাইনে-বাঁয়ে দেখতে হলে মুখ ঘোরাতে হচ্ছে। নাক আছে কিন্তু কোনও ঘ্রাণশক্তি নেই। জোরে-জোরে নিশ্বাস ফেলল সে। হৃৎপিণ্ডের আরাম হল কিন্তু কোনও গন্ধ পেল না।

মুখ হাঁ করল স্বপ্নেন্দু। জিভ নেই কিন্তু দাঁত আছে। অথচ দাঁতের গোড়ায় মাংস না থাকায় সেগুলোকে নগ্ন বীভৎস দেখাচ্ছে। শরীরের নিম্ন অংশের দিকে তাকাল সে। তলপেট থেকে দুটো শক্ত মোটা হাড় দুপাশে ছড়িয়ে পা হয়ে নিচে নেমে গেছে। তার যৌন অঙ্গ ইত্যাদির চিহ্নমাত্র নেই।

স্বপ্নেন্দু এইসব ভাবতে-ভাবতে কপালে হাত রাখল। তার মাথার মধ্যে কি চিন্তা করার নার্ভগুলো কাজ করছে? ব্রেইনবক্স কিংবা ক্রানিয়ামের ভেতরে কি মস্তিষ্ক অটুট আছে? নিশ্চয়ই আছে। তার ক্রানিয়াম মস্তিষ্ককে বাঁচিয়ে রেখেছে। নইলে সে এতসব ভাবতে পারছে কী করে।

স্বপ্নেন্দু থরথর করে কেঁপে উঠল। এই কি সে? এই কালচে শুকনো চামড়া মাঝে-মাঝে সেঁটে থাকা কঙ্কাল? খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে সে নিজের মাথাটাকে দেখতে চেষ্টা করছিল। হ্যাঁ তাইতো। মা মারা যাওয়ার পর মাথা ন্যাড়া করেছিল। তখন আয়নার সামনে দাঁড়ালে মাথার আকৃতিটা যেমন দেখাত এখন অনেকটা সেইরকমই লাগছে। তবে আকারে ছোট হয়ে গেছে কিন্তু আদলটা পালটায়নি।

বন্ধ দরজার দিকে তাকাল স্বপ্নেন্দু। তার হঠাৎ খুব ভয় করতে লাগল। সে মরে যায়নি। কিন্তু এইভাবে কঙ্কাল হয়ে বেঁচে থাকার কথা কে কবে শুনেছে। পাঁচজনের সামনে বের হলে কী প্রতিক্রিয়া হবে সবার? স্বপ্নেন্দুর হৃৎপিণ্ড কেঁপে উঠে কান্নাটা ছিটকে এল। সামান্য শব্দ হল কিন্তু এক ফোঁটাও অশ্রু বের হল না। চোখের জল নেই অথচ আলোড়িত হৃৎপিণ্ড ঠিক কেঁদে যাচ্ছে। শব্দটার কথা খেয়াল হতে সে সচকিত হল। তার উদর নেই, পাকস্থলী নেই। ধমনী, গ্রন্থি, নালী, পিত্ত, বস্তি, অন্ত্র, যকৃৎ কিছুই নেই। তবু শব্দটা হল। শব্দটা যে মুখ থেকে বের হয়নি এ ব্যাপারে সে স্থির নিশ্চিত। তাহলে? বিছানায় এসে বসল স্বপ্নেন্দু তারপর খুব সন্তর্পণে কথা বলার চেষ্টা করল 'স্বপ্নেন্দু?'

অবিকল নিজের গলাটা শুনতে পেল সে। শুনতে পেল কী করে? তার কি শ্রবণ-ইন্দ্রিয় কাজ করছে? স্বরযন্ত্র যার নেই সে কথা বলে কী করে? বিশ্বাস হল না ঠিক, স্বপ্নেন্দু আবার একটু জোরে চিৎকার করে ডাকল, 'স্বপ্নেন্দু।'

আঃ। সত্যি। সে কথা বলতে পারছে। স্বপ্নেন্দু বিছানায় শুয়ে চোখ বন্ধ করতে গিয়ে খেয়াল করল তার অক্ষিগোলক নেই তাই চোখের পাতা থাকার কথা নয়। তার মানে কখনও ঘুমুতে পারবে না সে। ঘুমুতে পারবে না কিন্তু কথা বলতে পারবে। আচ্ছা, তার কথা কি সামান্য নাকি-নাকি শোনাচ্ছে? ছেলেবেলায় গল্পের বইতে কঙ্কালদের যেরকম চন্দ্রবিন্দু দিয়ে কথা বলতে দেখত সেইরকম? সে আর-একবার শব্দ করল। খুব স্বাভাবিক শোনাচ্ছে না স্বর। প্রথমবার আনন্দে ঠাওর হয়নি কিন্তু এখন মনে হচ্ছে নাকি ভাবটা আছে। কিন্তু স্বরটা বের হচ্ছে কোত্থেকে? দ্বিতীয়বার পরীক্ষা করতে গিয়ে স্বপ্নেন্দুর কাছে ধরা পড়ল। ওই প্রচণ্ড শক্ত অথচ অদৃশ্য গোলাকার বস্তুটি যা বুকের খাঁচায় হৃৎপিণ্ডটাকে আড়াল করে রেখেছে, শব্দটা আসছে ওর ভেতর থেকে। সে কি শুনতে পাচ্ছে ওই গোলকটির কারণে? মাথাটাকে যতটা সম্ভব বুকের কাছাকাছি নামিয়ে সে কথা বলল। হ্যাঁ, এটাই সত্য। তার শরীরটাকে সচল রাখার সমস্ত জাদু ওই অদৃশ্য গোলকের মধ্যে রয়েছে। শরীর বলতে শুধু এই হাড়গুলো। অত্যন্ত যত্নে সে গোলকটির গায়ে হাত বোলাল। তারপর গুনগুন করে উঠল, 'এই আকাশে আমার মুক্তি আলোয় আলোয়'। কী চমৎকার!

তার স্বরে সুর আছে। একেই তো গান বলে। অথচ এতকাল সে একটা লাইনও সুরে গাইতে পারেনি।

সারাটা দিন স্বেচ্ছাবন্দি হয়ে কাটিয়ে দিল স্বপ্নেন্দু। মাঝে-মাঝে বাইরে থেকে চিৎকার, কান্না ভেসে আসছে! ব্যাপারটি কী জানার জন্যে তার কৌতূহল হলেও সে বিছানা ছাড়ল না। নিজের অতীতের শরীরটার জন্যে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। তার দাড়ি কামাতে খুব বিরক্ত লাগত একথা ঠিক, কিন্তু কামানো হয়ে গেলে গালটা কী নরম লাগত! চিবুকের কাছটা কী আদুরে ছিল। শরীরের বিভিন্ন অংশের ছবি একটু-একটু করে মনে পড়ায় স্বপ্নেন্দু আরও ভেঙে পড়ল। এত বছর ধরে সযত্নে লালিত শরীরটা আজ এক লহমায় উধাও, এখন শুধু একটা কঙ্কাল তার পরিচয়। কিছুক্ষণ কাটা ছাগলের মতো ছটফট করলে সে। তারপর নেতিয়ে রইল বিছানায়।

বিকেল হয়েছে কখন? একফোঁটা ঘুম আসেনি চোখে। খিদের কোনও চিহ্ন নেই। স্বপ্নেন্দু ধীরে-ধীরে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে নিজেকে খুব হালকা বোধ করল। তারপর জানলার কাছে এসে সন্তর্পণে পাল্লাটা খুলতে নির্জন রাস্তাটা চোখে পড়ল। একটাও মানুষ নেই। গাড়ি-ঘোড়া চলছে না। এবং বাতাসে একটা ঘোলাটে ভাব। তারপরেই নজরে এল। ঠিক উলটোদিকের বাড়িটার গায়ে বেশ ঝাঁকড়া বটগাছ ছিল। বিকেলবেলায় পাখিরা তাতে হাট বসাত। সেই বটগাছটাকে চেনা যাচ্ছে না। পাতা নেই, ছোট ডালগুলো অদৃশ্য হয়েছে। শুধু মোটা গুঁড়িটা পুড়ে কালচে হয়ে রয়েছে। স্বপ্নেন্দুর অস্বস্তি হচ্ছিল। পৃথিবীটা পালটে গেল নাকি? সবকিছু কেমন অচেনা দেখাচ্ছে। এইসময় সে শক্ত হল। একটা মানুষ আসছে। খুব দ্রুত হাঁটছে লোকটা। অনেকটা কমিক ফিল্মের মতো। চ্যাপলিন এইরকম হাঁটতেন। লোকটা কে? কাছে আসতেই লোকটাকে দেখে হতভম্ব হয়ে গেল স্বপ্নেন্দু। পরনে ফুলপ্যান্ট, ওভারকোট, কিন্তু মাথাটা ন্যাড়া। চুল নেই, মাংস নেই। স্রেফ একটা কঙ্কালের মাথা। পায়ের দিকে নজর দিতে সে দেখল কিছুই নেই সেখানে। লোকটা মুহূর্তেই চোখের আড়ালে মিলিয়ে গেল।

জানলাটা বন্ধ করল স্বপ্নেন্দু। তার মানে, সে একা নয়। আরও কিছু মানুষের চেহারার এই পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু কজন মানুষের? এই ঘরে বসে থাকলে কিছুই জানা যাবে না। চাকরটা থাকলে তাকে ডেকে দেখা যেত।

স্বপ্নেন্দু আর পারল না। পায়জামায় দুটো পা গলিয়ে দড়িটা বাঁধতে গিয়ে দেখল সেটা কোমরে থাকছে না। অনেক কায়দার পর মোটামুটি ভদ্রস্থ হল। গেঞ্জিটা এখন ঢলঢল করছে। তার ওপর পাঞ্জাবিটাকে মনে হচ্ছে হ্যাঙারে ঝোলানো হয়েছে। অভ্যাসে চুলে হাত বোলাতে গিয়ে হোঁচট খেল সে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারা দেখে হঠাৎ হাসি পেয়ে গেল।

তুমি, স্বপ্নেন্দু, তোমার আসল চেহারা হল এই। অবিকল কাকতাড়ুয়া। এতকাল মাংস-চামড়ার দৌলতে খুব ফুটুনি করেছ। আসল বস্তুটিকে চাপা দিয়ে দিব্যি ঘুরে বেড়িয়েছ। তোমার মুখের গড়নে কিঞ্চিত গরিলাদের ছায়া আছে। তোমার পূর্বপুরুষ যে বনমানুষ ছিল এ থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়।

জুতোগুলোর দিকে তাকাল সে। ওগুলো এখন পায়ে সম্পূর্ণ বেমানান। ঢলঢল করবে, হাঁটা যাবে না। বরং হাওয়াইটা চেষ্টা করা যেতে পারে। পায়ে ঢুকিয়ে দেখা গেল

সেটা বেশ বড়, তবে হাঁটা যাচ্ছে। অভ্যেসবশে ঘড়ি পরতে গিয়ে জব্দ হল। স্টেনলেসের ব্যান্ডটা হাত গলে বেরিয়ে আসছে। ওটাকে ছোট করা দরকার। প্রায় ছত্রিশ ঘণ্টা হয়ে গেল কিন্তু দম ফুরোয়নি ঘড়িটার। এটাকে নিয়ে আর কী হবে।

আয়নার দিকে তাকিয়ে মনটা খুঁত-খুঁত করছিল। ন্যাড়া মাথাটা ভীষণ কটকটে লাগছে। চট করে একটা চাদর বের করে একটা পাক বুকে জড়িয়ে মাথাটা ঢেকে নিল স্বপ্নেন্দু। তারপর সন্তর্পণে দরজা খুলল।

বাতাসটা এখনও গরম। তবে সহনীয় হয়ে এসেছে। কয়েক পা হাঁটতেই সে চমকে উঠল। ডানদিকের মোড়ে একটা চায়ের দোকান ছিল। দোকানটা অবিকল রয়েছে। কিন্তু সেখানে বসে আছে গোটা পাঁচেক কঙ্কাল। কঙ্কালগুলোর সাইজ বিভিন্ন রকমের। কেউ খুব মোটা, কেউ রোগা, কেউ বেঁটে কেউ লম্বা। চায়ের দোকানের মালিক অবনীদাকে সে চিনত। ওদের মধ্যে অবনীদা কোনটে? অবনীদা বেঁটেখাটো গোল মাথার ভারি ভালো মানুষ ছিলেন। স্বপ্নেন্দু বেশ কিছুক্ষণ লক্ষ করার পর একটি কঙ্কালকে শনাক্ত করল। টেবিলের ওপর মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। স্বপ্নেন্দু আরও লক্ষ করল পাঁচজনের মধ্যে দুজন সম্পূর্ণ নগ্ন। প্রচণ্ড কুৎসিত দেখাচ্ছে তাদের। অবনীদার পরনে একটা ধুতি জড়ানো। ওপরে সেই শার্টটা। খাকি রঙের, দুদিকে পকেট।

এদের দেখে মন কিছুটা শান্ত হল। তার মানে সে একা নয়। এপাড়ার অনেকেরই এক অবস্থা। স্বপ্নেন্দু ধীরে এগিয়ে যেতে হঠাৎ একজনের নজর পড়ল। চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে, আস্ত মানুষ।'

'আস্ত মানুষ।' বাকি চারজন একসঙ্গে উচ্চারণ করল।

স্বপ্নেন্দু কাছাকাছি যেতেই অবনীদা টেবিল থেকে নেমে এদিকে তাকাল। স্বপ্নেন্দু জিজ্ঞাসা করল, 'অবনীদা।'

'আরে এ আমাকে চেনে দেখছি।'

'চিনব না কেন? আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না?'

'গলার স্বরটা তো চেনা-চেনা লাগছে। কে ভাই আপনি?'

'আমি স্বপ্নেন্দু।'

'স্বপ্ন?' অবনীদা এবার চিনতে পারল, 'ওঃ, তুমি। কী হল বলো তো, এ কী হল? আমরা কী করে বেঁচে আছি? এই অবস্থায় তো প্রেতেরা বেঁচে থাকে, আমরা কি সবাই প্রেত হয়ে গেলাম?' অবনীদা আর্তনাদ করল।

'সবাই?' স্বপ্নেন্দুর মাথাটা সামান্য এগিয়ে গেল।

'সবাই। এমনকী আমার তিন বছরের বাচ্চাটা পর্যন্ত। তার চেহারা দেখলে শিউরে উঠতে হয়। অত হেলদি বাচ্চাটা একটা কঙ্কাল হয়ে ঘুরছে।'

'পাড়াটা এত ফাঁকা লাগছে কেন? কেউ মারাটারা গেল নাকি?'

'ফাঁকা? কাল সারারাত, আজ সারাদিন তো লোকে পাগলের মতো ছোটাছুটি কান্নাকাটি করেছে। এখন যে যার বাড়িতে ঢুকেছে, কারণ যদি সন্ধে হতেই আবার কালকের সেই গরম লাভার মতো কিছু কলকাতার ওপর বয়ে যায়। একবার তো মাংসমজ্জা শুষে নিয়ে গিয়েছে, এখন তো হাড়গুলো ছাড়া আমাদের আর কিছু নেই।'

অন্য লোকগুলো কেউ কথা বলছিল না। এবার একজন বলল, 'আজ সন্ধে সাতটায়

রেডিও খুলবেন। মুখ্যমন্ত্রী রেডিও থেকে এই বিষয়ে ভাষণ দেবেন।'

'মুখ্যমন্ত্রী? মুখ্যমন্ত্রী বেঁচে আছেন?'

'বাঃ বেঁচে থাকবেন না কেন? আমরা কেউ মারা যাইনি।'

'কিন্তু কী করে জানতে পারলেন যে উনি ভাষণ দেবেন?'

'তুমি কি এইমাত্র বের হলে?' অবনীদা জিগ্যেস করল।

'হ্যাঁ।'

'বিকেলে পুলিশের জিপ মাইকে বলে গেল।'

'পুলিশ?'

'হ্যাঁ। তারা ইউনিফর্ম পরে এসেছিল বটে কিন্তু শরীরের হাল আমাদের মতো। দেখি মুখ্যমন্ত্রী কী বলেন।'

'আপনার এখানে রেডিও আছে?'

'হ্যাঁ। চালালে এখন কোনও শব্দ হচ্ছে না। হয়তো স্টেশন খোলেনি। কিন্তু আগে ঢাকা দিল্লি গৌহাটি ধরতে পারতাম। এখন কিছুই আসছে না।'

'ব্যাটারি ঠিক আছে তো?'

'হ্যাঁ, সেটা দেখে নিয়েছি। তুমি দাঁড়িয়ে কেন, বসো।'

ওরা জায়গা করে দিলে স্বপ্নেন্দু বেঞ্চিতে বসল। সন্ধে হয়ে গেছে। কিন্তু চারধার অন্ধকারে ঢেকে যায়নি। রাস্তার আলোগুলো জ্বলছিল। স্বপ্নেন্দু বুঝল কাল রাত থেকেই জ্বলছে। আজ সকালে নেভানো হয়নি। সে আড়াচোখে লোকগুলোর দিকে তাকাল। প্রত্যেকের বুকের খাঁচায় কালচে হৃৎপিণ্ড দেখা যাচ্ছে। একজন অন্যমনস্ক হয়ে সেখানে হাত দিতে গিয়ে বাধা পেল। অর্থাৎ সেই অদৃশ্য খোলকে প্রত্যেকের হৃৎপিণ্ড আবদ্ধ। এক-একজনের মাথার করোটিও এক একরকম। কোনটা বেশি লম্বা, কোনটা সামনের দিকে ছুঁচলো। মুখের হাড়ের গঠনে বনমানুষের স্পষ্ট ছাপ। অবনীদার মুখে বেশ গরিলা-গরিলা ভাব আছে। তবে প্রত্যেকের করোটি বেশ মোটা।

স্বপ্নেন্দু দেখল চায়ের উনুনে আঁচ পড়েনি। জিনিসপত্র চারপাশে অবহেলায় ছড়ানো। সে জিগ্যেস করল, 'অবনীদা, আপনার দোকানের ছেলেটা আসেনি?'

'এসেছিল।' মাথা নাড়ল অবনীদা, 'আর ওকে দিয়ে আমার কী হবে। ওই উনুন ধরিয়ে আর কী হবে। চা খাওয়ার মানুষ কোথায়। আমি একেবারে শেষ হয়ে গেলাম ভাই। ধনেপ্রাণে শেষ।'

এক ব্যক্তি বলল, 'মানুষ কাজ করে পেটের জন্যে। সেই প্রয়োজন না থাকলে কী হবে কাজ করে। এ দায় থেকে বাঁচা গেল।'

'যা বলেছেন। আজ সারাদিন কিছুই খাইনি। অথচ দেখুন, আমার একটুও খিদে পাচ্ছে না। অথচ আমার পেটে আলসার ছিল। ডাক্তার বলেছিলেন নিয়ম করে খেতে। একদম যেন খালি পেটে না থাকি। তা পেটই যখন নেই।'

এইসময় তৃতীয়জন হেসে উঠল। সামান্য শব্দ হল। স্বপ্নেন্দু অবাক হয়ে লোকটাকে দেখল। সম্পূর্ণ উলঙ্গ। এই অবস্থায় কোনও মানুষ হাসতে পারে! আমাদের সব গিয়েছে কিন্তু প্রাণ এবং কঙ্কালটা আছে। তাই কীভাবে হাসি আসে? তারপরেই ওর খেয়াল হল, কালকের পর এই প্রথম সে হাসি শুনল। হাসির যদি অপব্যবহারও হয়ে থাকে তাহলেও

হাসি ইজ হাসি। তবু লোকটার দিকে তাকিয়ে তার অস্বস্তি হচ্ছিল। সে শান্ত স্বরে বলল, 'আপনার একটা পোশাক পরা উচিত ছিল।'

'উচিত ছিল?' লোকটা আবার খুকখুক করে হাসল, 'কেন উচিত ছিল?'

'পোশাক পরা কেন উচিত ছিল তা জিগ্যেস করছেন?'

'আগে করতাম না। এখন করছি। এখন আমার কোনও গোপন অঙ্গ নেই যে তাকে ঢেকে রাখব। এখন শীতকাল নয় যে হাড় কনকন করবে ঢেকে না রাখলে। গরমের সময় খোলাখুলি থাকলে আরাম হবে। হাওয়া এপাশ থেকে ওপাশে বইলে হাড় জুড়োবে। আপনি বললেই আমাকে শুনতে হবে?' খুকখুকিয়ে হাসল লোকটা।

অবনীদা বলল, 'অরবিন্দ, তুমি যা বললে তা, খুব মিথ্যে নয়। তবে কিনা চোখেরও তো একটা ব্যাপার আছে। দেখতে বড় খারাপ লাগে।'

'সে আলাদা কথা। উনি উচিত বলছেন। উচিত বলার কি? মুখ্যমন্ত্রী নাকি?'

স্বপ্নেন্দু বলল, 'মুখ্যমন্ত্রী বললে শুনতেন?'

'এই দ্যাখো আমরা এখানে কী জন্যে বসে আছি? মুখ্যমন্ত্রী সাতটার সময় রেডিওতে কিছু বলবেন বলেই তো। আমরা তো তাঁর কথা শুনব।'

স্বপ্নেন্দু আর কথা বাড়াল না। এক-একটা লোক থাকে ঝগড়াটে টাইপের। যে কোনও ছুতো পেলে তাদের জিভ লকলকিয়ে ওঠে। এতবড় একটা পরিবর্তন হয়ে গেল তবু লোকটার স্বভাব পালটাল না।

স্বপ্নেন্দু আবার লোকগুলোর দিকে তাকাল। সম্পূর্ণ ভৌতিক দৃশ্য। একদিন আগে হলে তবু লোকটার এইরকম চেহারার সঙ্গে বসে আছে ভাবলে বুক শুকিয়ে যেত। এই সময় অবনীদা রেডিওটাকে খুলে দিলেন। সেই কু শব্দ শুরু হয়েছে। এখন বেশ চুপচাপ চারধার। গরম বাতাসটা থেমে গেছে। রেডিওর স্টেশন শুরু হওয়ার সিগন্যালটা বন্ধ হয়ে পুরুষকণ্ঠ শোনা গেল, 'আকাশবাণী কলকাতা। বিশেষ ঘোষণা। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে গতকাল থেকে আকাশবাণীর নিয়মিত অধিবেশন বন্ধ রাখতে হয়েছিল বলে আমরা দুঃখিত। এখন সমস্ত কলকাতাবাসীর কাছে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিশেষ বক্তব্য রাখবেন।' কয়েক সেকেন্ড নীরবতার পর মুখ্যমন্ত্রীর পরিচিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'বন্ধুগণ। আমরা অভূতপূর্ব একটি পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে বাধ্য হয়েছি। পৃথিবীর ইতিহাসে কখনও এমন ঘটনার কথা এর আগে শোনা যায়নি। গতকাল রাত সাড়ে দশটার সময় হঠাৎ দূর মহাকাশের একটি নক্ষত্র স্থানচ্যুত হয়। তারই আকর্ষণে পৃথিবীর একাংশে প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। আমাদের দুর্ভাগ্যের কিংবা সৌভাগ্যের বিষয় সেই একাংশটি হল কলকাতা শহর। হঠাৎ বাতাস উত্তপ্ত হয়। এবং পরমাণু বিস্ফোরণের প্রতিক্রিয়া অথবা আগ্নেয়গিরি থেকে উদ্ভূত লাভার মতো একটি হাওয়া কলকাতার ওপর বয়ে যাওয়ায় মানুষের শরীর থেকে রক্ত-মাংস-ধমনি অদৃশ্য হয়ে যায়। শুধু মানুষ নয়, কলকাতার যত পশু-পাখি ছিল তাদেরও এই হাওয়া শিকার করে। মানুষ এবং সুগঠিত প্রাণীরাই শেষ পর্যন্ত জীবিত থাকতে পেরেছেন। সেই সময়ে চালু থাকা কিছু ক্যামেরায় ধরা পড়ে অদৃশ্য লাভার রং ছিল কালো।

'মাত্র আধঘণ্টা ওই লাভাস্রোতের স্থায়িত্ব কিন্তু তার মধ্যেই আমাদের পরিচিত মানবীয় চেহারা লুপ্ত হয়। কলকাতার চৌহদ্দিতে যত গাছপালা, ফুলের বাগান এবং ঘাস

ছিল সব ছাই হয়ে যায়। এই মুহূর্তে আমরা বাইরের পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন। আমি আমাদের বিজ্ঞানীদের বলেছি তাঁরা যেন অবিলম্বে বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। আমি তাঁদের এও বলেছি প্রকৃতিক পরিবর্তনের হেতু আমাদের শারীরিক পরিবর্তন হয়েছে। কোনও অবস্থায় আবার আগের চেহারায় আমরা ফিরে যেতে পারি কি না।

'বন্ধুগণ। আমি জানি এই পরিবর্তন মেনে নেওয়া খুব কঠিন। এতদিন আমরা যে শরীর দেখে অভ্যস্ত হয়েছি তার ব্যতিক্রম অবশ্যই পীড়া দেবে। কিন্তু জনসাধারণকে অনুরোধ করছি, এই যে পরিবর্তন ঘটে গেল তা আপাতত অনেকগুলো সমস্যা থেকে মুক্তি দেবে। প্রথমত, খাদ্যবস্তুর অভাব আমরা অনুভব করব না। পৃথিবীতে আমরা জন্মগ্রহণ করি এবং জীবিত থাকি কিছু কাজ করবার জন্যে। যা দেশের উপকারে লাগে এবং মনের শান্তি হয়। কিন্তু এতদিন আমরা শরীর টিকিয়ে রাখতে অনেক বাজে সময় ব্যয় করতাম। খাদ্য উৎপাদন এবং সমগ্র সেই খাদ্যকে পরিপাকের উপযোগী করে নিতে অনেক সময় এবং অর্থ নষ্ট হতো। এখন আমাদের আর এসব নিয়ে ভাবতে হবে না। এ মুহূর্তে আমাদের হাতে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ এবং আধুনিক জীবনের যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তু মজুত আছে। আমি কলকাতাবাসীর কাছে আন্তরিক আবেদন করছি তাঁরা যেন অবিলম্বে, স্বাভাবিক কাজকর্মে যোগ দেন। যে যা করছিলেন এতকাল আগামীকাল থেকেই সেইসব কাজ শুরু করেন। শারীরিক পরিবর্তনের কারণে যাঁরা কর্মচ্যুত হবেন সরকার তাঁদের সমস্ত দায়িত্ব নেবে। আমরা স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী হয়েছি, আপনারা সাহায্য করুন। কাল থেকে যে যার কাজে যোগ দিন।

'বন্ধুগণ, প্রথমেই আমি বলেছি কলকাতা দুর্ভাগ্য কিংবা সৌভাগ্যের অধিকারী। কেন সৌভাগ্য তা ব্যাখ্যা করা দরকার। এতকাল এই যুক্তরাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এবং সামাজিক পরিবেশে আমরা অনেক কাজ ইচ্ছে থাকলেও করতে পারিনি। আমরা একটা বিপ্লবের স্বপ্ন দেখতাম। কিন্তু পরিস্থিতি আমাদের অনেক দূরে থাকতে বাধ্য করেছিল। গতরাত্রে আমরা সেই সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছি। এই শারীরিক পরিবর্তন আমাদের কী-কী সুবিধে এনে দেবে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যায় না গিয়েও প্রধান কয়েকটি কথা জানাচ্ছি। এখন থেকে মানুষের সঙ্গে মানুষের কোনও শারীরিক পার্থক্য থাকবে না। কালার প্রবলেম বা গায়ের চামড়ার পার্থক্যপ্রসূত যে ব্যবধান তা দূর হবে। কলকাতার মানুষের চেহারা এক হয়ে যাওয়ায় কোনও সাম্প্রদায়িক সংঘাত হবে না। খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে। তাছাড়া অর্থনীতির নানান পরিবর্তন আসতে বাধ্য।

'বন্ধুগণ! কেউ-কেউ আমার কাছে আর-একটি বিষয়ে আশংকার কথা ব্যক্ত করেছেন। শারীরিক পরিবর্তনের কারণে মানুষের প্রজনন ক্ষমতা লুপ্ত হওয়ায় আমাদের বংশধররা পৃথিবীতে আসবে না। এর ফলে কলকাতাবাসীরা একদিন লুপ্ত হবে। কিন্তু আমি বিজ্ঞানীদের সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁরা আমাকে জানিয়েছেন বিপ্লব আমাদের যা দিতে পারত না এই লাভাস্রোত তা আমাদের দিয়েছে। আমরা এখন অমৃতের সন্তান। মৃত্যুর কালো হাত আর আমাদের স্পর্শ করবে না। আমরা অমর। যতদিন পৃথিবী থাকবে ততদিন আমরা বেঁচে থাকব। এই মহান সম্মানের অধিকারী হওয়া যে সত্যি সৌভাগ্যের সেকথা বলাই বাহুল্য। তবু আমি বিজ্ঞানীদের অনুরোধ করেছি তাঁরা গবেষণা করুন। এমন একটা আবিষ্কার করুন, কলকাতাবাসীরা প্রজনন ক্ষমতার অধিকারী হয়। আপনারা

স্মরণ করুন, একদিন আগেও আমরা জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য প্রচার চালিয়ে এসেছি। ওই লাল ত্রিকোণ চিহ্নের কোনও প্রয়োজন আর আমাদের নেই। অতএব আমরা আবার জনসাধারণকে অনুরোধ করছি অবিলম্বে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফিরিয়ে আনুন। নমস্কার।'

এরপরেই ঘোষকের স্বর শোনা গেল, 'এতক্ষণ কলকাতাবাসীর উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। গ্রামোফোন রেকর্ডে রবীন্দ্র-সুর বাজানো হচ্ছে। স্বপ্নেন্দু উঠে দাঁড়াল। রেডিওতে তখন বাজানো হচ্ছে, 'হে নূতন, দেখা দিক আর বার।'

অবনীদা করোটি ঘুরিয়ে জিগ্যেস করল, 'চললে?'

'হ্যাঁ। একটু চারপাশ ঘুরে আসি।'

অবনীদা বলল, 'কী করব বুঝতে পারছি না। মুখ্যমন্ত্রী বললেন যে যার কাজে ফিরে যেতে। আমি যদি কাল থেকে উনুন ধরাই তাহলে চায়ের খদ্দের পাব? কে খাবে চা?'

অরবিন্দ নামক লোকটা বলল, 'তুমি তো দেখছি সত্যি ভালোমানুষ। আরে তোমার উনুন ধরানোর কী দরকার? খাওয়ার-দাওয়ার চিন্তা নেই। পায়ের ওপর পা তুলে দিনরাত গপ্পো করব। এই উনুনটা ভেঙে ফেলে এখানে ভালো আড্ডা মারার জায়গা করো। তোমার তো খাটুনি বেঁচে গেল।'

'দিনরাত গপ্পো করব? আমার তো সময় কাটবে না।'

স্বপ্নেন্দু বেরিয়ে এল। মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণের প্রতিক্রিয়া কি না কে জানে তবে এখন রাস্তায় নরকঙ্কাল দেখা যাচ্ছে। কেউ-কেউ কাঁদছে। কিন্তু বাকিরা খুব ভয়ে-ভয়ে চারপাশে তাকাচ্ছে। এইসব কঙ্কালেরা পোশাক পরেছে এলোমেলোভাবে। বিছানার চাদর কোমরে জড়িয়ে নিয়েছে কেউ। স্বপ্নেন্দু লক্ষ করল কোনও মহিলা কঙ্কাল নেই রাস্তায়। একটি শিশু কঙ্কালকে বুকের কাছে নিয়ে কুঁজো হয়ে যাওয়া একটি কঙ্কাল ফুটপাতে দাঁড়িয়ে মাথা নাড়ছে। স্বপ্নেন্দুকে দেখে লোকটা জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি রক্তমাংসের মানুষ?'

স্বরে বোঝা গেল লোকটা বৃদ্ধ। উত্তর না দিয়ে স্বপ্নেন্দু মাথা থেকে চাদরের আড়ালটা সরিয়ে দিতে বৃদ্ধ মাথা নাড়ল, 'ওঃ। একই অবস্থা। সব মানুষের একই হাল। এ যে নরক হয়ে গেল।'

'নরক বলছেন কেন? মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ শোনেননি?'

'শুনেছি। কিন্তু তাতে কি মন মানে? দুদিন আগে আমার বউ মারা গেছে। কী সৌভাগ্যবতী ছিল সে। রক্তমাংসের শরীর নিয়ে ড্যাং-ড্যাং করে চিতায় চড়ে গেল।' বুড়োর স্বরে কান্না মিশল।

'কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী বললেন আমরাই একমাত্র সৌভাগ্যবান।'

'সৌভাগ্য? কী জানি!'

'আজকে আপনার শরীরের কি পরিবর্তন লক্ষ করলেন?'

বৃদ্ধ এবার হাসল, 'তা হয়েছে বইকী। প্রস্রাব করতে খুব কষ্ট হতো। সেটা দূর হয়েছে। হাঁটতে গেলে পায়ের শিরায় টান ধরত, এখন হচ্ছে না।'

'তাহলে বলুন, আপনি অনেক ভালো আছেন।'

'আমার কথা ছেড়ে দাও। এই বাচ্চাটা। মোটে একবছর বয়স। এখনও ভালো করে হাঁটতে পারে না। এর কী হবে? এ কি কখনও বড় হবে?'

স্বপ্নেন্দু বলল, 'আমি জানি না।'

আর হাঁটতে তার ভালো লাগছিল না। শরীর যদিও হালকা তবু হয়তো অনভ্যাসে ক্লান্তি লাগছিল। স্বপ্নেন্দু বাড়িতে ফিরে এল। পায়ের তলাটা বেশ টনটন করছে। তার মানে এতকাল চামড়া এবং মাংসে যে আড়াল রেখেছিল তা না থাকায় ব্যথা হয়েছে।

ঘরে ঢুকে পাঞ্জাবিটা খুলতেই মন খারাপ হয়ে গেল আবার। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখল সে। এই কাঠামোটা তার? অথচ এতকাল এর অস্তিত্ব সম্পর্কে সে সজাগই ছিল না। স্বপ্নেন্দুর খেয়াল হল তার হাড়ের গায়ে মাঝে-মাঝে কালচে পোড়া চামড়া লেগে আছে। এগুলো পরিষ্কার করে ফেললে ভালো হয়। বাথরুমে ঢুকল সে। কল খুলতে অবাক হল সে। জল নেই। এক ফোঁটা জল বের হল না। এই বাড়ির ছাদে একটা ট্যাঙ্ক আছে। সারা দিনরাত জলের আজ পর্যন্ত কোনও অভাব হয়নি। তারপরেই মেরুদণ্ডের হাড় কেঁপে উঠল, কলকাতা শহরের সমস্ত জল গতকালের প্রতিক্রিয়ায় উধাও হয়ে যায়নি তো! জল ছাড়া কি চলছে। মুখ্যমন্ত্রী একবারও এ বিষয়ে কিছু বললেন না। জল হল জীবন, কলকাতায় যদি জল না থাকে—! নিজেকে গালাগাল দিল সে। এখনও উলটোপালটা ভেবে যাচ্ছে। কলকাতার মানুষের আর জলের প্রয়োজন নেই। এখন যে শরীর নিয়ে তাদের বেঁচে থাকতে হবে জল তার কোনও কাজেই লাগবে না। তোয়ালে দিয়ে শরীরটাকে পরিষ্কার করল সে। ক্রমশ হাড়গুলোর চেহারা পালটে যেতে লাগল। বেশ তকতকে দেখাচ্ছিল সেগুলো। আয়নার সামনে এসে দাঁড়াতেই নিজের শরীরটাকে একটু পছন্দসই বলে মনে হল। আর তখনই সুজিতের কথা মনে পড়ল। সুজিত গতকাল ফোন করে বলেছিল আজকে সন্ধ্যায় যেন সে যায়। এই চেহারা নিয়ে যাওয়া যায়? তা ছাড়া, সুজিত, সুজিতের কী অবস্থা? ও তো নামকরা চিত্রাভিনেতা। পাশের ঘরে টেলিফোন। খুব সন্তর্পণে ডায়াল করল স্বপ্নেন্দু। এটা এখনও কাজ করছে কি না কে জানে। কিন্তু ডায়াল টোন ছিল যখন স্বপ্নেন্দু শুনল ওপাশে রিং হচ্ছে। তারপরেই সুজিতের নার্ভাস স্বর কানে এল, 'হ্যালো।'

'সুজিত? আমি স্বপ্নেন্দু।'

'ওঃ!'

'তুমি কেমন আছ?'

'আমি? আমি শেষ হয়ে গেছি। কমপ্লিট ব্রোক। আয়নার সামনে দাঁড়াতে পারছি না। কী ভয়ঙ্কর! আমি এখন কী করব? ঘরের দেয়াল জুড়ে আমার যে সুন্দর ছবি সেদিকে তাকালে বুক জ্বলে যাচ্ছে। কেউ আর আমার দিকে ফিল্ম অ্যাক্টর বলে তাকাবে? জানলা দিয়ে দেখলাম রাস্তার মানুষজন আমারই মতো দেখতে। এমনকী আমার চাকরটার সঙ্গেও কোনও পার্থক্য নেই।'

'মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন বিপ্লবও এতটা সাফল্য আনত না।'

'রেখে দাও বিপ্লব। এখন আর টালিগঞ্জে কাজ হবে ভেবেছ। আমি আজ সারাদিন আমাদের লাইনের সবাইকে কন্ট্যাক্ট করার চেষ্টা করেছি। তুমি জানো মিস মিত্র আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন!'

'মিস মিত্র?'

'ওঃ, তুমি সিনেমা দ্যাখো না নাকি? বাংলার শ্রেষ্ঠ সুন্দরী নায়িকা। কিন্তু গলায়

দড়ি দেওয়া সত্ত্বেও ওর মৃত্যু হয়নি। শুধু ঘাড়ের হাড় ভেঙে যাওয়ায় মাথাটা হেলে রয়েছে! এ কী হল স্বপ্নেন্দু?'

'জানি না। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন মেনে নিতে।'

'তোমাদের আর কী। এ সব এখন বলতে বাধা নেই। দেহপট সনে নট সকলই হারায়। উঃ, ভগবান, কী যে করি!'

'তোমার ওখানে আজ আমার—'

'সেসব ক্যানসেলড। ইয়ার্কি ইচ্ছে? আমার ফ্রিজে গাদাগাদা খাবার। কালকে তিনটে রয়্যাল স্যালুট এনেছিলাম। সবচেয়ে দামি হুইস্কি। সব চোখের সামনে অথচ আমি খেতে পারছি না।' ওপাশে সজোরে রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ পেল স্বপ্নেন্দু।

এই প্রথম তার হাসি পেল। মিস মিত্র আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেও পারেননি। মিস মিত্র সত্যিই সুন্দরী। আর তখনই ওর মনে হেনা সেনের মুখ ভেসে উঠল। আজ সারাদিন নিজেকে নিয়ে এমন ব্যস্ত ছিল যে হেনার কথা মনেই পড়েনি। হেনা কেমন আছে? সঙ্গে-সঙ্গে চিৎকার করে উঠল স্বপ্নেন্দু। সেই লোভনীয় শরীর আর তার চলনের ভঙ্গিটা চোখের সামনে দেখতে পেল। না হতে পারে না। হয়তো হেনার ওদিকে অদৃশ্য লাভার স্রোত বয়ে যায়নি। হেনার তীক্ষ্ণ অথচ দীঘির মতো ভারী বুক এবং নিতম্ব, চোখের কারুকাজ স্বপ্নেন্দুর মাথায় কিলবিল করতে লাগল। আর তারপরেই একটা ভয় হৃৎপিণ্ডটাকে আঘাত করল। যদি হেনা সেন আক্রান্ত না হয়, যদি তার শরীর এখনও আগের মতো মাদকতা জড়ানো থাকে তাহলে? স্বপ্নেন্দু ঝিম হয়ে বসে রইল। না, তা হতে পারে না। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন কলকাতার ওপর দিয়ে সেই অদৃশ্য লাভা স্রোত বয়ে গিয়েছে। হেনা সেন কোনওভাবেই বেঁচে যেতে পারে না। ঠিক হল না কথাটা, হেনা সেনের আগের শরীরটা অটুট থাকতে পারে না। যদি হেনা সেন আগের মতো থাকে তাহলে সে কখনও তার সামনে দাঁড়াতে পারবে না। রক্তমাংসের ওই সুন্দরী কখনই একটি জীবন্ত কঙ্কালকে চোখ চেয়ে দেখতে পারবে না। ঘৃণা এবং ভয়ে মুখ ফিরিয়ে নেবে। স্বপ্নেন্দু স্পষ্ট অনুভব করল তার হৃৎপিণ্ড কাঁপছে। হেনা সেনের জন্যে অদ্ভুত একটা আকর্ষণ বোধ করছিল সে। ঈশ্বর নিশ্চয়ই এতটা কঠিন হবেন না। ওই অদৃশ্য লাভস্রোত নিশ্চয়ই হেনার বাড়ির ওপর দিয়ে বয়ে গেছে। এখন এই রাত্রে কিছু জানবার উপায় নেই। ওর বাড়িতে টেলিফোন আছে কি না তা জানে না স্বপ্নেন্দু। কাছাকাছি হলে না হয় হেঁটে যাওয়া যেত।

ভীষণ কাহিল লাগছিল। আলোটা নেভাতে গিয়ে থমকে গিয়ে দাঁড়াল সে। তার হৃৎপিণ্ড আবার কাঁপছে। শরীর স্থির। তারপর পায়ে-পায়ে সে এগিয়ে গেল টেবিলটার কাছে। কাচের বাতিটা টকটকে লাল হয়ে গেছে। উলটো করে বসানো বাটিটার মধ্যে সেই লাল গোলাপটাকে এখন আরও জীবন্ত দেখাচ্ছে। আরও টাটকা। এমনকী ওর নিটোল নরম পাপড়ির গায়ে সেই জলের ফোঁটাও চকচক করছে। লোভীর মতো ফুলের দিকে তাকিয়ে রইল স্বপ্নেন্দু। কী উদ্ধত ভঙ্গি রক্তগোলাপটার। হাত বাড়াল সে। কিন্তু তারপরেই কথাটা খেয়াল হল। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন কলকাতার কোনও গাছ কিংবা বাগান যদি বেঁচে না থাকে, মাঠের ঘাসগুলো যদি শুকিয়ে ছাই হয়ে গিয়ে থাকে তা হলে এই লাল গোলাপটা এখনও এমন গর্বিত ভঙ্গিতে বেঁচে আছে কী করে? স্বপ্নেন্দুর মনে হল, হয়তো সমস্ত

কলকাতায় এই একটিমাত্র জীবিত ফুল। যদি ওটা কোনও ফুলদানি কিংবা টেবিলে খোলা থাকত তা হলে আজ সকালে ছাই হয়ে যেত। কিন্তু কাচের পাত্রের নিশ্ছিদ্র আড়াল ফুলটাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। এবার প্রচণ্ড লোভীর মতো মাথাটাকে কাচের বাটির গায়ে নিয়ে গেল সে। পাপড়ির শরীরের কোষগুলোকে যেন অনুভব করতে পারছে সে। এই কলকাতার কোথাও এই মুহূর্তে আর কোনও উদ্ভিদ নেই শুধু এই ফুলটি ছাড়া। কিন্তু কতদিন এ এইরকম থাকবে? আসতে-আসতে তো শুকিয়ে মরে যাবেই। স্বপ্নেন্দু মাথা নাড়ল। না, কাল রাত্রের ওই ভয়ঙ্কর ঘটনার পরও যখন এ বেঁচে আছে তখন নিশ্চয়ই অনেককাল অটুট থাকবে। ওই কাচের বাটিটাকে সরালে চলবে না। কোনও অবস্থায় ওই বাটিতে হাত দেবে না সে। তাহলে ফুলটা বেঁচে থাকবে। ওকে যেভাবেই হোক বাঁচিয়ে রাখতে হবে। স্বপ্নেন্দু কাচের বাটিটার দিকে তাকাল খুব জোর হাওয়া বইলে কি ওটা উলটে যাবে? ঠিক ভরসা হয় না। সে চারপাশে তাকিয়ে দেখল। তারপর আরও একটা কাচের বড় জার এনে সেটাকে উলটে বাটিটাকে চাপা দিল সন্তর্পণে, যাতে দুটোয় ছোঁয়াছুঁয়ি না হয়ে যায়। তারপরে সে ফিরে এল বিছানায়। দুটো কাচের আড়ালে থাকলেও ফুলের লাল রঙটা বোঝা যাচ্ছে। স্বপ্নেন্দুর সেই রূপকথার গল্পটা মনে পড়ল। গভীর সমুদ্রের নিচে একটা ঝিনুকের বুকে কারও প্রাণ লুকনো ছিল। মনে হল ওই দুই কাচের পাত্রের আড়ালে জীবন্ত ফুলটা তার প্রাণ। কারণ ওটার দিকে তাকালেই হৃৎপিণ্ডটা অদ্ভুত শান্ত হয়ে যায়। কোনও চিন্তা মাথায় আসে না, শুধু একটা ভালো লাগায় বিভোর হতে হয়।

কাল সারাটা রাত ঘুম আসেনি। চেষ্টা করেছে স্বপ্নেন্দু, বিছানায় নিথর হয়ে পড়ে থেকেছে। কিন্তু ঘুমুতে পারেনি। তার চোখের পাতা কিংবা অক্ষিগোলক নেই। শোওয়া অবস্থায় সবসময় ঘরের ছাদটায় দৃষ্টি আটকে থেকেছে। এই দৃষ্টি বন্ধ করার কোনও কায়দা তার জানা নেই। শেষপর্যন্ত বুঝতে পেরেছে পরিবর্তিত অবস্থায় তাদের ঘুম আসবে না। ঘুম প্রয়োজন শরীরের। ঘুমন্ত অবস্থায় হৃৎপিণ্ড কাজ করে যায়। তাই শরীর যদি না থাকে তা হলে ঘুমের কী দরকার। অতএব খাবার, জল ইত্যাদির মতো ঘুমও তার জীবন থেকে চলে গেল।

মাঝরাত্রে খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। সে সারাজীবন ঘুমাতে পারবে না এটা চিন্তা করতেই অস্বস্তিটা বেড়ে যাচ্ছিল। অন্যমনস্ক স্বপ্নেন্দু পাশ ফিরে তাকাতেই সেই গোলাপের রংটা দেখতে পেল। আর অমনি তার চিন্তা স্থির হয়ে মিলিয়ে গেল। সে লক্ষ করেছে বেশি উত্তেজিত হলে হৃৎপিণ্ড কাঁপে। ফুলটার দিকে তাকালে সেই কাঁপুনি থেমে যায়। সুন্দর শান্তিতে রাতটা কেটে গেল, ঘুম নেই, কিন্তু ফুলটার দিকে তাকিয়ে থেকে তার একটুও কষ্ট হচ্ছিল না সকালে।

আজও ছুটি। তার কিছুই করবার নেই। রেডিওটা খুলতেই বাজনা শুনতে পেল সে। আর মাঝে-মাঝেই সরকারের পক্ষ থেকে কলকাতাবাসীদের কাছে আবেদন জানানো হচ্ছে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা চালু করার জন্যে। খবর শুনল সে। আজ সকালে ট্রামবাস আগের মতো চলতে শুরু করেছে। কলকাতার মানুষ দলে-দলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছেন। মনে হচ্ছে তাঁরা ওই ঘটনার প্রাথমিক আঘাত খুব দ্রুত কাটিয়ে উঠেছেন। আজ ছুটির দিন। মুখ্যমন্ত্রী আবেদন করেছেন কাল থেকে সবাই যেন নিয়মিত অফিস-কাছারিতে যোগ দেন।

দুপুরে বাড়ি থেকে বের হল স্বপ্নেন্দু। সেই পাজামা-পাঞ্জাবি এবং চাদর জড়িয়ে। আজ রাস্তায় অনেক লোক। স্বপ্নেন্দুর ভালো লাগল প্রত্যেকেই যে যার মতো পোশাক পরেছে। ট্রাম স্টপেজের কাছে আসতেই সে একটা স্বর শুনতে পেল, 'এই যে দাদা, খুব শীত নাকি?'

সে মুখ ফিরিয়ে তাকাতে দেখতে পেল চারটি মাঝারি সাইজের কঙ্কাল একটা রকে বসে আছে। প্রত্যেকের পরনে চাপা প্যান্ট এবং রঙিন জামা। করোটির দিকে তাকালে বোঝা যায় ওদের বয়স খুব বেশি নয়। সে দেখছে বুঝে একজন বলল, 'অত লজ্জা কেন? আপনার মাথা কি আলাদা? খুলে ফেলুন, খুলে ফেলুন। পাঁচজনে দেখুক।'

আর-একজন সিনিক কাটল, 'যেন লজ্জাবতী বউ!'

স্বপ্নেন্দুর চোয়াল শক্ত হল। এরা যে রকবাজ তা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। সামনের বস্তির কিছু ছেলে এখানে এসে বসে আড্ডা মারে, খিস্তি করে, প্রয়োজনে বোমাটোমাও ছোঁড়ে। এই দলটা তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু এখন সে কিছুই করতে পারে না। এই শরীর নিয়ে মারামারি করার কথা চিন্তা করাও যায় না। কিন্তু এত কাণ্ডের পরও ওরা ওদের স্বভাব ত্যাগ করতে পারেনি সেটাই আশ্চর্যের কথা। এই জেনারেশনের ছেলেগুলো কি কোনও কিছুতেই রিয়্যাক্ট করে না? তার মনে হল, ওরা আগের মতোই আছে, হয়তো ভালোই আছে।

ধর্মতলার ট্রাম আসছিল। স্বপ্নেন্দু লক্ষ করল ড্রাইভারের শরীরে ওভারকোট, মাথায় মাফলার জড়ানো। কিন্তু লোকটা যে কঙ্কাল তা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। লোকটা নিশ্চয়ই তারই মতো। নইলে এই গরমে ওসব জড়িয়ে বের হয়। ট্রামটা থামতে উঠে পড়ল স্বপ্নেন্দু। বিভিন্ন সাইজের কঙ্কালে সিটগুলো ভরে আছে। কিছু দাঁড়িয়ে। বোঝা যাচ্ছে ছুটির দিন সবাই কলকাতার নতুন চেহারা দেখতে বেরিয়েছে। এবং তখনই তার চোখে পড়ল লেডিস সিটে দুজন মহিলা বসে আছেন। মহিলা, তার কারণ ওঁদের পরনে শাড়ি-ব্লাউজ। আঁচল ঘোমটার মতো মাথায় জড়ানো। স্বপ্নেন্দুর হৃৎপিণ্ড থরথরিয়ে উঠল। মুখের দিকে তাকালে কেমন ছ্যাঁক করে ওঠে। সে আরও একটু সরে এল। লেডিস সিটে কিছু জায়গা খালি আছে। যারা দাঁড়িয়ে তারা ইচ্ছে করেই বসেনি। সে দুই মহিলার মুখের দিকে তাকাল। গোলগাল ছোট্ট করোটি। নাক এবং গালের হনুতে স্পষ্ট পার্থক্য আছে পুরুষদের সঙ্গে। হাতের হাড় সরু- সরু। দেখলেই বোঝা যায় খুব পলকা শরীর। পাশে দাঁড়ানো একজন বলল, 'বসতে চান বসে পড়ুন। লেডিস উঠলেই হয়ে যাবে।'

একজন মহিলা সেকথা শুনে মুখ তুলেই ফিরিয়ে নিলেন। এঁর নাকের ডগাটা বসা, কপাল উঁচু। কোনও মেয়ের চেহারা এত বীভৎস হতে পারে? মনে হতেই হেসে ফেলল স্বপ্নেন্দু। রাস্তায় বের হলেই বোঝা যাচ্ছে পুরুষরাও কতখানি কুৎসিত দেখতে। এতকাল মাংস, চামড়া এবং রং প্রত্যেকের খামতি আড়াল করে রাখত।

আজ কলকাতার কোনও দোকানপাট খোলেনি। ধর্মতলাটা ছুটির দিনে যেমন, তার থেকেও বেশি খাঁ-খাঁ। যেন হরতাল হয়ে গেছে। শুধু কাতারে-কাতারে মানুষ উৎসুক হয়ে বেরিয়ে পড়েছে। বাস চলছে গোটা কয়েক। কিন্তু প্রাইভেট গাড়ি চোখে পড়ল বেশ কিছু। যারা চালাচ্ছে তাদের ভঙ্গি ঠিক আগের মতনই। ট্যাক্সি একটাও বের হয়নি রাস্তায়।

গড়ের মাঠের অবস্থা খারাপ হয়েছিল পাতাল রেলের কল্যাণে। এখন তো তাকানোই যায় না। সব ঘাস উধাও হয়ে ন্যাড়া হয়ে গেছে চারধার। গাছগুলো পর্যন্ত পোড়া কয়লা। ইডেন গার্ডেন একটা পোড়া বাগানের চেহারা নিয়েছে। আরও কয়েক পা হাঁটার পর চমকে উঠল স্বপ্নেন্দু। গঙ্গায় এক ফোঁটা জল নেই। চাপ-চাপ শক্ত কাদার ওপর মৃত জলচর প্রাণীর হাড় ছড়িয়ে আছে। নদীর কঙ্কালটাকে বীভৎস দেখাচ্ছিল। লঞ্চ এবং জাহাজগুলো নদীর কাদায় আটকে রয়েছে। জল নেই, কাথাটা মনে পড়ল। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন বহির্জগতের সঙ্গে কলকাতা বিচ্ছিন্ন। তাহলে এই গঙ্গায় শেষ যেখানে সেখানে কী আছে? স্বপ্নেন্দুর মাথায় ঢুকছিল না। নিশ্চয়ই গোটা সমুদ্রটা উধাও হয়ে যায়নি। অবশ্য সমুদ্র কলকাতার বাইরে।

সারাদিন স্বপ্নেন্দু ঘুরে বেড়াল। মানুষের আচরণ এখন প্রায় স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। তবে রাস্তাঘাটে বিভিন্ন সাইজের কঙ্কালের অকারণ ভিড়। তালতলায় এসে ওর মন্টুদার কথা মনে পড়ল। প্রচণ্ড আড্ডার লোক। বিয়ে-থা করেও ঠিক সংসারী হয়নি। বউদিই সংসার চালিয়ে এসেছেন, মন্টুদা টাকা দিয়ে খালাস। স্বপ্নেন্দু ট্রাম থেকে নেমে পড়ল। মন্টুদার বাবার এ অঞ্চলে বড়লোক বলে খ্যাতি ছিল। গোটা তিনেক বাড়ি আছ। সেগুলোর ভাড়াটে আদ্যিকালের ভাড়ায় বহাল তবিয়তে রয়েছে। এই নিয়ে কোর্ট-কাছারি চলছে। এইটেই মন্টুদার একমাত্র অশান্তির কারণ।

গলির মুখে একগাদা কঙ্কাল ভিড় করেছে। স্বপ্নেন্দু দরজার কড়া নাড়ল। প্রথমে কোনও সাড়াশব্দ নেই। তারপর একটা স্বর শোনা গেল, 'কে?'

'আমি স্বপ্নেন্দু। দরজা খোলো।'

তবু সময় লাগল। যে খুলল তার দিকে তাকিয়ে স্বপ্নেন্দুর ঠাহর করতে পারল না পরিচয়। সে জিগ্যেস করল, 'মন্টুদা আছে?'

বসার ঘরে ঢুকে ইজিচেয়ারটার দিকে তাকাতে স্বপ্নেন্দু চমকে উঠল। মন্টুদার শরীর ছিল হদ্দুট লম্বা। গায়ের রং টকটকে লাল। শরীরে একফোঁটা মেদ নেই। আর পঞ্চাশ বছর বয়সেও মাথা ভর্তি চুল দেখে ঈর্ষা হতো ওদের। অনেক বিখ্যাত পরিচালক মন্টুদাকে ফিল্মে নামাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেকথা শুনলেই হো-হো করে হাসত মন্টুদা, 'বায়োস্কোপ? ও স্কোপ আর নাই বা নিলাম। এই বেশ আছি। খাচ্ছি-দাচ্ছি বগল বাজাচ্ছি। কী বলিস?'

সেই মন্টুদা ইজিচেয়ারে লম্বা হয়ে পড়ে আছে। পরনে পাঞ্জাবি আর সিল্কের লুঙ্গি। করোটির সাইজটা লম্বাটে। কী বীভৎস সাদা দেখাচ্ছে ওটা। শুধু কঙ্কালের সাইজ দেখে স্বপ্নেন্দু অনুমান করল এ মন্টুদা। এই সময় মন্টুদা কথা বলল, 'ভেবলে গিয়েছিলি মনে হচ্ছে। বসে পড়।'

'মন্টুদা—' স্বপ্নেন্দু সন্তর্পণে চেয়ারটায় বসল।

'তুই যদি নাম না বলতিস তাহলে চিনতাম না।'

'কেন?'

'আমি এখন কাউকে চিনতেই পারছি না। তুই ভাবতে পারিস আমার বউ আর বড়মেয়েকে গুলিয়ে ফেলেছি দুবার। একেবারে এক সাইজের প্রোডাকশন। বহুত ঝামেলা হয়ে যাচ্ছে!' মন্টুদা সোজা হয়ে বসল।

'তোমার কোনও রিয়্যাকশন হয়নি?'

'রিয়্যাকশন! নিশ্চয়ই! এর চেয়ে আরাম আর কিছুতে কল্পনা করা যায়। চাকরি করতে হবে না এ জীবনে। বেশ পায়ের ওপর পা তুলে বই পড়ব। পৃথিবীর কত বই। তুই সিরিয়াসলি পড়লেও এক হাজারের এক ভাগও একটা জীবনে পড়ে শেষ করতে পারবি না। কিন্তু এখন? মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন আমরা অমর। ডাল-ভাতের ঝামেলা নেই। পৃথিবীর সব বই শেষ করব এখন।'

আরামদায়ক একটা শব্দ উচ্চারণ করল মন্টুদা।

'কিন্তু বহির্বিশ্বের সঙ্গে আমাদের কোনও যোগাযোগ নেই।'

'বয়ে গেল। এই কলকাতায় বই-এর অভাব?'

'হঠাৎ বই নিয়ে পড়লে?'

'কিছু একটা নিয়ে থাকতে হবে যে রে। নিজেকে খুব অশিক্ষিত মনে হয়। এবার শোধ তুলব। তোর বউদির ঘ্যানর-ঘ্যানর করার দিন খতম।'

'কেন?'

'সংসারের কোনও কাজ করো না। বাজার করো না, রেশন করো না। এইসব টিকটিকানি আর শুনতে হবে না। তারও জ্বালা জুড়োল আমিও বেঁচে গেলাম।' মন্টুদা মুখে হাতে দিল, 'শুধু সিগারেটের অভাব ফিল করছি।'

'সেকি? এত জিনিস থাকতে সিগারেটের?'

'অভ্যেস, ভাই অভ্যেস। সেই পনেরো বছর বয়সে শুরু করেছিলাম।'

'যাক, তোর খবর কী বল। অনেকদিন বাদে এলি।'

'মাইরি মন্টুদা, তোমার কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে কিছুই হয়নি। যেন আগের অবস্থায় আছ। তোমার কোনও প্রতিক্রিয়া হয়নি।'

'উপনিষদ পড়েছিস?'

'না।'

'ওই তো, জ্ঞান হবে কোত্থেকে? মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ শুনেছিস?'

'হ্যাঁ।'

'তাও শিক্ষা হল না। তিনি বলেছেন, সব কিছু স্বাভাবিক মনে মেনে নিতে। তাহলে আর কোনও কষ্ট থাকবে না। আরে একটা বিপ্লব করতে কত পরিশ্রম, কত সংগ্রাম কত রক্তক্ষয়। অথচ দ্যাখ, আমাদের কিছুই লাগল না অথচ বিপ্লব হয়ে গেল। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন।'

'মুখ্যমন্ত্রীর এত বাধ্য হলে কবে থেকে?'

'কারণ, বিরোধী নেতাদের বাণী এখনও কানে আসেনি। সমস্ত খবরের কাগজ এখনও বন্ধ। আরে জীবনটাকে এবার চুটিয়ে উপভোগ কর। পড়বি, গান শুনবি, গান গাইবি। আমরা তো এখন দেবতাদের মতন। রোগ-যন্ত্রণার বালাই নেই।'

মন্টুদার কথা শেষ হওয়া মাত্র একটি বালক দরজায় এসে দাঁড়াল। তার পরনের হাফপ্যান্ট দড়ি দিয়ে কোনওরকমে কোমরে বাঁধা। মন্টুদা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী সমাচার বৎস?'

'বাবা আমি খেলতে যাব?'

'আমার অনুমতির কিবা প্রয়োজন?'

'মা নিষেধ করছে। বলছে মাঠের ঘাস ছাই হয়ে গেছে, ওখানে যেতে হবে না।'

'চমৎকার। মাকে ডেকে দাও।'

ছেলেটি চলে গেল। মণ্টুদা বললেন, 'খোকা কী লাকি বল তো। সারা জীবন খেলে কাটাবে। ওর শৈশব কোনওদিন কাটবে না। আমরা বলতাম, মানুষের শৈশব হল তার জীবনের গোল্ডেন জেজ। ও চিরকাল সেই গোল্ডেন জেজে থাকবে। এর চেয়ে সুখবর আর কী আছে।'

এই সময় কেউ দরজার বাইরে দাঁড়াল। তার শাড়ির একাংশে দেখা যাচ্ছিল। মণ্টুদা ডাকলেন, 'হায়, তুমি ওখানে কেন প্রিয়ে! ভেতরে এসো। এখানে স্বপ্নেন্দু বসে আছে। তোমার দেবর। ওকে দেখে এত লজ্জা কেন?'

বউদি যেন আরও সঙ্কুচিত হলেন। তাঁর নিচু গলা শোনা গেল, 'কী বলছ?'

'কী আশ্চর্য! তোমার এ ঘরে ঢুকতে এত লজ্জা কেন?'

'না, আমি যেতে পারব না।'

মাথা নাড়ল মণ্টুদা। তারপর বলল, 'খোকাকে মাঠে পাঠাও। ও খেলুক।'

'ওখানে শুধু ছাই।'

'ছাই মাখুক। মহাদেব ছাই মাখতেন।'

'যা ইচ্ছে করো।'

'তোমার মনটা আগের মতো আছে। আরে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে চলো। তোমার কত কাজকর্ম কমে গেছে, তা দেখছ না!'

বউদি অন্যরকম গলায় বললেন, 'আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে।'

'চেষ্টা করলেও পারবে না। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন আমরা অমর।' কথাটা বলে হো-হো করে হেসে উঠল মণ্টুদা। স্বপ্নেন্দু বুঝল বউদি অসন্তুষ্ট হয়ে চলে গেছেন দরজার আড়াল থেকে।

হঠাৎ মণ্টুদা বলল, 'দাবা খেলবি?'

'দাবা!'

'চমৎকার সময় কাটানোর খেলা। তুই তো জানিস।'

'এখন ভালো লাগছে না।'

'ও।' মণ্টুদা আবার ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়ল, 'তুই এখনও শক কাটিয়ে উঠতে পারিসনি। চেষ্টা কর, চেষ্টা কর। জলের মতো হয়ে যা, যখন যেমন পাত্র তখন তেমন আকার।'

স্বপ্নেন্দু উঠল, 'আজ চলি মণ্টুদা।'

'চলে আসিস। মন খারাপ হলেই চলে আসিস, আমি ভালো করে দেবো।'

স্বপ্নেন্দু হেসে ফেলল, 'তুমি সত্যি নমস্য ব্যক্তি।'

সন্ধে হয়ে এসেছিল। রাস্তায় নেমে চমকে উঠল স্বপ্নেন্দু। মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে একটা নর কঙ্কাল চেঁচাচ্ছে, 'বেরিয়ে আয় শালা, এক বাপের বাচ্চা হলে সামনে আয়।' তার ডান হাতে একটা গোলমতন বস্তু দেখা যাচ্ছে। সেটাকে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে আস্ফালন করছে লোকটা। স্বপ্নেন্দু এগিয়ে যাচ্ছিল, পাশ থেকে একজন বলে উঠল, 'যাবেন না

দাদা, ওর হাতে পেটো আছে।'

'পেটো?'

'পুরোনো ঝগড়া। আজ বদলা নিতে এসেছে।'

স্বপ্নেন্দু হতভম্ব হয়ে গেল। যাদের মণ্টুদার বাড়িতে যাওয়ার সময় এখানে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল তারা আশেপাশে আড়াল খুঁজে সেঁধিয়েছে। পুরোনো অভ্যেসে এরা প্রাণভয়ে ভীত। কিন্তু যে লোকটা পেটো ছুড়তে এসেছে? স্বপ্নেন্দু লোকটার দিকে তাকাল। সমানে তড়পে যাচ্ছে লোকটা অকথ্য ভাষায়। এই যে এত বড় একটা পরিবর্তন হয়ে গেল কলকাতায়, মানুষ বিপর্যস্ত, তার কোনও প্রতিক্রিয়া কি ওর মধ্যে হয়নি? এখন পুরোনো আক্রোশ টিকে থাকতে পারে? স্বপ্নেন্দুর মাথায় ঢুকছিল না। এ বোধহয় শুধু কলকাতাতেই সম্ভব হতে পারে।

স্বপ্নেন্দু এগিয়ে গেল। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, এখন কলকাতাবাসী অমর। তিনি মিথ্যে কথা বলবেন না। তাই ওই লোকটা যতই শাসাক, তার কিছু করতে পারবে না।

গলির ভেতর থেকে কেউ বেরিয়ে আসছে দেখে লোকটা চিৎকার থামিয়ে মুখ ঘোরাল। ওর হাত ক্রমশ ওপরে উঠে যাচ্ছে। স্বপ্নেন্দু চেঁচাল, 'আমি স্বপ্নেন্দু, তুমি যাকে খুঁজছ সে নই। হাত নামাও।'

'বুঝব কী করে? সব শালাকে যে একরকম দেখতে হয়ে গেছে।'

ততক্ষণে লোকটার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে সে। না, লোক নয়। হাড়ের গঠন এবং শারীরিক চাঞ্চল্য প্রমাণ করছে এ তরুণ। স্বপ্নেন্দু বলল, 'তুমি খামোখা মাথা গরম করছ। তার গলার স্বর কি আমার মতন?'

একটু যেন চিন্তা করল ছেলেটা, তারপর বলল, 'এক মনে হচ্ছে না।'

'তাহলে হাত নামাও। তুমি একটা বুদ্ধু, এখন পেটো ছুড়ে কাউকে মারলেও তার কিছু হবে না। রক্তমাংস নেই তো পেটো কী করবে?'

ছেলেটা বলল, 'জানি।'

'জানো মানে?'

গলার স্বর নামিয়ে আনল ছেলেটি, 'ফালতু ভয় দেখাচ্ছি। দেখুন না, শালারা কেমন ছাগলের মতো লুকিয়েছে। দেখে যে কী আরাম লাগছে, কী বলব।'

স্বপ্নেন্দু অবাক হয়ে গেল। তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছেলেটি আবার বলল, 'নতুন কল বের করতে হবে বুঝলেন? আগে থেকে রোয়াবি না দেখালে কষ্ট করে অন্য কেউ পাড়ার মাস্তানিটা কব্জা করে নেবে। কেটে পড়ুন।'

স্বপ্নেন্দু আর দাঁড়াল না। ট্রাম-রাস্তায় এসে সে হতভম্ব হয়ে গেল। না, কোনও গাড়ি-ঘোড়ার চিহ্ন নেই। সন্ধে হয়ে গেছে। রাস্তার আলোগুলো এদিকে জ্বলছে না। কেমন যেন গা-ছমছমে ভাব। তাকে যেতে হবে অনেক দূর। আগে হলে কেয়ার করত না। কিন্তু এখন এতটা পথ হেঁটে যাওয়া অসম্ভব। এমনিতে তার পায়ের হাড় কনকন করছে। সন্ধে হচ্ছে বলে লোকজন রাস্তা থেকে কমে যাচ্ছে। স্বপ্নেন্দু ভেবে পাচ্ছিল না সে কী করবে। একটু-একটু করে হেঁটে সে ওয়েলিংটনের মোড়ে চলে এল। জায়গাটা শ্মশানের মতো ফাঁকা। কলকাতা শহরে দাঁড়িয়ে এমন অসহায় সে আর কখনও হয়নি। এইসময় একটা শিস শুনতে পেল সে। কেউ যেন মনের আনন্দে শিস দিয়ে যাচ্ছে। মেরে ছুরা

হ্যায় জাপানি। চারপাশে চোখ বোলাতে সে ফুটপাথের ধার ঘেঁষে ভিখিরিটাকে দেখতে পেল। দুটো ছেঁড়া চট গায়ে চাপিয়ে রাজার মতো হেলান দিয়ে বসে-বসে শিস দিচ্ছে। তার ঊর্ধ্বাঙ্গে কোনও বস্ত্র নেই। হঠাৎ তাকালে আনন্দমঠের মন্বন্তর গ্রামের ছবিটি মনে পড়ে যায়। চোখোচোখি হতে লোকটা খুকখুক করে হাসল, 'এই যে বাবু, দুটো পয়সা হবে।'

স্বপ্নেন্দু অবাক হল। ভিখিরিটা এখনও পয়সা চাইছে! কিন্তু হাসল কেন? সে কোনও কথা বলার আগেই ভিখিরিটা চেঁচিয়ে উঠল, 'লাথি মারি টাকার মুখে। আর আমাকে কারও কাছে পয়সা চাইতে হবে না। কী আনন্দ! আর শালা মানুষের গালাগালি শুনব না। মেরা জুতা হ্যায় জাপানি। এই যে দাদা, দুটো পয়সা হবে।' নিজের গলাটাকেই বিকৃত করে শোনাল লোকটা।

ঠিক তখন একটা প্রাইভেট গাড়িকে আসতে দেখল স্বপ্নেন্দু। ফিয়াট। গাড়িটা যাচ্ছে তার গন্তব্যস্থলের দিকে। স্বপ্নেন্দু হাত তুলল। সেটা পর্যাপ্ত নয় ভেবে রাস্তার মাঝখানে নেমে গিয়ে ইশারা করতে লাগল থামবার জন্যে। ড্রাইভার যেন খানিকটা ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে থামাল গাড়িটা। স্বপ্নেন্দু ছুটে গেল জানলায়,

'কোথায় যাচ্ছেন আপনি?'

'শ্যামবাজার।'

'আমিও যাব। কোনও কিছু পাচ্ছি না। যদি—।'

'উঠে বসুন।'

গাড়িতে উঠে স্বপ্নেন্দু বলল, 'ধন্যবাদ।'

'কোনও দরকার নেই। আগে আমি কাউকে লিফট দিতাম না। এখন তো কোনও ভয় নেই। এই যে হৃৎপিণ্ড দেখছেন ওটা এমন একটা প্রটেকশনে আছে যা দশটা আণবিক বোমা মারলেও ভাঙবে না। ডু য়ু নো, এটা কী?'

'না।'

'আমাদের পাপ। সারাজীবন আমি যে পাপ করেছি এটা তাই দিয়ে তৈরি।'

হেসে ফেলল স্বপ্নেন্দু, 'তাহলে একটি এক বছরের শিশুর বেলায় কী বলবেন?'

'সে তার বাপ-মায়ের কাছ থেকে রক্তের সূত্রে ওটা পেয়েছে।' স্বপ্নেন্দু দেখল গাড়ির কাচে রেডক্রশ চিহ্ন রয়েছে। সে জিগ্যেস করল, 'আপনি ডাক্তার?'

'আই ওয়াজ। আমার একটা মরণাপন্ন পেশেন্ট ছিল নার্সিংহোমে। আজ গিয়ে দেখি সে নাকি হেঁটে বাড়ি চলে গেছে। নার্সিংহোমের সবাই বেকার। সুতরাং আমিও। আমি এখন কী করব? মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন আমাদের মৃত্যু নেই। শরীর নেই যখন, তখন অসুখ-বিসুখ করবে না কারও। আমি বেকার হয়ে গেলাম। মুখ্যমন্ত্রী বললেন, যারা খাদ্য ব্যবসায় আছে তাদের তিনি দেখবেন। বাট হোয়াট অ্যাবাউট আস? তা ছাড়া, কেমন যেন অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল। সারাদিন রোগী দেখে বেড়াচ্ছি, চেম্বারে পেশেন্ট গিজ-গিজ করছে, সবসময় টেনশন। সারা জীবনে তো কম আর্ন করিনি। সেগুলো নিয়ে আমি কী করব এখন?' ডাক্তার স্বপ্নেন্দুর দিকে তাকালেন, 'আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু লিভ। জানেন, আমার কাছে কিছু সায়েনায়েড ছিল। এক ফোঁটা জিভে লাগলে চোখ বন্ধ হয়ে যাবে। মুঠোয় করে মুখে ঢাললাম, হৃদপিণ্ডে মাখালাম। নো রেসপন্স। হাতুড়ি দিয়ে ভাঙবার

চেষ্টা করলাম বুকের বাক্সটা। একটুও টসকাল না।'

ফোঁস করে নিশ্বাস ফেললেন ডাক্তার।

স্বপ্নেন্দু নিচু গলায় বলল, 'মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন এই পরিবর্তিত অবস্থাকে সহজ মনে মেনে নিতে। অ্যাকচুয়ালি, আপনি আপনার সঞ্চিত টাকা এখন মানুষের উপকারে খরচ করতে পারেন। খাওয়া-পরা অথবা অসুখ-বিসুখ ছাড়াও তো মানুষের অনেক প্রয়োজন আছে। সেগুলো এতকাল আমরা পারতাম না—।'

বাধা দিলেন ডাক্তার, 'আপনি কম্যুনিস্ট?'

'না। মোটেই না।'

'তাহলে রাবিশ কথাবার্তা বলবেন না। আমি সারাজীবন এত কষ্ট করে যা উপার্জন করেছি তা পাঁচজনের জন্যে বিলিয়ে দেব? তার চেয়ে নিজের হাতে পুড়িয়ে ফেললে বেশি আরাম লাগবে।'

স্বপ্নেন্দু কথা বলল না। গাড়ি ততক্ষণে কলেজ স্ট্রিট ছাড়িয়ে গেছে। পথঘাট নির্জন। এবার ডাক্তারের গলায় হাহাকার শোনা গেল, 'আমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দটাকে চিরকালের জন্য হারালাম।'

'কী সেটা?'

ডাক্তারের কন্ঠোটিটা দুলল, 'ইঞ্জেকশন। যখন আমি কারও শরীরের কাছে সিরিঞ্জ নিয়ে যেতাম অদ্ভুত শিহরণ হতো। তারপর যখন সূঁচটা তার গায়ে ঢুকিয়ে দিতাম তখন অদ্ভুত প্লেজার হতো। দিনে অন্তত গোটা পাঁচেক ইঞ্জেকশন না দিলে আমার রাত্রে ঘুম আসত না।'

'সেকি?'

'আমি অ্যাদ্দিন কাউকে বলিনি। এখন অবশ্য বলতে বাধা নেই। কাউকে বলিনি ঠিক নয়। আমার এক মনস্তাত্ত্বিক বন্ধুকে বলেছিলাম। সে জিগ্যেস করেছিল, আমি কি ইমপোটেন্ট? স্বীকার করিনি তখন। এখন কলকাতার মানুষ আর সেসবের কথা ভাববে না। তাই বলছি, হি ওয়াজ রাইট।'

স্বপ্নেন্দু নড়েচড়ে বসল। লোকটা পাগল নাকি? দু মিনিটের আলাপে যে সব কথা বলছে তা কোনও সুস্থ মানুষ বললে না? হয় পাগল, নয়—স্বপ্নেন্দু মাথা নাড়ল, এসব পরিবর্তিত পরিস্থিতির ফল। এখন মানুষের কিছুই হারাবার ভয়ডর নেই। অতএব নিজের গোপন তথ্য খুলে বললেও ক্ষতি নেই।

'শ্যামবাজারে কোথায়?'

স্বপ্নেন্দু রাস্তাটার নাম বলল। ডাক্তার বললেন, 'অয়েল ইন্ডিকেটারের দিকে তাকিয়ে দেখুন। ওটা শূন্যে আটকে আছে। অথচ গাড়িটা সুন্দর চলছে। জল নেই এক ফোঁটা তবু ইঞ্জিন বন্ধ হচ্ছে না। আগে শুনলে পাগল বলতাম। তাই না?'

'সেকি, পেট্রোল নেই তবু গাড়ি চলছে?

'দেখছেন তো।'

'হয়তো আপনার ইন্ডিকেটারটা ঠিক কাজ করছে না।'

'নো। ওটা ঠিক আছে।'

'তাহলে?'

'এটাও বোধহয় পরিবর্তিত পরিস্থিতির রেজাল্ট। আরে মশাই, গাড়িতে যে এক ফোঁটা জল নেই সেটা বিশ্বাস করেন তো। ওই দেখুন হেসোর কী অবস্থা।'

স্বপ্নেন্দু হতভম্ব হয়ে গেল। এখন থেকে গাড়ির জন্য আর পেট্রোলের দরকার হবে না? কী আশ্চর্য! স্বপ্নেন্দুর মোড়ে এসে গাড়িটা থামালেন ডাক্তার। ধন্যবাদ জানিয়ে নেমে যাচ্ছিল সে। ডাক্তার ডাকলেন, 'শুনুন মশাই, আপনার নাম জানি না। কোনওদিন দেখা হবে কি না তারও ঠিক নেই। তবে আমাকে পাগল ভাবার কোনও কারণ নেই। যে-যে কারণে আগে পাগল ভাবা হতো, এখন সেইসব কারণগুলো বাতিল হয়ে গিয়েছে। বরং আপনার যদি কোনও পাপটাপ থাকে তাহলে বলাবলি করতে শুরু করুন, দেখবেন বেশ হালকা লাগবে।'

গাড়িটা চোখের সামনে থেকে চলে গেলেও স্বপ্নেন্দু দাঁড়িয়েছিল। অদ্ভুত লোক তো! তার পরেই খেয়াল হল, তার নিজের কোনও পাপ আছে কি না। স্বপ্নেন্দু অনেক চিন্তা না করেও তেমন কোনও পাপের কথা মনে করতে পারল না। ছেলেবেলায় একবার একটা বেড়ালকে ঢিল ছুড়ে খোঁড়া করে দিয়েছিল। খুব চুরি করত বেড়ালটা। সে এখন পাপ আদৌ কি না বলা মুশকিল, কিন্তু ওকথা কাউকে বলা যাবে না।

ঘরে ঢুকে বিছানায় চিৎপাত হতে গিয়েই স্বপ্নেন্দুর মনে পড়ল। টেবিলের দিকে তাকাতেই কাচের আড়ালে সেই লাল গোলাপটাকে দেখতে পেল সে। গোলাপটাকে আরও টাটকা আরও বেশি লাল দেখাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে স্বপ্নেন্দুর মন শান্ত হয়ে গেল।

পরের দিন রেডিও খুলে স্বপ্নেন্দু বুঝল কলকাতার অবস্থা বেশ স্বাভাবিক। চমৎকার গানবাজনা হচ্ছে। খবরেও বলা হল, প্রচুর ট্রাম-বাস চলছে সকাল থেকে। গত দুদিনে কলকাতায় খুনজখম দূরের কথা সামান্য ছিনতাই-এর ঘটনা পর্যন্ত ঘটেনি। তবে ধুতি এবং লুঙ্গির চাহিদা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। নাগরিকদের কাছে আবেদন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী, অবিলম্বে যে যার কাজে যোগ দিন। আজ স্বপ্নেন্দু চাদরটাকে বাতিল করল। কারণ ওতে মনের জড়তা ধরা পড়ে। যা হয়েছে তা ওর একার ক্ষেত্রে নয় যখন, তখন প্রকাশ্যে মেনে নেওয়াই ভালো। ঘর থেকে বের হওয়ার আগে সে আবার ফুলটার দিকে তাকাল। চমৎকার তাজা। কলকাতা শহরে একমাত্র তার কাছেই ফুল আছে, খাঁটি ফুল। ওটাকে ছোঁওয়া যাবে না, টেবিল থেকে নড়ানো যাবে না। অথচ এই ঘরে ফুলটা একা পড়ে থাকবে সেটাও ভালো লাগছিল না। স্বপ্নেন্দু একটা চাদর দিয়ে বড় জারটাকে ঢেকে দিল।

আজ ট্রামে-বাসে খুব ভিড়। কিন্তু ভিড় ট্রামে উঠে স্বপ্নেন্দু বুঝতে পারল যতটা মনে হয়েছিল ততটা নয়। এক ভদ্রলোক যার অনেকগুলো দাঁত না থাকায় মুখটা বীভৎস দেখাচ্ছে, বললেন, 'স্পেস প্রবলেম মিটে গেছে মশাই। আগে ট্রামে-বাসে যত লোক ধরত এখন তার ডবল ধরবে।'

কথাটা শুনে সবাই হো-হো করে হেসে উঠল। একজন বলল, 'মুখ্যমন্ত্রী ঠিকই বলেছেন। বিপ্লব এলেও ট্রান্সপোর্ট প্রবলেম সলভ করতে পারত না।'

প্রথমজন স্বপ্নেন্দুর দিকে ফিরে জিগ্যেস করলেন, 'আপনাদের বাথরুমটাকে কী

করবেন ভাবছেন?'

'বাথরুম?' স্বপ্নেন্দু হতভম্ব।

'দূর মশাই। এখন তো আর বাথরুমের প্রয়োজন নেই। খামোকা কিছু ঘর খালি পড়ে থাকবে বাড়িতে-বাড়িতে। আমি ভাবছি ওটা ভাড়া দিয়ে দেব। আমাদের বাথরুমটা বেশ বড়।'

দ্বিতীয়জন বলল, 'ভাড়ার টাকা নিয়ে কী করবেন দাদু?'

'কেন? শখের জিনিস কিনব। এই ধরো কালার টিভি।'

'টিভি? টিভি স্টেশন তো চালু হয়নি।'

'হয়নি, কিন্তু হবে।'

'ওঃ, টিভির মেয়েগুলোকে কীরকম দেখাবে ভাবুন তো! আমার বড় মেয়েটা দেখতে ভালো নয় বলে অ্যানাউন্সারের চাকরি পায়নি। এখন আবার অ্যাপ্লাই করতে বলি, কী বলেন?'

স্বপ্নেন্দু বুঝল, কলকাতার মানুষ বেশ সহজেই পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছে। হয়তো মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধে কাজ হয়েছে। তার বেশ ভালো লাগছিল। লিফটের সামনে বিরাট লাইন। কিন্তু আজ অনেক বেশি লোক আসছে বলে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে লাইনটা। স্বপ্নেন্দু দেখল লাইনে তিনটে শাড়ি আছে। তার মানে মেয়েরাও অফিসে এসেছে। তার হৃৎপিণ্ড কাঁপতে লাগল। হেনা সেন আছেন নাকি লাইনে? কী করে হেনাকে চিনবে সে? আজ সকালে রেডিওতে বলেছিল, প্রত্যেক নাগরিক আইডেন্টিটি কার্ড সঙ্গে নিয়ে অফিসে যাবেন। কিন্তু সে কার্ড তো ব্যাগের ভেতরে থাকবে।

স্বপ্নেন্দু ছটফট করছিল। লিফটে উঠে সে শাড়ির দিকে তাকাল। সেদিন হেনা সেন যে শাড়ি পরেছিলেন সেটার সঙ্গে এই তিনটির রং মিলছে না। হেনা যদি তাকে দ্যাখেন তাহলে নিশ্চয়ই হাসবে। সঙ্গে-সঙ্গে খেয়াল হল, তার চেহারাও তো হেনার চেনার কথা নয়।

নিজের ফ্লোরে এসে স্বপ্নেন্দু অবাক হল। দেওয়ালে পোস্টার পড়েছে, কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারিতা চলবে না, চলবে না। ঘুষখোর অফিসারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। নিজের ঘরে যাওয়ার সময় সে দেখল অফিসে বিরাট জটলা হচ্ছে। বেশ উত্তেজনা। ঘরে ঢুকে সে দেখল তার চেয়ারে কেউ বসে আছে। তাকে দেখে লোকটা উঠে দাঁড়াতে স্বপ্নেন্দু চিনতে পারল। লোকটা নির্জীব গলায় জিগ্যেস করল, 'আপনি কি সাহেব?'

'এক গ্লাস জল দাও হরিমাধব।' বলতে-বলতে খেয়াল হল আর জলের দরকার নেই, জল পাওয়াও যাবে না। হরিমাধব ততক্ষণে তিন হাত দূরে ছিটকে গেছে, 'মাপ করুন স্যার। আমি ভাবিনি আপনি আসবেন।'

'ভাবনি?'

'না স্যার। বিশ্বাস করুন এর আগে আমি কখনও ওই চেয়ারে বসিনি। আজ বড় ইচ্ছে হল। শরীরটা যখন পালটে গেল, নিজেকে ভূতের মতো দেখাচ্ছে যখন, তখন ভাবলাম চেয়ারটায় বসে দেখি কেমন লাগে।'

'ঠিক আছে।' স্বপ্নেন্দু চেয়ারটায় বসল। অনেক কষ্টে প্যান্টটাকে কোমরে শক্ত করে বেঁধেছে। কিন্তু কেবলই মনে হয় এই বুঝি পড়ে গেল।

হরিমাধব এগিয়ে এল, 'স্যার, অফিসের সবাই খুব খেপে গেছে।'

'কেন?'

'ওই ট্রান্সফার হবে শুনে। আজ কেউ কাজ করবে না বলেছে।'

'এখনও ওইসব ওদের মাথায় আছে নাকি?'

'হ্যাঁ স্যার। আপনি সাবধানে থাকবেন।' হরিমাধব দরজার দিকে তাকাল, 'আর হ্যাঁ, ম্যাডাম আপনাকে ফোন করেছিলেন দুবার।'

সঙ্গে-সঙ্গে মিসেস বক্সীর শরীরটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। মরলেও বোধহয় স্বভাব পালটাবে না। তার পরেই ওর হাসি পেল। আর এখন যে হাসি পেতেই তা খুকখুক করে বেরিয়ে পড়ে। কঙ্কালশরীর বোধহয় নিঃশব্দে হাসতে পারে না। স্বপ্নেন্দু টেলিফোনটার দিকে তাকাল। অপারেটর এসেছে তাহলে। সে আবার হরিমাধবকে জিগ্যেস করল, 'তোমার কেমন লাগছে হরিমাধব?'

'ভালো না স্যার। এই ভূতের চেহারা নিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়ালেই শিউরে উঠি। আমার পরিবারকে আবার ঠিক শাঁকচুন্নির মতো দেখায়। নরক, নরকে এসে গেছি। স্যার, শাস্ত্রে লেখা ছিল কলিযুগের পর নাকি এইরকম সাক্ষাৎ নরকবাস ঘটবে।' ফুঁপিয়ে উঠল হরিমাধব। স্বপ্নেন্দু তাকাল হরিমাধবের বুকের দিকে। অদৃশ্য গোলকের গর্তে থাকা হৃৎপিণ্ডটা থরথরিয়ে কাঁপছে। তার মানে লোকটার কান্না জেনুইন। মাথাটা পরিষ্কার হয়ে গেল স্বপ্নেন্দুর। এখন কেউ ভান করলে তার বুকের দিকে তাকালেই ধরা পড়ে যাবে। বাঃ ফার্স্ট ক্লাস। এই সময় টেলিফোনটা বেজে উঠল। হ্যালো, বলতেই মিসেস বক্সীর গলা ভেসে এল, 'কখন এসেছেন? কেউ বলেনি আমি ডেকেছি?'

'বলেছে।' স্বপ্নেন্দু নিস্পৃহ স্বরে বলল।

'বলেছে? তবু আপনি আমার সঙ্গে দেখা করছেন না?'

'যাচ্ছি। আমি একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলাম।' রিসিভার নামিয়ে রেখে স্বপ্নেন্দু হরিমাধবকে জিগ্যেস করল, 'আজ অফিসে সবাই এসেছে?'

হরিমাধবের করোটিটা নড়ল, 'না স্যার, অনেকেই আসেনি। পেটের ধান্ধা যখন আর করতে হবে না তখন মিছিমিছি কেন আসতে যাবে?'

স্বপ্নেন্দুর মনটা খারাপ হয়ে গেল। সবাই আসেনি? তার মানে হেনা সেনও না আসতে পারেন। প্রশ্নটা করতে গিয়েও পারল না, কেমন সঙ্কোচ বোধ হল। হরিমাধব আবার এই নিয়ে গপ্পো করবে। যা করতে হবে তাতে অফিশিয়াল ব্যাপার যোগ না করলে হরিমাধবরা অন্যভাবে ন্যাবে।

ঘর থেকে বেরিয়ে আসামাত্র করিডোরে চিৎকার শুনতে পেল সে। দশ-বারোজন কঙ্কাল বিচিত্র পোশাকে দাঁড়িয়ে হাত তুলে স্লোগান দিচ্ছে। সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছে ওরা। স্বপ্নেন্দুকে দেখেও দেখল না যেন। বোধহয় চিনতে পারেনি। স্বপ্নেন্দু সুড়ুৎ করে মিসেস বক্সীর দরজার কাছে চলে এল। সেখানে একটা কঙ্কাল উর্দি পরে দাঁড়িয়ে আছে।

'কাকে চাই?' লোকটা জিগ্যেস করল।

এই প্রথম মিসেস বক্সীর ঘরে ঢুকতে বাধা পেল স্বপ্নেন্দু। বিরক্ত স্বরে সে জিগ্যেস করল, 'তুমি কে?'

'আমি ওঁর বেয়ারা। ম্যাডাম কাউকে ঘরে ঢুকতে দেবেন না।'

'কী আশ্চর্য! তুমি আমাকে চিনতে পারছ না? আমি স্বপ্নেন্দু!'

সঙ্গে-সঙ্গে লোকটা কপালে হাত ঠেকাল 'ক্ষমা করবেন স্যার। আমার একবার সেরকম মনে হয়েছিল কিন্তু সব মুখগুলো দেখতে যে একরকম। যান স্যার, ম্যাডাম আপনাকে যেতে বলেছেন।'

'এরকম পাহারা তো আগে দাওনি।'

'ওই যে, অফিসের লোকরা চেঁচাচ্ছে তাই ম্যাডাম বললেন।'

স্বপ্নেন্দু দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। বিশাল ঘরে কেউ নেই। টেবিলের ওপাশে ঘুরন্ত চেয়ারটাও ফাঁকা। স্বপ্নেন্দু একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। ঘরের কোণায়, একটা পর্দা ঘেরা জায়গা আছে। সেখানে ইজিচেয়ারে শুয়ে মিসেস বক্সী বিশ্রাম করেন। কিন্তু লাগোয়া বাথরুমের দরজাটা খোলা। ঘরে যিনি ঢুকলেন তাকে দেখে চমকে উঠল স্বপ্নেন্দু। অসম্ভব বেঁটে এবং রোগা একটা কঙ্কালের গায়ে আলখাল্লা টাইপের ম্যাক্সি জড়ানো। করোটির ওপরে একটা বড় রুমাল বাঁধা। ঘরে ঢুকেই ম্যাডাম স্থির হলেন, 'কে'?

'আমি ম্যাডাম, স্বপ্নেন্দু।'

'আই সি।' গুড়গুড় করে উনি চলে এলেন নিজের চেয়ারে। তারপর শরীরটা সিধে রেখে বললেন, 'আমি ভাবছি প্রত্যেকের বুকের ওপরে একটা নেমপ্লেট রাখতে বলব। নইলে চিনতে অসুবিধে হচ্ছে। এত দেরি হল কেন?'

'অফিসে আসব না ভেবেছিলাম।'

'সে কি? কেন? এখন তো শরীর খারাপের অজুহাত টিকবে না।'

'না। চাকরি করব না ভাবছি।'

'হোয়াট ডু য়ু মিন? আপনি শোনেননি চিফ মিনিস্টার কী বলেছেন? প্রত্যেক নাগরিক এতকাল যা-যা করেছেন এখনও তাই করতে হবে। অন্তত সরকারি, বেসরকারি চাকরিতে যারা ছিলেন তাঁদের নিষ্ঠার সঙ্গে সেই চাকরি করতে হবে। একটা স্পেশাল পুলিশ ফোর্স এই ব্যাপারটা দেখবে।' খুকখুক করে হাসলেন মিসেস বক্সী, 'চাকরি করব না বললেই মিটে গেল?'

'সে কি? পুলিশরাও এখনও অ্যাকটিভ আছে নাকি?'

'মোর অ্যাকটিভ। আপনি ভাবছেন গুলি করেও যখন কিছু হবে না তখন যা ইচ্ছে করবেন? এর মধ্যে বিজ্ঞানীরা এমন একটা অস্ত্র বের করেছেন যার রিঅ্যাকশনে হৃৎপিণ্ড আধঘণ্টা অসাড় হয়ে যাবে। সেই সময় আপনি নড়তে-চড়তেও পারবেন না। আপনাকে অ্যারেস্ট করে টিউব রেলে ফেলে রাখা হবে।'

'টিউব রেলে?'

'ইয়েস। টিউব রেল তো ইনকমপ্লিট। তা ছাড়া, এখন আর টিউবের কোনও প্রয়োজনও হবে না। ট্রান্সপোর্ট প্রবলেম সলভ্‌ড। তাই টিউবটাকে অন্ধকূপ হিসেবে ব্যবহার করা হবে। পানিশমেন্ট সেল।' তারপরে অন্য স্বরে মিসেস বক্সী বললেন, 'ওসব চিন্তা ছাড়ুন। ইউ আর ইয়ং হ্যান্ডসাম। কত ব্রাইট প্রসপেক্ট সামনে পড়ে আছে। আজকের অ্যাটেন্ডেন্স অবশ্য সেভেন্টি পার্সেন্ট। নট ব্যাড।'

স্বপ্নেন্দু ঠিক ঠাওর করতে পারছিল না মিসেস বক্সী ভয় দেখাচ্ছেন কি না। তবু

সে জিগ্যেস করল, 'ডেকেছিলেন কেন?'

মিসেস বক্সী বললেন, 'স্লোগান শুনেছেন? মানুষের অভ্যেস কোথায় যাবে? এই ভৌতিক শরীরেও ওরা চেঁচাচ্ছে। এটা বন্ধ করতে হবে।'

'বলুন কী করব?'

'আরে, সেটা আপনি ঠিক করুন।'

'ওই ট্রান্সফার অর্ডারটা বাতিল করে দিন।'

'সে কি!'

'ঠিকই বলছি। এখন আর পার্টিরা ঘুষ দিতে আসবে না। কারণ মানুষের অনেক প্রয়োজন আর ঠিক আগের মতো নেই। তা ছাড়া, ঘুষ নিয়ে ওরা কী করবে? টাকারও মূল্য কমে গেছে।'

'ইউ আর রাইট। আমি অনেকবার ভেবেছি। সত্যি কথা। এখন আর ঘুষ দেবে কে? আর ঘুষ নিয়ে কীই-বা করবে। কিন্তু এটা প্রেস্টিজের ব্যাপার। চট করে আমরা এই সিদ্ধান্ত ওদের জানাব না'—মিসেস বক্সী চেয়ার ছাড়লেন। মহিলার চেহারা এখন আমূল পালটে গেছে। সেই থপথপে মাংসের তালটা চলে যাওয়ায় বেশ ছিমছাম দেখাচ্ছে। কিন্তু ম্যাক্সিটা নিশ্চয়ই ওঁর নয়। মিসেস বক্সী হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন, 'আমাকে খুব কুৎসিত দেখাচ্ছে?'

'না-না। বিউটিফুল।'

'ওঃ বাটারিং করবেন না। ওটা আমি একদম পছন্দ করি না। আমি তো প্রথমে এমন শকড ছিলাম যে বিছানা থেকে উঠতেই পারিনি। নাউ আই ফিল ইটস বেটার। অ্যাট লিস্ট উই আর সেভড ফ্রম ইওর হাঙ্গরি আইস।' তার পরেই হেসে ফেললেন মিসেস বক্সী, 'রাগ করবেন না। আমি আপনাকে মিন করিনি। ইউ আর গুড। আসুন না আজকে সন্ধেবেলায় আমার বাড়িতে। আমার মেয়ে খুশি হবে।'

'আপনার মেয়ে?

স্বপ্নেন্দু এতটা তরল হতে ম্যাডামকে কখনও দ্যাখেনি।

'হ্যাঁ। এবার লরেটো থেকে পাশ করেছে। ম্যাক্সিটা তো ওরই।'

'ও, ঠিক আছে যাওয়া যাবে।' স্বপ্নেন্দু উঠে দাঁড়াল।

'কিন্তু বিনা শর্তে নয়।'

'মানে?'

'ওদের ক্ষমা চাইতে হবে বিক্ষোভ করার জন্যে। তারপর আমরা ট্রান্সফার অর্ডারটা ক্যানসেল করব। ও কে?'

যাঃ বাবা। কোন কথা থেকে কোথায় চলে এলেন মহিলা। স্বপ্নেন্দু করোটি নেড়ে বেরিয়ে এল বাইরে।

দুপুরে খবর পাওয়া গেল ওদের গেট মিটিং-এ একদম লোক হয়নি। নেতারা অনেক অনুরোধ করা সত্ত্বেও কর্মচারীরা নাকি সেখানে উপস্থিত হয়নি। তারা বলেছে এখন যেহেতু অফিসে আসা বাধ্যতামূলক তাই আসতে হবে। ট্রান্সফার নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কোনও লাভ নেই। নেতারা নাকি খুব ভেঙে পড়েছে কর্মচারীদের এই ব্যবহারে। টিফিনের পর নেতারা এল তার ঘরে। স্বপ্নেন্দু ওদের বসতে বলল, 'বলুন, কী চাই আপনাদের?'

'ওটা করবেন না।'

'কর্মচারীরা তাই চাইছেন?'

'এখন তো অনেকেই সরে যাচ্ছে। কিন্তু এটা আমাদের প্রেস্টিজের প্রশ্ন।'

'মিসেস বক্সীর সঙ্গে কথা বলুন।'

'না। উনি খুব একরোখা। তা ছাড়া, আমরা আপনাকে মধ্যস্থতা করতে বলছি।'

'মেনে নিন। অফিস অর্ডার বলে কথা।'

'মেনে নিলে আমাদের আন্দোলনের মেরুদণ্ড ভেঙে যাবে।'

'আপনারা আর কী নিয়ে আন্দোলন করবেন?'

'চাকরি যখন করছি তখন সমস্যা তো আসবেই! তা ছাড়া, এখন থেকে আর আটান্ন বছর বয়সে রিটায়ারমেন্ট নেই। অতএব সমস্যা থাকবেই।'

'রিটায়ারমেন্ট নেই?'

'না স্যার। কারণ মানুষ মরছে না। নিউ জেনারেশন আসছে না।'

স্বপ্নেন্দু চমকে উঠল, 'তাহলে তো প্রমোশনও হবে না।'

'না স্যার।'

এক মিনিট ভাবল স্বপ্নেন্দু। এই চাকরি চিরকাল করে যেতে হবে? কোনও প্রমোশন নেই? তারপর লোকগুলোর মুখের দিকে তাকাল সে। করোটি দেখে মনের প্রতিক্রিয়া বোঝা যায় না। আর এরা শার্ট পরে আছে বলে ওদের হৃৎপিণ্ড দেখা যাচ্ছে না। হরিমাধবের শার্টের বোতাম একটাও নেই। তাই ওরটা বুঝতে অনেক সুবিধে। হঠাৎ হেনা সেনের কথা মনে পড়ল। সে জিগ্যেস করল, 'শুক্রবার যে মহিলা তর্ক করেছিলেন তিনি কোথায়? তিনি কি এখন আপনাদের সঙ্গে আছেন?'

নেতারা মুখ চাওয়াচায়ি করল। শেষপর্যন্ত একজন বলল, 'উনি আসেননি আজ।'

'ও।' স্বপ্নেন্দুর মন খারাপ হয়ে গেলেও সে মুখে বলল, 'ভদ্রমহিলা বিচক্ষণ কথাবার্তা বলেছিলেন। অলরাইট। আপনারা যান, আমি দেখছি কী করা যায়। বুঝতেই পারছেন এসব আমার হাতে নেই।'

'আমরা জানি স্যার। আপনি মধ্যস্থতা করুন। ততক্ষণ আমরা একটু-আধটু আন্দোলন চালাব।'

'আন্দোলন চালাবেন মানে?'

'না চালালে ইমেজ নষ্ট হয়ে যাবে।'

নেতারা চলে গেলে স্বপ্নেন্দু উঠে দাঁড়াল। যাক, প্রবলেম সলভড। তবে একথা এখনই মিসেস বক্সীকে বলা চলবে না। ওঁকেও দুদিন ঝুলিয়ে রাখলে অন্য কাজ নিয়ে টিকটিক করবেন না। শালা, প্রমোশনই যখন কোনওকালে হবে না তখন কাজ দেখিয়ে লাভ কী? টেলিফোনটা শব্দ করতেই বিরক্ত হল স্বপ্নেন্দু। মিসেস বক্সী নির্ঘাত। দরজার দিকে এগিয়ে যেতে-যেতে আবার ফিরে এল সে। সে যে বেরিয়ে যাচ্ছে একথা বলে দেওয়া ভালো।

'আমি মুখার্জি বলছি।'

যাঃ শালা। থার্ড অ্যাসেসমেন্ট অফিসার মুখার্জির ফাইলটা তো মিসেস বক্সীর কাছে আটকে আছে। সে জবাব দিল, 'বলুন।'

'শোনো। তোমাকে শুক্রবারে যে রিকোয়েস্ট করেছিলাম সেটা করতে হবে না। ম্যাডামের আক্রমণের কোনও দরকার নেই।'

'কেন?'

'নিশ্চুপ হয়ে বসে আছি এখন। আমি আর ইন্টারেস্টেড নই।'

টেলিফোন নামিয়ে হেসে ফেলল স্বপ্নেন্দু। বিপ্লবও এতটা কার্যকরী হতো না। মুখ্যমন্ত্রী ঠিকই বলেছেন। জাঁদরেল ঘুষখোর অফিসার আর ঘুষের জন্যে অনুরোধ করছে না। চমৎকার।

মিসেস বক্সীকে জানাল না স্বপ্নেন্দু। হরিমাধবকে বলে গেল কেউ জিগ্যেস করলে বলতে শরীর খারাপ বলে তাড়াতাড়ি চলে গেছেন। হরিমাধবের বিস্ময় বাড়াল, 'স্যার, আপনার শরীর খারাপ?'

তৎক্ষণাৎ খেয়াল হল। শরীর কোথায় যে খারাপ হবে? এই অজুহাতটা চিরকালের মতো বাতিল হয়ে গেল। স্বপ্নেন্দু গম্ভীর গলায় বলল, 'ঠিক আছে। কেউ খুঁজলে বলে দিও জরুরি কাজে বেরিয়েছি।'

এখন দুপুর শেষ হয়নি। রোদের তাপ বড্ড বেশি। কিন্তু ঘাম হচ্ছে না বা হওয়ার কোনও সম্ভাবনা না থাকায় তেমন কষ্ট হচ্ছে না। বাস থেকে নেমে স্বপ্নেন্দু হেসে ফেলল। কন্ডাক্টর চুপচাপ বসে আছে। কোনও যাত্রীকেই টিকিট কাটতে হচ্ছে না। এটা কদ্দিন চলবে কে জানে।

রাস্তাটা নির্জন। হঠাৎ স্বপ্নেন্দুর বুকের ভেতরটায় থম ধরল। তার হৃৎপিণ্ড কাঁপতে শুরু করল। খুব নার্ভাস লাগছে এখন। এইভাবে চট করে চলে না এলেই ভালো ছিল। তারপর মরিয়া হল সে। লাল ব্লাউজ লাল শাড়ির আগুন তাকে চুম্বকের মতো টানছিল।

কলিংবেলের বোতামে আঙুল রাখতেই ভেতরে যেন ঝড় বয়ে গেল। নির্জন দুপুরে বোধহয় আওয়াজ বেশি হয়। কেউ দরজা খুলছে না। মিনিট দুয়েক অপেক্ষা করার পর স্বপ্নেন্দু আবার বেল টিপল। এরপর ধীরে-ধীরে দরজা খুলে দাঁড়ালেন এক মহিলা। মহিলা কারণ তাঁর পরনে সাদা শাড়ি, মাথাটা বিরাট ঘোমটার আড়ালে ঢাকা। সেই পরশুরামের গল্পের চরিত্র যেন।

'কী চাই?'

'হেনা সেন আছেন?' স্বপ্নেন্দুর স্বর কাঁপছিল।

'আপনি কে?'

'আমি ওঁর অফিসে কাজ করি। আমার নাম স্বপ্নেন্দু।'

'ও তুমি। এসো ভেতরে এসো।' মহিলা দরজা ফাঁক করতে স্বপ্নেন্দু ঢুকে পড়ল। দরজা বন্ধ করে মহিলা কাতর গলায় বললেন, 'এ কী হল বাবা। আমরা কী এমন পাপ করেছি যে এই শাস্তি পেতে হচ্ছে।'

স্বপ্নেন্দু বুঝল ইনি হেনার মা। মনে পড়ল না সেদিন ইনি তাকে তুমি বলেছিলেন কি না। সে বলল, 'কী আর করা যাবে বলুন।'

মহিলা বললেন, 'এইভাবে বাঁচতে চাই না বাবা। তিনি স্বর্গে বসে রইলেন আর আমি চিরকাল এই নরকে পড়ে থাকব? আমার তো বাঁচবার কোনও আকাঙ্ক্ষাই ছিল না। শুধু ওই মেয়েটার একটা বিয়ে করতে পারলে। কলকাতার সব মানুষের

কি এই দশা?'

'হ্যাঁ মাসিমা।'

'কলকাতার বাইরের?'

'তাদের কথা জানি না।'

'পরশু থেকে মেয়ে আমার বিছানা ছাড়েনি। শুধু পড়ে-পড়ে কেঁদে যাচ্ছে। তুমিই প্রথম আমাদের বাড়িতে এলে।'

'ওঁর সঙ্গে একটু কথা বলা যাবে?' স্বপ্নেন্দু যেন অনুনয় করল।

'কথা? ও তো কথাই বলতে চাইছে না। কতবার ওকে বললাম সহজ হতে তা মেয়ে আমাকে খেঁকিয়ে উঠছে। সরে যাও সরে যাও। আমি কাউকে সহ্য করতে পারছি না। ও কি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইবে?'

মহিলা মাথার পড়ে যাওয়া ঘোমটা চট করে টেনে নিলেন। স্বপ্নেন্দু লক্ষ করল এঁর করোটির গায়ে সামান্য হলদে দাগ রয়েছে।

'তাহলে থাক। ওঁকে বলবেন আমি এসেছিলাম।' নিশ্বাস ফেলল স্বপ্নেন্দু। মহিলা বললেন, 'দাঁড়াও। তুমি বড্ড ভালো ছেলে বাবা।'

অবাক হয়ে স্বপ্নেন্দু জিগ্যেস করল, 'একথা বলছেন কেন?'

'নিশ্চয়ই কারণ আছে। আমি ভাবছি তুমি যদি নিজে গিয়ে ওকে সহজ হতে বলো তাহলে যদি কাজ হয়।'

'আপনি যদি বলেন।' স্বপ্নেন্দুর হৃৎপিণ্ড কাঁপতে লাগল।

'আগে হলে হয়তো বলতাম না। কিন্তু এখন আমার মাথার ঠিক নেই। দ্যাখো, যদি পারো ওকে সহজ করতে। ওই দরজা দিয়ে যাও।'

স্বপ্নেন্দুর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। তারপর ধীরে-ধীরে সে বাঁদিকের ছোট্ট প্যাসেজটা ধরে সেঁটে একটা ভেজানো দরজার সামনে দাঁড়াল। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল মহিলা নেই। নিজের জামা ঠিক করে নিল স্বপ্নেন্দু। তারপর দরজায় হাত দিল।

ঘরটা অন্ধকার। সমস্ত জানলা বন্ধ। প্রথমে দৃষ্টি চলছিল না। তবু স্বপ্নেন্দু ভেতরে ঢুকতেই খাটটাকে দেখতে পেল। খাটের ওপর হেনা সেন উপুড় হয়ে শুয়ে আছেন। হলদে ফুল তোলা ম্যাক্সি ওর গায়ে। বড় হাতায় কবজি পর্যন্ত ঢাকা। পায়ের হাড় এবং সাদা করোটি এবার দেখতে পেল স্বপ্নেন্দু। উপুড় হয়ে শুয়ে থাকায় হেনা সেন তার উপস্থিতি টের পাননি। স্বপ্নেন্দুর হৃৎপিণ্ড স্থির হয়ে গেল। হেনা সেন ছাড়া নিশ্চয়ই এই ঘরে অন্য কেউ থাকবে না। সে চোখ বন্ধ করতে গিয়েও পারল না। কারণ তার চোখের পাতাই নেই। হৃৎপিণ্ড অনুভবে দৃষ্টিশক্তি যোগাচ্ছে।

সেই হেনা সেন? স্বপ্নেন্দুর মনে হচ্ছিল এখানে না এলেই ভালো হতো। যে মাখনের মতো নরম শরীর তাকে চুম্বকের মতো টেনেছিল সেটাকে স্মৃতিতে বাঁচিয়ে রাখাই উচিত ছিল। এখন তো হেনা সেন তারই মতো বীভৎস। অথচ এই ঘরে ঢোকবার আগে বুকের ভেতর ভূমিকম্প হচ্ছিল তার। তার অনুরণন তো এখনও মেলায়নি।

স্বপ্নেন্দু নিচু স্বরে ডাকল, 'শুনুন।'

হেনা সেনের কোনও প্রতিক্রিয়া হল কি না বুঝতে পারল না সে। এক পা এগিয়ে সে আবার ডাকল, 'মিস সেন।'

এবার চকিতে কয়েকটি ঘুরে গেল। আর তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বসে হেনা সেন চিৎকার করে উঠলেন, 'কে? কে? ও মাগো!' তার একটা হাত মুখে চাপা দিল। সঙ্গে-সঙ্গে নিজেকে ধিক্কার দিল স্বপ্নেন্দু। এ কী দেখছে সে। কিন্তু ততক্ষণে সেই চামড়া-মাংস-রক্ত হীন কঙ্কালের মুখটা চাদরে ঢেকে ফেলেছে হেনা সেন। এখনও যেন ঘরের মধ্যে আর্তনাদটা পাক খাচ্ছে। স্বপ্নেন্দু ঘোর কাটিয়ে বলে উঠল, 'নার্ভাস হবেন না মিস সেন। আমি স্বপ্নেন্দু।'

'স্বপ্ন?' সঙ্গে-সঙ্গে হেনা সেনের মাথাটা আলোড়িত হল, 'আমি চিনি না আপনাকে। কেন এলেন এখানে? বেরিয়ে যান, বেরিয়ে যান বলছি। ওমা, মাগো।'

আর্তনাদ শুনে স্বপ্নেন্দু এতটা অবাক হয়ে গিয়েছিল যে-কোনও শব্দ উচ্চারণ করতে পারেনি প্রথমটায়। যেন সত্যি কোনও মহিলার ঘরে কে আচম্বিতে ঢুকেছে এবং তিনি চিৎকার করছেন আত্মরক্ষার জন্যে। স্বপ্নেন্দুর নামটা শুনেও ওঁর কোনও প্রতিক্রিয়া হয়নি দেখে সে আরও তাজ্জব হল। এখনই সেই মহিলা ছুটে আসবেন এবং তাকে বেরিয়ে যেতে হবে এই আশংকায় স্বপ্নেন্দু দরজার দিকে তাকাল। কিন্তু মহিলার আসার কোনও লক্ষণ দেখা না যাওয়ায় সাহস বাড়ল তার। হেনা সেন এখন দু-হাতে চাদরটাকে আঁকড়ে ধরে কাঁপছেন।

স্বপ্নেন্দু আর এক পা এগোল, 'মিস সেন। আমি আপনার অফিসে কাজ করি। এই দুদিন আমি আসতে পারিনি। আজ না এসে পারলাম না। আপনি সত্যি আমাকে চিনতে পারছেন না?'

'না, আমি কাউকে চিনি না।' উত্তেজনা আছে কিন্তু এবার তার ঝাঁঝ কম।

'তা কি হতে পারে? আমি শুক্রবারে এখানে এসেছিলাম।'

'আজ কেন এসেছেন? মজা দেখতে?'

'মোটেই নয়।' স্বপ্নেন্দু আবার দরজাটার দিকে তাকাল। মহিলা ওর ওপাশে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সব শুনছেন কি না কে জানে! তবু সে মরিয়া হয়ে বলল, 'এই ক'দিন আমি আপনার কথা ভেবেছি।'

'কী মিথ্যে বলতে এসেছেন!'

'মিথ্যে নয়। আমার বলা শোভন নয়।' স্বপ্নেন্দুকে থামিয়ে দিয়ে হেনা সেন বললেন, 'কী জন্যে এসেছিলেন আমি জানি। এখন তো আর সেসব নেই। আমার শরীর, আমার শরীরটার দিকে তাকালে পুরুষজাতটার চোখ লোভে চকচক করে উঠত। ওই ঘেন্নায় আমি—তা আর এখন কেন? এখন তো আমি একটা কঙ্কাল। এখন আমাকে একটু নিশ্চিন্তে থাকতে দিন।'

'আপনি ভুল বলছেন।'

'একটুও না। সেদিন যখন আপনি আমাকে ঘরে ডেকেছিলেন তখনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম। সেই চোখ। লালসা থিক-থিক করছে। আজ আমার কিছু নেই। আপনাদের কাছে আমার কোনও মূল্য নেই। উঃ।'

'আমি আবার বলছি আপনি ভুল বলছেন।'

'নাঃ।' চিৎকারটা বাড়ল। তারপর এক টানে চাদর খুলে হিসহিসে গলায় হেনা সেন বললেন, 'দেখুন চেয়ে দেখুন। এই হলাম আমি।'

স্বপ্নেন্দু এবার ভালো করে দেখল। তার বুক মুচড়ে যাচ্ছিল। সেই ঠোঁটের জাদুকরি হাসি, চোখের কাজ, গালের টোল আর মুখের মায়া কোথায় মিলিয়ে গেল। একটা ছোট্ট কঙ্কালের জেদি মুখ তার দিকে ফেরানো। কিন্তু সেইসঙ্গে তার মনে হল রাস্তাঘাটে এই কদিনে সে অনেক কঙ্কালের মুখ দেখেছে। তাদের চোয়াল, কপাল, নাকের তুলনায় হেনা সেনের মুখ অনেক সুন্দর। অন্তত ওর চিবুকে একটা আলতো আদুরে ভাব মাখানো আছে। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে মুগ্ধ হল স্বপ্নেন্দু। তারপর বলল, 'আমার মুখের দিকে দেখুন। আমিও আপনার মতন। তবে একটা কথা বলি, সব হারিয়েও আপনি অনেকের চেয়ে সুন্দর, বেশি সুন্দর।'

'আবার সেই মিথ্যে কথা! সারাজীবন ধরে এই স্তুতি শুনেছি। আর না। কী আশায় আপনি এসেছেন আমার কাছে? আমার শরীর? তবে দেখুন। নিজের চোখে দেখুন।' হঠাৎ দুহাতে পাগলের মতো ম্যাক্সিটা খুলে ফেললেন হেনা সেন, 'দেখুন, ভালো করে দেখুন। আমার শরীরে একটা কটা হাড় ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। আপনারা, পুরুষজাত চিবিয়ে-চিবিয়ে সব নরম সুন্দর গিলেছেন। বাট নাউ আই অ্যাম ফিনিশড়। গেট আউট প্লিজ।' হেনা সেন থরথর করে কাঁপছিলেন।

স্বপ্নেন্দুর মনে হল অসম্ভব সুন্দর একটা দৃশ্য দেখেছে। হেনা সেনের দুটো পা ঈষৎ ভাঁজ করা, কোমর বেঁকানো, বুকের খাঁচার ভেতরে তার হৃৎপিণ্ড ধড়ফড় করছে। যেন কুমোরটুলিতে মূর্তি গড়ার প্রাথমিক কাজ শেষ হয়েছে, এবার মাটির প্রলেপ লাগিয়ে দিলেই হল। সে একটু ঝুঁকে বিছানা থেকে চাদর তুলে নিয়ে হেনা সেনের শরীরে ছড়িয়ে দিল, তারপর বলল, 'উত্তেজিত হবেন না। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে।'

'কে বলেছেন?' হেনা সেনের স্বরে বিস্ময়।

'মুখ্যমন্ত্রী।'

'আঃ। আপনি অদ্ভুত লোক তো।'

'উনি তো অন্যায় কিছু বলেননি। আমাদের যা গিয়েছে তা নিয়ে চিন্তা করে কী লাভ! আমরা তো অমরত্ব পেলাম, তাই না?'

'কীসের বিনিময়ে অমরত্ব পেলাম? কে চায় এমন অমরত্ব? অন্তত আমি চাই না। আমার ওই শরীরটাকে কৃপণের মতো লোভী হাতগুলোর আওতা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলাম। কেন, কীসের জন্যে? আমি তো তার ব্যবহারই জানলাম না, তার স্বাদ আমার অচেনা রয়ে গেল চিরজীবনের জন্যে। কে চায় এই অমরত্ব?'

'উত্তেজিত হবেন না। আপনি বিশ্বাস করুন আমি কোনও অভিসন্ধি নিয়ে আসিনি।'

'তাহলে কেন এসেছেন?'

'বলব। আগে জামাটা পরে নিন।'

'আমি আর শাড়ি পরতে পারব না। আঃ।'

'কেন পারবেন না? অফিসে আজ তিনজন মহিলাকে শাড়ি পরে যেতে দেখেছি।'

'অফিসে? অফিসে লোক গিয়েছিল? মেয়েরা গিয়েছিল?'

'হ্যাঁ। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন সবাইকে স্বাভাবিকভাবেই চলতে। যাঁরা অফিসে যাবেন না তাঁদের পাতাল-নরকে ঠেলে দেওয়া হবে।'

'পাতাল-নরক?' হেনা সেনের স্বরে আবার বিস্ময়।

'হ্যাঁ। ওই যে টিউব রেল হচ্ছিল। ওটা কমপ্লিট হতে সময় লাগবে। কিন্তু এখন আর তেমন ট্রান্সপোর্ট প্রবলেম নেই। তাই টিউবের মুখ বন্ধ করে পুলিশ অপরাধীদের ওখানে ফেলে দেবে।'

'আমি অফিসে যাব না। এই মুখ, শরীর নিয়ে যেতে পারব না।'

'তাহলে পাতাল-নরকে যেতে হবে। ঠিক আছে, ব্যাপারটা আমি দেখব। আপনার জামা পরুন আগে। আমি কি ঘর থেকে বেরিয়ে যাব?'

হেনা সেনের মুখ নিচু হল। স্বপ্নেন্দুর মনে হল হেনা লজ্জা পেয়েছেন। সে দেওয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়াতে হেনা সেনকে দেখতে পেল। ছবির বাঁধানো ফ্রেমে হেনা সুন্দর হাসছেন। সেই মোহিনী শরীর আর মুখের হাসিতে ঘর যেন আলো হয়ে গেছে। এই ছবিটাকে খুলে ফেলা উচিত। স্বপ্নেন্দু মনে-মনে বলল।

ঠিক তখন হেনা সেন বিছানা থেকে নেমে দাঁড়িয়ে, 'বসুন।'

স্বপ্নেন্দু ফিরে তাকাল। হাতাওয়ালা ম্যাক্সি পায়ের গোড়ালি ছুঁয়েছে। মাথায় একটা কালো রুমাল বাঁধা। স্বপ্নেন্দু বলল, 'সুন্দর।'

হেনার মাথা সামান্য নড়ল, 'আবার বানানো কথা!'

'বিশ্বাস করুন!' স্বপ্নেন্দুর স্বর ভারী হল।

'আপনি কি পাগল?'

'তাই মনে হচ্ছে? জানলাগুলো খুলে দিই?'

'আলো আসবে যে।'

'আসুক। এখন থেকে খোলা হাওয়ায় বের হবেন।'

'আমি পারব না, লজ্জা লাগছে, কেমন—ভাবতে পারছি না।'

'উহুঁ। বরং দেখবেন পাঁচজনে আপনার দিকে তাকাবে।'

'আবার?' হেনা একটা চেয়ারে বসলেন। পাশে স্বপ্নেন্দু।

'আপনি আমার কাছে কী চান বলুন তো?'

'আপনার কী মনে হয়?'

'আমি বুঝতে পারছি না। আমার তো দেওয়ার মতো কিছু নেই। সত্যি বলতে কী এই কণ্ঠস্বর ছাড়া আমি আর মেয়েও নই।'

'ভুল হল। কণ্ঠে আমাদের স্বর নেই। ওটা বক্ষস্বর হবে। আর তাই যদি বলেন তা হলে আমিও তো পুরুষ নেই। একমাত্র স্বরে সেটা বোঝা যায় আর হয়তো হাড়ের গঠনে। তাই না?'

'তা হলে? কী চান আপনি?'

'আপনাকে।'

'ওঃ, আমি এই কথাটাই তো বুঝতে পারছি না।'

'বুঝতে হবে না। কাল থেকে অফিসে যাচ্ছেন?'

'কাল থেকে? না-না।'

'বেশ যেদিন যাবেন বলবেন। আমি একটা ছুটির দরখাস্তে আপনার সই করিয়ে নিয়ে যাব। বাড়িতে বইপত্র আছে?'

'আপনি এমনভাবে কথা বলছেন যেন কিছুই হয়নি।'

'মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে এসব নিয়ে একদম মাথা ঘামাবেন না।'

'কী নিয়ে মাথা ঘামাব?'

'বলব?'

'বলুন।'

'আপনার মায়ের সঙ্গে আলোচনা করুন একটা সমস্যা নিয়ে।'

'কী সমস্যা?'

'আপনার বিয়ে হয়ে গেলে উনি কোথায় থাকবেন? আপনার সঙ্গে থাকতে ওঁর আপত্তি আছে কিনা? নাকি এখানেই থাকতে চান!'

'বিয়ে? আপনি কি সুস্থ?'

'অবশ্যই।'

'আমাকে কে বিয়ে করবে? আমি তো আর মেয়েই নই।'

এইসময় দরজায় হেনার মা এসে দাঁড়ালেন। স্বপ্নেন্দু তাঁকে আগে লক্ষ করেছিল। সে উঠে দাঁড়াল, 'আসুন। আপনার মেয়ে সমানে ঝগড়া করে যাচ্ছে।'

'মোটেই না।' হেনা মৃদু আপত্তি করল।

'সে কি? একটু আগে আপনি চেঁচাচ্ছিলেন না! আমাকে চিনতে পর্যন্ত চাইছিলেন না। বসুন মাসিমা।'

'না বসব না। তুই ভালো আছিস?'

জবাব দিলেন না হেনা। একটু চুপ করে বললেন, 'তুমি একটা কাপড় বাঁধো তো মাথায়, বিশ্রী দেখাচ্ছে।'

মহিলা ক্লান্ত গলায় বললেন, 'আমাকে আর কী দেখাবে! ভাগ্যিস তুমি এলে বাবা। নইলে ওকে নিয়ে যে কী করতাম আমি! কোনও কথা শুনতে চাইছিল না। শরীর নিয়ে ওর চিরকালই—।'

'আঃ চুপ করো তো।' মাকে থামিয়ে দিলেন হেনা সেন।

স্বপ্নেন্দু বলল, 'আপনারা এক কাজ করুন। বাইরে পৃথিবীতে কী হচ্ছে তা জানতেই পারছেন না। চলুন আপনারা আমার সঙ্গে। বাইরে হেঁটে আসি। নইলে একা-একা ঘরে বসে থাকলে আরও মন খারাপ হবে।'

হেনার মা বললেন, 'না বাবা। আমার বাইরে যেতে ইচ্ছে করছে না। তোর ইচ্ছে হলে ঘুরে আয়। স্বপ্নেন্দু যখন বলছে।' হেনার মা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

হেনা কোনও জবাব দিলেন না। স্বপ্নেন্দু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জিগ্যেস করল, 'কী হল?'

'আজকে একদম ইচ্ছে করছে না।'

'ঠিক আছে। কাল তৈরি থাকবেন। এলেই বেরিয়ে পড়তে হবে।'

'কাল আপনি আসবেন?'

'নিশ্চয়ই। আর এখন কেউ কিছু বলবে না। পাড়াতেও দুর্নাম হবে না।'

'আশ্চর্য!'

'তার মানে?'

'সত্যি-সত্যি আপনি আসবেন?'

'হ্যাঁ। বললাম তো লোকলজ্জার কোনও কারণ নেই।'

'আপনি আমাকে ঠকাচ্ছেন না তো?'

'ঠকিয়ে আমার কী লাভ?'

'আমার খুব ভয় করে।'

'কীসের ভয়?'

'পুরুষজাতটাকে। ওরা মেয়েদের শুধু শরীরের জন্যেই চায়। সেটা মিটে গেলে আর তাকিয়েও দ্যাখে না। তাই—?

'এখন তো আর সেসব প্রশ্ন ওঠে না।'

হেনা সেন যেন চেতনায় ফিরলেন, 'তা বটে। সেজন্যে আরও গোলমাল লাগছে। আপনি যা বলেছেন সব কি সত্যি?'

'সব। আর এই সব পুরোনো ভাবনাগুলোকে এখন বাতিল করুন। মনটাকে পরিষ্কার করুন। দেখবেন সব কিছু হালকা লাগবে। কলকাতা শহরটার চেহারা একদম পালটে গেছে। আপনি কেন স্মৃতি আঁকড়ে থাকবেন?'

'পালটে গেছে মানে?'

'নদীতে জল নেই, পুকুরগুলো খাঁ-খাঁ করছে। একটাও গাছ নেই, ঘাস বাগান ফুল সব ছাই হয়ে গেছে।' বলতে-বলতে থমকে দাঁড়াল স্বপ্নেন্দু, 'না সব নয়। একটা ফুল আশ্চর্যজনকভাবে বেঁচে আছে, এখনও।'

'একটা ফুল? কোন ফুল, কোথায়?'

স্বপ্নেন্দু হাসল, শব্দ হল, 'সেটা বলা যাবে না। একমাত্র আমিই তার হদিশ জানি।'

'আঃ, আবার সাজানো কথা!'

স্বপ্নেন্দু বুঝতে পারল, হেনা মনে করেছেন স্বপ্নেন্দু তার কথা বলছে। যেন হেনাকে একটা ফুলের সঙ্গে তুলনা করেছে স্বপ্নেন্দু। সে আর ভুল ভাঙাল না। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি সাজানো কথা বলি না।'

হেনা সেন উঠলেন, 'আজ যে আমার কী হল!'

'কী হল?'

'আপনি আসার আগে মনে হচ্ছিল, থাক, বাদ দিন।'

দরজা বন্ধ করার আগে হেনা জিজ্ঞাসা করলেন, 'সত্যি কথা বলুন তো, আমি কি খুব কুৎসিত হয়ে যাইনি?'

স্বপ্নেন্দু বলল, 'পরিবর্তিত পরিস্থিতি অনুযায়ী মোটেই না।'

হেনার মাথাটা নিচু হল, 'আপনি আমার মনটাকে পালটে দিয়ে গেলেন। আবার কবে আসবেন?'

'কাল।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ।' স্বপ্নেন্দু আর দাঁড়াল না।

বাইরে বেরিয়ে স্বপ্নেন্দুর হাঁটার গতি বেড়ে গেল। জয় করায়ত্ত। এত সহজে যে সে হেনা সেনকে পেয়ে যাবে তা কল্পনায় ছিল না। একথা ঠিক যদি এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন

না ঘটত তাহলে ব্যাপারটা এত সহজ হতো না। হেনা সেন তাকে নানাভাবে যাচাই করতেন এবং হয়তো শেষপর্যন্ত ছুড়ে ফেলতেন।

স্বপ্নেন্দু ভাবল, এবার একটা দিন ঠিক করে ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কাছে ওরা যাবে। হ্যাঁ, তার শরীর নেই। পুরুষ মানুষের কোনও চিহ্ন তার নেই। হেনার মধ্যে মহিলার পাওয়া যাবে না। কিন্তু ওগুলোই কি সব? পুরুষ এবং মহিলা কি দুজনের শরীরের মধ্যেই তৃপ্তি খুঁজবে শুধু? তাদের মনের আনন্দ বলেও তো একটা ব্যাপার আছে। হেনা সঙ্গে থাকলে সে ওই আনন্দ পাবেই। দুজনে মিলে গল্প করবে, ভালোবাসবে, বেড়াতে যাবে। আসন্ন ভবিষ্যতের কথা ভেবে স্বপ্নেন্দু শিহরণ বোধ করছিল।

বাস থেকে নেমে চোখের ওপর একটা ঘটনা ঘটতে দেখল সে। একজন মহিলা অলসভাবে হাঁটছিলেন। তাঁর হাতে একটা রেডিও সেট। বোধহয় সারাতে দিয়েছিলেন বা ওইরকম কিছু। হঠাৎ একটা লোক তাঁর হাত থেকে সেটা ছিনিয়ে দৌড়তে শুরু করল। মহিলা চিৎকার করে পিছু ধাওয়া করতে কোত্থেকে আর একটা লোক উদয় হয়ে তাঁর শাড়ির আঁচল টেনে ধরল। পতপত করে শাড়িটা খুলে গেল। মহিলা চেষ্টা করেও সেটাকে আটকাতে পারলেন না। দ্বিতীয় লোকটা শাড়িটা হাতে নিয়ে উলটো দিকে দৌড়ল। স্বপ্নেন্দু এতটা উত্তেজিত হয়েছিল যে সে পিছু ধাওয়া করল দ্বিতীয় লোকটার। কিন্তু দূরত্ব এত বেশি যে তার পক্ষে ধরা সম্ভব নয় বুঝে চিৎকার করতে লাগল যাতে অন্য লোক লোকটাকে ধরে। কিন্তু সে দেখল চারপাশের মানুষজন সে-চেষ্টাই করছে না। বরং হাসাহাসি শুরু হয়েছে। স্বপ্নেন্দু রাগত গলায় বলল, 'আপনারা হাসছেন? লজ্জা করছে না? একজন মহিলাকে বেইজ্জত করছে সবার সামনে। ছি-ছি!'

জনতার একজন বলল, 'কে মহিলা? উনি মহিলা তার প্রমাণ আছে?' থমকে গেল স্বপ্নেন্দু, 'শাড়ি-ব্লাউজ পরেছেন দেখছেন না?'

'আপনি শাড়ি-ব্লাউজ পরলে মশাই একইরকম দেখাবে। শোনেননি কাল থেকে ট্রাম-বাসে লেডিস সিট উঠে যাচ্ছে।'

লেডিস সিট উঠে যাচ্ছে? ততক্ষণে ছিনতাইকারী হাওয়া হয়ে গিয়েছে। স্বপ্নেন্দু মহিলার দিকে তাকাল। দুহাতে জামা ঢাকার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। স্বপ্নেন্দু বুঝল পুরোনো সংস্কার এবং অভ্যেস ত্যাগ করতে পারেননি মহিলা।

সকালে শহরটা বেশ ছিমছাম ছিল। দুপুরে কী হয়েছিল স্বপ্নেন্দু জানে না। হেনা সেনের বাড়িতে যতক্ষণ ছিল বাইরের পৃথিবীর কথা খেয়াল ছিল না। কিন্তু বিকেলে মনে হল কলকাতা যেন স্বচ্ছন্দ নয়। মানুষগুলোর ব্যবহার পালটে গিয়েছে।

অবনীদা বসেছিল দোকানে। স্বপ্নেন্দু দেখল দোকানটা ন্যাড়া। জিনিসপত্র কিছুই নেই। স্বপ্নেন্দু জিগ্যেস করল, 'কেমন আছেন অবনীদা? আমি স্বপ্নেন্দু।'

'দেখছ তো ভাই। ওগুলো নিয়ে ওরা কী করবে জানি না তবু নিয়ে গেল।'

'কী নিয়ে গেল?'

'চায়ের কাপ-ডিশ-কেটলি-জলের ড্রাম!'

'কারা নিল?'

'এখন তো চেনা মুশকিল। দলবেঁধে সাত আটজন এসেছিল। লুট করে নিয়ে চলে গেল। বললাম কোনও কাজে লাগবে না ভাই, কিন্তু শুনল না। তুমি কিছু দ্যাখোনি?'

'মনে হল কিছু একটা হয়েছে।'

'দোকানপাট লুঠ হচ্ছে, বড়রাস্তার কাপড়ের দোকানগুলো ভেঙে সবাই যে যার বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছে। এমনকী মিষ্টির দোকান লুঠ করে সেগুলো চটকাচ্ছে মানুষগুলো। এসব কেন হচ্ছে জানো?'

'কেন?'

'সবাই বুঝে গেছে তাদের আর পাওয়ার কিছু নেই। পুলিশ এসেছিল লরিতে চেপে। ধাওয়া করতে সবাই পালাল। কিন্তু এর মধ্যেই মানুষ জেনে গেছে পুলিশের পুরোনো বন্দুকগুলো অকেজো হয়ে গিয়েছে। নতুন যে অস্ত্রের কথা শোনা যাচ্ছে তা কেউ চাক্ষুষ করেনি। এখন তাই পুলিশ দেখলে কেউ ভয় পায় না।'

'অকেজো হয়ে গিয়েছে মানে?'

'ট্রিগার টিপলেও গুলি বের হচ্ছে না। বোধহয় গুলিগুলোর বারোটা বেজে গেছে। কী ভয়ঙ্কর কথা! চারদিকে এখন অরাজকতা শুরু হয়ে যাবে। তুমি জানো আমার ছেলেটা আমাকে কী বলেছে?'

'কী?'

'বলল, একদম চোখ রাঙাবে না। তোমার খাই না পরি? আমি আমার মতো থাকব তুমি নাক গলাবে না। জীবনে যা কিছু সবই তো ভোগ করেছ, আমি কী পেলাম? বোঝো! আমার ভয় হচ্ছে আমাদের সংসারগুলো পর্যন্ত ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। নরক, নরক এসে গেল।'

এইসময় আর-একটা কঙ্কাল এসে হাজির হল। তার দিকে তাকিয়ে চিনতে পারল না স্বপ্নেন্দু। লোকটা বলল, 'টিভি চালু হয়েছে?

অবনীদা মাথা নাড়ল, 'জানি না। ওটা ছেলে বগলদাবা করে সরে পড়েছে। বাড়ির সব জিনিস সে হাওয়া করে দিচ্ছে।'

'কেন?'

'এখন পড়ে থাকা নাকি মূর্খামি। এমনকী সে তার মাকে বলছে, তুমি আর মা কোথায়, মা হতে হলে তো মেয়েমানুষ হতে হয়।'

স্বপ্নেন্দু আর দাঁড়াল না। তার মন খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। পাশের বাড়ির জানলায় একটি মুখ চিৎকার করে উঠল, 'কে-কে?'

'আমি স্বপ্নেন্দু।'

'ও তুমি। আমি তোমার হরিজ্যাঠা। কিন্তু তুমি স্বপ্নেন্দু তার প্রমাণ কী? আজকাল তো কাউকে বোঝা যায় না। বাপের নাম বলো?'

'আমার বাবা আপনার বন্ধু ছিলেন। ঈশ্বর তারকনাথ—।'

'ও বুঝেছি। উই হ্যাভ লস্ট আওয়ার আইডেন্টিফিকেশন। সাম্যবাদ। সাম্যবাদ। কম্যুনিজম। তোমার মুখ্যমন্ত্রী যা বোঝাবেন তাই বুঝতে হবে? বাবা ছেলের দিকে তাকিয়ে চিনতে পারে না। মেয়েকে আর মেয়ে বলে মনে হয় না। হ্যাঁ, শোনো। সবসময় দরজা বন্ধ রাখবে বাবা। কোনও সিকিউরিটি নেই। যে-কোনও মুহূর্তেই বাড়ি লুঠ হতে পারে। বড়রাস্তায় কী হয়েছে শুনেছ?'

'শুনেছি।'

'দাঙ্গার সময় এরকম হতো। তখন কারণটা বোঝা যেত। আমি তো দরজা খুলছি না। যা কথা বলার জানলা দিয়ে বলো।'

স্বপ্নেন্দু সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এল। এই সিঁড়ির মুখে কোনও দরজা নেই। ওপরে উঠে পাশাপাশি দুটো ফ্ল্যাট। নিচে দরজা থাকলে কে বন্ধ করবে সেই ঝামেলায় ওটা খোলা রাখা রয়েছে।

ঘরের দরজা বন্ধ করে স্বপ্নেন্দু টেবিলের কাছে চলে এল। চাদর সরাতে ঝাপসা লাল রঙ চোখে পড়ল। সন্তর্পণে বড় জারটা খুলতেই ছোট কাচের বাটির মধ্যে রক্তগোলাপটাকে স্পষ্ট দেখা গেল। সেই একই রকম সতেজ, ডাঁটো পাপড়ি। আর কী আশ্চর্য, সেই জলের ফোঁটাটাও অবিকল রয়ে গেছে। স্বপ্নেন্দু বুঝতে পারছিল একটু হাওয়ার স্পর্শ পেলে ফুলটা হয়তো ছাই হয়ে যাবে। সে কৃপণের মতো ফুলটার দিকে তাকাল। আঃ, হৃৎপিণ্ড ক্রমশ শান্তিতে ভরে যাচ্ছে। কী আরাম।

একটা তোয়ালে নিয়ে মুখ পরিষ্কার করল সে। ধুলো লেগেছিল করোটিতে। তোয়ালেতে বেশ ময়লা। নিজের জামাকাপড় খুলে সে খাটের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। জানলা দিয়ে হাওয়া ঢুকছে ঘরে। ঝিরঝিরে হাওয়া তার হাড়ের মধ্যে দিয়ে স্বচ্ছন্দে এপাশ-ওপাশ করছে। শীতকালে কী হবে? তখন কি হাড় কনকন করবে?

স্বপ্নেন্দুর মনে হেনা সেনের মুখ ভেসে উঠল। নরম চিবুক, গলায় স্বরে এখনও আগের মমতা। হেনা কি তাকে ভালোবেসেছে? স্বপ্নেন্দুর হৃৎপিণ্ড কেঁপে উঠল। আর কিছু চায় না সে। শুধু হেনা ভালোবেসে তার পাশে থাক। ওর সেই মায়া-চোখ আদুরে গাল, মোহিনী হাসি, দম-বন্ধ করা বুক নাই থাকল, কিন্তু হেনা তো আছে। আজ বিকেলে যা দেখল এবং শুনল তাতে কলকাতার পরিবেশটা কাল কী হবে অনুমান করা যাচ্ছে না। মানুষের চরিত্র খুব দ্রুত পালটে যাচ্ছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হেনাকে বিয়ে করা দরকার। স্বপ্নেন্দু বিছানা ছেড়ে উঠল। তারপর টেলিফোন ডাইরেক্টরি দেখে ম্যারেজ রেজিস্ট্রারকে ফোন করল।

'হ্যালো। ম্যারেজ রেজিস্ট্রার অফিস?'

'হ্যাঁ। কী চাই?'

'এখন বিয়ে করতে গেলে নোটিশ দিতে হয়?'

'বিয়ে? কে বিয়ে করবে?'

'আমি।' কথাটা বলতে একটু লজ্জা বোধ করল স্বপ্নেন্দু।

'আপনি কি পাগল হয়ে গিয়েছেন?'

'মানে? এটা কি ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিস নয়? এস কে রায়—।

'হ্যাঁ ঠিকই।'

'আপনার ওখান থেকে আমার এক বন্ধু মাস তিনেক আগে রেজিস্ট্রি করেছে। পাগল বলছেন কেন?'

'আপনি কাকে বিয়ে করবেন?'

'যাকে ভালোবাসি তাকে।'

'তিনি ছেলে না মেয়ে?'

'কী আজেবাজে কথা বলছেন?'

'মাপ করবেন। এখন তো কেউ আর ছেলে কিংবা মেয়ে প্রমাণ করতে পারছেন না। ফলে বিয়ে হবে কী করে? পুরোনো আইনে আছে পুরুষ এবং মহিলার মধ্যে বিয়ে হতে পারে। পুরুষে-পুরুষে কিংবা মহিলায়-মহিলায় অথবা নপুংসকদের মধ্যে বর্তমানে বিবাহের কোনও আইন নেই। বুঝলেন মশাই?' হাসলেন রেজিস্ট্রার। শব্দ হল।

'সে কি! এখন তাহলে বিয়ে হবে না?'

'না। তাছাড়া আপনি তো তাজ্জব মানুষ। যেখানে এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মানুষ উন্মাদ হয়ে উঠেছে, সম্পর্ক ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে সেখানে আপনি বিয়ের কথা ভাবছেন? ইটস এ নিউজ। খবরের কাগজে ছাপা হওয়া উচিত।' হে-হে করে হেসে উঠলেন রেজিস্ট্রার।

বিরক্ত এবং হতাশ স্বপ্নেন্দু বলল, 'জ্ঞান দেবেন না। তাহলে আপনি আছেন কী করতে? আপনার চাকরি তো গেল।'

'গেল। দুহাতে এতকাল কামিয়েছি ভাই। সব গেল। তবে একটা সুখবর আছে। আপনি সরকারের কাছ থেকে সার্টিফিকেট নিতে পারেন।'

'সার্টিফিকেট?'

'হ্যাঁ। আপনি অমুক চন্দ্র অমুক, এক্স শ্রীমতী অমুকের সঙ্গে একসঙ্গে থাকতে চান। এ বিষয়ে এক্স শ্রীমতীর কোনও আপত্তি নেই। তাকেও সই করতে হবে। সরকার আপনাদের পাঁচ বছর একত্রে থাকার অনুমতি দেবেন।'

'পাঁচ বছর?'

'স্টেয়িং টুগেদার। তারপর ইচ্ছে করলে ছাড়াও যেতে পারে, আবার ওটা রিনিউ করাতেও পারেন। আগে বিবাহিত জীবন কতদিন টিকত? পঞ্চাশ-ষাট বড়জোর সত্তর। তার বেশি নয়। কিন্তু এখন অনন্ত জীবন। তাই এই ব্যবস্থা। আগে হলে এত কথার জন্যে দক্ষিণা চাইতাম, এখন কী ঠিক করলেন জানাবেন। আমিই না হয় সার্টিফিকেটের ব্যবস্থা করে দেব।'

'সার্টিফিকেট যদি না চাই?'

'মিটে গেল গোল।' ওপাশ থেকে লাইনটা কেটে দেওয়ার শব্দ হল। রিসিভার নামিয়ে রেখে স্বপ্নেন্দু কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। যাঃ শালা, এই কঙ্কাল শরীরে বিয়েরও ব্যবস্থা নেই। ওর মনে হল মুখ্যমন্ত্রী এই পরিবর্তিত অবস্থার কথা এতটা না ভাবলেও পারতেন। হেনা সেনের মনে পুরোনো সংস্কার জড়িয়ে আছে। বিয়ে ছাড়া একসঙ্গে থাকতে চাইলে হয়! যতই সুন্দরী হও, আধুনিকা হও—বিয়েটি চাই।

এই সময় বাইরে খুব হইচই শোনা গেল। স্বপ্নেন্দু জানলায় গিয়ে দাঁড়াতেই দেখতে পেল তিন-চারজন লোক একটা লোককে ঘিরে ধরেছে। লোকটা মোটরবাইকে বসে। লোকগুলো ওকে টানাটানি করছে। লোকটার কঙ্কাল বেশ রোগাপটকা। হঠাৎ মুখ তুলে সে স্বপ্নেন্দুকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে উঠল, 'দেখুন, এরা আমার বাইক কেড়ে নিতে চাইছে। দিনদুপুরে ছিনতাই করছে!' লোকগুলো হাসল। একজন বলল, 'এ বাইক তোর তার প্রমাণ কী?'

'আমার লাইসেন্স আছে। এই দেখুন।'

'হে হে হে। এ তো রক্তমাংসের মানুষের ছবি। তোর ছবি তার কী প্রমাণ?'

লোকটা প্রতিবাদ করছিল কিন্তু ওরা ওকে টেনে-হিঁচড়ে নামিয়ে বাইকটাকে নিয়ে চলে গেল।

স্বপ্নেন্দু সরে এল জানলা থেকে। হঠাৎ সমস্ত শহরের মানুষ পাগল হয়ে গেল নাকি! সে রেডিও খুলতেই মুখ্যমন্ত্রীর গলা ভেসে এল, 'বন্ধুগণ। আমরা যে পরিবর্তিত অবস্থায় পৌঁছেছি তাকে কাজে লাগানোর জন্যে আমি কলকাতাবাসীর কাছে আবেদন রাখছি। আপনারা এই পরিস্থিতির সুযোগ নিন। এখন অবস্থা অনেক উন্নত। দলে-দলে মানুষ অফিস-কাছারিতে যাচ্ছেন। ট্রাম-বাসে সহজে চলাফেরা করছেন। কলকাতায় আর কখনও খাদ্যাভাব জলাভাব অনুভূত হবে না। কিন্তু কোনও-কোনও কু লোক এত সুন্দর ব্যবস্থাকে বানচাল করে দিতে চাইছেন। আমি এই বলে তাদের সতর্ক করে দিতে চাই কোনওরকম অশান্তি সরকার সহ্য করবে না। জনসাধারণকে অনুরোধ করছি এর প্রতিবাদ করতে। আপনারা সবাইকে বন্ধুর মতো গ্রহণ করুন।'

এইসময় দরজায় শব্দ হল। রেডিওটাকে বন্ধ করে স্বপ্নেন্দু মুখ ফেরাল। দ্বিতীয়বার শব্দটা হল। কে এল এই সময়ে? সন্ধে হয়ে আসছে। সতর্কবাণী মনে পড়ল। পরিচিত ব্যক্তি ছাড়া চট করে দরজা খোলা উচিত হবে না। স্বপ্নেন্দু জিগ্যেস করল, 'কে ওখানে?'

'আমি।' স্বরটি মহিলার।

'আমি কে?'

'আহা, খোলোই না।'

স্বপ্নেন্দুর হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠল। হেনা না? ওর মতো স্বর। হেনা এসেছে ভাবাই যায় না। সে দ্রুত দরজার পাল্লা খুলতেই দেখল মাথায় ঘোমটা দিয়ে হাতে ব্যাগ নিয়ে মহিলা ঘরে ঢুকে পড়ল। কিন্তু এ হেনা নয়, নিশ্চয়ই নয়।

'কী ব্যাপার?' মহিলা মুখ তুলতেই হোঁচট খেল। না, এ হেনা নয়। হেনার চিবুক বড় আদুরে, মসৃণ এবং গোলাকার।

'আমাকে চিনতে পারছ না? হায় ভগবান। আমি আত্রেয়ী।'

'আত্রেয়ী?'

'আমি ভেবেছিলাম গলার স্বরে তুমি চিনবে। তোমাকে তো খুব সেনসিটিভ বলে আমি জানতাম। তুমি কি অন্য কোনও মেয়ের কথা ভেবেছিলে?'

'না-না।' স্বপ্নেন্দু বুঝতে পারছিল না আত্রেয়ী কেন এল, 'আসলে ব্যাপারটা এত চমকপ্রদ, বলো কী খবর। বসো।'

'আমাকে কেমন দেখাচ্ছে স্বপ্নেন্দু—'

মাথার ঘোমটাটা সরিয়ে ফেলল আত্রেয়ী। সাদা করোটিটা ক্যাট-ক্যাট করছে। সেটার আকৃতি গোল। কপালটা উঁচু। চোখের ফুটোদুটো বেশ বড়, নাকের ডগা বসা, চিবুক চৌকো। হেনা সেনকে দেখে মনের যে আরাম হয়েছিল তার বিন্দুমাত্র হল না আত্রেয়ীকে দেখে। কিন্তু কেমন খসখসে শিরশিরানি বোধ করল হৃৎপিণ্ড। স্বপ্নেন্দু জবাব দিল, 'ভালো।'

'কিন্তু ও নাকি সহ্য করতে পারছে না। আমিও না।'

'এটা তো মেনে নিতেই হবে।'

'সে কথা কে বোঝায় বলো। দরজাটা বন্ধ করে দাও। বাইরে খুব গোলমাল।'

'এই অবস্থায় এলে কেন?' স্বপ্নেন্দু দরজাটা বন্ধ করে দিল।

'না এসে উপায় ছিল না। আমি একটা পাগলের সঙ্গে থাকতে পারি না।'

'পাগল?'

'হ্যাঁ। ও পাগল হয়ে গিয়েছে।'

'সে কি! কেন?'

'কী বলব তোমাকে! ও পুরুষত্বহীন হয়ে পড়েছিল। অনেক চিকিৎসার পর ও কোথায় সেরে আসছিল। এইসময় ঘটনাটা ঘটতে ও পাগল হয়ে গেল। এই হারানোটা ও স্ট্যান্ড করতে পারছে না। কাল আমাকে মেরেছে। এরপর আমি থাকি কী করে? না, আর একসঙ্গে থাকা সম্ভব নয়।' একনাগাড়ে কথাগুলো বলে ঈষৎ হাঁপাতে লাগল সে।

স্বপ্নেন্দু বলল, 'বসো।'

চেয়ারে বসে আত্রেয়ী জিগ্যেস করল, 'তুমি অপছন্দ করছ?'

'না তো। আমি তোমাকে বসতে বললাম কেন?'

'কিন্তু আমি আর ফিরব না। আমি তোমার সঙ্গে থাকব।'

'আমার সঙ্গে থাকবে?' এবার চরমে উঠল স্বপ্নেন্দু।

'হ্যাঁ। আমি তোমাকে ভালোবেসেছিলাম। আমি জানি তুমিও আমাকে চেয়েছিলে।'

'সে তো ছাত্রাবস্থায়।'

'হ্যাঁ। তখন আমি ভুল করেছিলাম। গ্রেট মিসটেক। এখন সেটা সংশোধন করে নিতে চাই। আমরা তো অমর হয়ে গেছি, কোনও মৃত্যুভয় নেই। আমরা চিরজীবন পরস্পরকে ভালোবাসব।' আত্রেয়ী এগিয়ে এল কয়েক পা, 'আমি প্রমাণ করে দেব ভালোবাসা কাকে বলে।'

স্বপ্নেন্দু চমকে উঠল, 'কী আজেবাজে কথা বলছ? তোমরা স্বামী জানতে পারলে কী হবে ভেবেছ? তা ছাড়া—।'

'কিছুই হবে না। কারণ আমি তার স্ত্রী নই।'

'স্ত্রী নও মানে? তোমরা বিবাহিত।'

'ছিলাম। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আমি আর মহিলা নই। মানে যেহেতু আমার ফিমেল অর্গানগুলো নেই তাই ও আমাকে স্ত্রী হিসেবে ক্লেইম করতে পারে না। তা ছাড়া, ও নিজেও তো পুরুষ নেই।' শব্দ করে হাসল আত্রেয়ী, 'এখন পৃথিবীতে স্ত্রী-পুরুষ আলাদা করে নেই। কোনওরকম পার্থক্য থাকছে না। এখন একটাই পরিচয় আমাদের, আমরা মানুষ।'

ফাঁপরে পড়ল স্বপ্নেন্দু। সে বলল, 'কিন্তু তুমি তোমার মা-বাবার কাছে চলে যেতে পারতে। যদি প্রয়োজন হয় আমি পৌঁছে দিচ্ছি।'

'তারা তো সব পাটনায়। শোনোনি, কলকাতার সঙ্গে বহির্বিশ্বের কোনও যোগাযোগ নেই। তা ছাড়া, তুমি কি আমাকে পছন্দ করছ না?' তেজি ভঙ্গিতে কথা বলল আত্রেয়ী।

'না-না, সেকথা হচ্ছে না। তুমি হঠাৎ এখানে উঠলে লোকে বলবে কী?'

'লোকের আর কাজ নেই যে এ ব্যাপারে মাথা ঘামাবে। তা ছাড়া, আমি যে মেয়ে তাই প্রমাণ করবে কে? স্বপ্নেন্দু!'

'বলো?'

আত্রেয়ী এগিয়ে গেল স্বপ্নেন্দুর কাছে, 'আমি ভুল করেছিলাম। এতকাল একটুও শান্তি পাইনি। তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিও না।'

'কিন্তু তুমি বুঝতে পারছ না, এ হয় না।'

'কেন হয় না। পৃথিবীর যে-কোনও মেয়ের তুলনায় আমি তোমাকে বেশি ভালোবাসব। তুমি আমার সঙ্গে সাতদিন থাকো। তারপর যদি তোমার আমাকে খারাপ লাগে তাহলে আমি কথা দিচ্ছি আর বিরক্ত করব না।' কান্নার শব্দ উঠল এই ঘরে। জল নেই, শুধু শব্দে বোঝা যাচ্ছে আত্রেয়ী কাঁদছে।

স্বপ্নেন্দু খুব নার্ভাস বোধ করছিল। আত্রেয়ীকে ছাত্রাবস্থায় তার ভালো লাগত ঠিকই, কিন্তু কখনও প্রেম বলে যে ব্যাপার তা মনে আসেনি। অথচ এখন আত্রেয়ী সেইরকম চাপাতে চাইছে। বাইরে এখন বেশ অন্ধকার। তা ছাড়া, রাস্তার অবস্থা যা তাতে এই রাতটা কোথাও যেতে বলা উচিত হবে না। আজকের রাতটা কোনওরকমে কাটিয়ে দিয়ে কাল সকালে এর বিহিত করতে হবে।

স্বপ্নেন্দু বলল, 'কেঁদো না আত্রেয়ী! সহজ হও।'

'তুমি আমাকে এখনই তাড়িয়ে দেবে না তো?'

'পাগল!'

স্বপ্নেন্দু একদম প্রস্তুত ছিল না। তার কথাটা শেষ হওয়া মাত্র আত্রেয়ী ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল। অদ্ভুত অনুভূতি হল স্বপ্নেন্দুর। তার বুকের হৃৎপিণ্ডে মুখ রেখে আত্রেয়ী বলছে, 'তোমাকে ভালোবাসি, ভালোবাসি, ভালোবাসি।' আর তার হৃৎপিণ্ড কাঁপছে। হাড়ে-হাড়ে ঘষা লাগায় শব্দ হচ্ছে। কোনও শারীরিক অনুভূতি নেই। কোনও চাঞ্চল্য নেই। বরং হাড়ের সঙ্গে হাড়ের স্পর্শে একটা অস্বস্তিকর শব্দ কানে আসছে।

অনেক কষ্টে স্বপ্নেন্দু আত্রেয়ীকে ছাড়াতে পারল। স্বপ্নেন্দু ভেবে পাচ্ছিল না কী করবে। আত্রেয়ী তার বুকে মুখ রাখার সময় তার খারাপ লেগেছিল কি? একমাত্র ওই শব্দটি তাকে সচেতন করেছিল। এছাড়া সে যে নরম হয়ে পড়েছিল, বেশ আরাম হচ্ছিল, তা কি মিথ্যে? যে-কোনও মেয়ে বুকে মাথা রাখলেই কি এমন হয়? হেনা সেন যদি জানতে পারে—। ছিঃ। হেনার কথা ভাবতেই দৃশ্যটা তেতো হয়ে গেল। সে আত্রেয়ীকে কথা ঘোরাবার জন্যে জিগ্যেস করল, 'এলে কী করে? রাস্তায় তো গোলমাল হচ্ছে।'

'অনেক কষ্টে এসেছি। একটা বাসে উঠেছিলাম। ওরা লেডিস সিটে বসতেই দিল না! বলল, এখন কেউ লেডিস নয়। নেমেই দেখি একটা কাপড়ের দোকান লুঠ হচ্ছে। আমি তাড়াতাড়ি পা চালাতে তিনটে লোক আমার পিছন-পিছন হাঁটতে লাগল।' আত্রেয়ী দম নিল।

'তোমার পিছন-পিছন? আগে হলেও কথা ছিল।'

'না, শরীরের জন্যে নয়। এই শাড়ির জন্যে। ততক্ষণে আমি এই গলির মধ্যে ঢুকে পড়েছি। ওই চায়ের দোকানের লোকটা তখন না থাকলে—।'

'চায়ের দোকান। অবনীদা। অবনীদা তোমায় দেখেছে?'

'ওঁর নাম বুঝি অবনীদা! উনি তেড়ে উঠতে লোকগুলো চলে গেল।'

'আমার কাছে আসছ সেটা ওকে বলেছ?'

'হ্যাঁ। আমি যে বাড়িটা গুলিয়ে ফেলেছিলাম।'

'কিছু বলেনি?' হতাশ গলায় জিজ্ঞাসা করল স্বপ্নেন্দু।

'কেন? অবনীদা কি তোমার গার্জেন?'

'তা কেন হবে?'

'উঃ, স্বপ্ন, তুমি এখনও লোক-নিন্দের ভয়ে মরছ! চলো, তোমার সংসার দেখি।'

'সংসার? আমার আবার সংসার কী। চাকরটা বোধহয় দেশে গিয়ে বেঁচে গেল। আর কখনও আসবে বলে মনে হয় না। এই তো দুটো ঘর। তুমি ওই ঘরটা ব্যবহার করতে পারো। পরিষ্কার আছে কি না জানি না। কদিন তো ঝাঁট পড়েনি—।'

'ওই ঘর ব্যবহার করব মানে?'

'তুমি তো আজ রাত্রে এখানে থাকছ!'

'নিশ্চয়ই। কিন্তু তার জন্যে আলাদা ঘর ব্যবহার করতে হবে কেন?'

'তুমি কি আমার সঙ্গে শোবে না?' আত্রেয়ীর স্বরে বিস্ময়।

'শোনো, আফটার অল তুমি মেয়ে, পরস্ত্রী।'

'চমৎকার। একটু আগে তোমাকে বললাম আমি আর কারও স্ত্রী নই। তোমাকে ভালোবাসি বলে ছুটে এসেছি। তবু তোমার হুঁশ হল না। স্বপ্নেন্দু ভয় পেও না, তোমার পাশে শুলে আমার অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার কোনও চান্স নেই।'

'আত্রেয়ী!'

হি-হি করে হেসে উঠল আত্রেয়ী, 'রাগ করো না। এসব কথা আগে উচ্চারণ করতে লজ্জা করত। এখন একটু-আধটু না হয় করি। পাগলামি ছাড়ো, এখন আমরা একসঙ্গে থাকব। জানো স্বপ্ন, আমি চিরকাল ভাবতাম মানুষ কেন মানুষকে আত্মিক ভালোবাসবে না? কেন শরীর তার অবলম্বন হবে? একটা মেয়ের ঠোঁট, বুক, পাছা, যোনির আকর্ষণে আর-একটা ছেলে কুকুরের মতো পেছনে-পেছনে ঘুরবে কেন? ওটাকে ভালোবাসা বলে? ছি! যখন শরীরের ওইসব ক্ষণিক যাদু শেষ হয়ে যাবে, মেয়েটা ছিবড়ে হয়ে যাবে তখন ছেলেটা সেই কুকুরের মতো লেজ গুটিয়ে আর একটা কুকুরীর সন্ধানে ফিরবে! ভাবতেই ঘেন্নায় শরীর গুলিয়ে উঠত। যাকে বিয়ে করেছিলাম সে তো নর্দমা ঘাঁটার মতো শরীরটা খুঁড়ত। কত মাথা ঠুকেছি কিছুতেই শোনেনি। কিন্তু ঈশ্বর শুনেছিলেন। নইলে হঠাৎ সে নপুংসক হয়ে যাবে কেন? অথচ আবার সেটা ফিরে পাওয়ার জন্যে কী চেষ্টা! না পেয়ে পাগল হয়ে গেল। কার্স, কার্স! পুরুষদের ওই পাশবিক অহঙ্কার আমি সহ্য করতে পারি না। ঈশ্বর আমার মনের কথা বুঝেছেন।'

স্বপ্নেন্দু অবাক হয়ে শুনছিল, 'তুমি পুরুষদের ভালোবাসতে চাওনি?'

'হ্যাঁ চেয়েছি। কিন্তু তাতে শরীর থাকবে না। প্লেটোনিক লাভ হল অমর। তাতে দেহের কদর্যতন্ত্রি থাকে না। স্বর্গীয়। এসো স্বপ্ন, আমরা সেই স্বর্গীয় প্রেমে অনন্তকাল ডুবে থাকি। তুমি আর আমি।' হাত বাড়াল আত্রেয়ী।

'কিন্তু তুমি যে এই হাত বাড়াচ্ছ, সেটাতেও তো দেহের প্রয়োজন হচ্ছে!'

'না, এই কঙ্কালের হাড়ে রক্তমাংস নেই। অতএব এটা দেহ কেন হতে যাবে?'

আত্রেয়ীর দিকে তাকাল স্বপ্নেন্দু। এই মেয়েটাও কি ওর স্বামীর মতো পাগল হয়ে গেল। হঠাৎ সে জিগ্যেস করল, 'কিন্তু আমি যদি অন্য কোনও মেয়েকে ভালোবাসি? যদি সে আমাকে সমানভাবে চায়?'

হাসল আত্রেয়ী, 'এখন তো কেউ মেয়ে নয়। সত্যি কি কাউকে ভালোবাস?'

'হ্যাঁ।'

'আমি বিশ্বাস করি না। আমি তাকে দেখতে চাই।'

'বেশ, দেখাব।'

আত্রেয়ীর বসবার ভঙ্গিতে বোঝা যাচ্ছিল সে হতভম্ব হয়ে পড়েছে। শেষপর্যন্ত সে মুখ তুলল, 'তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছ স্বপ্ন?'

'মোটেই না। আমি তোমাকে বন্ধু মনে করি।'

'আমিও তাই চাই। এখন দুজন মানুষের মধ্যে বন্ধুত্বের বেশি কিছু হতে পারে না। তাহলে এমন করে বলছ কেন?'

এইসময় বাইরে খুব হইচই শোনা গেল। স্বপ্নেন্দু দ্রুত জানলায় এসে দেখল নিচের রাস্তায় উন্মত্ত কয়েকটা কঙ্কাল একটি কঙ্কালকে ধরেছে। তারপর তার শরীরে আগুন জ্বালিয়ে দিল লোকগুলো। জ্যান্ত পুড়িয়ে মারছে ওরা। স্বপ্নেন্দুর মাথা খারাপ হয়ে গেল। পাগলের মতো ছোটাছুটি করল লোকটা। একটা আগুনের গোলা রাস্তাময় ছোটাছুটি করছে। তারপর আগুন আপনা-আপনি নিভে গেলে লোকটা হো-হো করে হাসল। তার হাড়ে শুধু সামান্য পোড়া দাগ ছাড়া একটুও ক্ষতি হয়নি। আক্রমণকারীরা হতভম্ব হয়ে পড়েছিল। এবার তারা পালিয়ে গেল যে যার মতন। আক্রান্ত লোকটি চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'আমি অমর। হা-হা-হা মার তোরা, কত মারবি আমায় মার।'

যেন কোনও চলচ্চিত্রের দৃশ্য চোখের সামনে দেখানো হল। স্বপ্নেন্দুর মনে হল একবার রাস্তায় গিয়ে দেখা দরকার। দূরে চিৎকার চেঁচামেচি চলছে এখন। সে রেডিও খুলতেই কোনও শব্দ পেল না। আকাশবাণী কি মৃত? স্বপ্নেন্দু আত্রেয়ীকে বলল, 'তুমি বসো। আমি একটু দেখে আসছি কী হচ্ছে বাইরে।'

'আমিও যাব।'

না বলতে গিয়ে থমকে গেল স্বপ্নেন্দু। এই ঘরে আত্রেয়ীকে একা রেখে যাওয়া উচিত হবে না। টেবিলে জারের তলায় ফুলটা রয়েছে। যদি কোনও খেয়ালে চাদরের ঢাকনা সরায় তাহলে ও ফুলটাকে দেখতে পাবে। সে কোনও ঝুঁকি নিতে চাইল না।

আত্রেয়ীকে নিয়ে বাইরে আসতেই দেখল লাঠি নিয়ে কিছু কঙ্কাল ছোটাছুটি করছে। মোড়ের কাছে আসতে সে অবাক হল! অবনীদার দোকানে একটা কঙ্কাল বসে আছে মূর্তির মতো। তার অঙ্গে এক ফোঁটা সুতো নেই। স্বপ্নেন্দু বলল, 'আচ্ছা, অবনীদা কোথায়?'

'আমিই অবনী। স্বপ্নেন্দু?'

'হ্যাঁ।'

'বাড়ি ফিরে যাও স্বপ্নেন্দু। দেখছ না মানুষ কেমন পাগল হয়ে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি চলে যাও।' অবনীদা বলল।

'কী ব্যাপার?'

'মানুষ জেনে গেছে এই পৃথিবী থেকে তাদের পাওয়ার কিছু নেই। অথচ তাদের অনন্তকাল অমর হয়ে থাকতে হবে। এমনকী আগুনও তাদের দগ্ধ করছে না। সবাই এই দশা থেকে মুক্তি চায়। সবাই চিতায় শুতে চায় স্বপ্নেন্দু।'

'সবাই?'

'হ্যাঁ। আমি তো চাই। তুমি জানো না, আমার স্ত্রী আজ বেরিয়ে গেছে। সে নাকি যে-কোনও উপায়ে আত্মহত্যা করবেই। কত বললাম তবু গেল।'

'আপনি বাধা দিলেন না?'

'কী হবে দিয়ে? ওরা আমার লুঙ্গিটাকে খুলে নিয়ে গেল। এই যে উদোম হয়ে বসে আছি খারাপ লাগছে না কিন্তু। বেশ হাওয়া চলছে শরীরে। যাওয়ার সময় আমার ছোট ছেলেটা বলল, মায়ের সঙ্গে থাকবে। জানো, সে বলল মায়ের সঙ্গে? সব নষ্ট হয়ে গেছে, সব সম্পর্ক, কিন্তু স্বপ্নেন্দু শিশুরা এখন মাকে মা বলে জানে।'

অবনীদা বলল, 'আর দাঁড়িয়ে থেকো না। তোমার সঙ্গে মহিলা আছেন। ওঁর শাড়ি খুলে নেবে ওরা।'

'কিন্তু পুলিশ নেই?'

'না। এখন কিছুই নেই। সবাই লুঠ করতে নেমেছে। কারণ লুঠ করলে যদি খুন হয়ে যায় তাহলে সে বেঁচে যাবে। এই মৃত্যুর নাম জীবন।'

স্বপ্নেন্দু ফিরে আসছিল। তাদের পাশের দরজায় তখন একটা অদ্ভুত দৃশ্য। সেই বৃদ্ধ ল্যাম্পপোস্টের গায়ে দড়ি ঝুলিয়ে গলায় ফাঁস ঢুকিয়ে লাফিয়ে পড়ল। তাকে দেখতে ভিড় জমে গেছে। ঘাড়টা সামান্য বেঁকে গেল। কিন্তু লোকটা চেঁচাতে লাগল, 'আমি কি মরেছি? কী দেখছ তোমরা, আমি কি মরেছি?'

উলঙ্গ সেই কঙ্কালটার দিকে তাকিয়ে একজন চেঁচাল, 'বললাম মরবেন না, তবু শুনলেন না। এখন ঝুলুন ওখানে সারাজীবন। আমি অত ওপরে উঠে দড়ি কাটতে পারব না। আমি মরেছি, মরলে কেউ চেঁচায়?'

হাউ-হাউ করে কাঁদছিল বুড়ো। 'দড়ি দিয়েও মারলাম না।' তার শরীরটা হাওয়ায় দুলছিল একজন লাফিয়ে তার পা-দুটো ঠেলে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'দোল দোল দোল, দে হরিবোল।'

স্বপ্নেন্দু আর দাঁড়াল না। তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে এল। ঘরে ঢুকে আত্রেয়ী বলল, 'ডিসগাস্টিং। মানুষ কোথায় স্বাভাবিক ভাবে বাঁচার চেষ্টা করবে না মরার জন্যে হেদিয়ে মরছে। এই, আমি শাড়িটা খুলছি।'

স্বপ্নেন্দু অবাক হয়ে দেখল আত্রেয়ী তার শরীর থেকে শাড়ি খুলে ফেলল। জামাটাকে টান মেরে ছুড়ে ফেলে বলল, 'কেমন দেখাচ্ছে?'

'জাদুঘরে এইরকম মূর্তি দেখেছি।'

'এখন তো কলকাতা শহরটাই জাদুঘর হয়ে গেছে। লোকটা ঠিকই বলেছে, বেশ হাওয়া পাস করছে শরীরের ভেতর দিয়ে। হাড় জুড়োচ্ছে। এসো শুয়ে পড়ি। খুব টায়ার্ড লাগছে।'

'তুমি শোও। আমি—।'

স্বপ্নেন্দু জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। নিচে প্রচণ্ড উত্তেজক কিছু চলছে। ঝুঁকে পড়ল সে। সে বৃদ্ধ এখনও ল্যাম্পপোস্টে দোল খাচ্ছে এবং সেই অবস্থায় চিৎকার করে উঠছেন, 'মেরে ফ্যাল, খোকা তুই মেরে ফ্যাল আমাকে। আমি তোর পায়ে পড়ছি খোকা, এভাবে দোল খাওয়াস না।'

নিচে দাঁড়ানো একটা কঙ্কাল খেঁকিয়ে উঠল, 'খই-খই করে বলেছিলাম এখন গলায় দড়ি দিলে কেউ মরে না। তখন শুনলে না কেন?'

'আমি বুঝতে পারিনি। যেমন করে হোক মেরে ফ্যাল আমাকে। আমি তোর বাপ, তোকে হুকুম করছি মার আমাকে।'

'মার বললেই হল। অত ওপরে ঝুলে তো বেশ মজাসে হাওয়া খাচ্ছ।' কঙ্কালটি আশেপাশে মজা দেখতে আসা মুখগুলির দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল, 'একটা উপায় বলুন তো? আমার মাথায় কিছু আসছে না।'

জনতা সঙ্গে-সঙ্গে উত্তেজিতভাবে নানান রকম পরামর্শ দিতে লাগল। শেষপর্যন্ত স্থির হল নিচে আগুন জ্বালিয়ে বৃদ্ধকে পুড়িয়ে মারা হবে। সেই মতো প্রচুর কাঠ জোগাড় করল। তারপর সোৎসাহে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হল বৃদ্ধের নিচে। দাউ-দাউ করে সেই আগুন বৃদ্ধকে গ্রাস করে ফেলতে স্বপ্নেন্দু চোখ বন্ধ করতে চাইলেও পারল না। তার চোখের পাতা কিংবা মণি নেই তবু সে সব দেখতে পাচ্ছে। এবং দেখে যেতে হবে। আর তারপরেই অদ্ভুত কাণ্ডটা ঘটল। আগুনের শিখা বৃদ্ধের শরীরের খাঁচাকে লালচে করতে না করতে গলায় ফাঁস পরানো দড়িটা পুড়ে গিয়ে খসে পড়ল রাস্তায়। হইহই করে সবাই ছুটে গেল বৃদ্ধের কাছে। বৃদ্ধ উঠে দাঁড়াতে পারছে না। কারণ পতনের পর তার পায়ের হাড় ভেঙেছে। কিন্তু সে সমানে চিৎকার করে যাচ্ছে, 'মেরে ফ্যাল আমাকে, মেরে ফ্যাল।'

সবাই মিলে ওকে ধরাধরি করে ভেতরে নিয়ে যেতে স্বপ্নেন্দু মুখ ফেরাল। আত্রেয়ী তার বালিশ জড়িয়ে শুয়ে আছে পাশ ফিরে। ওর হাড়গুলো বড্ড বেশি সাদা। বুকের খাঁচায় নিরেট হৃৎপিণ্ডটার দিকে তাকাল সে। ওটাকে ভাঙা যাবে না, কিছুতেই না। আত্রেয়ী ডাকল, 'কী দেখছ গো?'

স্বপ্নেন্দু বুঝে উঠছিল না সে কী করবে। এই ঘরে আত্রেয়ীর সঙ্গে রাত কাটিয়েছে শুনলে হেনা তাকে কি ভালোবাসবে? তার সঙ্গে সারাজীবন থাকতে চাইবে?

আত্রেয়ী ডাকল, 'কী হল? এসো কাছে এসো।'

'কী হবে কাছে এসে?' স্বপ্নেন্দু সময় নিচ্ছিল।

'তোমাকে জড়িয়ে ধরে সারারাত ঘুমিয়ে থাকব।'

'আমার ঘুম আসে না।'

'আমারও।'

'তাহলে?'

'তোমার বুকে মুখ রেখে রাতটা কাটিয়ে দেব।'

স্বপ্নেন্দু টেবিলের দিকে তাকাল। গোলাপটাকে দেখতে তার খুব ইচ্ছে করছিল। কিন্তু আত্রেয়ীর সামনে কাপড় সরিয়ে ওটার দিকে তাকাতে সাহস হচ্ছিল না। ও নিশ্চয়ই লোভী হবে। ওরকম ডাঁটো গোলাপ দেখলে কেউ স্থির থাকতে পারে না। বরং ও ঘুমিয়ে পড়লে, দূর, এখন তো ঘুম চলে গেছে সাধারণ মানুষের চোখ থেকে।

স্বপ্নেন্দু এক পা এগিয়ে এল। একটি নগ্নকঙ্কাল এবার চিৎ হল। মেয়েদের শরীরে মাংস না থাকলে কীরকম বীভৎস হয়ে যায়। রাস্তাঘাটে যত কঙ্কাল চোখে পড়েছে তাদের দেখলেই এটা বোঝা যায়। পুরুষদের হাড়ের গঠন মেয়েদের চেয়ে অনেক সুন্দর। কিন্তু

হেনার চিবুক? মাংস বা চামড়া না থাকা সত্ত্বেও কীরকম আদুরে। আর আত্রেয়ী! ওর দিকে তাকিয়ে কোনও অনুভূতিই হচ্ছে না।

আত্রেয়ী আবার ডাকল, 'এসো না!'

স্বপ্নেন্দু বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়াল, 'শোনো আত্রেয়ী, আমি একটি মেয়েকে ভালোবাসি। তার নাম হেনা। আমি তার সঙ্গেই থাকতে চাই।'

'হেনা, সে কে?'

'আমার বান্ধবী।'

'তুমি ভালোবাস? কত বছর?'

'বছর নয়। তিনদিন।'

'সে কি? তিনদিনে একটা মেয়ের মন বোঝা যায়?'

'যায়। যে বুঝতে পারে সে একমুহূর্তেই পারে।'

'আমি বিশ্বাস করি না।'

'তোমার অবিশ্বাসে আমি কী করতে পারি।'

'তুমি আমাকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে এসব বলছ।'

'আমি মিথ্যে বলছি না।'

আত্রেয়ী ধীরে-ধীরে উঠে বসল, 'আমি সত্যি কিছু বুঝতে পারছি না। মাত্র তিনদিন দেখে তুমি একটি মেয়ের ওপর নির্ভর করতে চাইছ? সে তোমাকে কী দেবে? তারও তো শরীর নেই। মেয়ে বলে তার কোনও আলাদা অস্তিত্বই নেই। আর আমি তোমাকে চেয়ে পাগলের মতো ছুটে এসেছি এই বিপদে—।' আত্রেয়ীর গলা রুদ্ধ হল। স্বপ্নেন্দুর মনে হল ওর মুখটা খুব করুণ দেখাচ্ছে।

'কিন্তু তুমি এতগুলো বছরে আসোনি কেন?'

'আসতে পারিনি। কারণ ও আমাকে ডিভোর্স দিত না। তা ছাড়া, আমার ওই এঁটো শরীরটাকে আমি তোমায় দিতে পারতাম না স্বপ্নেন্দু। অনেক কষ্টে নিজেকে গুটিয়ে রেখেছিলাম। কলেজ জীবনের ছবিটাকে জোর করে মুছে ফেলেছিলাম। কিন্তু সেদিন লিন্ডসে স্ট্রিটে তোমায় দেখে বুঝলাম এতদিন শুধু নিজেকে ঠকিয়েছি। তাই যে মুহূর্তে এই শরীরটা পবিত্র হয়ে গেল অমনি তোমার কাছে ছুটে এলাম স্বপ্ন।'

স্বপ্নেন্দুর মনে হল আত্রেয়ী সত্যি কথা বলছে। কিন্তু সে এই সত্যিটাকে মেনে নেবে কী করে? সে বলল, 'আত্রেয়ী, আমি তোমার সঙ্গে হেনার আলাপ করিয়ে দেব।'

'বেশ, কিন্তু আমি তোমার কাছেই থাকব। এতে কি তোমার হেনা আপত্তি করবে?'

'জানি না। তবে শুনেছি মেয়েরা সতীন পছন্দ করে না।'

'সতীন? ও, তুমি ভুলে যাচ্ছ আমরা কেউ মেয়ে নই।'

'তাহলে তো চুকেই গেল। তুমি শুয়ে পড়ো, আমি—।'

'আমার পাশে শুতে তোমার এখনও আপত্তি? বন্ধু কি বন্ধুর পাশে শোয় না?'

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে হাড়ে-হাড়ে কোনও অনুভূতি না হলেও পুরোনো অভ্যেসে বসতে ইচ্ছে করে। স্বপ্নেন্দু খাটে [illegible] মাথাটা এলিয়ে দিতেই আত্রেয়ী ওর বুকের কাছে সরে এল। এসে বলল, 'তোমার হৃৎপিণ্ডের শব্দ পাচ্ছি।'

স্বপ্নেন্দু আড়ষ্ট গলায় জিগ্যেস করল, 'আচ্ছা আত্রেয়ী, এতসব ব্যাপার হয়ে গেল,

মানুষের এমন অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটল, সবাই হা-হুতাশ করছে কিন্তু তোমার কোনও প্রতিক্রিয়া হয়নি না?'

'না।' আত্রেয়ী হাসল যেন, 'কারণ আমি আমার শরীরটাকে ঘেন্না করতাম। ওটা আমার শত্রু ছিল। আর কথা বলো না, আমাকে তোমার হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ শুনতে দাও।' আত্রেয়ী স্বপ্নেন্দুর বুকের খাঁচায় কান চেপে ধরল। তার ভেতরে সেই শক্ত স্বচ্ছ মোড়কের ভেতরে যে হৃৎপিণ্ড দপদপ করছিল সে ততক্ষণে অনেক সহজ। হেনাকে সে ভালোবাসে। কিন্তু এই মুহূর্তে সে আত্রেয়ীকেও ভালোবাসে। শরীরের নির্দিষ্ট গতি যেহেতু আর চারপাশে নেই তাই কোনও অপরাধবোধও আর কাজ করছে না। স্বপ্নেন্দু আর-একবার টেবিলের দিকে তাকাল। ওই কাপড়ের ঢাকনা সরিয়ে জারের আড়ালটা তুললেই তার চোখে ঘুম কিংবা শান্তি নেমে আসত। কিন্তু ওই ঝুঁকি সে কিছুতেই নিতে পারে না। তাকে সারারাত আত্রেয়ীকে পাহারা দিতে হবে।

ভোরবেলায় স্বপ্নেন্দু বলল, 'চলো, ঘুরে আসি।'

মাঝরাত্রে একটা ঝগড়া হয়েছিল। স্বপ্নেন্দুর পক্ষে সারারাত একনাগাড়ে একই ভঙ্গিতে শুয়ে থাকা সম্ভব নয়। অথচ আত্রেয়ীর কানে হৃৎপিণ্ডের শব্দ পৌঁছনো চাই। এই নিয়ে কথা কাটাকাটি। স্বপ্নেন্দু বলেছিল, 'এটা উদ্ভট আবদার। বড্ড বেশি চাওয়া।'

তারপর থেকে আত্রেয়ী চুপচাপ হয়ে গেছে। কোনও কথা বলেনি এতক্ষণ। স্বপ্নেন্দু প্রস্তাব করতেও উত্তর দিল না। স্বপ্নেন্দুর ইচ্ছে হল একাই বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু ফুলটাকে এই ঘরে আত্রেয়ীর সঙ্গে একা রেখে যাওয়া অসম্ভব। সে কাছে এল, 'আত্রেয়ী, আমার সঙ্গে কথা বলবে না!'

আত্রেয়ী মুখ ফেরাল, 'আমি যে বড্ড বেশি চাই।'

'একটু কম চাও, তাহলেই তো সব মিটে যায়।'

'বেশ, সেইটুকু হল তুমি।' আত্রেয়ী হাসল।

এখন সবে আঁধার সরেছে। কিন্তু রাস্তাঘাটে বেশ মানুষ। যেহেতু কারও চোখে ঘুম নেই তাই রাস্তা রাত্রেও ফাঁকা হয় না। বের হওয়ার সময় আত্রেয়ী আর পোশাক পরেনি। স্বপ্নেন্দু আপত্তি জানলে বলেছিল, 'এখন আর লজ্জা কি? লোকে তো মেয়ে বলে বুঝবে না। বরং কাপড় থাকলে কেড়ে নিতে পারে।'

স্বপ্নেন্দু তবু ইতস্তত করেছিল, 'কেমন ল্যাংটো-ল্যাংটো দেখায়। তা ছাড়া, হাড়ের গঠন দেখেও ছেলে-মেয়ে পার্থক্য বোঝা যায়।'

উড়িয়ে দিয়েছিল আত্রেয়ী, 'ওটা যারা হাড় নিয়ে পড়াশুনো করেছে শুধু তারাই পারে। পাবলিক চিরকাল মুখ্যু।'

এখন রেডিও থেকে বারংবার ঘোষণা করেছে, 'শান্তি বজায় রাখুন। গুজবে কান দেবেন না। ভোর ছ'টায় মুখ্যমন্ত্রীর জাতির উদ্দেশে ভাষণ শুনুন।'

বের হওয়ার সময় পকেট ট্রানজিস্টারটা সঙ্গে নিয়েছিল স্বপ্নেন্দু। তার পরনে পাজামা-পাঞ্জাবি। গলির মোড়ে আসতেই দুটো লোক এগিয়ে এল, 'এই যে দাদা, জামাকাপড় ছাড়ুন।'

'ছাড়ব মানে?' স্বপ্নেন্দুর গলায় বিস্ময়।

'এখন সব পরা চলবে না। পোশাক ব্যবধান সৃষ্টি করে। খুলে ফেলুন।'

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'বোঝার কিছু নেই। আপনার সঙ্গে যে দাদা আছেন তিনি তো পোশাক পরেননি। আপনি উঁচ মেরে পাঞ্জাবি চাপিয়েছেন। জানেন, কলকাতায় কত লোকের গায়ে একটা সুতো পর্যন্ত নেই? এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সবাই এক হতে হবে। পোশাক মানুষ পরত লজ্জা নিবারণের জন্যে। সেইটি যখন নেই তখন পোশাক খুলে সব মানুষ এক হয়ে যাক।'

স্বপ্নেন্দু আত্রেয়ীর দিকে তাকাল। ওরা ওকে দাদা বলল। চমৎকার। এর মধ্যে ভিড় জমে গেছে। সবাই নগ্ন। একজন বলল, 'অত কথায় কাজ কি? জোর করে খুলে নিলেই তো হয়।'

প্রথমজন বলল, 'না-না। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন শান্তি বজায় রাখতে। উনি নিজেই খুলবেন। আমরা ওঁকে ঘেরাও করে রাখব যতক্ষন না খোলেন।' কোনও জোর-জবরদস্তি কেউ করবেন না।'

'এই ঘেরাওটা জোর-জবরদস্তি নয়?' স্বপ্নেন্দু অসহায় হয়ে পড়েছিল।

'না। এটা একটা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের হাতিয়ার।'

আত্রেয়ী মুখ খুলতে গিয়ে থেমে গেল। ওর মনে হল কথা বললেই যে সে পুরুষ নয় তা বুঝে যাবে ওরা। শেষপর্যন্ত বাধ্য হল স্বপ্নেন্দু। মুহূর্তেই জামাকাপড় উধাও হয়ে গেল। সমস্ত শরীরের হাড় ভোরের হাওয়ায় শীতল হল। এমনকী ট্রানজিস্টারটাও হাতছাড়া হয়ে গেল। শুধু ঘরের চাবিটা কোনওক্রমে বাঁচাতে পারল স্বপ্নেন্দু। প্রথম লোকটি বলল, 'এতক্ষণে আপনি জনতার সঙ্গে মিশে গেলেন ভাই। যে পোশাক পরবে তাকেই বাধা দেবেন! শান্তি বজায় রাখুন।'

ভিড় ছাড়িয়ে কয়েক পা হেঁটে আত্রেয়ী কথা বলল, 'তোমাকে তখনই সাবধান করেছিলাম কিন্তু শুনলে না! যাক, মন খারাপ কোরো না। তোমার শরীরের কাঠামো সত্যি চমৎকার।'

স্বপ্নেন্দু কাঁধ নাচাল। চায়ের দোকানটায় আজ বেশ ভিড়। সেখানে অবনীদা কোনজন বুঝতে পারল না স্বপ্নেন্দু। ওরা হাঁটতে-হাঁটতে ট্রাম-রাস্তার পাশে চলে আসতেই দেখল সার-সার ট্রাম জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে আছে। চারধারে শুধু থিকথিকে নরকঙ্কাল। তারা চিৎকার করছে, এ ওকে আক্রমণ করছে। আত্রেয়ীকে নিয়ে স্বপ্নেন্দু একটা গাড়ি-বারান্দার তলায় সরে আসতেই চোখে পড়ল দুজন কঙ্কাল রকে বসে একটা ট্রানজিস্টার চালিয়েছে। তারপরেই ঘোষকের কণ্ঠ শোনা গেল, 'এখন কলকাতাবাসীর উদ্দেশে ভাষণ দেবেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী।'

স্বপ্নেন্দু সরে এল লোকদুটোর কাছে। এবং তখনই সে চিনতে পারল নিজের ট্রানজিস্টারটাকে। হুবহু সেই দাগটা। এই ব্যাটারাই পোশাক খোলার সময় হাতিয়েছে। ওরা এখন স্বপ্নেন্দুকে চিনতে না পারায় মনোযোগ দিয়ে ট্রানজিস্টার শুনছে। স্বপ্নেন্দুর ইচ্ছে হল ওটা কেড়ে নেয়। কিন্তু তখনই মুখ্যমন্ত্রী বলতে শুরু করলেন, 'বন্ধুগণ, আমরা এখন এক গভীর সমস্যাময় সময়ে রয়েছি। পরিবর্তিত পরিস্থিতি উদ্ভূত অভাবনীয় সুযোগগুলো বানচাল করে দেওয়ার জন্যে কিছু প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সক্রিয় হয়েছে। তারা

এই অতিবৈপ্লবিক পরিবর্তনকে মেনে নিতে পারছে না। শহরের চারদিকে অশান্তি এবং গোলযোগ সৃষ্টি করতে চাইছে। এই ষড়যন্ত্র আমরা ধ্বংস করবই। এমনকী এইসব ষড়যন্ত্রকারীরা এখন মৃত্যুকামনা করছে। আপনারা জানেন, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মৃত্যু হল একটি জঘন্য ব্যবস্থা যা শুধু দালালরাই কামনা করে। এই অতিবৈপ্লবিক পরিবর্তন আমরা মৃত্যুকে জয় করেছি। এখন সমস্ত মানুষ এক এবং অবিনশ্বর। এই দালালগোষ্ঠী ষড়যন্ত্র করছে যাতে মৃত্যু এসে আমাদের এই নবীন সমাজব্যবস্থাকে বানচাল করে দেয়। আমি একথা জোর গলায় ঘোষণা করতে চাই, সমস্ত ষড়যন্ত্র ধ্বংস হয়ে যাবে। আপনারা এদের প্রতিরোধ করুন। শহরে শান্তি বজায় রাখুন।'

ভাষণ শেষ হওয়া মাত্রই যার হাতে ট্রানজিস্টার ছিল সে প্রচণ্ড আক্রোশে ওটাকে ফুটপাথে আছড়ে ফেলতেই সেটা দুমড়ে-মুচড়ে গেল। তারপর চিৎকার করে বলল, 'শালা জ্ঞান দিচ্ছে। কী বলল অর্ধেক কথা আমি বুঝতেই পারিনি। কী ভাষায় যে কথা বলে!'

তার সঙ্গী বলল, 'ওটা ভাঙলি কেন? বিবিধ ভারতী শোনা যেত।'

'একটা গেল তাতে কি, আর-একটা ছিনতাই করে নেব।'

ওরা চলে যাওয়ার পর স্বপ্নেন্দু বলল, 'ওই ট্রানজিস্টারটা আমার ছিল।'

'সত্যি! তুমি ওদের বললে না কেন?'

'বললে শুনত? দেখছ না ওরা কীরকম মাস্তান।'

'এই জন্য তোমাকে ঘর থেকে বের হতে নিষেধ করেছিলাম।'

'সারাক্ষণ ঘরে বন্দি হয়ে থাকা যায়!'

'বন্দি বলছ কেন?'

'বন্দি নয় তো কি? ঘরে বসে কী করব?'

'কেন?' আত্রেয়ী অন্যরকম গলায় বলল, 'ভালোবাসব।'

চকিতে মুখ ফেরাল স্বপ্নেন্দু। আত্রেয়ী কি পাগল হয়ে গিয়েছে। কোনও-কোনও পাগলকে নাকি সাদা চোখে ঠিক ঠাওর করা যায় না। তাদের ব্যবহার ও কথাবার্তায় সেটা প্রকাশ পায়। আত্রেয়ী কি সেই ধরনের? নইলে ভালোবাসা ছাড়া অন্য কোনও চিন্তা ওর মাথায় নেই কেন?

সে বলল, 'আমাকে একটু যেতে হবে।'

'কোথায়?'

'হেনার বাড়িতে। অনেকদূর। তোমাকে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না।'

'কিন্তু তুমি যাবে কী করে? দেখছ না আজ ট্রাম-বাস চলছে না।'

'চলে যাব। তুমি বরং চারপাশ ঘুরে দ্যাখো।'

'বাব্বা। এ যেন বিষকেও হার মানাচ্ছে। বেশ, যাও, তোমাকে তো আমি বাধা দেব না কিছুতেই। আমি রইলাম। চাবিটা দাও।'

'কীসের চাবি?'

'ঘরের।'

'না। ওই ঘরে তোমাকে একা যেতে দিতে পারি না।'

'কেন?' আত্রেয়ী এত বিস্মিত যে ওর গলা দিয়ে স্বর বের হল না ভালো করে।

'রাগ করো না। নিশ্চয়ই এমন একটা কারণ আছে যা এই মুহূর্তে তোমাকে বলতে

পারছি না। আত্রেয়ী, ভুল বুঝো না। আমি তোমাকে পরে সব খুলে বলব। তুমি অপেক্ষা করো। আমি ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই চলে আসছি।'

'কিন্তু আমি তোমাকে চিনব কী করে?' আত্রেয়ীর গলায় স্বর করুণ।

'তিন ঘণ্টা পরে ঘরের দরজার সামনে অপেক্ষা কোরো। অন্য জায়গায় থেকো না। আমি ঠিক চলে আসব।' স্বপ্নেন্দু হাঁটতে শুরু করল।

দূরত্ব কম নয়। কিন্তু স্বপ্নেন্দুর হাঁটতে কোনও অসুবিধে হচ্ছিল না। এই কয়দিনে নতুন শরীর বেশ অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। পায়ে কোনও ব্যথা অনুভূত হচ্ছে না।

আজ রাস্তায় ট্রাম-বাস নেই। মুখ্যমন্ত্রী বারংবার আবেদন জানানো সত্ত্বেও জনজীবন স্বাভাবিক হয়নি। তার বদলে কাতারে-কাতারে নগ্ন কঙ্কাল রাস্তায় আক্ষেপ করছে, উন্মাদের মতো ছোটাছুটি করছে। তারা কী করবে সেটাই জানে না, কিন্তু চুপচাপ ঘরে বসে থাকা বোধহয় আরও কষ্টকর। অথচ আত্রেয়ী তাকে নিয়ে ঘরেই থাকতে চাইছিল। আত্রেয়ী বলছে ও তাকে প্রচণ্ড ভালোবাসে। ভালোবাসলে বোধহয় ওইভাবে নির্জনে থাকা যায়। কিন্তু সে তো হেনাকে ভালোবেসেছে। তবে এতক্ষণে আত্রেয়ীকেও তার খারাপ লাগছে না। কাল রাত্রে আত্রেয়ী তাকে সুন্দর-সুন্দর গান শুনিয়েছে। সে শুনতে চায়নি কিন্তু আত্রেয়ী গেয়ে গেছে। পুরোনো দিনের আবেগ মাখানো গান এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত। এই পরিবেশে সেগুলো মোটেই খারাপ লাগেনি তার। ভালোবাসলে মানুষ গান গাইতে পারে। কিন্তু ব্যাপারটা ক্রমশ জটিল হয়ে যাচ্ছে। হেনার সঙ্গে বসে আত্রেয়ীর ব্যাপারটা ফয়সালা করতে হবে। কী করে তা সম্ভব সেটাই জানা নেই।

রাজাবাজারের কাছাকাছি পৌঁছে ভিড়টা নজরে এল। অন্তত কয়েকশো কঙ্কাল ভিড় করে কিছু দেখছে। স্বপ্নেন্দু ঠেলেঠুলে এগিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু একজন খেঁকিয়ে উঠল, 'আঃ মরণ, নজরের মাথা খেয়েছেন নাকি!'

স্বর মেয়েলি, স্বপ্নেন্দু বিনীত ভঙ্গিতে বলল, 'আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।'

'বুঝবেন কী করে। দেখার জন্যে তো তর সইছে না।'

'আপনি মহিলা তা তো বোঝার উপায় নেই।'

'ঢং। বোঝার উপায় নেই। ভালো করে চেয়ে দেখলেই তো বোঝা যায়।' বলতে-বলতে কনুই দিয়ে একটা মৃদু ধাক্কা দিল সে। স্বপ্নেন্দু খুব তাজ্জব হল। এতক্ষণ তার ধারণা ছিল পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নারী-পুরুষ একাকার হয়ে গিয়েছে। কাল সারারাত আত্রেয়ীর সঙ্গে থেকেও তাকে নিজের শরীরের থেকে আলাদা বলে মনে হয়নি। সে খুঁটিয়ে দেখল। তারপর স্থির করল, মেয়েকঙ্কালের মুখের গঠন ছোট হয়, হাড়গুলো একটু পলকা এবং নরমভাব মেশানো। সেক্ষেত্রে বালকদের সঙ্গে খুব বেশি তফাৎ হবার কথা নয়। স্বপ্নেন্দু কথা ঘোরাবার জন্যে জিগ্যেস করল, 'কী হচ্ছে এখানে?'

স্ত্রী-কঙ্কালটি বলল, 'ওরা একটা লোককে ধরেছে। তার বিচার হচ্ছে।'

স্বপ্নেন্দু ততক্ষণে দেখতে পেয়েছে। ভিড়ের মাঝখানে চার-পাঁচজন আসামীকে বসিয়ে রেখেছে। এবার জেরা শুরু হয়, 'আপনি মরতে চেয়েছেন, শুধু তাই নয় আপনি আরও পাঁচজনকে মরতে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। কেন?'

লোকটি নির্লিপ্ত গলায় বলল, 'আমার গণতান্ত্রিক অধিকার আছে মরতে চাওয়ার।'

'মোটেই না। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যারা মরতে চায় তারা ষড়যন্ত্রকারী। তারা এই

অতি-বৈপ্লবিক ব্যবস্থাকে বানচাল করে দিতে চায়। একবার যদি কেউ মরে যেতে পারে তাহলে সবাই সেই পথ ধরবে। এই অতি-বৈপ্লবিক ব্যবস্থায় কারও ব্যক্তিগত ইচ্ছা পূর্ণ হতে পারে না।'

'আমি এসব জানি না। আপনারা কি শাস্তি দেবেন আমাকে? আমি বলি, বরং আমাকে মেরে ফেলুন। এখানে কারও কোনও সুখ নেই। মুখ নেই। সব মুখ এক। কারও কোনও যন্ত্রণা নেই। কারও সামনে কোনও রহস্য নেই। উই হ্যাভ লস্ট আওয়ার আইডেন্টিটি। এইভাবে বেঁচে থাকা যায় না। '

'আপনি দালালদের মতো কথা বলছেন।'

'জানি না। তবে যে দেশে ফুল নেই, গাছ নেই, জল নেই, একটুও সবুজ নেই সেই দেশে আমি অনন্তকাল বেঁচে থাকতে চাই না।' লোকটা মাথা নাড়ল, 'এমনকী একটা মেয়ে পর্যন্ত নেই।'

'ওমেনস লিব কথাটা শুনেছেন? মেয়েরা এতকাল পুরুষদের সমান হওয়ার জন্যে আন্দোলন করছিলেন। আর আপনাদের মতো পুরুষেরা সেই আন্দোলন দাবিয়ে রেখেছিলেন। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মেয়েদের সেই আশা পূর্ণ হয়েছে।'

স্বপ্নেন্দু শুনল স্ত্রী-কঙ্কালটি চাপা স্বরে বলল, 'ঝাঁটা মার। গতর গেলে মেয়েমানুষের আর কী থাকল!'

'যা হোক আপনি মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অমান্য করেছেন। এই জন্যে আপনাকে শাস্তি দিচ্ছি।'

'চমৎকার। মেরে ফেলুন।'

'না ওটা করলে মুখ্যমন্ত্রীর হাত নরম হবে।'

লোকটি হাসল, 'আপনার হাত-পায়ের প্রতি জোড়ে ইলেকট্রিক করাত চালাব যাতে শুধু আপনার বুকের খাঁচাটা ফুটপাথে পড়ে থাকে। হৃৎপিণ্ড তো ভাঙা যাবে না। আপনি চিরকাল ওই অবস্থায় পড়ে থাকবেন। হাঁটাচলা করার স্বাধীনতা থাকবে না।'

স্বপ্নেন্দু ভিড় থেকে বেরিয়ে এল। লোকটা নিশ্চয়ই গর্দভ। নইলে মৃত্যুর জন্যে এঁড়ে তর্ক করে। হঠাৎ তার খেয়াল হল কেউ সঙ্গে আসছে। স্ত্রী-কঙ্কালটিকে সে চিনতে পারল, 'আপনি? কোথায় যাচ্ছেন?'

'যাবার তো জায়গা নেই। ওসব দৃশ্য সহ্য করতে পারি না আমি। আপনি বেরিয়ে এলেন বলে আমিও চলে এলাম।'

'আপনার বাড়ি কোথায়?'

'বাড়ি নেই। ঘর ছিল। ভাসতে-ভাসতে হাড়কাটায় ঠেকেছিলাম। এখন আমাকে বেবশ্যে বলে চেনা যায় না; না?' স্ত্রী কঙ্কালটি খিলখিলিয়ে হাসল।

স্বপ্নেন্দু আড়ষ্ট হল। এই কঙ্কালটি একসময় বেশ্যাবৃত্তি করত। অথচ এখন ওকে দেখলে নিজেদের মতোই লাগছে। সে বলল, 'আমি এবার বাঁদিকে যাব। আপনি যেখানে ইচ্ছে যান।'

'তাতো বলবেই। এখন আমি বেকার। কিন্তু তখন ধাক্কা দিলে কেন?'

'আমি তো বললাম আপনাকে লক্ষ করিনি।'

'ইস্ আর কী। ধান্দাবাজ লোকেরাই ধাক্কা দেয়।'

স্বপ্নেন্দুর হঠাৎ ভয় এল বুকে। এই স্ত্রী-কঙ্কালটির উদ্দেশ্য সে বুঝতে পারছিল না। সে দৌড়ে পাঁচজন কঙ্কালের সঙ্গে মিশে হাঁটতে লাগল। স্ত্রী-কঙ্কালটি ছুটে এল সেখানে। স্বপ্নেন্দু বুঝতে পারল কোথায় ধাঁধায় পড়েছে। ছয়জনের মধ্যে কে কোনজন তা বুঝে উঠছে না। তারপর একজনের হাত চেপে ধরে স্ত্রী-কঙ্কালটি চিৎকার করে উঠল, 'এই শালা, ধোঁকা দিয়ে পালিয়ে আসা হয়েছে না?'

সেই লোকটি অবাক ও বিরক্ত হয়ে ধমকে উঠল, 'আরে, আমার হাত ধরেছিস কেন, খোট?' আর-একজন হেসে বলল, 'হয়ে শালী রাণ্ডী থি।'

স্ত্রী-কঙ্কালটি বোকার মতো দাঁড়িয়ে পড়লে স্বপ্নেন্দু হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। দ্রুত পা চালাতে লাগল সে। লস্ট আইডেন্টিটি। তা না হলে সে রক্ষা পেত না ওই জাঁহাবাজ স্ত্রী-কঙ্কালটির হাত থেকে। পরিচয় হারিয়ে যাওয়ায় একটা বড় উপকার হল। এখন যে কেউ যে-কোনও ভূমিকায় অভিনয় করতে পারে। এখন শরীর খুব দ্রুত হাঁটতে পারছে। তবু সময় কম লাগল না। রাস্তায় যেতে-যেতে অনেক দৃশ্য দেখেছে স্বপ্নেন্দু। যে যেখানে ইচ্ছে আগুন ধরাচ্ছে। তাতে কারও কোনও আপত্তি নেই যেন। দমকলের গাড়িই নেই কারণ জল অদৃশ্য। এমনকী যার ঘর পুড়ছে তারও যেন সম্পত্তির ওপর মায়া চলে গেছে। সমস্ত মানুষ এখন উন্মাদ। হেনাদের বাড়ির সামনে এসে দেখল প্রচণ্ড ভিড় জমেছে। অনুমানে বুঝল সেখানেও কোনও বিচার-পর্ব চলছে। কৌতূহল হলেও সেদিকে আর পা বাড়াল না সে। একবারে যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে।

দরজা খোলা। ঘরের আসবাবগুলো নেই। সব খাঁ-খাঁ করছে। স্বপ্নেন্দু ডাকল, 'হেনা!'

ভেতর থেকে কোনও সাড়া এল না। স্বপ্নেন্দু এগোল। কোনও ঘরে কেউ নেই। হতভম্ব হয়ে গেল সে। হেনারা গেল কোথায়? নিজের অজান্তেই সে চিৎকার করল, 'হেনা!'

স্বপ্নেন্দু বাইরে বেরিয়ে আসতেই দেখল তিনজন একজনকে প্রায় টানতে-টানতে নিয়ে আসছে। যাকে টানছে তার স্বর চিনতে পারল স্বপ্নেন্দু। সে ছুটে গেল সামনে, 'হেনা, হেনা তোমার কী হয়েছে?'

যারা টানছিল, তারা দাঁড়িয়ে পড়ল। যাকে টানছিল সে সোজা হল। স্বপ্নেন্দু আবার বলল, 'হেনা, তোমার কী হয়েছে? আমি স্বপ্নেন্দু।'

সঙ্গে-সঙ্গে কান্নায় ভেঙে পড়ল হেনা। মাটিতে উবু হয়ে বসে কান্না জড়ানো স্বরে বলল, 'ওরা আমার মাকে ধরে নিয়ে গেল।'

'কেন?'

যারা হেনাকে এনেছিল তাদের একজন বলল, 'ওঁর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে।'

'মাথায় ঘিলু নেই খারাপ হবে কী করে?'

'তাহলে হৃৎপিণ্ড খারাপ হয়ে গিয়েছে। জানলা দিয়ে নিচে ঝাঁপ দিয়েছিলেন মরার জন্যে। হাত-পা ভেঙেছে, মরেননি। সেই অবস্থায় পাগলের মতো মরতে চাইছিলেন। সেই অবস্থায় বিচার করে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশমতো পাতাল-কূপে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এক বছরের জন্যে বন্দি করে রাখতে। আপনি যখন এঁর পরিচিত তখন এঁকে সামলান। আমরা চলি।' লোকগুলো চলে গেল।

ধাক্কাটা সামলে স্বপ্নেন্দু হেনার মাথায় হাত দিল, 'হেনা, শান্ত হও।'

'ওরা মাকে ধরে নিয়ে গেছে। তুমি কিছু করবে না?' কান্না আছে কিন্তু পরিবর্তিত অবস্থায় জলের তো দেখা পাওয়া যাবে না।

'এখনই তো কিছু করা যাবে না। তুমি ওঁকে বাধা দাওনি কেন?'

'দিয়েছিলাম। শোনেননি আমার কথা। উলটে বললেন, তোর তো একটা প্রেমিক আছে, আমি কী নিয়ে থাকব। ভাবতে পারো, আমার মা আমাকে ওই কথা বলল।'

'কী পরিবর্তন। এখন আমি কী করব।'

হেনাকে তুলে দাঁড় করাল স্বপ্নেন্দু, 'আমি আছি, তোমার ভয় নেই হেনা।'

'মাকে কি আমি ফিরে পাব না?'

'পাবে। এখন তো কেউ মরে না। নিশ্চয়ই চেষ্টা করব আমি। আমার ওপর ভরসা রাখো হেনা। আমি তোমাকে গ্রহণ করতে এতদূরে চলে এসেছি।'

'সত্যি?' হেনার স্বরে উত্তাপ।

'সত্যি। তুমি আমার সঙ্গে চলো।'

'আমাকে কোনওদিন কষ্ট দেবে না?'

'না।'

'কিন্তু কীভাবে থাকব? এখন তো আমাদের বিয়ে হবে না।'

'আমরা সার্টিফিকেট জোগাড় করব সরকার থেকে। আমি কথা বলেছি।'

'কিন্তু আমাকে নিয়ে তুমি কী করবে?'

'আমি ভালোবাসব। আমি তোমাকে সুখী করব।'

'সত্যি সুখে রাখবে আমাকে?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু এখন তো কলকাতা থেকে সুখ উধাও হয়ে গিয়েছে। তুমি কী করে আমাকে সুখী করবে? তোমার কাছে কি সুখের গোপন মন্ত্র আছে?'

'কী সুখ তুমি চাও হেনা?'

'জানি না। একটা অসহায় মেয়ে কী সুখ চাইতে পারে!'

'আমি তার থেকে অনেক বেশি সুখ দেব তোমাকে। তুমি এসো।'

'কী সে সুখ?'

'এখন বলব না। তুমি আমার ঘরে চলো। তারপর তোমাকে দেখাব।' হেনা বোধহয় অবিশ্বাস করল, কিন্তু অবাধ্য হল না। ধীরে-ধীরে সম্মত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। কয়েক পা হাঁটবার পর স্বপ্নেন্দুর খেয়াল হল, 'তোমাদের ফ্ল্যাটের দরজা খোলা। বন্ধ করবে না?'

'কী হবে বন্ধ করে? ওখানে যা ছিল সব লুঠ হয়ে গেছে মা পড়ে যাওয়ার পরে। তোমার সঙ্গে গেলে আমি আর এখানে ফিরে আসছি না।'

স্বপ্নেন্দু লক্ষ করেছিল হেনার শরীরে পোশাক নেই। অথচ হেনা এ ব্যাপারে খুব সচেতন ছিল। নিশ্চয়ই উত্তেজনায় ওর এ বিষয়ে আর লক্ষ ছিল না। সে হেনার দিকে তাকাল। ওর হাড়ের গঠনেও যেন একটা ছন্দ ছড়ানো আছে।

হেনার হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল। সারাটা পথ সে কেবল ঘুরে-ফিরে মায়ের কথা বলেছে।

স্বপ্নেন্দু তাকে সান্ত্বনা দিয়েছে, পরিচিত কর্তাব্যক্তিকে ধরে সে নিশ্চয়ই হেনার মাকে উদ্ধার করবে। হাঁটতে-হাঁটতে ওরা রাজাবাজারের কাছে পৌঁছে একটা ছোট্ট ভিড় দেখল। ফুটপাথে হাত-পা-মুন্ডুহীন অবস্থায় একটা বুকের খাঁচা পড়ে আছে। অথচ সেই খাঁচায় আটকে থাকা নিরেট আবরণের ভেতর থেকে হৃৎপিণ্ড সমানে চিৎকার করে যাচ্ছে, 'মেরে ফ্যাল, মেরে ফ্যাল...।'

হেনা চমকে উঠল, 'কী হয়েছে ওর?'

স্বপ্নেন্দু ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিল। এর মধ্যেই শাস্তি দেওয়া হয়ে গেছে। একে প্রকাশ্যে রাখা হয়েছে যাতে সাধারণ নাগরিকরা মৃত্যুর কথা বলতে ভয় পায়। কিন্তু কি লাভ হচ্ছে ওতে। শাস্তি পাওয়ার পরও তো লোকটা সমানে চেঁচিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এসব কথা হেনাকে বলা যায় না। ঘটনাটা জানালে হেনা চট করে মায়ের অবস্থা ভাববে। ভদ্রমহিলা যদি সচেতন না হন তাহলে তাঁরও এই পরিণতি ঘটবে। সে উদাস গলায় বলল, 'হয়তো পড়ে-টড়ে হাড়গোড় ভেঙেছে। তুমি আমার হাত ধরো।'

হেনা যেন একটু কাঁপল, 'যাঃ, খোলা রাস্তায় হাত ধরে হাঁটব কী!'

'তাতে কী হয়েছে? এখানে কেউ বুঝতে পারবে নাকি আমরা ছেলে-মেয়ে ছিলাম।'

'ছিলাম।' ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলল হেনা।

'হাত না ধরলে ভিড়ের মধ্যে নিজেদের গুলিয়ে ফেলতে পারি।'

এবার হেনা হাত বাড়াল। শীতল না উষ্ণ বোঝা গেল না কারণ স্বপ্নেন্দু আবিষ্কার করল তার নিজের হাতের অনুভূতি হারিয়ে গেছে। সে তবু বলল, 'তোমার হাত খুব নরম ছিল, না?'

সঙ্গে-সঙ্গে ফুঁপিয়ে উঠল হেনা। ত্রস্ত স্বপ্নেন্দু জিগ্যেস করল, 'কী হল তোমার?'

'কেন মনে করিয়ে দাও ওসব?'

'সরি। আসলে, তুমি এখনও খুব নরম। তোমার মনটা এত নরম—।'

চারধারে অশান্তি বাড়ছে। ওরা থেমে এগোচ্ছিল। রাস্তায় যে যাকে পারছে আঘাত করছে। হাড়ে-হাড়ে ঠকাঠক শব্দ হচ্ছে। একটা জায়গায় বিচার চলছিল বোধহয়। হঠাৎ জনতা খেপে গিয়ে বিচারকদের ধাওয়া করল। বিচারকরা পালাতে-পালাতে চিৎকার করছিল, 'শান্তি বজায় রাখুন। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন...।' কিন্তু কে শোনে কার কথা।

বড়রাস্তা তবু নিরাপদ। জনতার মধ্যে মিশে গিয়ে কোনওরকমে এগিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু গলিতে ঢোকা বিপজ্জনক। সেখানে আগুন জ্বলছে। জল নেই, দমকল নেই অতএব আগুনের পোয়াবারো। চোখের সামনে বাড়িঘর পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে—এটা দেখার মধ্যে বেশ মজা আছে বোধহয়। মানুষগুলো এতকাল কোনও উত্তেজনা পাচ্ছিল না। এখন আগুনের খেলা দেখে বেশ আনন্দ পাচ্ছে। কেউ-কেউ আবার সেই আগুনে স্নান করার মতো পাক খেয়ে আসছে। হেনা স্বপ্নেন্দুর হাত ধরে বলল, 'কলকাতায় যখন আর কিছুই পোড়াবার থাকবে না তখন কী করবে ওরা? কীসে উত্তেজনা পাবে?'

'জানি না।'

হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়াতে হেনা প্রশ্ন করল, 'তুমি তখন আমাকে কী দেখাবে বলেছিলে?'

স্বপ্নেন্দু হাসল, 'অধৈর্য হচ্ছ কেন? আমার ওখানে চলো, তারপর দেখবে।'

হেনা বলল, 'ভাবতে কেমন লাগে, না? তুমি ডাকলে আর আমি চলে এলাম। একবারও ভবিষ্যতের কথা ভাবলাম না।'

'তোমার ভবিষ্যৎ তো আমার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে।'

'কী জানি।'

আর এই সময় আত্রেয়ীর কথা মনে পড়ল স্বপ্নেন্দুর। ও যদি চলে না যায় তাহলে বাড়িতে যাওয়া মাত্র দেখা হবে। ওর কথা শুনলে হেনা কী ভাববে? তাকে যদি বিশ্বাসঘাতক মনে করে চলে আসে?

স্বপ্নেন্দু ভেবে পাচ্ছিল না কী করবে! বলি-বলি করেও বলতে পারল না সে। তার মনে হল এর চেয়ে হেনাদের বাড়িতেই থেকে গেলে হতো। আত্রেয়ী তার খোঁজ পেত না। কিন্তু তখন মনে হয়েছিল হেনাকে নিজের কাছে নিয়ে যাবে, হেনার কাছে থাকার কথা খেয়ালে আসেনি। স্বপ্নেন্দুর হঠাৎ মনে হল সে আত্রেয়ীকে এত ভয় পাচ্ছে কেন? আত্রেয়ী তাকে ভালোবাসে এইটুকু কি হেনা সহ্য করবে না? কোনও পুরুষ যদি তাকে ভালোবাসত তাহলে হেনা কী করত! এখন তো আত্রেয়ী আর মেয়ে নয়। সে স্থির করল, যা হওয়ার হবে। যেমন করেই হোক হেনাকে রাজি করাবে তার সঙ্গে থাকতে।

শেষপর্যন্ত পাড়ায় পৌঁছল ওরা। হেনা বলল, 'এদিকটা বেশি ঘিঞ্জি না?'

উত্তর কলকাতায় থাকার জন্যে এই প্রথম খারাপ লাগল স্বপ্নেন্দুর। তবু বলল, 'এসব তো বনেদি পাড়া। প্ল্যান করে তৈরি হয়নি তখন। তবে আমার ঘরে হাওয়া আসে।' একমাত্র তারাই হাত ধরাধরি করে যাচ্ছে। আর বাকি মানুষ পাগলের মতো চিৎকার করছে। গলিতে ঢুকেই ধোঁয়া দেখতে পেল ওরা। স্বপ্নেন্দুর ভয় হচ্ছিল তাদের বাড়ি ছাই হয়ে গেছে কি না। বাড়ির কথা মনে হতেই চাবির কথা খেয়ালে এল। চাবিটা কোথায়? হাতে নেই তো। সে স্তব্ধ হয়ে গেল। ওরকম দামি গা-তালা চাবি ছাড়া খোলা মুশকিল। কখন যে হাত থেকে টুক করে পড়ে গেছে সেটা তার খেয়ালেই নেই। এখন একটা তালাওয়ালা যদি না পাওয়া যায় তাহলে দরজা ভাঙতে হবে। সে চাপা গলায় বলল, 'সর্বনাশ।'

হেনা চমকে উঠল, 'কী হয়েছে? তোমার বাড়িতে আগুন দিয়েছে নাকি?'

'না। কিন্তু আমি ঘরের চাবি হারিয়ে ফেলেছি?'

'সে কি?'

'হ্যাঁ। খুব শক্ত তালা। এখন দরজা খুলব কী করে?'

হেনা এবার হেসে উঠল, 'তোমার বুকে হাত দিয়ে দ্যাখো।'

'বুকে?' স্বপ্নেন্দু অবাক হয়ে নিজের হৃৎপিণ্ডের দিকে তাকাল। এবং তখনই সে তার চাবিটাকে পেল। হৃৎপিণ্ডের চার দিকের শক্ত স্বচ্ছ মোড়কের গায়ে চাবিটা আটকে আছে। ওটা ওখানে কী করে গেল? স্বপ্নেন্দু হাত বাড়িয়ে চাবিটাকে টানতে গিয়ে টের পেল? মোড়কটিতে চুম্বক কাজ করছে। যা কিছু শক্ত তাই বোধহয় এই হৃৎপিণ্ড টেনে নেয়। অদ্ভুত ব্যাপার।

কয়েক পা এগিয়ে অবনীদার চায়ের দোকানটার দিকে নজর যেতেই স্তব্ধ হয়ে গেল স্বপ্নেন্দু। ধিকি-ধিকি আগুন জ্বলছে সেখানে। একটা লোক সামনে উবু হয়ে বসে সেদিকে তাকিয়ে। দোকানটা এখন প্রায় ছাই। স্বপ্নেন্দুর মনে হল লোকটা নিশ্চয়ই অবনীদা।

খুব কষ্ট না পেলে কোনও মানুষ ওইভাবে বসে থাকতে পারে না। আর এই দোকান ছাই হওয়ায় সবচেয়ে বেশি কষ্ট পাবে একমাত্র অবনীদা। সে ডাকল, 'অবনীদা, না?'

'হুঁ। তুমি কে ভাই?' অবনীদার ভঙ্গির পরিবর্তন হল না।

'আমি স্বপ্নেন্দু।'

'দ্যাখো, ওরা কিছু না পেয়ে দোকানটাকে জ্বালিয়ে দিয়ে গেল।'

'কেন? আপনি কী করেছিলেন?'

'কিছু না। ওদের তো কোনও কাজ করার নেই অথচ কিছু একটা করতে হবে। এই দোকানটা চোখে পড়তেই পুড়িয়ে দিল। খুব হইহই করল যতক্ষণ আগুন জ্বলছিল। তারপর চলে গেল। ওই দ্যাখো ন্যাড়ার বাপ এখনও পড়ে আছে ফুটপাথে।'

স্বপ্নেন্দু চোখ ফেরাল। সেই বৃদ্ধ যে দড়িতে ঝুলছিল, আগুনের ঝাঁকা খেয়েছিল সে এখন হাত-পা-হীন অবস্থায় ফুটপাতে পড়ে আছে। কোনও কথা বলছে না কিন্তু তার শরীর নড়ায় বোঝা যাচ্ছে মৃত্যু ধারেকাছে আসেনি।

স্বপ্নেন্দু হেনার হাত ধরে এগিয়ে গেল বাড়ির দিকে। হেনা জিজ্ঞাসা করল, 'ওর কী হয়েছে?'

'পড়ে-টড়ে গেছে বোধহয়।' নিরীহ ভঙ্গিতে বলল স্বপ্নেন্দু।

'মিথ্যে কথা। নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। ঠিক আছে, আমিই জিজ্ঞাসা করছি।' ফুটপাথে উঠে সামান্য ঝুঁকে হেনা জিগ্যেস করল, 'আপনার এরকম হল কেন?'

বৃদ্ধের মুন্ডু হেনার দিকে ফিরল, 'বলব না।'

'কেন বলবেন না?'

'আমার ইচ্ছে তাই বলব না। আবার বলে মুন্ডুটাকে হারাই আর কী?'

হেনা একটু হকচকিয়ে সরে এল। স্বপ্নেন্দু বলল, 'তেমন কিছু না, হলে কি বলত না?'

হেনার কিন্তু তখনও খুঁতখুঁতুনি যাচ্ছিল না।

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতেই স্বপ্নেন্দু থমকে দাঁড়াল। একটা কঙ্কাল মুখ ঝুঁকিয়ে বসে আছে দরজার গোড়ায়। ওদের দেখেই সে উঠে দাঁড়াল, 'স্বপ্নেন্দু না?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি হেনা?'

হেনা এবার বিস্মিত। স্বপ্নেন্দুর দিকে মুখ ফিরিয়ে জিগ্যেস করল, 'ইনি কে?'

'আমি?' হি-হি করে হাসল আত্রেয়ী, 'আমি কেউ না! পথের ভিখিরি। দূর ছাই, আমি শুধু ভুলে যাই, এখন তো একটা ভিখিরিও নেই।'

স্বপ্নেন্দু বলল, 'হেনা, এর নাম আত্রেয়ী। আমরা একসঙ্গে পড়তাম। তারপর ওর বিয়ে হয়ে যায়, যোগাযোগও ছিল না। কাল এই বিপর্যয়ে আমার এখানে এসেছে।'

'তবু বলতে পারলে না আমরা বন্ধু।' চিৎকার করে উঠল আত্রেয়ী।

'ঠিক আছে, বন্ধু।'

হেনা অবাক হয়ে বলল, 'তোমরা কাল একসঙ্গে ছিলে? তুমি আমাকে একথা বলোনি কেন স্বপ্নেন্দু?'

সঙ্গে-সঙ্গে নেমে এল আত্রেয়ী, 'এই খোকা, তুমি ওকে ভালোবাস?'

'জানি না।'

'কিন্তু ও তোমাকে ভালোবাসে। তুমি তো মেয়ে ছিলে, আমিও। আমরা কী চাইতাম? ছেলেদের সমান হব, তাই না? আজ তো ছেলে-মেয়ের মধ্যে কোনও তফাত নেই। তাহলে শুধু-শুধু মেয়েলিপনা করব কেন?'

'আপনি আমার হাত ছাড়ুন।'

'না, ছাড়ব কেন? তোমাকে আমার বন্ধু হতে হবে।'

'খামোকা বন্ধু হতে যাব কেন?'

'কারণ তোমাকে স্বপ্নেন্দু ভালোবাসে।'

'তার সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক?'

আত্রেয়ী বলল, 'কারণ আমি স্বপ্নেন্দুকে ভালোবাসি।'

চকিতে হেনা জিগ্যেস করল, 'ও আপনাকে ভালোবাসে?'

'না। ও তোমাকে ভালোবাসে তাই।'

'তাহলে?'

'কী তাহলে? এখন তো আর কিছু পাওয়ার আশা নেই। আমাদের শরীর নেই, নারীত্ব নেই। শুধু হৃৎপিণ্ড আছে যা দিয়ে আমরা ভালোবাসতে পারি। এসো আমরা বন্ধুর মতো থাকি।'

'না।'

'কেন?'

'আমি আপনাকে সহ্য করতে পারছি না।'

'আমি পারছি।'

'আপনি পাগল।'

ঠিক এই সময়ে সিঁড়ির নিচে একটি কঙ্কাল এসে দাঁড়াল, 'স্বপ্নেন্দু আছ?'

স্বপ্নেন্দু বলল, 'কে আপনি?'

'আমি অবনীদা।'

'ও, কী ব্যাপার?'

'আমাকে একটু জায়গা দেবে স্বপ্নেন্দু, আজকের রাতটার জন্যে। আমার খুব ভয় করছে। ওরা নাকি আবার আসবে।'

'কারা?'

'যারা পাগল হয়ে এসব করছে।'

'আসুন।'

অবনীদা উঠে এলেন। তারপর বললেন, 'তোমরা বাইরে দাঁড়িয়ে থেকো না। নিচের দরজা খোলা। ওরা দেখলে এখানেও উঠে আসতে পারে।'

স্বপ্নেন্দু দ্রুত নেমে নিচের দরজা বন্ধ করে এল। তারপরে ঘরের চাবি খুলে দিতেই সবাই ভেতরে ঢুকল। স্বপ্নেন্দু বলল, 'দুটো ঘরে ভাগ করে থাকো। আত্রেয়ী, আমি ভেবেছিলাম তুমি চলে যাবে। তোমাকে বারংবার বলেছি যে আমি হেনাকে ভালোবাসি।'

'কিন্তু আমি তো তোমাকে ভালোবাসি।'

'উঃ, আমি পাগল হয়ে যাব।' স্বপ্নেন্দু চেঁচিয়ে উঠল।

আত্রেয়ী হেসে উঠল খিলখিল করে। তারপর এগিয়ে গেল হেনার কাছে, 'এখন তো কোনও উপায় নেই, নইলে তোমার শরীরে গন্ধ নিতাম।'

'মানে?'

'কী করে ওকে মজালে ভাই?'

হেনা বিরক্ত হল, 'ভদ্রভাবে কথা বলুন।'

আবার হাসল আত্রেয়ী। তারপর অবনীদার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনাকে আমি চিনি না। কিন্তু বলুন তো, আমি কি অন্যায় করেছি?'

অবনীদা মাথা নাড়লেন, 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

এই সময় বাইরের হাওয়া আরও বেড়ে গেল। শুধু হাড়ে-হাড়ে শব্দ হচ্ছে। সমস্ত কলকাতা শহরে যেন হাড়ের বাজনা বাজছে।

স্বপ্নেন্দু বলল, 'আমার বুকটা কেমন করছে হেনা, আমার বুকের ভেতরটা দুলছে।'

হেনা এবার এগিয়ে এল তার সামনে, 'কিন্তু আমার সুখ? কী সুখ দেবে তুমি?'

'সুখ?'

'হ্যাঁ। মিথ্যে বলার চেষ্টা করো না।'

'মিথ্যে, কী বলছ তুমি?'

'নিশ্চয়ই। তুমি মিথ্যেবাদী। আমাকে ভালোবাসার বুলি শুনিয়ে ধাঁওতা দিয়েছ। ওই পাগলের সঙ্গে রাত কাটিয়ে গেছ আমার কাছে। কী নেবে তুমি আমার কাছ থেকে? কী লোভ তোমার?'

'হেনা!' চিৎকার করে উঠল স্বপ্নেন্দু।

'চেঁচিও না। আমি আর কিছুতেই ভুলছি না।' হেনা অবনীদার দিকে তাকাল, 'এই যে, আপনি শুনুন, এই লোকটা বলেছিল ওর সঙ্গে এলে আমাকে নাকি সুখ দেবে। বলুন ওকে সেই সুখ দিতে!'

অবনীদা বললেন, 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

এই সময় আত্রেয়ী এগিয়ে এল, 'সুখ চাইলেই কি পাওয়া যায়? কাল রাত্রে আমি সুখ পেয়েছিলাম। সুখ পেতে জানতে হয়।'

হেনা চিৎকার করে উঠল, 'তুমি ওকে সুখ দিয়েছ?'

'আমি জানি না, বিশ্বাস করো, আমি তোমাকেই ভালোবাসি।'

'মিথ্যে কথা। কী প্রমাণ আছে এর?'

'আছে, প্রমাণ আছে।'

'বিশ্বাস করি না। প্রমাণ দাও।'

'আমি তোমার হৃদয় শান্ত করে দিতে পারি।'

'কীভাবে?'

'তোমার একটুও উত্তেজনা থাকবে না হৃদয়ে।'

এবার অবনীদা বললেন, 'তুমি কি ম্যাজিক জানো স্বপ্নেন্দু?'

'তার চেয়ে বেশি। আমার কাছে এমন একটা জিনিস আছে যা কলকাতার মানুষ চিন্তাও করতে পারবে না। বসুন আপনারা ওখানে।'

স্বপ্নেন্দুর স্বরে এমন কিছু ছিল যে বাধ্য হল ওরা খাটে বসতে। স্বপ্নেন্দু এগিয়ে

গেল টেবিলের কাছে। তারপর সন্তর্পণে চাদরটা সরাল। আবছা লালচে আভা দেখা গেল। হেনা জিগ্যেস করল, 'কী ওটা?'

আত্রেয়ী শিশুর গলায় বলল, 'বাঃ সুন্দর।'

এবার কাচের বড় জারটা। সেটা সরাতেই কাচের বাটির তলায় লাল টকটকে ডাঁটো গোলাপটাকে দেখতে পেল সবাই। উদ্ধত ভঙ্গিতে যেন তাকিয়ে রয়েছে। সেই জলের ফোঁটাটাও তেমন টলটলে।

স্বপ্নেন্দু বলল, 'এটা রক্তগোলাপ। কলকাতায় কোথাও আর ফুল নেই। শুধু আমার কাছে, আমার কাছে ও বেঁচে আছে। তোমরা ওর দিকে একটু তাকাও, দেখবে হৃৎপিণ্ড শান্ত হয়ে যাবে। আরাম পাবে।'

ওরা তিনজন মুগ্ধ চোখে ফুলের দিকে তাকাচ্ছিল। প্রত্যেকের উত্তেজনা ধীরে-ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছিল। হেনা অস্ফুটে বলল, 'আঃ, কী আরাম। স্বপ্নেন্দু, আমি তোমার কাছ থেকে সত্যিকারের সুখ পেলাম। আর-একটুও কষ্ট হচ্ছে না আমার। তুমি কী ভালো!'

অবনীদা বললেন, 'স্বপ্নেন্দু, আমি কৃতজ্ঞ। আমার হৃৎপিণ্ড জুড়িয়ে গেল।'

শুধু আত্রেয়ী কোনও কথা বলল না।

স্বপ্নেন্দু ডাকল, 'আত্রেয়ী!'

আত্রেয়ী দুহাতে মুখ ঢাকল 'আমি চাই না। সুখ চাই না। সারাজীবনে যে একটুও সুখ পেল না তার আর সুখের দরকার নেই। ঢেকে ফেলো ওটাকে।'

হেনা বলল, 'না।' তারপর বিছানা ছেড়ে উঠে এল, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি স্বপ্নেন্দু। তুমি আমার ওপর রাগ করো না।'

এই প্রথম শব্দটা শুনে স্বপ্নেন্দু আপ্লুত হল। তার হাত ধরল আত্রেয়ী, 'তুমি ওই ফুলটা আমাকে দাও।'

'কেন?'

'ওটা আমার।'

'না। এই ফুল তুমি চেয়ো না।'

'কেন? আমাকে তুমি দিতে পারবে না?'

এবার আত্রেয়ী উঠে এল, 'আমি কী দোষ করলাম? আমাকে দাও ফুলটা।'

সে হাত বাড়ালে হেনা বাধা দিল, 'না। আমি নেবো। ও আমাকে দেবে। আমি স্বপ্নেন্দুকে ভালোবাসি।'

'না, আমি তোমার চেয়ে অনেক বেশি ভালোবাসি ওকে।' হেনাকে সরিয়ে দিতে চাইল আত্রেয়ী। তারপরেই ঘরে দৃশ্যটা অভিনীত হল। একদা-রমণী দুটো শরীর পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল আক্রোশে। এতক্ষণ বাইরের রাস্তায় যে হাড়ের শব্দ হচ্ছিল সেটা এখন চলে এল ঘরের ভেতরে। স্বপ্নেন্দু পাথরের মতো দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখছিল। তার যেন কিছুই করার নেই। সমস্ত আত্মসম্মান, চক্ষুলজ্জা খুইয়ে দুটো মানুষ নিজেদের অহঙ্কার বাঁচাতে একটা ফুলের জন্যে লড়ছে।

এই সময় অবনীদা বাধা দিল। জোর করে ওদের ছাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'ছি-ছি, আপনারা পাগল হয়ে গেলেন নাকি!'

দুজনেই একসঙ্গে চিৎকার করল, 'আমার ফুলটা চাই।'

অবনীদা বলল, 'বেশ, স্বপ্নেন্দু যাকে দেবে সেই ফুলটা পাবে। যে পাবে না তাকে এটা মেনে নিতে হবে।'

কিন্তু স্বপ্নেন্দু মাথা নাড়ল, 'না। ওই ফুলে আমি হাত দেব না।'

'কেন?' তিনটে গলা একসঙ্গে প্রশ্ন করল।

'বিশ্বাস করো, ওই ঢাকনার তলা থেকে বের করে আনলে ফুলটা আর বাঁচবে না। একে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে ঢাকনা সরানো চলবে না।'

'বিশ্বাস করি না।' আত্রেয়ী বলল।

'তুমি প্রমাণ করো কাকে তুমি ভালোবাস।' হেনা দাবি জানাল।

স্বপ্নেন্দু অসহায় বোধ করল। তারপর মরিয়া হল। কাঁপা হাতে সে কাচের বাটিটাকে স্পর্শ করল। তারপর এক ঝটকায় সেটাকে সরিয়ে ফুলটাকে হাতের মুঠোয় নিয়ে বুকের অদৃশ্য খোলকের ওপর চেপে ধরল।

তিনটে বিস্মিত কঙ্কালের সামনে তখন একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখা দিল। ফুলটাকে হৃৎপিণ্ডে চেপে ধরতেই স্বপ্নেন্দুর সমস্ত শরীর থরথর করে উঠল। তারপর কঙ্কালের ওপর ধীরে-ধীরে মাংস-চামড়া-ধমনি দেখা দিল। শেষপর্যন্ত একটি পূর্ণ মানুষের চেহারায় ফিরে গিয়ে স্বপ্নেন্দু উচ্চারণ করল, 'মাগো।' এবং তারপর একটি সম্পূর্ণ মানুষের শরীর ক্রমশ নত হল, নত হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল।

ওরা তিনজন ছুটে এল সেই শরীরের পাশে। বুকের ওপর ফুলটা শুকিয়ে ছাই হয়ে আছে। স্বপ্নেন্দুর মুখে তৃপ্তির ছাপ, শরীরে প্রাণ নেই। ওরা তিনজন পাগলের মতো কিছুক্ষণ স্বপ্নেন্দুকে ডাকাডাকি করল। তারপর অবনীদা ছুটে গেল জানলায়, শেষপর্যন্ত দরজায়। আত্রেয়ী এবং হেনার সামনে একটি রক্তমাংসের পূর্ণ নগ্ন মানুষ। ওরা দুজন পাগলের মতো সেই মানুষকে স্পর্শ করছিল। একটি মানুষ, তার চোখ নাক মুখ গলা বুক পেট দিয়ে যে সম্পূর্ণ, তাকে দু-হাতে আস্বাদ করতে চাইছিল একদা-রমণীরা।

অবনীদা ততক্ষণে ছুটে গিয়েছে রাস্তায়। পাগলের মতো চিৎকার করে বলছে, 'শুনুন আপনারা। একটা মানুষ মরে গেছে। সত্যিকারের মৃত্যু। সম্পূর্ণ রক্তমাংসের মানুষ। আমাদের মধ্যে একজনই মরে যেতে পারল। সেই ভাগ্যবান পুরুষটিকে দাহ করতে হবে। শুনুন আপনারা।'

কলকাতার নরকঙ্কালরা অবাক হয়ে শুনছিল, একটা রক্তমাংসের মানুষ মরে যেতে পেরেছে। ঘোর কাটতেই সমস্ত কঙ্কাল ছুটে আসছিল সেই গলিতে। ঈর্ষান্বিত, বিহ্বল সেই নরকঙ্কালের মিছিলের দিকে তাকিয়ে উন্মাদ অবনীদা তখনও চেঁচিয়ে যাচ্ছে, 'রক্তমাংসের পুরুষ। মরে গেছে, একদম মরে গেছে। সেই ভাগ্যবানের নাম স্বপ্নেন্দু।'

কালোচিতার ফটোগ্রাফ

এ যেন স্বর্গের সিঁড়ি, উঠছে তো উঠছেই, শেষ আর হয় না। এই পাহাড়ি শহরটার নিচ থেকে ওপরে শর্টকাট পথ তৈরি করতে এমন বেশ কয়েকটা সিঁড়ি ছড়িয়ে আছে এখানে-ওখানে। বাজার থেকে জিনিসপত্র কিনে বড় প্যাকেটে পুরে সেটা বুকের ওপর চেপে ধরে তার একটা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছিল মতিলাল। আজকাল টানা উঠতে বুকে হাঁপ ধরে। হঠাৎ তার নজরে পড়ল একেবারে ওপর থেকে একটি মানুষ তরতরিয়ে নিচে নেমে আসছে। এ নিশ্চয়ই কোনও ডানপিটে তরুণ, নইলে ওই গতিতে নামার কথা চিন্তা করত না। ওভাবে নামতে হলে রীতিমতো অভ্যস্ত হওয়া দরকার। মতিলাল সরে যাওয়ার চেষ্টা করল। সিঁড়িটা চওড়া নয়, একদিকে পাহাড়, অন্যদিকে খাদ। কিন্তু সে ভালো করে সরে যাওয়ার আগে ছেলেটি তাকে মৃদু ধাক্কা মেরে নিচে চলে গেল একটুও গতি না কমিয়ে। আর ওই সামান্য ধাক্কাতেই মতিলালের হাতের প্যাকেট ছিটকে পড়ল মাটিতে। বেরিয়ে এল চিনি-চায়ের ছোট প্যাকেটগুলো, দুটো ম্যাগাজিন।

চাপা গলায় গালাগালি করতে-করতে উবু হয়ে বসে সে প্যাকেটদুটো এবং ম্যাগাজিন তুলছিল। যৌবনের শুরুতে মানুষ নিজেকে কী না কী মনে করে। ভাগ্যিস এই প্যাকেটগুলো ছিঁড়ে যায়নি। উঠে দাঁড়াবার আগে সে যে জিনিসটাকে দেখতে পেল সেটা তার নয়। একটা সেলোফেন কাগজে মোড়া বস্তু পড়ে আছে পায়ের কাছে। হাত বাড়িয়ে তুলেই বুঝতে পারল জিনিসটা বেশ ভারী। মতিলাল নিশ্চিত যে ওই অতি স্মার্ট ছেলেটি ধাক্কার সময় টের পায়নি জিনিসটা পড়ে গেছে। সে নিচের দিকে তাকাল। ছেলেটি এবার সিঁড়ি থেকে নেমে বাজারের দিকে যাচ্ছে। পরনে নীল জিনস্ এবং ওপরে চামড়ার জ্যাকেট, মাথায় একটা সাদা টুপি। সে চিৎকার করে ডাকার চেষ্টা করল কিন্তু ছেলেটা মুখ তুলল না। মতিলাল জিনিসগুলো নিয়ে যতটা সম্ভব জোরে নিচে নামতে লাগল। আজকাল ধীরেসুস্থে হাঁটাচলায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে সে। কিন্তু ছেলেটাকে ধরতে হবে বলে সে জোরে নামছিল। বেচারা হয়তো এখন টের পাবে না জিনিস পড়ে গেছে। যখন পাবে তখন আফসোস করবে। তাই এখন ওটা ওকে ফেরত দিয়ে কিছু কথা শোনানো যেতে পারে।

নিচে নামার পর সে ছেলেটাকে দেখতে পেল না। ওপর থেকে সে দেখেছে ছেলেটি গিয়েছে বাজারের দিকে। অতএব সেদিকেই চলল সে। সাদা টুপি চামড়ার জ্যাকেট পরা মানুষের চেহারা খুঁজে-খুঁজে একসময় ক্লান্ত হয়ে গেল মতিলাল।

এখন কী করা যায়? অন্যের জিনিস বাড়ি বয়ে নিয়ে যাওয়া কোনও মানে হয় না। আবার যেখানে পেয়েছিল সেখানে ফেলে রেখে যেতেও ভদ্রতায় লাগছে। এই দোকানদারদের কাছে দেওয়ার চেয়ে সবাইকে জানিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া অনেক বেশি যুক্তিযুক্ত। সে সেলোফেনের মোড়কটা ধীরে-ধীরে খুলছিল। কী জমা দিচ্ছে তা দেখেই জমা দেবে। হঠাৎ মোড়কের ফাঁক দিয়ে একটা সরু কালো নল বেরিয়ে আসামাত্র সে চমকে উঠল। হায় ভগবান! এটা একটা পিস্তল! সে তাড়াতাড়ি মোড়কটা জড়িয়ে

এপাশ-ওপাশ তাকাতেই দেখল এক মাঝবয়সি গোঁফওয়ালা লোক চট করে চোখ সরিয়ে নিল। লোকটা কি পিস্তল দেখতে পেয়েছে? বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটছিল কেউ। মতিলাল বুঝতে পারছিল না তার কী করা উচিত। এই পিস্তল আইনি না বেআইনি তাই বা কে জানে। যদি ছেলেটা এই আইনসঙ্গত মনে করত তা হলে কি ওভাবে ফেলে যেত। এত ভারী জিনিস যখন পড়েছিল তখন কোনও আওয়াজ কানে যায়নি তো? আচ্ছা, এমন হতে পারে ছেলেটা এই পিস্তলের কথা জানেই না, তার হাত থেকে কিছু পড়েনি ওখানে। পিস্তল অনেক আগে কেউ রেখে গিয়েছিল ওখানে। না হলে পড়ার সময় নিশ্চয়ই আওয়াজ পেত সে। অন্য কারও পিস্তল সে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে পেয়েছে। পুলিশকে গিয়ে এই কথা বলে পিস্তল জমা দিলে ওরা বিশ্বাস করবে? গত কয়েক মাস ধরে উগ্রপন্থীদের ধরার জন্য পুলিশ মরিয়া হয়ে উঠেছে। এই পাহাড়ি শহরে এখন সামান্য গোলমাল হলে ব্যাপক ধরপাকড় হয়। কিছুদিন আগে উগ্রপন্থীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে কারও-বা-কারও মৃত্যু খুব স্বাভাবিক ঘটনা ছিল। এখন অবস্থা কিছুটা শান্ত হলেও পুলিশ সহজে তার কথা বিশ্বাস করবে বলে মনে হয় না। কিন্তু এই বাজারের রাস্তায় পিস্তল হাতে কেউ যদি তাকে ধরে তা হলেও তো কৈফিয়ত দেওয়ার কিছু থাকবে না। মতিলাল আর ভাবতে পারছিল না। মোড়কটাকে বড় ব্যাগের ভেতরে চালান করে দিয়ে সে মুখ তুলতেই দেখল গোঁফওয়ালা লোকটা আবার তার দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিল। তার মানে ওই লোকটা তাকে লক্ষ করছে। কেন? পা-দুটো হঠাৎ দুর্বল হয়ে গেল ওর। লোকটা কী করে জানল তার কাছে পিস্তল আছে? সে এই প্রশ্নের জবাব না পেয়ে নিজেকে বোঝাল হয়তো অন্য কারণে লোকটা তাকে লক্ষ করছে। এখন সর্বত্র পুলিশের লোক ছড়ানো। বাজারে ফিরে এসেও কেনাকাটা না করে ব্যাগ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার কারণে ওর সন্দেহ হতে পারে।

মতিলাল পা চালাল। কিছুটা যাওয়ার পর মুখ ফিরিয়ে পেছনে তাকিয়ে সে আর গোঁফওয়ালা লোকটাকে দেখতে পেল না। ওর মন একটু হালকা হল। খাড়াই সিঁড়ি বেয়ে ধীরে-ধীরে ওপরে উঠে এল সে। লোকজন অবশ্য ওঠানামা করছে কিন্তু সন্দেহ করার মতো কাউকে তার চোখ পড়ল না।

একপাশে ঢালু পাহাড়, অন্যপাশে সুন্দর বাড়িগুলো। দুপুর গড়ালেই রোদ এসে পড়ে এখানে আবহাওয়া ভালো থাকলে। মতিলাল একটু দ্রুত হাঁটছিল। রাস্তা থেকে কয়েক ধাপ উঠে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে সে নিজের বাড়ির দরজার সামনে পৌঁছে গেল। তালা খুলে ভেতরে ঢুকে আগে বড় প্যাকেটটাকে টেবিলের ওপর রাখল। দরজাটা ভালো করে বন্ধ করে সে প্যাকেট থেকে সেলোফেনের মোড়কটাকে বের করে সন্তর্পণে খুলতে লাগল। হ্যাঁ, সত্যি-সত্যি এটা একটা পিস্তল। পিস্তলটা রাখা হয়েছে একটা রবারের খাপের মধ্যে। মতিলালের মনে হল এই কারণে সিঁড়ির ওপর পড়া সত্ত্বেও কোনও আওয়াজ কানে আসেনি। পিস্তলকে রবারের খাপে রাখার নিয়ম কি না তার জানা নেই। সে দেখল অস্ত্রটির বুকের ভেতর গুলি ভরা আছে। অর্থাৎ এখনই ব্যবহার করতে চাইলে কোনও অসুবিধে নেই।

পিস্তলটা হাতে নিয়ে চেয়ারে বসে সে বাইরের দিকে তাকাল। কাচের জানলার বাইরে তখন কাঞ্চনজঙ্ঘা ঝকঝক করছে। দেখলেই মন ভালো হয়ে যায়। মতিলাল

পৃথিবীর সবাইকে এখন ক্ষমা করে দিল। যারা তার শত্রুতা করেছে, যাদের সে সহ্য করতে পারে না তার লিস্ট তৈরি করতে হলে প্রথমে সুভদ্রার নাম লিখতে হয়। সে একা থাকে। এই ছোট্ট বাড়িটায় একা থাকতে তার খারাপ লাগে না আজকাল। তবু সুভদ্রা তাকে শান্তিতে থাকতে দেবে না। পিস্তলটা যদি কারও ওপর ব্যবহার করতে সে বাধ্য হয় তা হলে প্রথমে সুভদ্রা। মতিলাল চোখ বন্ধ করল। তার বন্ধ চোখের পাতায় এখন সুভদ্রার মুখ! ফোলা-ফোলা চোখ, সবসময় কিছু একটা ভেবে চলেছে। বিশ্বাস শব্দটি ওর অভিধানে নেই। গুলিটা ছুড়লে ঠিক কোথায় গিয়ে লাগলে সুভদ্রাকে কেমন দেখাবে তা ভেবে পাচ্ছিল না মতিলাল। ধীরে-ধীরে মুখটা তার কাছে অন্যরকম হয়ে গেল। যতই ঝগড়া করুক, গালমন্দ দিক, আলাদা থাকুক, যে মুখে এককালে সে আদর করেছে, যদিও খুবই গোনাগুনতি ব্যাপার, তবু সেই মুখ গুলিতে ক্ষতবিক্ষত করতে পারবে না। সুভদ্রার জন্যে তার ক্রমশ মায়া হতে লাগল। আর তখনই বেল বাজল।

কে এল! উঠে দরজা খুলতে গিয়ে খেয়াল হল। পিস্তলটা তার হাতে দেখতে পেলে যে আসবে তারই চোখ বড় হয়ে যাবে। সঙ্গে-সঙ্গে গুজব তৈরি হবে। কোথায় রাখা যায় এটা? দ্বিতীয়বার বেল বাজাতেই মতিলাল তড়িঘড়ি করে দেওয়ালে ঝোলানো একটা তিব্বতি ব্যাগের ভেতর মোড়কসমেত পিস্তলটা ঢুকিয়ে দিল। সুভদ্রা চলে যাওয়ার পর থেকে ওই ব্যাগে হাত দেওয়া হয়নি। যতটা পারে শান্ত মুখে দরজা খুলেই হকচকিয়ে গেল সে। গম্ভীর মুখে সুভদ্রা দাঁড়িয়ে আছে। দরজা খোলামাত্র তাকে ঠেলে সরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল সুভদ্রা।

'কে আছে, অ্যাঁ? এতক্ষণ কার সঙ্গে ফুর্তি করা হচ্ছিল? বেল টিপতে-টিপতে হাতে কড়া পড়ে গেল আর বাবুর খোলার নাম নেই?' দুমদুম শব্দ করে ভেতরে ঢুকে চারপাশ দেখে নিল সুভদ্রা।

দরজাটা বন্ধ করে প্রায় চোরের মতো খানিকটা দূরত্বে এসে দাঁড়াল মতিলাল।

'এতক্ষণ কী করছিলে?'

'কিছু না।'

'তা হলে দরজা খুলছিলে না কেন?'

'এমনি।'

'এমনি? উত্তর শুনে শরীর গুলিয়ে ওঠে। শুধু এই কারণে তোমার সঙ্গে আমি ঘর করতে পারিনি, বুঝলে? শোনো, তোমাকে এবার টাকা বাড়াতে হবে।'

'টাকা?'

'আকাশ থেকে পড়লে কেন? যা টাকা দিচ্ছ তাতে কোনও ভদ্রমহিলার মাস চলে না।'

'আমি কী করতে পারি?' মিনমিন করে বলল মতিলাল।

'কী করতে পারি মানে? ইয়ার্কি? তোমার বউ-এর খাওয়া-পরা চলছে না আর তুমি বলছ কী করতে পারি? অন্য কেউ হলে মুখ ভেঙে দিতাম আমি।' গজগজ করে উঠল সুভদ্রা, 'একেই দুর্নাম রটাচ্ছ আমি নাকি মুখরা, খারাপ ব্যবহার করি, তার ওপর মুখ ভেঙে দিলে আর দেখতে হবে না। এখন থেকে প্রত্যেক মাসে দুশো টাকা করে বেশি দেবে।'

'আমি কোত্থেকে পাব? আমি যা রোজগার করি তা তো জানো!'

'আমি কিছুই জানি না। কেন, যেসব মেয়েছেলের সঙ্গে দিনরাত ফুসুর-ফুসুর করতে তাদের গিয়ে বলো না। অকম্মের বাদশা।'

'ঠিক আছে, কিন্তু আমারও তো একটা কথা ছিল।'

'তোমার কোনও কথা থাকতে পারে না।'

'কিন্তু ছিল, বিশ্বাস করো।'

'ল্যাঙটের আবার বুক পকেট। বলো, বলে ফেলো।'

'ইয়ে, তুমি তো আমাকে ছেড়ে গেছ—।'

'হ্যাঁ। গেছি। ওরকম মাদিমুখো পুরুষের সঙ্গে কেউ থাকতে পারে না।'

'ঠিক আছে। এখন তুমি যার কাছে আছ—।'

'তার মানে? তুমি আমাকে চরিত্রহীনা বলছ?'

'না, না, এখন তো তোমার সঙ্গে বলরাম থাকে; থাকে না?'

'তাতে কী এল-গেল। সে কি আমার মন্ত্রপড়া স্বামী? বিয়ে করেছি তাকে? আমি কি নিতান্তই উন্মুক? বিয়ে করলে তোমার কাছ থেকে টাকা-পয়সা পাওয়া যাবে নাকি?'

'ও। তা হলে বিয়ে না করে এমনি-এমনি আছ?'

'হ্যাঁ। সাহেব-মেমরা যেমন থাকে। তা তোমার এখানেও বুড়ি-বুড়ি মেয়েছেলেরা যাতায়াত করে বলে শুনেছি। যদি কাউকে দেখতে পাই!' সুভদ্রা ঘুরে দাঁড়িয়ে সদ্য কিনে আনা প্যাকেটগুলো দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ওগুলো কী?'

'চা, চিনি।'

'আমি নিয়ে যাচ্ছি। কীসে নিই!' চোখ ঘুরল সুভদ্রার। তারপর এগিয়ে গিয়ে দেওয়াল থেকে তিব্বতি ব্যাগটা টেনে নামিয়ে প্যাকেটগুলো তাতে ফেলে দিল। হাঁ-হাঁ করে উঠল মতিলাল, 'আরে, আরে করছ কী? ওই ব্যাগটা নিও না!'

'কেন? এটা তোমার বাবার সম্পত্তি? আমি কিনেছিলাম না? আমার জিনিস নিতে আমাকেই নিষেধ করা হচ্ছে। যদি বিয়ে করতাম তবে এবাড়ির সব জিনিসই নিয়ে যেতে হতো আমাকে। আজ যাচ্ছি। সামনের মাস থেকে দুশো টাকা বেশি দেবে।' যেমন এসেছিল তেমনি ঝড়ের মতো চলে গেল সুভদ্রা।

দরজা বন্ধ করে ধীরে-ধীরে কিচেনে গেল মতিলাল। গ্যাস জ্বেলে এক কাপ কফি বানিয়ে বসার ঘরে এল। সামনের জানলা দিয়ে পাহাড়ের অনেকটা দেখা যায়। সেদিকে তাকিয়ে কফিতে চুমুক দিল সে। বেতের চেয়ারে বসে পাহাড় দেখতে-দেখতে সময় কাটানো ওর প্রিয় অভ্যেস। সুভদ্রা চলে গেছে অনেকক্ষণ, কিন্তু মনে হচ্ছে ওর কথাগুলো এই ঘরে ভাসছে। জীবনের একটা ভুল অনেক দাম দিয়ে গেল। বলরাম তারই বন্ধু। কন্ট্রাক্টরি করে। কাঁচা পয়সা হাতে। সুভদ্রার শরীরের দিকে নজর ছিল অনেকদিন। এখন সে সুভদ্রার কাছেই থাকে। অথচ সুভদ্রা নাকি ওর কাছ থেকে একটা পয়সাও নেয় না। অভাবে থাকবে, তবু সাহায্য নেবে না। প্রয়োজন হলে এ বাড়িতে এসে সে ঝামেলা করবে। মানুষের চরিত্র বোঝা মুশকিল।

মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স তার। চাকরি করে ব্যাঙ্কে। সুভদ্রা চলে যাওয়ার পর কোনও মেয়েমানুষের সঙ্গে নতুন করে সম্পর্ক তৈরি হয়নি। এই বয়সে বন্ধুরা রুমাল

পালটানোর মতো মেয়েমানুষ পালটায়। তার উৎসাহ হয় না। আজ রবিবার। ব্যাঙ্ক বন্ধ। কোনও কাজ নেই। দুপুরে একটু ঘুমিয়ে নিয়ে চা খাবে। সন্ধে থেকে হুইস্কি। রাত বাড়লে একটা চমৎকার ঘুম। এইভাবেই বাকি জীবন যদি কাটিয়ে দিতে পারত। সে কফি শেষ করে নিজের ঘরে এল। বিছানার ওপরে একটা সিনেমার পত্রিকা। মাধুরী দীক্ষিতের মুখ। এখনকার নায়িকারা বেশি সুন্দরী না মধুবালা, মালা সিনহারা? বিষয়টা নিয়ে ভাবতে বসলে বেশ ভালোভাবে সময় কেটে যায়। অড্রে হেপবার্ন, সোফিয়া লোরেন না ব্রিটি ওয়ানের সেই মেয়েটা। কী যেন নামটা?

এইসময় দরজার বেল বেজে উঠল প্যাঁক-প্যাঁক করে। লোকটা রসকষহীন। বেল বাজানোর ধরনের ওপর মানুষের চরিত্র অনেকটা বোঝা যায়। মতিলাল এগিয়ে গেল দরজা খুলতে। নিশ্চয়ই সুভদ্রা ফিরে আসেনি। এমনভাবে বেল ও বাজায় না।

দরজা খুলতেই হকচকিয়ে গেল মতিলাল। এক জিপ পুলিশ সামনে দাঁড়িয়ে। থানার ওসি থাপাকে সে চেনে। দয়া মায়া স্নেহ বলে বোধগুলো ঈশ্বর ওর জন্মের সময় দিতে ভুলে গিয়েছিলেন। থাপার হাতে রিভলভার। সেটা মতিলালের নাকের ডগায় নাচিয়ে থাপা বলল, 'হ্যান্ডস আপ। চালাকির চেষ্টা করলে গুলি করে খুলি উড়িয়ে দেব।'

কোনওরকমে দুটো হাত মাথার ওপর তুলতেই ধমক খেল সে, 'ঘরে চলো।'

অতএব ঘরে ঢুকতেই হল। পুলিশ বাহিনীকে সদর দরজায় রেখে থাপা দুজনকে নিয়ে ভেতরে এল, 'বাড়িতে আর কে-কে আছে?'

'কেউ নেই।' মাথার ওপর হাত তুলেই রেখেছিল সে।

'কী-কী বেআইনি অস্ত্র আছে বাড়িতে?'

'অস্ত্র! অস্ত্র থাকবে কেন?' করুণ গলায় পালটা প্রশ্ন করল সে।

'মারব মুখে এক থাবড়া, আমাকেই প্রশ্ন করা হচ্ছে। বের করো পিস্তলটা।'

'আমি-আপনার কথা বুঝতে পারছি না, বিশ্বাস করুন!' ককিয়ে উঠল সে।

'তোমার কাছে কোনও পিস্তল নেই?' ছোট-ছোট চোখে তাকাল থাপা।

'না নেই।'

'আজকে একজন তোমাকে পিস্তল পাচার করেনি?'

'না। বিশ্বাস করুন।'

'অ্যাই সার্চ করো। সব খুঁজে দ্যাখো। নো মার্সি।' থাপা আদেশ দেওয়ামাত্র বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল তল্লাশি করতে। মতিলাল দেখল ওরা ঘর লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছে। দুটো কাচের প্লেট ভাঙল। সব গেল।

ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যে করেন। চিনি, দুধ, চা যা ইচ্ছে সুভদ্রা নিয়ে যাক, আর কোনওদিন সে বাধা দেবে না। ভাগ্যিস ও আজ এসেছিল এবং তিকাতি ব্যাগে পিস্তলটাকে রাখায় ব্যাগের সঙ্গে আপদটাকেও নিয়ে গিয়েছে সুভদ্রা।

'হাত নামাও।' থাপার গলা।

আদেশ শুনে চোখ খুলে ধীরে-ধীরে হাত নামাল মতিলাল।

'কোথায় রেখেছ?'

মতিলাল চোখ ঘুরিয়ে দেখল বাহিনী হতাশ মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

'আমি কিছুই জানি না।'

সঙ্গে-সঙ্গে থাপার হাত এগিয়ে এল। তার সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে দেখল লোকটা। শেষে তাকে বলল, 'যদি প্রমাণ পাই মালটা তোমার কাছে ছিল তা হলে তোমার চামড়া ছাড়িয়ে নেব। এই, ডাকতো লোকটাকে। আজ ওর একদিন না আমার, দেখি?'

সেপাইরা বাইরে থেকে যাকে ধরে নিয়ে এল তাকে দেখে মতিলাল অবাক। সেই মাঝবয়সি গোঁফওয়ালা লোকটা। থাপা এগিয়ে গিয়ে ওর জামার কলার এমনভাবে মুঠোয় ধরল যেন দম আটকে গেল, 'অ্যাই শালা। এই খবর এনেছিস? কোথায় পিস্তল?'

লোকটা হাউমাউ করে উঠল, 'মাইরি বলছি ওর প্যাকেটে ছিল। আমি দেখেছি।'

'থাকলে কোথায় যাবে?'

'ও ওই প্যাকেট নিয়ে এ বাড়িতে ঢুকেছে।'

'ঢুকে আর বের হয়নি?'

'তা বলতে পারব না। মাঝখানে আমি কিছুক্ষণের জন্যে আপনাকে ফোন করতে গিয়েছিলাম। প্যাকেটটা পেয়েছেন?' লোকটা সেই অবস্থায় বলল।

'এখানে কোনও প্যাকেটই নেই। শোন, এবার থেকে ইনফরমেশন কারেক্ট না হলে,—' প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি নিয়ে ঠেলে ফেলে দিল লোকটাকে। তারপর সদলবলে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। জিপের চলে যাওয়া শব্দ কানে যাওয়ার পর মতিলাল দেখল লোকটা চেষ্টা করছে উঠে বসতে। পড়ে যাওয়ার সময় নিশ্চয়ই প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে লোকটা।

মতিলাল একটা চেয়ার টেনে বসল। ওঠার চেষ্টা করে লোকটা হাঁটু মুড়ে বসে বলল, 'আমাকে দেখে খুব মজা লাগছে, না?'

মতিলাল বলল, 'পিস্তলটা পাওয়া গেলে আমার অবস্থা তোমার চেয়ে খারাপ হতো।'

দৃশ্যটা কল্পনা করে লোকটা যেন নিজের কষ্ট একটু কম করে দেখল, 'আচ্ছা, মালটা কোথায় হাওয়া করে দিলে ভাই? তাজ্জব ব্যাপার?'

'কী মাল?'

'ইয়ার্কি? আমি স্পষ্ট দেখেছি তুমি প্যাকেটটা কুড়িয়ে নিলে। ওটা যে তোমার নয় সেটা বুঝতে পেরেই পেছনে লাগলাম। বাজারের মধ্যে কাউকে খুঁজে না পেয়ে তুমি যখন মোড়ক খুলছিলে তখন স্পষ্ট পিস্তলের নলটা দেখতে পেয়েছি।'

'তুমি তা হলে পুলিশের লোক?'

'তোমার ঘটে একটুও বুদ্ধি নেই। পুলিশের লোক হলে থাপা আমার গায়ে হাত তুলতে সাহস পেত? আমার কাজ হল গোপন খবর ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিয়ে কিছু কামাই করে নেওয়া। তুমি আমাকে আজ বোকা বানালে। আমি জানি পিস্তলটা এই বাড়িতেই আছে।' লোকটা উঠে দাঁড়াল।

মতিলাল দার্শনিকের মতো বলল, 'খুঁজে দ্যাখো, ওরাও তো খুঁজল।'

লোকটা যেন আদেশের অপেক্ষায় ছিল। সঙ্গে-সঙ্গে জিনিসপত্র সরিয়ে দেখতে লাগল। দেখতে-দেখতে বলল, 'তুমি কি বিবাহিত? বউ কোথায়?'

'পিস্তলটা আগে খোঁজ তারপর খেজুরে আলাপ করো।' মতিলাল খেঁকিয়ে উঠল। খুঁজতে-খুঁজতে লোকটা কিচেনে পৌঁছে গেল। একটু বাদে তার গলা ভেসে এল,

'খুব খিদে পেয়েছে। তোমার রুটি আর সবজি খেতে পারি?'

'দুটোর বেশি নেবে না। প্লেটে করে নিয়ে এখানে চলে এসো।' মতিলাল হুকুম করল। লোকটা প্লেট নিয়ে রুটি চিবোতে-চিবোতে এগিয়ে এসে বলল, 'ওঃ বাঁচলাম।'

'লোকটা কে?' মতিলাল এখন যেন কর্তৃত্বে।

'কোন লোক?'

'যে সিঁড়ি বেয়ে ওপর থেকে নামছিল। যার প্যাকেট পড়ে যেতে তুমি দেখেছিলে?'

'আমি কি পৃথিবীর সব মানুষকে চিনি?' মুখ ঘুরিয়ে নিল লোকটা।

'তুমি মিথ্যে কথা বলছ।'

'বিনা পয়সায় আমি খবর দিই না।'

'পুলিশকে তো নাম বলেছ। একই খবর বিক্রি করে কবার পয়সা নেবে।'

'মাইরি আর কী? পুলিশকে ওর কথা বলতে যাব কেন? বলেছি তুমি বাজারের মধ্যে পিস্তল নিয়ে ঘুরছিলে। ছেলেটার কথা ভুলেও পুলিশকে বলিনি।'

'তুমি তো আচ্ছা শয়তান!' মতিলাল অবাক।

'শয়তান বলো আর যাই বলো আমার তাতে কিছু যায় আসে না। বিজনেস ইজ বিজনেস, আমার বউ তো পৃথিবীর সব গালাগাল শিখে ফেলেছে আমাকে দেবে বলে। তাতে কোন কাজটা হয়েছে শুনি? এখন তুমি জিগ্যেস করতে পারো কেন আমি পুলিশকে ছেলেটার কথা বলিনি। প্রথম কথা, যদি তুমি কুড়িয়ে পেয়েছ তা হলে তোমার অপরাধ কমে যাবে, পুলিশের কাছেও তেমন গুরুত্ব থাকবে না। দ্বিতীয়ত, যদি তুমি পুলিশের চোখ এড়িয়ে পিস্তলটা রেখে দিতে পারো তা হলে আমি ওই ছেলেটার কাছে গিয়ে বলতে পারি তার পিস্তল কোথায় আছে এবং টাকা খিঁচতে পারি।' লোকটা খাওয়া শেষ করে হাসল।

'যে পিস্তল মাটিতে ফেলে দিয়ে যায় সে কেন তোমার কাছে খবর পেয়ে সেটা নিতে আসবে?'

'অনেক সময় বাধ্য হয়ে ফেলে। বিপদ এড়াবার জন্যে ফেলতে হয়। তা হলে পিস্তলটাকে তুমি এ বাড়ি থেকে পাচার করে দিয়েছ। দারুণ ঘোড়েল মাল তুমি।'

'অনেকক্ষণ থেকে গালাগাল দিচ্ছ তুমি!'

'দেব না? আজ তোমার জন্যে কামাই বন্ধ, উলটে মার খেতে হল!'

'কী নাম তোমার?'

'শান বাহাদুর।'

'থাকো কোথায়?'

'বোটানিক্যাল গার্ডেনের রাস্তায়।'

'মাঝে-মাঝে এসো। মন ভালো থাকলে গল্প করা যাবে।'

'মন খারাপ হয় নাকি খুব?'

'তাতো হয়ই। একা মানুষ।'

'ও। তা হলে চলো। আমার বউ-এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছি, তোমার মন একদম ভালো হয়ে যাবে।' শান বাহাদুর হাসল।

'এই বললে তোমার বউ গালাগালির এক্সপার্ট।'

'তাই তো নিয়ে যাচ্ছি। কিছুক্ষণ গালাগালি শুনলে দেখবে মনটা আর মনে থাকে না। কেমন উদাস হয়ে যায়।'

'মাপ করো ভাই। তুমি গিয়ে তোমার চেনা সেই ছেলেটাকে খবর দাও। তাতে যদি কিছু রোজগার হয় তোমার।' মতিলাল প্রায় জোর করে শান বাহাদুরকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

চেয়ারে বসতেই তার সুভদ্রার কথা মনে এল। পিস্তলটা দেখতে পেয়েও নিশ্চয়ই চেঁচিয়ে উঠবে। এখনও যে দ্যাখেনি তার প্রমাণ দেখলে এতক্ষণে ছুটে আসত। কিন্তু পুলিশ যদি জানতে পারে ওর কাছে পিস্তল আছে তা হলে আর দেখতে হবে না। মেরে কিমা বানিয়ে দেবে সুভদ্রাকে। বিনা দোষে কষ্ট পাবে বেচারা।

মতিলালের মনে হল এখনই সুভদ্রার বাড়িতে গিয়ে ওকে সাবধান করে দেওয়া উচিত। সে উঠল। কিন্তু তারপরই মনে পড়ল শান বাহাদুরের কথা। লোকটা যদি বাইরে গিয়ে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে থাকে। তা হলে নিশ্চয়ই ওর পিছু নেবে। সুভদ্রার কাছে গেলে দুই-এ দুই চার করে নিতে অসুবিধে হবে না ওর। এমনিতে হয়তো কিছু হতো না, সে আগ বাড়িয়ে বিপদ ডেকে আনবে।

মতিলাল নিজের বিছানায় চলে এল। জুতো খুলে মোজা-পায়েই শুয়ে পড়ল সে। আঃ কী আরাম! একটু ঘুমিয়ে নিয়ে বিকেল নাগাদ সুভদ্রার খোঁজে গেলেই হবে, ততক্ষণ শানবাহাদুরের ধৈর্য থাকবে না দাঁড়িয়ে থাকার। চোখ বন্ধ করল সে। চোখের পাতায় হেমা মালিনী, রেখা অথবা জিনাতের শরীর ঘুরে-ঘুরে আসত লাগল। এইভাবে কল্পনা করা ওর দীর্ঘদিনের অভ্যেস।

বাড়ির সামনে রাস্তার গায়ে একটা দেওয়ালের ওপর বসেছিল শানবাহাদুর। থাপার কাছে মার খাওয়াটা অবশ্য ইতিমধ্যে তেমন মনে পড়ছে না, কিন্তু ওই শুঁটকো লোকটা কীভাবে যে পিস্তল হাওয়া করে দিল তা বুঝতে না পেরে সে খুব অবাক হচ্ছিল। বাড়িটা বড় নয়। সে যখন থাপাকে টেলিফোন করতে গিয়েছিল তখন যদি কেউ এই বাড়িতে এসে থাকে যার হাতে মতিলাল পিস্তলটা পাচার করতে দিয়েছে তা হলে নিশ্চয়ই বোকা বনতে পারে। কিন্তু যে-ই আসুক তাকে সতর্ক করতে মতিলাল নিশ্চয়ই এখনই বের হবে।

প্রায় একঘণ্টা বসে থাকার পর শানবাহাদুরের শীত করতে লাগল। মতিলালের বাড়ি থেকে বের হওয়ার কোনও লক্ষণ নেই। ক্রমশ তার মনে হতে লাগল অনর্থক সময় নষ্ট করছে। পিস্তলটার পিছনে পড়ে না থেকে অন্য কিছুর সন্ধানে গেলে দু পয়সা কামাই হতে পারত। সে পুলিশের খোচড় নয়। কিন্তু অনেকেই তাই মনে করে। এই শহরে যারা অস্ত্র দিয়ে কারবার করে তারা তাকে ভালো চোখে দেখে না। ওদের অস্ত্রের কথা পুলিশ যদি জানতে পারে তা হলে যে শেষ হয়ে যাবে এমন হুমকি সে পেয়েছে। ভুলেও অমন কাজ করবে না সে। বাজারে মতিলালকে দেখে মনে হয়েছিল এ লাইনের লোক নয়। তাই কামানোর ধান্দা হয়েছিল। যে ছেলেটা রিভলভার ফেলে গেছে তাকে বের করতে পারলে রোজগারের আশা আছে! কিন্তু মুশকিল হল, ছেলেটাকে সে দেখেনি।

মতিলাল দেখেছে। ওকে দিয়ে যদি ছেলেটাকে বের করা যায়! হঠাৎ শানবাহাদুরের চোখ চকচক করে উঠল। মতিলাল বের হচ্ছে। দরজায় তালা দিল। সন্ধে হয়ে আসছে বলে ফুলহাতা সোয়েটার আর টুপি পরেছে। কোনওদিকে না তাকিয়ে লোকটা হাঁটছে এখন। কিছুটা যেতে দিয়ে শানবাহাদুর ওকে অনুসরণ করল।

উঁচু রাস্তা ভেঙে চিড়িয়াখানার পথ ধরল মতিলাল। ওদিকে যাওয়া মানে শহর থেকে বেরিয়ে যাওয়া। মতলবখানা কী? কিছুক্ষণ যাওয়ার পর একটা বাড়ির সামনে পৌঁছে মতিলালকে অসহায়ের মতো তাকাতে দেখল। বাড়িটার সামনে জিপ দাঁড়িয়ে আছে। পকেট থেকে সিগারেট বের করে মতিলাল সেটাকে ধরাল। তারপর ধীরে-ধীরে বাড়ি থেকে কিছুটা দূরত্বে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। শানবাহাদুর ব্যাপারটা বুঝতে পারল না। এদিকে বাড়িঘর কম। যা আছে সব কাঠের।

আলো মরে যাওয়া আলোয় মতিলালের মুখের যেটুকু দেখা যাচ্ছে তাতে শানবাহাদুরের মনে হল লোকটা বেশ কষ্টে আছে। হয়তো ওই জিপের জন্যেই বাড়িতে ঢুকতে পারছে না। শানবাহাদুরের মায়া হল। সে কাছে এগিয়ে গেল। মতিলাল তাকে দেখে অবাক। শানবাহাদুর হাসল, 'আবার দেখা হয়ে গেল ভাই।'

'না। তুমি আমার পিছন-পিছন এসেছ।' মতিলাল রেগে গেল।

'আহা! রাগ করছ কেন? আমি তো তোমার উপকারেও লাগতে পারি।'

'আমার কোনও দরকার নেই। কেটে পড়ো এখান থেকে।'

'জিপটা কার?'

'কার আমি কী করে বলব?'

এইসময় একটা চিৎকার ভেসে এল। ওরা দেখল বিপরীত দিক থেকে একটি যুবতী ছুটে আসছে। যুবতী সুন্দরী নয়, কিন্তু স্বাস্থ্যবতী। মতিলাল অস্বস্তিতে পড়ল।

যুবতী কাছে এসে মতিলালের হাত ধরল, 'ওমাঃ, এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বাড়িতে চলুন।'

মতিলাল বলল, 'এর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, তাই কথা বলছিলাম।'

'তাই?' যুবতী শানবাহাদুরের দিকে তাকাতেই সে ঘাড় নেড়ে না বলল।

'কেন মিছিমিছি দুঃখ পেতে এখানে আসেন আপনি? জানেন তো রোজ এইসময় বলরামদা জিপ নিয়ে এখানে আসে।' যুবতী বিষণ্ণ গলায় বলল।

'ঠিক আছে। ঠিক আছে।' কথাটাকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করল মতিলাল।

'মোটেই ঠিক নেই। আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে। দিদি আমাকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলেছে। নিজে আপনাকে ছেড়ে বাপের বাড়িতে বসে বলরামদার সঙ্গে প্রেম করবে তার বেলা দোষ নেই, আর আমি একটু—' থেমে গেল যুবতী।

'শ্বশুরবাড়িতে ফিরে গেলে ভালো করতে না?' মতিলাল জিজ্ঞাসা করল।

'ঝি-এর মতো খাটাবে। বড় ভাই-এর বিধবা বউকে কে পুষতে চায়? তা ছাড়া, আমার কথাও তো ভাবতে হবে। কী-বা বয়স আমার।' যুবতী ঠোঁট ফোলাল।

এসব কথা একটা বাইরের লোকের সামনে হোক চাইছিল না মতিলাল। সে সস্নেহে বলল, 'মানু, যাও, ভেতরে যাও।'

ঠিক তখনই বাড়ির সদর দরজা খুলে গেল। ওরা দেখল বলরাম বেরিয়ে এল,

পেছনে সুভদ্রা। শকুনের চোখ বলতে হয়, সেখান থেকেই দেখতে পেয়ে চিৎকার শুরু করল সুভদ্রা। 'অ, তুই ওই মিনসেকে ডেকে এনেছিস? এত বড় স্পর্ধা। মায়ের পেটের বোন হয়েও তুই আমাকে চাকু মারতে চাস। আর তুমিও কেমন পুরুষ? সুড়সুড় করে চলে এলে?'

মতিলাল রেগে গেল। আচ্ছা নির্লজ্জ মেয়েছেলে! সে চিৎকার করল, 'আমাকে কেউ এখানে ডেকে আনেনি। মিছিমিছি তুমি সুজাতাকে দোষ দিচ্ছ!'

'ইস! দরদ যে উথলে পড়ছে। অল্পবয়সের শালি পেয়ে নোলা ঝরছে!' চিৎকার করল সুভদ্রা। এবার তাকে থামাতে যেন বলরাম কিছু বলল। কিন্তু সেটাকে পাত্তা না দিয়ে সুভদ্রা বলল, 'তুমি চুপ করো। আমাদের ব্যাপারে নাক গলাবে না।'

শানবাহাদুর চাপা গলায় মন্তব্য করল, 'এ যে আমার বউ-এর এক কাঠি ওপরে।'

কিন্তু ততক্ষণে ওপরে একটা ঘটনা ঘটে গেল। বলরামকে ধমকানো মাত্র সে ঘুরে চড় মারল সুভদ্রার গালে। সুভদ্রা পড়তে-পড়তে সামলে নিল। মতিলাল দৃশ্যটা বিশ্বাস করতে পারছিল না। সুজাতা চাপা গলায় বলল, 'দিদি আর চেঁচাবে না।'

ওরা দেখল মার খেয়ে সুভদ্রা চোখে হাত চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে উঠল। বলরামকে এবার একটু অপ্রস্তুত দেখাল। সে হাত ধরে সুভদ্রাকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেল। আর সুভদ্রাও সুড়সুড় করে অনুসরণ করল তাকে।

সুজাতা এবার হাসল, 'দিদিকে আপনি কখনও মেরেছেন?'

'না, কখনও না। কেউ বলতে পারবে না ও কথা।' প্রতিবাদ করল মতিলাল।

'ওইটাই ভুল করেছেন।'

'মানে?'

'বলরামদার হাতে মার খেলে দিদি কেঁচো হয়ে যায়। তখন খুব ভালোবাসে।'

'সে কি?'

'হ্যাঁ। যারা মুখে চেঁচায় তাদের ওষুধ ওটা।'

শানবাহাদুর কান খাড়া করে শুনছিল। হঠাৎ সে সোজা হয়ে পেছন ফিরে হাঁটতে শুরু করল। তার এভাবে চলে যাওয়াটা অবাক করল ওদের। সুজাতা বলল, 'আপনার বন্ধু কিছু না বলে চলে গেল কেন?'

মতিলাল মাথা নাড়ল, 'কী জানি?'

'আপনি আর কতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন?'

'তোমার দিদির সঙ্গে জরুরি কথা ছিল।'

'এখন কোনও চান্স নেই।' হাসল সুজাতা, 'মার খেয়েছে, এবার আদর খাবে।'

মাথা গরম হয়ে গেল মতিলালের, 'তুমি জানো এটা বেআইনি। এখনও ও আমার বউ।'

'মোটেই না। সবাই জানে আপনাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।'

'ছাড়াছাড়ি হলে ও আমার কাছে যায় কেন? প্রতিমাসে আমার কাছে টাকা নেয় কেন?'

'নরম মাটি পেলে সবাই আঁচড়ায়। আপনার ঘরে আবার বউ এলে ও কি বারবার সেখানে যেত? আপনি শোক-শোক মুখ করে পড়ে থাকেন বলেই যায়!' সুজাতা হাসল।

মতিলাল ভেবে পাচ্ছিল না তার কী করা উচিত। যে উদ্দেশ্যে এখানে আসা তা বলরাম চলে না যাওয়া পর্যন্ত করা যাবে না। আবার নিজের বউ তার বন্ধুর সঙ্গে চোখের সামনে ঘরের দরজা বন্ধ করে আছে এমন দৃশ্য সহ্য করা অসম্ভব। সে বলল, 'আমি যাচ্ছি।'

'কী বলতে এসেছিলেন দিদিকে?'

'বলতে না, করতে।' দৃঢ় গলায় বলল মতিলাল।

'করতে মানে?' হাঁ হয়ে গেল সুজাতা।

'সাহায্য করতে। কিন্তু মনে হচ্ছে এখন তার কোনও দরকার নেই।'

'তার মানে?'

'এখন তোমার দিদির যে সর্বনাশই হোক না কেন তাতে আমার কিছু এসে যায় না।'

'আপনি মনের কথা বললেন না।'

'বিশ্বাস করো সুজাতা, আমি আর পারছি না।'

'আমি আপনাকে বিশ্বাস করি।'

'তোমার দিদি আমাকে ছেড়ে এখন বলরামের সঙ্গে, উঃ।'

'যে দিন চলে গেছে তাকে পেছন থেকে টেনে ধরে রাখতে পারবেন? অতীত ভুলে গিয়ে সামনের দিকে তাকান আপনি। কী করতে এসেছিলেন বলুন।'

কিন্তু-কিন্তু করেও না বলে পারল না মতিলাল, 'তোমার দিদি আজ দুপুরে আমার ওখানে গিয়ে অনেক গালমন্দ করে আমার কেনা মুদির দোকানের জিনিসপত্র একটা ঢিকাতি ব্যাগে পুরে নিয়ে এসেছে এখানে। ওই ব্যাগটা আমার চাই, জিনিসপত্র সমেত।'

'ব্যাগটা দিদির ঘরে। এখন তো পাওয়া যাবে না।'

'তুমি ওকে ব্যাগটা নিয়ে ফিরতে দেখেছ?'

'হ্যাঁ। বলল, চা-চিনি আছে। আর তখনই বলরামদা এসে গেল বলে দিদি ব্যাগটা ঘরের কোণে রেখে দিয়েছে।'

'জিনিসপত্র বের করেনি?'

'না। কিন্তু আপনি সর্বনাশ থেকে বাঁচার জন্যে সাহায্য করতে এসেছিলেন, বললেন। ওই ব্যাগটা ফেরত আনলেই সেটা হবে?'

'না। জিনিসপত্র সমেত ব্যাগটা নিয়ে আসতে হবে। তুমি যেমন করেই হোক কেউ ওর ভেতরে হাত দেওয়ার আগেই সরিয়ে ফেলে আমার কাছে নিয়ে আসতে পারবে? প্লিজ!' মতিলাল কাতর গলায় বলল।

'কী আছে ব্যাগের ভেতরে?'

'বলব। সব বলব। আগে তুমি ব্যাগটাকে নিয়ে এসো।'

'ঠিক আছে। আপনি বাড়ি চলে যান। আমি চেষ্টা করব নিয়ে যেতে।' সুজাতা বলল।

পরনে জিন্স আর জ্যাকেট, গলায় সিল্কের মাফলার, মাথায় আঁটা টুপি, পা ফেলছিল

সে হিন্দি ছবির নায়কের মতো। এই ভর বিকেলেও তার চোখ রোদ চশমার আড়ালে। দার্জিলিং-এ মেঘ না থাকলেও এমনসময় রোদের গায়ে তুলতুলে আনন্দ থাকে, চোখ ঢাকার প্রয়োজন হয় না। তবু সে চোখ ঢেকে রেখেছিল।

ভানুভক্তের মূর্তির পাশে দাঁড়িয়ে সে সতর্কভাবে চারপাশে তাকাল। না, সন্দেহজনক কাউকে নজরে পড়ছে না। এখন ট্যুরিস্ট মরশুম। স্বাভাবিকভাবেই ম্যাল ভরে আছে প্রচুর আদেখলে বাঙালিতে। প্রথম-প্রথম মজা লাগত, এখন মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। রোগা খচ্চরের ওপর চল্লিশে পা দেওয়া আমাশা রুগি বাঙালিবাবু তার বেঢপ বউকে কোনওরকমে তুলে ক্যামেরা বাগিয়ে ধরছে ছবির জন্যে। আটপৌরে বউ-এর পরনে ধার করা প্যান্ট যা শরীরটাকে আরও কিম্ভূত করে তুলেছে। কিন্তু লোকগুলোর চেহারা দেখে মনে হচ্ছে চাঁদের মাটিতে সবে পা দিচ্ছে। এই দৃশ্য এখানে রোজ কতবার কতভাবে অভিনীত হচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ দেখতে পেল থাপাকে। এমন হারামি পুলিশ অফিসার দার্জিলিং-এ এর আগে কখনও আসেনি। কাউকে কেয়ার করে না। এমনকী এম পি সাহেবের চিঠিকেও পাত্তা দেয়নি একবার। আজ দুপুরে খবর এল থাপার লিস্টে তার নাম উঠেছে। অস্ত্র সমেত তাকে ধরতে পারলে চামড়া ছাড়িয়ে নেবেই। আর খবরটা পাওয়ার পর হঠাৎই লোকটার মুখোমুখি হয়ে পড়েছিল সে। খুব জোরে কেটে পড়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গিয়েছিল বাজারে। নামবার সময় এমন নার্ভাস হয়ে গিয়েছিল যে পিস্তলটাকে ফেলে দিয়েছিল সিঁড়ির কোণে। পরে যখন বুঝতে পারল থাপা তার পিছু নেয়নি, তখন আফসোস হয়েছিল খুব। ছুটে গিয়েছিল সিঁড়ি ভেঙে। আশ্চর্য, এরই মধ্যে হাওয়া হয়ে গিয়েছে পিস্তল।

এখন এখানে একটা পিস্তল জোগাড় করতে বেশি কসরত করতে হয় না। কিন্তু টাকা লাগে। কিছু টাকা ফালতু খরচ হবে। সে দেখল থাপা চারপাশে তাকাতে-তাকাতে তার দিকেই এগিয়ে আসছে। এখন এখান থেকে কেটে পড়ার চেষ্টা করা বোকামি। সে চেষ্টা করল সহজ মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকতে। পাশ দিয়ে যেতে-যেতে থাপা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। লোকটা তাকে দেখছে। এখনও পর্যন্ত পুলিশের খাতায় দাগি হিসেবে তার নাম ওঠেনি। সন্দেহভাজন হিসেবে যে লিস্ট ও তৈরি করেছে তাতে উঠলেও উঠতে পারে।

'বহুৎ আচ্ছা!' চাপা গলায় বলল থাপা।

এবার তাকাতেই হয়। সে মুখ ফিরিয়ে হাসল, 'ইয়েস স্যার!'

'নামটা যেন কী?'

'প্রদীপ, প্রদীপ গুরুং।'

'আজ দুপুরে তোমার সঙ্গে কি আমার দেখা হয়েছিল?'

'না, স্যার, আমি তো আপনাকে দেখিনি।'

'তুমি জানো আমি কে?'

'ইয়েস স্যার। আপনি দার্জিলিং থানার ওসি।'

'কী করে জানলে? কোনও ভদ্রলোকের ছেলে পুলিশ অফিসারকে চিনতে পারে না।'

'আমার বাবা কিন্তু ঠিক ভদ্রলোক নয়।'

'তার মানে?'

'বাবা ব্যবসা করে। ইধার কা মাল উধার। দো-নম্বরি।'

'আচ্ছা। কী নাম তার?'

'জি, নরবাহাদুর গুরুং।'

'আচ্ছা। তোমার এই ওপিনিয়নের কথা নরবাহাদুরজি জানেন?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'তুমি আর একঘণ্টা পরে থানায় এসো।'

'থানায়? কেন স্যার?'

উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করল না থাপা। ছোট ছড়ি হাতে হেঁটে চলে গেল ম্যালের ওপাশে। প্রদীপ ঠোঁট কামড়াল। বেশি কথা বলা হয়ে গেল। এখন কী করবে? থানায় গেলে থাপা তাকে নির্ঘাৎ পুরে দেবে গারদে। ঘুমের রাস্তায় তিন-তিনটি জিপ রবারি হয়ে গেছে। পুলিশ কারও নাম পায়নি। পেতে কতক্ষণ? একঘণ্টা অনেক সময়। তার আগে ঘুরে আসতে হবে। প্রদীপ এগিয়ে গেল অজিত ম্যানসনের পেছনের দিকে। মডার্ন টেলার্সের সামনে দাঁড় করানো তার মোটরবাইকটায় উঠে স্টার্ট দিল। তারপর তীব্র গতিতে বেরিয়ে গেল লেবং রেসকোর্সের দিকে।

টিবেটিয়ান রিফ্যুজিস সেন্টার ছাড়িয়ে আর একটু এগিয়ে ডানদিকের কাঁচা পথ দিয়ে মোটরবাইক তুলতেই সাইনবোর্ডটা চোখে পড়ল, 'পরম আনন্দ।' আরও একটু যেতে ছোট ব্যারাকবাড়ি আর তার সামনের চিলতে মাঠ নজরে এল। মোটরবাইকের আওয়াজ কানে যেতেই ব্যারাক থেকে পিল-পিল করে বেরিয়ে এল জনা কুড়ি বাচ্চা ছেলে। স্টার্ট বন্ধ করতেই তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রদীপের ওপর। কেউ বাইকে উঠে বসল, কেউ ওর কাঁধে। সবচেয়ে পুচকেটাকে কাঁধে নিয়ে প্রদীপ বাইক থেকে নামল। বাচ্চাগুলো তখন চেঁচাচ্ছে, 'বাইক-আঙ্কল জিন্দাবাদ, বাইক-আঙ্কল জিন্দাবাদ।' প্রদীপ ধমকাল, 'আরে, চুপ, একদম চুপ। আমি তোমাদের বাইক-আঙ্কল নই, শুধু আঙ্কল। তা আজ পেট ভরে খাওয়া-দাওয়া হয়েছে তো সবার?'

সবাই একসঙ্গে হ্যাঁ বলল। প্রদীপ বলল, 'তা হলে একটা গান শোনাও।'

সঙ্গে-সঙ্গে বাচ্চারা শোলে ছবির গান ধরল, 'এ দোস্তি—।'

প্রদীপ ওদের সঙ্গে গলা মেলাতে-মেলাতে দেখল মিসেস এভার্ট বারান্দায় দাঁড়িয়েছেন। ভদ্রমহিলার মুখ স্বাভাবিক নয়। এই আমেরিকান মহিলা একা কারও কোনও সাহায্য ছাড়া এইখানে হোম বানিয়েছেন পিতৃপরিচয়হীন অসহায় ছেলেগুলোকে মানুষ করার জন্যে। ভদ্রমহিলার বয়স পঞ্চাশের কাছে। দুজন সহকারিনীকে নিয়ে উনি যা পরিশ্রম করেন তা দেখে শ্রদ্ধায় মন ভরে যায়। তিন-তিনটে জিপ লুঠের অর্ধেক টাকা প্রদীপ ওঁর হাতে তুলে দিয়েছে হোমের খরচ চালানোর জন্যে। অবশ্য সে বলেনি টাকাগুলো কী করে পাওয়া গেল।

গান শেষ হওয়া মাত্র প্রদীপ মিসেস এভার্টের সামনে গিয়ে মাথা নাড়ল, 'গুড ইভনিং'।

'গুড ইভনিং প্রদীপ।'

'আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে কোনও সমস্যায় পড়েছেন।'

'সমস্যা ছাড়া তো জীবন নয়।'

'আমাকে বলুন, যদি কিছু সাহায্য করতে পারি।'

'না। এটা আমাদের মতো সাধারণ মানুষের হাতের বাইরে। অনলি গভর্নমেন্ট ইচ্ছে করলে পারে। আমি এম পি-র কাছে গিয়েছিলাম, দরখাস্ত দিয়ে এসেছি।'

'আপনার কি সমস্যার কথা বলতে আপত্তি আছে?'

'না। এই যে বাড়ি, মাঠ, এসবের জন্যে আমি প্রতিমাসে আড়াইশো টাকা ভাড়া দিই। এ নিয়ে কখনও কোনও ট্রাবল হয়নি। হঠাৎ মিস্টার প্রধান আমাকে জানিয়েছেন যে তিনি এইসব জমি-জায়গা বিক্রি করে দিচ্ছেন একজন ব্যবসায়ীকে যিনি এখানে ফ্যাক্টরি খুলবেন। আমাকে উঠে যাওয়ার নোটিস দিয়েছেন উনি।'

'তারপর?'

'আমি কোথায় যাব এতগুলো বাচ্চাকে নিয়ে? আমি ওঁর কাছে অ্যাপিল করলাম। উনি বললেন পঞ্চাশ হাজার টাকা দিলে মাড়োয়াড়িকে সম্পত্তিটা বিক্রি না করে আমাকে দিতে পারেন। কিন্তু অত টাকা একসঙ্গে আমি পাব কোথায়? অসম্ভব। তাই সরকারকে লিখেছি যদি তাঁরা সাহায্য করেন।'

'পঞ্চাশ হাজার টাকা?'

'ইয়েস।'

'কোন মাড়োয়াড়ি এই জমিটা নিচ্ছে?'

'জানি না। এইসব ফুলের মতো বাচ্চাদের নিয়ে আমি কোথায় যেতে পারি তা ভেবে কূল পাচ্ছি না।'

'আপনার হাতে আর কতদিন সময় আছে?'

'তিনমাসের একটু কম সময়। তার মানে—।'

'ঠিক আছে। আমি আপনার সঙ্গে সাতদিন পরে দেখা করব। ততদিন আপনি কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না।'

'এ ব্যাপারে তুমি কী করতে পারো প্রদীপ?'

'এই বাচ্চাগুলোর জন্যে আমি সব কিছু করতে পারি ম্যাডাম।'

'দেখো এমন কিছু করো না যাতে ঈশ্বর অসন্তুষ্ট হন। আগামীকাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট আমাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছেন। আমার বিশ্বাস, একটা ভালো খবর কাল পাব।'

'তাহলে তো ভালো কথা। কিন্তু সেটা না হওয়া পর্যন্ত আজকাল আমি বিশ্বাস করতে পারি না। আচ্ছা, আজ আমি আসছি।'

ম্যাডামের কাছ থেকে বিদায় নেওয়া যত সহজ, শিশুদের কাছ থেকে তত কঠিন। তবু খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রদীপ বাইক চালু করল। আর মিনিট দশেক সময় আছে। থাপা বলে গেছে এক ঘণ্টার মধ্যে তার সঙ্গে দেখা করতে। সে কাঁচা পথটা ধরেই যে গতিতে বাইক চালাচ্ছিল তাতে আচমকা ব্রেক কষে থামানো মুশকিল। এখন এই সন্ধে হয়ে আসার সময়ে পথ পরিষ্কার থাকার কথা। কিন্তু বাঁক ঘুরতেই সে দেখতে পেল রাস্তা বন্ধ। দুটো জিপ ঠিক পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। এখন ব্রেক করলে ছিটকে যেতে হবে। পাশ দিয়ে রাস্তা নেই যে কাটিয়ে যাবে।

মরিয়া হয়ে জিপের কাছে এসে সামনের চাকা ঝাঁকুনি দিয়ে ওপরে তুলল সে। বাইকে গতি এমন প্রবল ছিল যে বাইক উঠে গেল জিপের বনেটে এবং ছাদ ছুঁয়ে লাফিয়ে পড়ল ওপাশের পথে। পড়ার সময় ব্যালেন্স হারাতে-হারাতেও সামলে নিল প্রদীপ। এখন বাইক থামিয়ে ঘুরে গিয়ে লোকগুলোকে চ্যালেঞ্জ করা যায়, কিন্তু সময় নষ্ট হবে তাতে। প্রদীপ শূন্য রাস্তা ধরে দার্জিলিং থানার দিকে বাইক ছোটাল।

একরকম একটা দৃশ্য দেখবে জিপের আরোহীরা কল্পনা করেনি। ওরা ভেবেছিল সামনে বাধা দেখে বাইক থেমে যাবে। কিন্তু ওটা যে গতি বাড়িয়ে সার্কাসের খেলা দেখাবে তা কে জানত। অথচ ওই লোকটাকে ধরতেই তারা এসেছিল। ওদের বস-এর কাছে খবর গেছে একমাত্র একটি বাইকে করা আসা লোকের সঙ্গেই হোমের ম্যাডামের সংযোগ আছে। সেই লোক প্রত্যেক সপ্তাহে অন্তত দু-দিন হোমে আসে। সরকারি মহল নিয়ে বস চিন্তা করে না। এই ছেলেটি কে, কী তার পরিচয়—বের করার দায়িত্ব দিয়েছিল ওদের ওপর। কিন্তু লোকটা যে এমন সার্কাস দেখাবে তা ওরা অনুমান করেনি।

আধঘণ্টা বাদে জলাপাহাড়ের রাস্তায় একটি সুন্দর বাংলো বাড়ির বারান্দায় বসে চা খেতে-খেতে বস্ যখন কাহিনিটা শুনল তখন তার মুখে অদ্ভুত হাসি ফুটল, 'তোমরা কজন ছিলে ওখানে?'

'স্যার, চারজন।'

'চারজন যখন একজনকে আটকাতে পারোনি তখন তোমাদের যে টাকা দেওয়া হয়ে থাকে তা ওকে দেওয়া যায়। কী বলো? আমি ঠিক বলছি কি না?' বস্ একটুও উত্তেজিত নয়।

ঠিক সেই সময় থাপার সামনে ভদ্রলোকের মতো বসেছিল প্রদীপ।

'নরবাহাদুর গুরুং তোমার বাবা?'

'ইয়েস স্যার।'

'কিন্তু তিনি সম্পর্কটা অস্বীকার করেছেন।'

'মানে?'

'আমি একটু আগে তাঁকে টেলিফোন করেছিলাম। তিনি বললেন, ওই নামে তাঁর এক ছেলে ছিল কিন্তু এখন সে মৃত। তাকে ত্যাজ্যপুত্র করেছেন তিনি।'

'একথা বাবাই বলতে পারেন।'

'কেন একজন বাবা ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করেন?'

প্রদীপ মুখ তুলল, 'স্যার, এর জবাব উনি দিতে পারবেন।'

'তুমি কোথায় থাকো?'

'লা ডেন লা রোডে।'

'কোন বাড়িতে?'

'পোস্ট অফিসের নিচে।'

'কী করো তুমি?'

'টুকটাক বিজনেস।'

'দু-নম্বরি?'

'না স্যার। ওটা পারলে তো বাবার সঙ্গেই থাকতে পারতাম।'

'প্রদীপ গুরুং। আমি চাই না দার্জিলিং-এ কোনও গোলমাল হোক।'

'আমিও চাই না স্যার।'

'কয়েকদিন আগে ঘুমের রাস্তায় তিনটে ডাকাতি হয়েছে। প্রায় তিরিশ হাজার টাকার কমপ্লেন আছে। এ ব্যাপারে তুমি কিছু জানো?'

'না স্যার।'

'এত তাড়াতাড়ি উত্তর দিতে হবে না। ভেবে দ্যাখো। আমি কাউকে ধরতে পারিনি বটে কিন্তু বর্ণনা পেয়েছি। তার একজনের সঙ্গে তোমার বেশ মিল আছে।'

ফাঁদটা এগিয়ে আসছে। প্রদীপের শরীর শিরশির করে উঠল।

'আমি এখনই তোমাকে কিছু বলছি না। ইচ্ছে করলে তোমাকে দুরমুশ করে সব কথা বের করে নিতে আমি জানি। সেটা পরে করা যাবে যদি তুমি নিজে থেকে না বলো।' থাপার কথা শেষ হওয়া মাত্র টেলিফোন বাজল। রিসিভার তুলে হ্যালো বলার পর থাপার মুখ উজ্জ্বল হল, 'ইয়েস, অ্যাঁ? আচ্ছা! কী রকম দেখতে? আমার মনে হয় এ ব্যাপারে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি। হ্যাঁ, আপনি কমপ্লেন করছেন না? ঠিক আছে, ঠিক আছে!' রিসিভার নামিয়ে রেখে থাপা সরাসরি তাকাল, 'ম্যাল থেকে বেরিয়ে তুমি কোথায় গিয়েছিলে?'

'কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করতে।'

'কোথায়?'

'পরম আনন্দ-এ।'

''ওখানে তোমার কী দরকার?'

'হোমের বাচ্চাদের আমি ভালোবাসি।'

'সত্যি কথা বলছ না এর মধ্যে দু-নম্বরি কিছু আছে?'

'আমি দু-নম্বরি কাজ করি না।'

'আস্তে কথা বলো। কেউ চেঁচিয়ে কথা বললে আমার মাথা ঠিক থাকে না।'

'আই অ্যাম সরি স্যার—।'

'মাটি থেকে উঁচুতে বাইক তুলতে পারো?'

অবাক চোখে থাপাকে দেখল প্রদীপ। এর মধ্যে লোকটার কাছে খবর এসে গেল? সে হাসার চেষ্টা করল, 'ইচ্ছে করলেই যে পারব তা নয়, হঠাৎ-হঠাৎ হয়ে যায়।'

'শোনো, প্রদীপ, আজ সকালে তোমার কাছে একটা বেআইনি রিভলভার ছিল?'

'না স্যার, রিভলভার ছিল না।'

'আমার লোক বলছে ছিল। কিন্তু ওটা যদি আবার তোমার কাছে ফিরে আসে তাহলে তোমাকে আমি পুঁতে ফেলব। কথাটা মনে রেখো। আমি তোমাকে দেখা করতে বলছিলাম যে কারণে সেটা আর প্রয়োজন হবে না।'

'কারণটা কী ছিল স্যার?'

'যখন প্রয়োজন হবে না তখন তোমাকে বলে আমার লাভ নেই।'

থাপা হাত নাড়ল, 'তোমাকে আর-একটা কাজ দিতে পারি। কিছু রোজগার হতে পারে তোমার।'

'রোজগার হলে আমি রাজি স্যার।'

একটা কাগজে ঠিকানা, নাম লিখে এগিয়ে দিল থাপা, 'এঁর সঙ্গে আজই দেখা করো। উনি তোমাকে খুঁজছেন, তোমারও উপকার হবে।'

নাম-ঠিকানা পড়ল প্রদীপ। বিখ্যাত মানুষ। এই শহরে একে চেনে না এমন কেউ নেই।

'ঠিক আছে, তুমি যেতে পারো।'

'স্যার। একটা রিকোয়েস্ট ছিল।'

থাপা তাকাল। প্রদীপ বলল, 'পরম আনন্দ যিনি চালান তাঁকে নিশ্চয়ই আপনি চেনেন। অমন মানুষ হয় না। বাচ্চাগুলোও খুব ভালো। কিন্তু হোমের বাড়িটা যাঁর, তিনি বিক্রি করে দিচ্ছেন একজনকে। সেই লোকটা ফ্যাক্টারি বানাবে ওখানে। এর ফলে ওই বাচ্চাগুলোর মাথা গোঁজার জায়গা থাকবে না। আপনি ওদের বাঁচান স্যার।'

'ওই সম্পত্তি কার?'

'মিস্টার প্রধানের।'

'কেউ যদি তার পার্সোনাল প্রপার্টি বিক্রি করে দিতে চায় তা হলে আইন বাধা দিতে পারে না।'

'আমি জানি স্যার। শুধু মানবিকতার কারণে যদি কিছু করা যায়—।'

'তোমার এতে কী স্বার্থ?'

'বাচ্চাগুলো আমাকে ভালোবাসে।'

'অদ্ভুত। তাহলে মিসেস এভার্টকে বলো প্রধানের কাছ থেকে সম্পত্তিটা কিনে নিতে।'

'হোমের সেই সামর্থ্য নেই। জনসাধারণের দানের ওপর হোম চলে।'

'তোমার যখন এত দরদ তখন তুমি কিনে নিয়ে হোমকে দান করে দাও।'

'টাকাটা আমার পক্ষে অনেক।'

থাপা কাঁধ নাচাল, 'সরি প্রদীপ, আমার পক্ষে এ ব্যাপারে কোনও সাহায্য করা সম্ভব নয়। কেউ আইন ভাঙলে আমি তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারি কিন্তু—। ওয়েল, গুডবাই।'

বাইরে বেরিয়ে এসে প্রদীপ দেখল দার্জিলিং শহরে ইতিমধ্যেই সন্ধের অন্ধকার ঘন হচ্ছে। একটু বাদেই কুয়াশারা নামবে দল বেঁধে, রাস্তা ভালো করে দেখা যাবে না। থাপার লেখা কাগজটা ওর হাতের মুঠোয় ছিল। সেটাকে পকেটে পুরে বাইক চালু করল সে। তারপর হেডলাইট জ্বেলে ছুটে গেল জলাপাহাড়ের পথে। ম্যাল পেরিয়ে ঘোড়ার আস্তাবলের কাছে এসে গতি কমাতেই সে ডাকটা শুনতে পেয়ে বাইক থামাল। দৌড়ে কাছে এল লিটন। বেঁটে, কিন্তু শরীরে ভালো শক্তি। মাথায় বুদ্ধি পুরোপুরি নেই। লিটন বলল, 'কোথায় থাকো? সারাদিন খুঁজে বেড়াচ্ছি!'

'কেন?'

'তোমার পিস্তল হাওয়া হয়ে গেছে?'

'তোকে কে বলল?'

'আগে বলো, হ্যাঁ কি না?'

'হাওয়া হয়নি। থাপার হাত থেকে বাঁচার জন্য সিঁড়িতে ফেলে দিয়েছিলাম।'

'বড় সিঁড়িতে তো? পরে আর পাওনি, ঠিক?'

'হ্যাঁ। কে বলল তোকে?'

'শানবাহাদুর নামে একটা লোক বাজারের পাশে ভাটিখানায় বসে এই গল্পটা সবাইকে শোনাচ্ছিল। এমনকী যে লোকটা পিস্তলটা পেয়েছিল পুলিশ তার বাড়িতেও নাকি সার্চ করতে গিয়েছিল অথচ কিছু পায়নি।'

'লোকটা আমার নাম বলেছে?'

'নাঃ। বর্ণনা দিচ্ছিল। বুড়ো ভানুপ্রসাদ সেটা শুনে এসে আমাকে বলে। শুনে আমার সন্দেহ হয়, ওটা তুমি হতে পারো!'

'তুই এখানে অপেক্ষা কর। আমি ঘুরে আসছি এখনই। তারপর কথা বলব।' বাইক চালু করল প্রদীপ। লিটন কোমরে হাত দিয়ে ওর যাওয়া দেখল। তারপর পাশের চায়ের দোকানে ঢুকল। প্রদীপ সম্পর্কে ওর প্রবল আস্থা আছে। ইদানীং সে প্রদীপের সঙ্গে ছায়ার মতো থাকে। প্রদীপ বাঁ হাতে পিস্তল চালিয়েও লক্ষ্যভেদ করতে পারে। তিন-তিনটে ছোট অপারেশন থেকে লিটন ছয় হাজার টাকা পেয়েছে। তাই এখন প্রদীপ যে আদেশ করবে তাই তাকে শুনতে হবে। সে সিগারেট পাকাতে লাগল একমনে।

গেট বন্ধ। হেডলাইটের আলো ফেলে হর্ন দিল প্রদীপ। একটু বাদে একজন বন্দুকধারীকে দেখা গেল। এক হাতের আড়ালে চোখ ঢেকে অন্যহাতে বন্দুক নিয়ে এগিয়ে আসছে।

'কৌন হ্যায়?'

'আমার নাম প্রদীপ গুরুং। তোমার সাহেব আমাকে ডেকেছেন।'

লোকটা কোনও কথা না বলে গেট খুলে দিল। ওর ভঙ্গি দেখে বোঝা গেল যে এই নামের লোক যে আসবে তা জানা ছিল। বাইক নিয়ে সোজা বাংলোর সিঁড়ির সামনে চলে এল প্রদীপ। নিচে নেমে দাঁড়ানো মাত্র একটি লোক এগিয়ে এল, 'প্রদীপ গুরুং?'

'ইয়েস।'

'আসুন।'

লোকটিকে অনুসরণ করে সে যে ঘরে ঢুকল সেটিতে আসবাব বলতে চারটে সাদা সোফা এবং একটি সাদা রঙের টেবিল। প্রদীপকে সেখানে বসিয়ে লোকটা চলে গেল। পায়ের তলায় কার্পেট। দেওয়ালে কোনও ছবি নেই। ওপাশের দরজায় ভারী সাদা পর্দা ঝুলছে। দেওয়ালের রঙও সাদা। প্রদীপ উশখুশ করছিল। থাপা তাকে বলতেই সে এখানে চলে এল। থাপা বলেছে এই লোকটা তাকে যে কাজ দেবে তা করতে পারলে রোজগার হবে। কাজটা নিশ্চয়ই দু-নম্বরি কিছু হবে না, হলে থাপা তাকে এখানে পাঠাত না।

এইসময় লোকটাকে ঘরে ঢুকতে দেখল প্রদীপ। এর আগে দূর থেকে সে দেখেছে। এত বড় মানুষের কাছাকাছি পৌঁছবার ক্ষমতা তার এখনও হয়নি। কাছ থেকে সাদা শার্ট, সাদা হাফস্লিভ সোয়েটার, সাদা প্যান্ট এবং সাদা চপ্পল মানুষটিকে তার বেশ সাদাসিধে বলে মনে হল। ফরসা গায়ের রঙের সঙ্গে চওড়া টাক চমৎকার মানিয়ে গিয়েছে।

উল্টোদিকের সোফায় বসে তিনি বললেন, 'গুড ইভনিং।'

'গুড ইভনিং স্যার। আমি প্রদীপ গুরুং।'

'এ বাড়িতে ঢোকার সময় থেকে তো দু-দুবার নামটা বলেছেন। আমি থাপার কাছে কিছুটা শুনেছি, বাকিটা জেনে নিয়েছি। মোটর বাইক ভালো চালাতে পারেন?'

'এমন কিছু নয় স্যার।' নম্র গলায় বলল প্রদীপ।

'দু-নম্বরি করেন না কিন্তু দু-নম্বরি জিনিস রাখেন?'

'তার মানে?'

'গতকাল পর্যন্ত আপনার কাছে একটা বেআইনি পিস্তল ছিল।'

'এখন নেই ভাবলেন কী করে?'

'যন্ত্র বলে দিল আপনি কোনও অস্ত্র ছাড়া এখানে এসেছেন। গুড। আপনাকে আমার একটা কথা বলার আছে। আপনার মধ্যে যদি ক্ষমতা থাকে তাহলে তা ছোটমাপের বেআইনি কাজ করে নষ্ট করবেন না। থাপার কাছে প্রমাণ না থাকলেও তিন-তিনটে ছিনতাই-এর কাজ আপনি এবং আপনার সঙ্গী করেছেন, এটা আমি জানি। জানি কিন্তু প্রমাণ নেই। তাই আপনি চ্যালেঞ্জ করলে কিছু বলতে পারব না। চা না কফি?'

প্রদীপের হঠাৎ শীত-শীত করছিল। এই লোকটি খুব শান্ত গলায় কথা বলছেন। মুখচোখে একটুও উত্তেজনা নেই। অথচ তার সম্পর্কে যেসব কথা বলে গেলেন তা ওঁর মতো মানুষ কী করে জানলো তা ওর জানা নেই।

সে মাথা নাড়ল, 'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।'

'ও কে। শুনুন। আপনার মতো এনার্জেটিক ইয়ংম্যান আমি খুব পছন্দ করি। আমি আপনাকে একটা কাজ দিতে পারি। লেপার্ড দেখেছেন?'

'সিনেমায় দেখেছি।'

'হুম। ব্ল্যাক লেপার্ড।'

'না স্যার, রঙ মনে নেই।'

'এখান থেকে সত্তর মাইল দূরে সিকিম-টিবেট বর্ডারের কাছে কিছু ব্ল্যাক লেপার্ড এখনও আছে বলে শোনা যাচ্ছে। খুব বিরল প্রজাতির প্রাণী। আজ সকালে তাদের দুজনকে দেখা গিয়েছে। তারা তখন যৌনমিলনে ব্যস্ত ছিল।'

'ইমপসিবল।'

'হোয়াই?'

'এইসব প্রাণীদের মেটিং-এর সময় সাধারণত কেউ দেখতে পায় না।'

'সাধারণত। কিন্তু দেখেছে। সিকিমের একটা ট্যুরিস্ট বাস ওই সময় ওই পথ দিয়ে ওখানে পৌঁছে যায়। তাদের তিনজন যাত্রী ওই দৃশ্যের ছবি তোলে। বাসটা আজই গ্যাংটকে ফিরে গেছে। যাওয়ার পথে বাসের ড্রাইভার একটা পুলিশ স্টেশনে খবরটা দিয়ে যায়। পুলিশ স্পটে গিয়ে কিছুই দেখতে পায়নি।'

'আমাকে কী করতে হবে?'

'ওই তিনজন যাত্রীর নাম-ঠিকানা জোগাড় করতে হবে।'

'কেন?'

'ব্ল্যাক লেপার্ড ভারতবর্ষে নেই। আছে হিমালয়ের এই এলাকায়। এতদিন পর্যন্ত

ওদের অস্তিত্ব কেউ জানতই না। আমার হবি রেয়ার ফটোগ্রাফ কালেক্ট করা। আমি যখন জানতে পারলাম তিনজন ট্যুরিস্ট ওই ব্ল্যাক লেপার্ডের মেটিং দৃশ্যের ছবি তুলেছে তখন মনে হল ছবিগুলো একমাত্র আমার কালেকশনেই থাকবে। আমার টাকা আছে তাই ছবিগুলো আমি চাইতে পারি। তিনটে সাধারণ ট্যুরিস্ট ওই ছবি তুলে বাড়ি ফিরে তাদের অ্যালবামে সেঁটে রাখবে। কিন্তু আমার কাছে থাকলে ওগুলো অন্যমাত্রা পাবে। ওই তিনজনের খবর পেলে আমি ছবিগুলো কিনে নেব। আজ ওরা গ্যাংটকে ফিরে গেছে। হয়তো ওদের ফিল্মের রোল শেষ হতে আরও দু-একদিন লাগবে। অতএব আমি আপনাকে ওই দু-একদিন সময় দিচ্ছি।' ভদ্রলোক হাসলেন।

'আপনি তো ট্যুরিস্ট কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করলেই ওদের ঠিকানা পেতেন।'

'না পেতাম না। গ্যাংটকে সাইট সিয়িং ট্যুর করে অন্তত পনেরোটা নামী কোম্পানি। এ ছাড়াও আনরেজিস্টার্ড কোম্পানি আছে। যারা ডেইলি টিকিট কিনে ওইসব বাসে উঠে তারা নিজেদের ঠিকানা কোম্পানিকে দেয় না, কোম্পানি সেটা চায়ও না।'

'বুঝলাম। কিন্তু আমি ওদের কী করে খুঁজে বের করব?'

'সেটা আপনার সমস্যা।

'এর জন্যে আমি কত টাকা পারিশ্রমিক পাব?'

'পাঁচ হাজার টাকা।'

'ওই তিন ক্যামেরায় তোলা ছবির দাম আপনার কাছে তিন হাজার?'

'নো। নট দ্যাট। হয়তো ওদেরও আলাদা টাকা দিতে হবে।'

'সেইজন্যে আপনার বাজেট জানতে চাইছি।'

'ধরুন, ছয় হাজার।'

'আমার পক্ষে কাজটা করা সম্ভব নয়।'

'কারণ?'

'অত কম টাকার জন্যে এমন ঝামেলা—।'

'কত টাকা হলে কাজটা করতে পারবেন?'

'পঞ্চাশ হাজার।'

'মাই গড! আর ইউ ম্যাড?'

'নো স্যার। ব্ল্যাক লেপার্ডের মেটিং দৃশ্য পৃথিবীতে আর কারও কাছে আছে কি না জানি না। না থাকার সম্ভাবনাই বেশি। সেক্ষেত্রে আপনি ছবিগুলোর বিনিময়ে কয়েক লক্ষ টাকা রোজগার করবেন। আমি কি পাগলের মতো কথা বলছি?'

'পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে আপনি কী করবেন?'

'সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।'

'আমি বোধহয় আন্দাজ করতে পারছি ইয়ংম্যান। প্রধানের জমিটার দাম পঞ্চাশ হাজার টাকা। তাই তো! বেশ, ইটস এ ডিল। ছবিগুলো নিয়ে আসতে পারলে আপনি প্রধানকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে হোমের নামে জমি ট্রান্সফার করতে পারবেন। আর এই নিন, তিন হাজার টাকা। এটা আপনার ইনসিডেন্টাল এক্সপেন্স।' পকেট থেকে তিরিশটা একশো টাকার নোট বের করে প্রদীপের সামনে রেখে ভদ্রলোক গলা পাল্টালেন, 'এবার কাজের কথায় আসি। জায়গাটা এখান থেকে সত্তর মাইল দূরে হলেও গ্যাংটক থেকে

মাইল পনেরো উত্তরে। এর খুব কাছাকাছি জনবসতির নাম টিংলা। টিংলা পর্যন্ত একটা বাস যায় দিনে একবারই। যে জায়গায় ব্ল্যাক লেপার্ড দুটোকে দেখা গিয়েছিল তার বর্ণনা আমি পাইনি। সেটা আপনাকেই উদ্ধার করতে হবে। আর এর জন্যে আপনি দুদিন সময় পাবেন।'

'সরি স্যার। আগামীকাল গ্যাংটক পৌঁছতেই দুপুর হয়ে যাবে। আমি অন্তত তিনদিন সময় চাইছি। তিনটে পুরো কাজের দিন।' টাকাগুলো তুলে নিল প্রদীপ।

ভদ্রলোক পকেট থেকে কার্ড বের করলেন, 'এইটে আমার নিজস্ব টেলিফোন। আমি না থাকলে রেকর্ডার আপনার পাঠানো ম্যাসেজ রেকর্ড করে রাখবে।'

'ও কে স্যার।' প্রদীপ উঠে দাঁড়াল। ভদ্রলোক হাসলেন। মাথা নেড়ে প্রদীপ যখন দরজার কাছে পৌঁছে গিয়েছে তখন ভদ্রলোক বললেন, 'আমি এক প্রোডাক্টে বিশ্বাস করি। চেষ্টা করেছিলাম তবু হয়নি এসব কথার কোনও মূল্য আমার কাছে নেই।'

প্রদীপ নীরবে মাথা নেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

মতিলাল তার বিছানায় শুয়েছিল। আজকের বিকেলের ঘটনার পর থেকে ওর কেবলই মনে হচ্ছিল বেঁচে থেকে কোনও লাভ নেই। স্বামী হয়ে স্ত্রীকে কন্ট্রোল করতে পারেনি সেটা এক জিনিস, অনেকেই পারে না। স্ত্রীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় অনেকের। কিন্তু চোখের সামনে অন্য পুরুষের হাতে মার খেয়ে সুভদ্রা যেভাবে কেঁচো হয়ে গেল তা দেখার পর বেঁচে থেকে কী লাভ। মার খাওয়ার পর সুভদ্রা যদি চিৎকার করে তার সাহায্য চাইত তা হলে সে ছুটে যেত। তা না করে ও ওই লোকটার সঙ্গে ভেতরে ঢুকে গিয়ে দরজা বন্ধ করল—এর শাস্তি ওকে পেতেই হবে। সামনের মাস থেকে একটা পয়সাও দেবে না সুভদ্রাকে। সুভদ্রা যদি এখানে এসে ঝগড়া করে তা হলে সে হাত চালাবে। জীবনে কখনও মেয়েমানুষের শরীরে হাত তোলেনি সে, এবার তুলবে। ওই মেয়েকে বাঁচাবার জন্যে সে আগবাড়িয়ে গিয়েছিল বলে এখন আফসোস হচ্ছিল। এই সময় দরজায় শব্দ হল।

দরজা খুলতে ইচ্ছে করছিল না কিন্তু দ্বিতীয়বারের শব্দের সময় চাপা নারীকণ্ঠ কানে এল। অতএব উঠতে হল মতিলালকে। দরজা খুলতে ছিটকে ভেতরে চলে এল সুজাতা। মতিলাল দেখে পুলকিত হল। ওর কাঁধে সেই তিব্বতি ব্যাগ। ঘরে ঢুকে চারপাশে তাকিয়ে সুজাতা বলল, 'এম্মা! কী করে রেখেছ তুমি? ঘরটা যে নরক হয়ে উঠেছে।'

মতিলাল বলল, 'তাতে কার কী?'

সুজাতা তার শরীর থেকে চাদরটা খুলে টেবিলের ওপর রাখল। ব্যাগটা চাদরের ওপর। মতিলাল দেখল মেয়েটা একটা আঁটো ব্লাউজ ছাড়া কিছু পরেনি।

'তোমার ঠান্ডা লাগে না?'

সুজাতা নিজের শরীরের দিকে তাকাল, 'ওমা! তোমার এসব নজরে পড়ে নাকি! শোনো, দিদি আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। বলেছে আমাকে জব্দ করতে যাকে ডেকে এনেছিলি তার কাছে যা। আমি বললাম, যাওয়ার হলে যাব। শুনে বলল, গিয়ে দ্যাখ না। একটা কাঠের পুতুল ছাড়া কিছু না। মেয়েমানুষ আর পাশবালিশের কোনও তফাত বোঝে না। তাই নাকি?'

মতিলাল জবাব দিল না। কথাগুলো কানে যাওয়া মাত্র সুভদ্রা সম্পর্কে তার বিদ্বেষ বাড়ছিল। সে নিজের ঘরে চলে গেল। তার খুব আফসোস হচ্ছিল। আজ দুপুরেও যদি সে সুভদ্রাকে প্রহার করত তা হলে সন্ধেবেলায় ওই দৃশ্য দেখতে হতো না।

সুজাতা চলে এল তার শোওয়ার ঘরের দরজায়, 'কী হল, বাকিটা নেই কেন?'

'ব্যাগটা এখানে আনো।'

'ব্যাগে কী ছিল?'

'সেটা আমি বুঝব।'

'চিনি, চা আর—!'

মতিলাল তাকাল। নিশ্চয়ই দেখেছে সুজাতা। আর দেখেছে বলে আপনির বদলে তুমি-তুমি করে কথা বলছে। সে নিশ্বাস চেপে বলল, 'আর?'

'পিস্তল। গুলিভরা পিস্তল। দিদি তোমার কাছ থেকে নিয়ে গিয়েছিল, না?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার কাছে পিস্তল কেন? দিদিকে মারবে বলে?'

'সেটা পারলে খুশি হতাম।'

'তুমি খুব হিংসেয় জ্বলছ। তার মানে তুমি দিদিকে ভালোবাস।'

'পিস্তলটা কোথায়?'

সুজাতা চলে গেল ওঘরে। ফিরে এল পিস্তল হাতে, কিন্তু দিল না। না দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আমাকে তোমার খারাপ লাগে?'

'আমি জানি না।'

'এখন থেকে আমি এখানে থাকব।'

'কেন?'

'আমার ইচ্ছে তাই। তুমি খেয়েছ?'

'হ্যাঁ।' মিথ্যে কথা বলল।

পিস্তলটা বিছানায় ছুড়ে দিয়ে চোখের আড়াল হল সুজাতা। চট করে ওটাকে তুলে নিয়ে চোখের সামনে আনল মতিলাল। না। মানুষ খুন করতে পারবে না সে। কিন্তু বদলা নিতে হবে। কীভাবে বদলা নেওয়া যায়? পিস্তলটাকে একটা খালি জুতোর বাক্সের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখল সে। এবং তখনই ভুটানি মদের বোতল হাতে সুজাতা ফিরে এল, 'এই হুইস্কি তুমি খাও?'

'না।'

'তা হলে রেখেছ কেন?'

'একজন দিয়েছিল তাই এনেছিলাম।'

গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে কাঁচা খেল সুজাতা, 'বড্ড কড়া!'

'জল ছাড়া খাচ্ছ!'

'তুমি খাও।'

'না।'

'আমার দিব্যি, একটু খাও।'

সুজাতার মুখের দিকে তাকিয়ে মতিলালের হঠাৎ যেন অন্যরকম লাগল। সে

সুজাতার বাড়ানো গ্লাসটা নিয়ে মুখে ঢালল। সঙ্গে-সঙ্গে কান গরম, গলা জ্বলতে লাগল। প্রথম ধাক্কা কমে গেলে শরীরে যেন আগুন ছড়াল। সুজাতা দ্বিতীয়বার গ্লাসে ঢেলে নিজের গলায় ঢালল। ঢেলে আর-এক পেগ এগিয়ে দিল। মতিলাল বলল, 'না। আর না।'

'কেন?'

'আমার অভ্যেস নেই।'

'কী হবে খেলে? বাড়িতেই তো আছ। আমি আছি।'

অতএব দ্বিতীয় গ্লাস মুখে ঢালল মতিলাল। তার শরীরে এখন গরম বাতাস পাক খাচ্ছে। গ্লাস-বোতল একপাশে সরিয়ে রেখে সুজাতা জামার বোতামে হাত দিল। একটু বাদে মতিলালের মনে হল এমন পেলব নারী-শরীর সে কখনও দেখেনি। দু-হাতে সুজাতাকে জড়িয়ে ধরে ওর ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরল সে। সুজাতা বলল, 'আঃ আস্তে। দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।'

সমস্ত শরীরে ঝড়। বিছানায় দুটো শরীর যখন পরস্পরকে জানতে-জানতে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে তখন সুজাতা বলল, 'দিদি মিথ্যে কথা বলেছে।'

'ও মিথুক।'

'তুমি আমাকে বিয়ে করবে?' দু-হাতে মতিলালকে আঁকড়ে ধরেছিল সুজাতা।

'আমি বদলা নেব।'

'কীসের বদলা?'

উত্তর দিতে পারল না মতিলাল। উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা সে হারিয়ে ফেলছিল, কিন্তু সেই মুহূর্তেই বাড়িটাকে চমকে দিয়ে বাইরের দরজার বেলের বোতাম টিপল কেউ। শব্দটা মতিলালের নার্ভে আঘাত করতেই সমস্ত উত্তেজনা উধাও। সুজাতা নিচুস্বরে বলল, 'বাজাক। মনে হচ্ছে দিদি এসেছে।'

'ও না।'

'কী করে বুঝলে?'

'ও এভাবে বেল বাজায় না।'

'বাব্বা! বেল বাজানোর আওয়াজেও মানুষ চিনতে পারো নাকি তুমি। যাও, দ্যাখো।' সুজাতা বিছানায় পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল। ওর উন্মুক্ত শরীরের দিকে তাকিয়ে এই ঘর ছেড়ে যাওয়ার একটুও ইচ্ছে হচ্ছিল না মতিলালের। অনেক-অনেক দিনের পর সে যেন এক নতুন স্বাদ পাচ্ছিল একটু আগে। যে স্বাদ সুভদ্রা তাকে এক মুহূর্তের জন্যে কখনও দেয়নি।

নিজেকে ভদ্রস্থ করে দরজা খুলতেই দুটো লোককে দেখতে পেল মতিলাল। সামনে যে দাঁড়িয়ে আছে সে বেশ হ্যান্ডসাম, সিনেমার নায়কের মতো দেখতে। পিছনের লোকটা বেঁটে কিন্তু বোঝা যায় শক্তিশালী। বাড়ির সামনে একটা মোটরবাইক দাঁড়িয়ে আছে।

মতিলাল জিজ্ঞাসা করল, 'কী চাই?'

'আপনার নাম মতিলাল?' সামনের লোকটি জিজ্ঞাসা করল।

'জি হাঁ।'

'ভেতরে আসতে পারি?'

'কিন্তু আমি যে এখন খুব ব্যস্ত।'

'এদিকে আমার যে সময় নেই। আমাকে এখনই গ্যাংটকে যেতে হবে।'

'গ্যাংটকে? এত রাত্রে?'

'সেটা আমার সমস্যা।'

'ও। আসুন। তাড়াতাড়ি বলবেন যা বলার।'

প্রদীপ এবং লিটন ঘরে ঢুকল। চারপাশে তাকিয়ে প্রদীপ একটা চেয়ারে গিয়ে বসল। মতিলাল বুঝতে পারছিল না এদের মতলব। তার মন পড়ে আছে পাশের ঘরে। সেখানে শুয়ে থাকা সুজাতা নিশ্চয় কথাবার্তা শুনে পোশাক পরে নিয়েছে। লোকদুটো আর সময় পেল না এখানে আসার।

'হ্যাঁ, বলুন!' মতিলাল বিরক্তি প্রকাশ করল।

'মতিলালজী। আজ সকালে আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। আমি খুবই দুঃখিত। সেই সময় আপনাকে আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটু ধাক্কা দিয়ে ফেলেছিলাম যার ফলে আপনার এবং আমার, দুজনের হাত থেকে কিছু জিনিস পড়ে যায়। এখন অনুগ্রহ করে যদি আমার জিনিসটা আমাকে ফেরত দিয়ে দেন তা হলে চলে যাই।' প্রদীপ শান্ত গলায় বলল।

'কী জিনিস পড়ে গিয়েছিল?' মতিলালের বুকে ড্রাম বাজতে লাগল। তার চেহারাটা মনে পড়ল। ওপর থেকে দ্রুত নেমে আসা যুবকটি যে তার সামনে বসে আছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। প্রদীপ উঠল। হাঁটতে-হাঁটতে ঘরটা দেখল। মতিলালের চোখ তার ওপর ঘুরছিল।

প্রদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'আমি আপনার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করতে চাই। পিস্তলটা কোথায়?'

অস্বীকার করতে গিয়েও পারল না মতিলাল 'পিস্তলটা যে আপনার তার প্রমাণ কী?'

এই সময় লিটন বলে উঠল, 'এতো আজব চিড়িয়া। তোমাকে এখনও চেনেনি গুরু।'

প্রদীপ হাসল, 'প্রমাণ লোকে কোর্টে দেয়। শুনুন। আপনি একজন সাধারণ মানুষ। খবর পেলাম আপানর বউ পালিয়ে অন্যের সঙ্গে প্রেম করছে। পিস্তল নিয়ে আপনি কী করতে পারবেন? তার চেয়ে আমার জিনিস আমাকে দিয়ে দিন।'

'ওটা আমার কাছে আছে তা আপনাকে কে বলল?'

'শানবাহাদুর। এখন সে মাতাল হয়ে পড়ে আছে।'

ঠিক তখনই শোয়ার ঘরের দরজায় এসে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল সুজাতা। যতটা পোশাক সংক্ষিপ্তভাবে পরে নেওয়া সম্ভব তাই পরেছে সে। প্রদীপ দেখল মেয়েটাকে। সুন্দরী বলতে যা বোঝায় তেমন নয় কিন্তু মেয়েটার শরীর আছে আর সেটাকে ব্যবহার করতে জানে।

'আমার এই বাড়িতে পুলিশ সার্চ করে গেছে, কিছু পায়নি।'

'পুলিশ যাতে না পায় সেই ব্যবস্থা আপনি করেছিলেন। ওটা যে পুলিশের হাতে পৌঁছয়নি সেইজন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। তার জন্যে কত টাকা দিতে হবে?'

লিটন চাপা গলায় বলল, 'বস্, সময় নষ্ট করছ।'

পকেট থেকে দুশো টাকা বের করে টেবিলে রাখল প্রদীপ, 'দিন।'

মতিলাল আর পারল না। সেখান থেকেই চিৎকার করে বলল, 'সুজাতা, ভেতরের ঘরে খাটের নিচে জুতোর বাক্স থেকে পিস্তলটা বের করে ওকে দিয়ে দাও। ঝমেলা চুকে যাক।'

সুজাতা ঘরে ঢুকে যাওয়া মাত্র বাইরে গাড়ির শব্দ এবং হেডলাইটের আলো দেখা গেল। ওরা কিছু বুঝে ওঠার আগে থাপা কয়েকজন সেপাইকে সঙ্গে নিয়ে বাড়িতে ঢুকলেন। প্রদীপ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি এখানে?

থাপা দু পকেটে হাত ঢুকিয়ে বলল, 'আমি তোমাকে এত বোকা বলে ভাবিনি প্রদীপ। পিস্তলটার খোঁজে এখানে আসার আগে তোমার চিন্তা করার দরকার ছিল। আমার হাতে এতদিন কোনও প্রমাণ না থাকায় তোমাকে ছুঁতে পারেনি। আজ তুমি ফেঁসে গেলে।'

'আপনি আজ কী প্রমাণ পেয়েছেন?'

'ওকে সার্চ করো।' থাপা হুকুম দিতেই সেপাইরা এসে প্রদীপের শরীর হাতড়ে দেখল। লিটনকেও বাদ দিল না তারা। ওরা কিছু না পেতে থাপা মতিলালের সামনে গিয়ে দাঁড়াল, 'আজ তোর হাড় ভাঙব আমি। যা জিজ্ঞাসা করছি তার জবাব ঠিকঠাক দিবি। ও পিস্তলের খোঁজে এখানে এসেছে, তাই তো?'

মতিলালকে এখন হতবুদ্ধি দেখাচ্ছিল। কোনওরকমে মাথা নাড়ল সে, হ্যাঁ। থাপার মুখে হাসি ফুটল, 'গুড। পিস্তলটা দিয়েছ ওকে?' চুপ করে রইল মতিলাল। থাপা চিৎকার করল, 'কথা বল!'

'না। দিইনি।' মতিলাল শোওয়ার ঘরের দরজার দিকে তাকাল।

সেখানে কেউ নেই।

'কোথায় রেখেছ ওটাকে?'

'আমি রাখিনি।'

'কে রেখেছে? বাঁচতে চাও তো সত্যি কথা বলো।'

'আমি জানি না। কিছু জানি না।'

থাপার নজরে পড়ল কিছু টাকা সামনে পড়ে আছে। নোটগুলো তুলে সে গুনল, দুশো। এইসময় প্রদীপ বলল, 'আপনি মিছিমিছি সময় নষ্ট করছেন স্যার।'

'সেটা আমি বুঝব। তোমাদের এই জুড়িকে যদি হাজতে ঢোকাতে পারি—! এই টাকা কি তুমি দিয়েছ ওকে?'

'আপনি তো পিস্তল খুঁজতে এসেছেন। টাকার খোঁজ নিয়ে আপনি কী করবেন?'

কিছু বলতে গিয়ে থাপা চুপ করে গেল। তার চোখ মতিলালের ওপর। মতিলাল যেন অনেকক্ষণ থেকে বিপরীত দরজায় দিকে তাকিয়ে কিছু লক্ষ করার চেষ্টা করছে। থাপা চটপট শোওয়ার ঘরের দরজায় পৌঁছে গেল। ঘরে ঢুকেই সে চিৎকার করে উঠল, 'এই জানলা দিয়ে পালিয়েছে। কে ছিল এই ঘরে?'

খ্যাপা মোষের মতো বেরিয়ে এল থাপা, 'এই ঘরে মেয়েছেলে ছিল। মেয়েদের পোশাক পড়ে আছে বিছানার ওপর। কে ছিল?'

'আমার—আমার—।' মতিলাল ঢোক গিলল।

'তোমার বউ?' থাপা ধমকে উঠল।

'না স্যার। বউ না। বউ-এর বোন!'

'ও বাব্বা। শালির সঙ্গে লীলা করছিলে নাকি? অনেক গুণ আছে দেখছি। কিন্তু জানলা দিয়ে শালি পালাল কেন? পিস্তলটা ওই নিয়ে গেছে?'

'আমি জানি না স্যার, কিছু জানি না।'

থাপাকে এখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় দেখাচ্ছে। প্রদীপ এগিয়ে গেল, 'স্যার, আপনি যে কাজটা পাইয়ে দিয়েছেন সেটা করতে হলে আমাকে এখনই গ্যাংটকে রওনা হতে হয়। আপনি বিশ্বাস করুন, আমি পিস্তলটা পাইনি।'

কথাগুলো কানে গেল না যেন থাপার। মতিলালের দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'তোমার শালিকে আমি আজ রাত্রেই তুলে আনছি। তারপর তোমাদের মজা দেখাব।'

প্রায় ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেল থাপা তার দলবল নিয়ে। লিটন এতক্ষণ একপাশে সিঁটিয়ে ছিল, এবার বলল, 'চলো গুরু, কেটে পড়ি।'

প্রদীপ মতিলালের দিকে তাকাল। মতিলাল এখন দুহাতে মুখ ঢেকে বসে আছে। ওর শরীর কাঁপছে। প্রদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'এটা কী হল?'

'আমি বুঝতে পারছি না। ও কেন পালাল?'

'পালিয়ে দার্জিলিং-এর কোথাও থাপার হাত থেকে লুকিয়ে থাকতে পারবে না।' প্রদীপ ঘুরে দাঁড়াল, 'টাকাটা রইল। যদি পিস্তলটা আপনার হাতে আসে তাহলে ফিরে এসে ওটা নেব আমি।'

বাইরে বেরিয়ে এল সে, পিছনে লিটন।

এখন বেশ ঠান্ডা। আকাশ পরিষ্কার। অন্ধকার রাস্তায় মানুষজন নেই। লিটন বলল, 'শালা বহুৎ হারামি। আমি বদলা নেব।'

'কার কথা বলছিস?'

'শানবাহাদুর। ভাবলাম নেশার ঘোরে কথা বলছে, আউট হয়ে গেল। পয়সা দিলাম তবু আমরা চলে আসার পরেই পুলিশকে খবরটা দিয়েছে।'

'ছুঁচো মেরে এখন লাভ নেই। গ্যাংটকে পিস্তলটা সঙ্গে থাকলে ভালো হতো।' মোটরবাইকে উঠে পড়ল সে, 'কাল সকালের ফার্স্ট বাস ধরে গ্যাংটকে চলে আসবি, হোটেল ড্রিমল্যান্ডে গিয়ে খবর নিবি।' ইঞ্জিন চালু করল প্রদীপ।

'তুমি একা এতটা রাস্তা যাবে? আমি পেছনে বসি না।'

'না। একা যেতে আমার সুবিধে হবে।' মোটরবাইক চালু করল প্রদীপ। লিটন হাঁটতে শুরু করল বিপরীত দিকে। মোড় ঘুরতেই হেডলাইটের আলোয় একটা মূর্তিকে দৌড়ে মাঝখানে চলে আসতে দেখল প্রদীপ। আলোর বৃত্তে দাঁড়িয়ে যে মূর্তিটা হাত নাড়ছে সে স্ত্রীলোক।

কাছাকাছি আসতেই চিনতে পারল প্রদীপ। সে বাইকটাকে থামাতেই সুজাতা ছুটে এল কাছে, 'আমাকে বাঁচান। আপনার পায়ে পড়ি, আপনি আমাকে বাঁচান।'

'আমি কীভাবে বাঁচাব?'

'আপনি তো গ্যাংটকে যাচ্ছেন।'

'তোমাকে কে বলল?'

'আমি শুনেছি। বাড়িতে ঢোকার সময় আপনি জামাইবাবুকে বলেছিলেন। আপনি আমাকে গ্যাংটকে নিয়ে চলুন। ওখানে আমার এক পিসি থাকে। ওখানে গেলে এখানকার

পুলিশ আমাকে কিছু করতে পারবে না।'

'কাল সকালের বাস ধরে চলে যেও।'

'তার সুযোগই পুলিশ আমাকে দেবে না। আপনার পিস্তলটাকে বাঁচাতে গিয়ে এ আমি কী বিপদ ডেকে আনলাম।' কেঁদে ফেলল সুজাতা।

'পিস্তলটা বাঁচাতে গেলে কেন?'

'মনে হয়েছিল ওটা পেলে পুলিশ আপনাকে ছাড়বে না।'

'আমাকে তুমি চেনো না। আমাকে পুলিশ ধরলে তোমার কী?'

'আমি আপনাকে চিনি।'

'সে কি? কোথায় দেখেছ?'

'দেখেছি। দার্জিলিং-এই।'

'তুমি মিথ্যে কথা বলছ। তোমার জামাইবাবুকে বাঁচাতে চেয়েছিলে তুমি।'

'তা হলে পালাতাম না। জানলা দিয়ে পিস্তলটা ছুড়ে ফেলতাম বাইরে।'

'ওটা তোমার কাছে আছে?'

'হ্যাঁ।'

'আমাকে দাও।'

'না। আগে আপনি আমাকে গ্যাংটক নিয়ে যান, তারপর।'

'তোমাকে কীভাবে নিয়ে যাব? আমি তো এখনই বাইকে রওনা হচ্ছি।'

'বাইকের পিছনে বসে আমি যেতে পারব।'

'তোমার ঠান্ডা লাগবে। গায়ে তো বেশি জামা-কাপড় নেই।'

'লাগুক। তবু এখান থেকে যেতেই হবে।'

'ঠিক আছে। তুমি স্টেশনের সামনে গিয়ে দাঁড়াও। আমি পনেরো মিনিটের মধ্যে আসছি। সাবধান, পুলিশ যেন তোমাকে দেখতে না পায়।'

'আপনি আমাকে ফেলে চলে যাচ্ছেন না তো?'

প্রদীপ হাসল, 'তোমাকে ফেলে আমি চলে যেতে পারি, কিন্তু আমার পিস্তলটাকে নিয়ে যাওয়াটা খুব জরুরি।'

পনেরো মিনিট বাদে প্রদীপ যখন স্টেশনের পাশের রাস্তায় বাইক দাঁড় করাল তখন চারপাশে ঘন কুয়াশা। এতটা পথ মোটরবাইকে যাওয়ার সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে এসেছে সে। এপাশ-ওপাশে তাকাতেই অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল সুজাতা। তার দুই হাত বুকের ওপর। শীতে কাঁপছে সে। প্রদীপ ব্যাকসিটে রাখা ওভারকোট এগিয়ে দিল, 'এটা পরে নাও। টুপি, মাফলার আছে ওখানে। চটপট।'

কৃতার্থ হয়ে আদেশ মান্য করল সুজাতা। তারপর বাইকের পিছনে উঠে বসল। দার্জিলিং ছাড়িয়ে বাইক এগিয়ে যাওয়া মাত্র সুজাতা ফিসফিস করে বলল, 'পিস্তলটা নেবেন না?'

'গ্যাংটকে পৌঁছবার পর নেওয়ার কথা।'

সুজাতা হাসল। তারপর বলল, 'আপনি খুব ভালো।'

প্রদীপ জবাব দিল না। এ রকম তৈল মর্দন মানুষ কোনও বিপাকে পড়ে করে,

সেটা তার জানা আছে।

দার্জিলিং থেকে তিস্তাবাজার হয়ে কালিম্পংকে ডানদিকে রেখে মধ্যরাত্রে গ্যাংটকের দিকে ছুটে যাওয়াটা মোটেই আরামদায়ক নয়। কিন্তু প্রদীপ যাবতীয় প্রাকৃতিক প্রতিরোধকে উপেক্ষা করার চেষ্টায় ছিল। লিটনকে সঙ্গে না নিয়ে রওনা হওয়া ভুল হচ্ছিল সেটা কিছুটা দূর আসার পরই টের পেয়েছিল। এখন লিটনের বদলে সুজাতা পিছনে থাকায়, কোনও কথা না বলা সত্ত্বেও, তার মনে হচ্ছিল এই কষ্টকর যাত্রায় সে একা নেই। আর একটি মানুষের তপ্ত উপস্থিতি তাকে যথেষ্ট স্বস্তি দিচ্ছিল।

পাহাড়ি রাস্তায় সন্ধে ঘন হয়ে গেলে কেউ গাড়ি চালায় না। নিতান্ত বাধ্য না হলে কোনও গাড়িকে রাতদুপুরে এইসব পথে দেখা যায় না। একটানা যেতে-যেতে বাইক গরম হয়ে উঠেছে বেশ। প্রদীপ রাস্তার পাশে একটা সমান জায়গা পেয়ে বাইক দাঁড় করাল। নিচে পা দিতে গিয়ে বুঝতে পারল পায়ে ঝিঁঝি ধরে গেছে। সোজা হয়ে দাঁড়ানো যাচ্ছে না।

বাইক থেকে নেমে সুজাতা প্রথম কথা বলল, 'এখানে কেন?'

'ইনি বিশ্রাম চাইছেন।' প্রদীপ পায়ে সাড় আনার চেষ্টা করছিল, 'উঃ কী ঠান্ডা!'

'পায়ে কী হয়েছে?'

'বাঁ পা অবশ-অবশ লাগছে। এক নাগাড়ে—। ঠিক আছে।'

প্রদীপ সোজা হল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার ঠান্ডা লাগছে না?'

'লাগছে। সহ্য করা ছাড়া উপায় নেই।'

'এইভাবে এককথায় দার্জিলিং ছেড়ে চলে এলে, ওখানে কেউ চিন্তা করবে না?'

'আমার জন্যে কেউ চিন্তা করে না।'

'জামাইবাবু? দিদি?'

'দিদি তো মুক্তি পাবে। জামাইবাবু,' হাসল সুজাতা, 'আজকের আগে আমার দিকে ভালো করে কখনও তাকাননি। আজ. যে আমার মাথায় কী ঢুকল—!'

'নিজের বিপদ নিজে ডেকে আনলে!'

'ঠিক বলেছেন।'

'আমরা গ্যাংটকে পৌঁছে যাব ভোরের মধ্যে। ওইসময় পিসির বাড়িতে গেলে তিনি অবাক হবেন না? জানতে চাইবেন না কীভাবে এলে?'

'সেটাই তো স্বাভাবিক। একটা কিছু উত্তর দিতে হবে।'

'তুমি বিবাহিতা?'

'একসময় ছিলাম। এখন নই।'

প্রদীপ আর কথা বাড়াল না।

ওরা গ্যাংটকে ঢুকল যখন তখন শহর ঘুমন্ত। ইতিমধ্যে আকাশের চেহারা বদল হয়েছে। সিকিমের আকাশে এখন গুঁড়ি-গুঁড়ি মেঘ। সূর্যদেবের ওঠার কোনও আয়োজনই নেই। রাস্তার আলোগুলো বুড়ি ডাইনির চোখ হয়ে জ্বলছে। প্রদীপ গলা তুলে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় নামবে?'

'আপনি কোনদিকে যাচ্ছেন?' গলা তুলতে হল সুজাতাকেও।

'হোটেল ড্রিমল্যান্ড। বাড়ির কাছাকাছি না নামলে তোমার এখন একা হাঁটা ঠিক

হবে না। তুমি আমার সঙ্গে চলো। আলো ফুটলে পিসির বাড়িতে চলে যেও।'

'আপনার কোনও অসুবিধে হবে না তো?'

প্রদীপ জবাব দিল না।

হোটেল ডিমল্যান্ড কুলীন নয়। এর আগে দুবার গ্যাংটক এসে এখানেই উঠেছিল প্রদীপ। এই সময়ে কাউন্টারে লোক থাকার কথা নয় কিন্তু কয়েকজন ট্যুরিস্ট সাইট সিয়িং-এ যাচ্ছে বলে হোটেলের কর্মচারী জেগেছিল। ওদের দেখে লোকটা অবাক, 'আপনারা বাইকে করে এতটা রাস্তা এসেছেন? এই রাত্রে!'

প্রদীপ হেসে বলল, 'ঘর হবে?'

'সিওর। ডাবল বেড?'

লিটন আসবে দুপুরের আগেই। ওর জন্যে ব্যবস্থা রাখা দরকার।

প্রদীপ ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলল।

লোকটি চাবি নিয়ে দোতলায় উঠে ঘর খুলে দিয়ে বলল, 'পরে একসময় খাতাপত্তরের কাজ করে নেব। চা খাবেন?'

'সিওর। সেইসঙ্গে কিছু স্ন্যাক্স।'

লোকটা চলে গেলে সুজাতা জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি ডাবল বেড নিলেন কেন?'

এবার খেয়াল হল প্রদীপের। সুজাতা কি তাকে সন্দেহ করছে?

সে হাসল, 'নিলাম।'

'আপনি কী করে ভাবলেন এখানে আমি থাকব?'

'সারারাত ধরে আমার বাইকের পিছনে বসে আসবে এটাও তো কখনও ভাবিনি।'

'আমি যাচ্ছি।'

'বসো। আমার এক বন্ধু আসবে সকালের বাসে, যে আমার সঙ্গে তোমার জামাইবাবুর বাড়িতে গিয়েছিল। ব্যবস্থাটা তার জন্যে।' প্রদীপ বাথরুমে চলে গেল। গরমজলের কল খুলে মুখে দিল খানিকটা। আঃ, আরাম। বাইকের সাইড ক্যারিয়ারে যে অ্যাটাচিটা রয়েছে সেটা আনিয়ে নিতে হবে। দুদিন চলে যাবে এমন সব কিছু তাতে ঠাসা আছে।

বাইরে বেরিয়ে এসে সে বলল, 'তুমি তো এক বস্ত্রে এসেছ। এই মুহূর্তে আমিও তোমাকে সাহায্য করতে পারব না। তবু মুখটা ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে এসো।'

এগিয়ে যাওয়ার সময় নিচু গলায় সুজাতা বলে গেল, 'সরি।'

দুঃখিত হওয়াটা সন্দেহ প্রকাশের কারণে এটা বুঝেও না বোঝার চেষ্টা করল প্রদীপ। এখন একটু ঘুমিয়ে নেওয়া দরকার। সকাল আটটার মধ্যে বেরিয়ে কাজ শুরু করতে হবে। চা এল। চা আর বিস্কুট। তাড়াতাড়ি সেগুলো শেষ করে একটা বিছানায় লম্বা হল প্রদীপ। 'আমি আটটা পর্যন্ত ঘুমাব। ততক্ষণ কথা না বললে উপকার করা হবে।'

'তা হলে এটা রাখুন।' পিস্তলটা বের করে বিছানার ওপর রেখে সুজাতা বাথরুম চলে গেল।

সোওয়া আটটা নাগাদ ঘুম ভাঙল প্রদীপের। বিছানায় শুয়েই বুঝতে পারল সুজাতা ঘরে নেই। ও চোখ বন্ধ করল। মেয়েদের সম্পর্কে তার কোনও উন্নাসিকতা নেই। ঠিকঠাক

প্রেমে পড়ার মতো কোনও মেয়ের দর্শন সে এখনও পর্যন্ত পায়নি। মেয়েরা এসেছে জীবনে কিন্তু তারা মেয়ে বলেই প্রেমে পড়তে হবে এমনটা কখনও মনে হয়নি। কেউ-কেউ এসে শরীরের স্বাদ দিয়ে চলে গেছে এবং এই কারণে তার কোনও পাপবোধ নেই। সেইসব মেয়েরা এসেছিল স্বেচ্ছায়, চলে যাওয়ার ব্যবস্থা রেখে। আজ দার্জিলিং থেকে গ্যাংটকের দীর্ঘপথটা যে মেয়ে পাড়ি দিয়ে এল তার পেছনে বসে, এই হোটেলের বন্ধ ঘরে শুয়ে রইল পাশের বিছানায় সে নিশ্চয়ই তাকে এখন সাধু-সন্ন্যাসী ভাবছে।

প্রদীপ উঠল। এবং তখনই চোখে পড়ল পাশের বিছানার ওপর তার এনে দেওয়া ওভারকোট মাফলার এবং টুপি পড়ে আছে। সে বাথরুমের দরজা খুলে দেখল সেখানেও সুজাতা নেই। সে ওকে শহরে ঢোকার সময় বলেছিল আলো ফুটলে চলে যেতে। সেইমতো কাজ করেছে মেয়েটা। শুধু যাওয়ার সময় বলে যেতে পারত। প্রদীপ হাসল, সে নিজেই তো বিরক্ত করতে নিষেধ করেছিল।

সাড়ে আটটা নাগাদ প্রদীপ পথে নামল। বাইক নিয়ে সোজা চলে এল বাজারের কাছে যেখানে পরপর ট্যুরিস্ট অফিসগুলো রয়েছে। বেশিরভাগ বাস ইতিমধ্যে ট্যুরিস্টদের দ্রষ্টব্য জায়গা দেখাতে চলে গিয়েছে। কিছু বাস তৈরি হচ্ছে।

ঘণ্টাখানেক ধরে একের পর এক অফিসে ঘুরে প্রদীপ দেখল কোনও কাজের কাজ হচ্ছে না। কোনও অফিসই বলতে পারছে না কাল সিকিম-তিব্বত বর্ডারে কোন বাস গিয়েছিল। খোঁজ নিয়ে জানা গেল রেজিস্টার্ড ট্যুরিস্ট কোম্পানি ছাড়াও বেশ কিছু সংস্থা মিনিবাসে ট্যুরিস্টদের নিয়ে ওদিকে বেড়াতে যায়। নবম অফিস থেকে হতাশ হয়ে বেরিয়ে প্রদীপ যখন ভাবছে কী করা যায় তখন তার মনে পড়ে গেল। যে বাসটা গতকাল ওদিকে গিয়েছিল তার যাত্রীরা ব্ল্যাক লেপার্ডদের মেটিং দেখেছে। তিনজন ট্যুরিস্ট তার ছবি তুলেছে। এমন বিচিত্র ঘটনার কথা শহরে ফিরে এসে কেউ আলোচনা করবে না এমন হতেই পারে না।

সামনে দাঁড়ানো একটা বাসের দিকে তাকাল সে। কয়েকজন যাত্রী উঠেছে। ড্রাইভার নিচে দাঁড়িয়ে। সে এগিয়ে গেল, 'আচ্ছা, ব্ল্যাক লেপার্ড দেখা যায় বলে শুনেছি। কোন বাসে গেলে দেখার সুযোগ পাব বলতে পারেন?'

লোকটা অবাক চোখে তাকাল, 'ব্ল্যাক লেপার্ড?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আমি তো এ জীবনে দেখিনি। দেখা যায় কে বলল আপনাকে?'

'কালই একটা ট্যুরিস্টবাসের সবাই দেখেছে। টিবেটিয়ান বর্ডারের কাছাকাছি।'

'আমি তো শুনিনি। আপনাকে কি কমলাপ্রসাদ বলেছে এই গল্পটা?'

'না। কমলাপ্রসাদ কে?'

'ড্রাইভার। হিমালয়ান ট্যুরিজমের বাস চালায়। ওর কথায় কান দেবেন না। দিনকে রাত করার মতো মিথ্যে কথা ওর জিভে। একদিন তো এসে বলেছিল ইয়েতির বাচ্চাকে দেখেছিল। বেচারা নাকি পথ হারিয়ে কাঁদছিল। হাঃ হাঃ হাঃ।'

গল্পটা গল্পই হতে পারে। কিন্তু ড্রাইভার কাছাকাছি পুলিশ স্টেশনে খবর দিয়ে গিয়েছিল। সেই পুলিশ স্টেশনের খাতায় নিশ্চয়ই ড্রাইভারের পরিচয় পাওয়া যাবে। আর মিথ্যে হলে লোকটা পুলিশকে কি ভাওঁতা দেবার মতো সাহস পাবে?

হিমালয়ান ট্যুরিজমের অফিসে ঢুকে পড়ল প্রদীপ। টেবিলের ওপাশে একটি মাঝবয়সি সুন্দরী সিকিমিজ মহিলা কাগজপত্র দেখছিলেন, মুখ তুলে হাসলেন, 'গুডমর্নিং।'

'গুডমর্নিং। বসতে পারি?'

'সিওর। বলুন, আপনার জন্যে আমরা কী করতে পারি?'

ভদ্রমহিলা এখন একা অথচ 'আমরা' শব্দটি ব্যবহার করলেন। অর্থাৎ ইনি ট্যুরিস্টদের সঙ্গে এইভাবে কথা বলে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। প্রদীপ হাসল, 'ম্যাডাম, আপনার গলার হার একটু অদ্ভুত রকমের। কিছু মনে করবেন না, ওগুলো কি নীলমুক্তো?'

মহিলা এবার ছড়িয়ে হাসলেন, 'আপনার চোখ দেখছি জহুরির।'

'ধন্যবাদ। আপনাদের সংস্থায় কমলাপ্রসাদ নামে কোনও ড্রাইভার আছে?'

'কেন বলুন তো?'

'আমি শুনলাম গতকাল কমলাপ্রসাদ যে বাস নিয়ে ট্যুরে গিয়েছিলেন সেই বাসের যাত্রীরা ব্ল্যাক লেপার্ড দেখেছেন। ব্ল্যাক লেপার্ড ভারতবর্ষে দেখতে পাওয়া যায় না। এই ব্যাপারটা আমাকে বিস্মিত করেছে।'

'কমলাপ্রসাদ ব্ল্যাক লেপার্ড দেখেছে? কই আমরা তো একথা জানি না। এমন একটা খবর চেপে রাখার লোক ও নয়।'

'আপনি ওর ঠিকানাটা দিতে পারেন?'

প্রদীপ প্রশ্ন করতেই একটা রোগা বেঁটে লোককে অফিসে ঢুকতে দেখা গেল। ভদ্রমহিলা হাসলেন, 'কমলাপ্রসাদ, কালকে তুমি ব্ল্যাক লেপার্ড দেখেছ?'

'কালকে দেখিনি।'

'কবে দেখেছিলে?

'মাসখানেক আগে। সিনেমায়। প্যাসেঞ্জার লিস্ট দেখি।'

'এই ভদ্রলোক তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান।'

কমলাপ্রসাদ প্রদীপের দিকে তাকাল। প্রদীপ হাসল, 'আমার নাম প্রদীপ গুরুং। গতকাল আপনি টিবেটিয়ান বর্ডারে ট্যুরিস্টদের নিয়ে গিয়েছিলেন?'

'জী হ্যাঁ।'

'ওখানে ব্ল্যাক লেপার্ড দেখার পর পুলিশ স্টেশনে জানিয়েছিলেন?'

কমলাপ্রসাদ হেসে উঠল শব্দ করে, 'লোকে বলে আমি গল্প বানাই। কিন্তু আমাকে নিয়ে যে গল্প বানাতে পারে সে তো আরও বড় গুলবাজ।'

প্রদীপ হতাশ হল, 'আপনি কিছু দেখেননি?'

'না স্যার। দেখে থাকলে সেটা অফিসে এসে জানাতাম। না দেখে-দেখে গল্প বানিয়ে এখন আমি ক্লান্ত। সত্যি যদি দেখার মতো কিছু পেতাম, সেটা ব্ল্যাক লেপার্ড হোক অথবা ইয়েতি হোক, আমার চেয়ে খুশি কেউ হতো না।'

'আপনি গতকাল কোন রুটে গিয়েছেন?'

কমলাপ্রসাদ দেওয়ালে টাঙানো ম্যাপটার দিকে তাকাল। একটা স্কেল টেবিল থেকে তুলে সে দেখাল গ্যাংটক থেকে বেরিয়ে কোন-কোন রাস্তায় সে বাস নিয়ে ঘুরেছে। প্রদীপ উঠে দাঁড়িয়ে লক্ষ করল।

'সিকিম-টিবেট বর্ডারটা কোনদিকে?'

'এদিকে।' স্কেল সরাল কমলাপ্রসাদ।

'ওদিকে আপনাদের কোনও বাস গিয়েছিল?'

'না। ওখানে সাধারণত এভারেস্ট ট্যুরিজমের বাস যায়।'

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।'

এভারেস্ট ট্যুরিজমের অফিসে পৌঁছে প্রদীপ দেখল এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বসে আছেন। সরাসরি প্রশ্ন না করে প্রদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'আজ আপনাদের কোনও বাস তিব্বত বর্ডারে যাবে?'

'না।'

'গতকাল গিয়েছিল?'

'হ্যাঁ।'

'গতকাল যিনি বাসটা চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারি?'

'কেন বলুন তো?'

'ব্যাপারটা ব্যক্তিগত।'

'তা ব্যক্তিগত ব্যাপার যখন তখন অফিসে এসেছেন কেন? চন্দ্রনাথের বাড়িতে গিয়া দেখা করুন। যত্তসব ঝুটঝামেলা।'

'চন্দ্রনাথের বাড়িটা কোথায়?'

'জিজ্ঞাসা করে নিন। বাইরে অনেক লোক আছে তাদের জিজ্ঞাসা করুন।' লোকটা খেঁকিয়ে উঠল। প্রদীপের মনে হল এই চন্দ্রনাথের সঙ্গে লোকটির সম্পর্ক নিশ্চয়ই ভালো নয়। বাইরে বেরিয়ে আড্ডারত কিছু লোকের কাছে সে চন্দ্রনাথের খবর পেয়ে গেল। এখন এ সময় নাকি চন্দ্রনাথ বাড়িতে থাকার লোক নয়। তাকে পাওয়া যাবে হংলুর ভাটিখানায়। জায়গাটা কোথায় জেনে নিয়ে বাইকে উঠে বসল প্রদীপ। লোকটা যদি মাতাল হয় তা হলে গিয়ে কোনও লাভ হবে না।

হংলুর ভাটিখানা খুঁজে পেতে অসুবিধে হল না। এই সকাল পার হতে-না-হতেই সেখানে মাতালদের ভিড় জমে গেছে। প্রশ্ন করে করে চন্দ্রনাথের সামনে যখন পৌঁছল তখন নেশায় চোখ বন্ধ করে বসে আছে। লোকটার স্বাস্থ্য এখনও ভালো। চল্লিশের কাছাকাছি বয়স। মুখে খোঁচা দাড়ি দাঁড়িয়ে।

প্রদীপ ওর পাশে বসে জিজ্ঞাসা করল, 'ক'গ্লাস খেয়েছেন?'

চোখ না খুলে চন্দ্রনাথ জবাব দিল, 'এই প্রশ্নের জবাব আমি আমার বউকেও দিই না। তুমি কে?'

'আমি আপনার খোঁজে এভারেস্ট ট্যুরিজমে গিয়েছিলাম। বুড়োটা খুব খারাপ ব্যবহার করল!'

'করবেই! শালা আমাকে সহ্য করতে পারে না। গতকাল ফিরে এসে যেই বলেছি আজ আর বেরুতে পারব না অমনি ওর মেজাজ খারাপ হয়েছে। কেন রে শালা, আমি কি তোর বাপের চাকর যে রোজ-রোজ গাড়ি চালাব?' চোখ খুলে মাথা নাড়ল চন্দ্রনাথ। 'ঠিক কথা।'

'কিন্তু ভাই, আমার খোঁজে কেন?'

প্রদীপ বুঝল লোকটার মাথা পরিষ্কার আছে এখনও। সে বলল, 'কাল আপনি

বাস নিয়ে বর্ডারের দিকে গিয়েছিলেন?'

গিয়েছিলাম। কিন্তু ও ব্যাপারে আমি কিছু জানি না। পুলিশ?'

'না। আমি পুলিশ নই। আমি ধরে নিচ্ছি আপনি কিছু জানেন না। কিন্তু আপনার বাসে তিনজন ট্যুরিস্ট ছিল যারা ক্যামেরায় ছবি তুলেছে। ওঁদের চেনেন?'

'খাচ্চলে। কত লোক রোজ গ্যাংটকে বেড়াতে আসছে। তারা টিকিট কেটে বাসে ওঠে। আমি সেই বাস নিয়ে এখানে ওখানে যাই। তারা কে কী করে আমি চিনব কী করে?'

'ঠিক কথা। তবু মনে করে দেখুন, কিছু মনে পড়ে কি না।' প্রদীপ একটা কুড়ি টাকার নোট বের করে চন্দ্রনাথের সামনে রাখল। বাঁ-হাতে নোটটা তুলে নিয়ে চন্দ্রনাথ চোখ বন্ধ করল, 'ক্যামেরা কার-কার হাতে ছিল এখন মনে নেই। বিকেলে গ্যাংটকে ফিরে এসে যে যার হোটেলে চলে গেল। তবে একজন লোক খুব মোটা ছিল। আড়াইজন মানুষের মতো মোটা। অথচ মাথাটা ছিল আপেলের মতো গোল। বাস থেকে নেমে লোকটা একজনকে জিজ্ঞাসা করছিল 'হলিডে' হোটেলে যাওয়ার রাস্তাটার কথা। আমি একটু অবাক হয়েছিলাম। আসতে পারল অথচ যেতে পারছে না কেন?'

'ওই লোকটা ছাড়া আর কেউ?'

'একটা বিদেশি বুড়ি ছিল। খুব বকবক করছিল! ওই বুড়িই আমাকে বলেছিল থানায় খবর দিতে। ওখানে তো থানা নেই, একটা পুলিশ ফাঁড়িতে খবর দিয়ে এসেছিলাম।'

'ওই বুড়ি কোন দেশের?

'তা বলতে পারব না। বিদেশিনীদের আমার একরকম লাগে। তবে বুড়ি উঠেছে ট্যুরিস্ট লজে। কারণ ফেরার সময় ওই লজের সামনে ওঁকে নামিয়েছি।' চন্দ্রনাথ বলল।

'আপনার বাসে কাল কজন যাত্রী ছিল?'

'আটজন।'

রাস্তায় বেরিয়ে প্রদীপ নিজের বাইকের গায়ে হাত বোলাল। দুটো নাম পাওয়া গেল। বুড়ি ক্যামেরায় ছবি না তুললেও ক্যামেরাম্যানদের হদিশ দিতে পারেন। যাঁরা সবসময়ে টিকটিক করেন তারা অনেক কিছু মনে রাখেন। সে সোজা ট্যুরিস্ট লজে চলে এল।

ভদ্রমহিলা ঘরে ছিলেন। নিজেকে সাংবাদিক হিসাবে রিসেপশনে পরিচয় দিয়ে সে ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলতে চাইল। রিসেপশন ভদ্রমহিলাকে সেকথা জানাতে তিনি অপেক্ষা করতে বললেন। লাউঞ্জে চেয়ার সাজানো। তার একটায় বসল প্রদীপ। এখন ঘড়িতে যে সময় তাতে লিটনের ইতিমধ্যে এসে যাওয়ার কথা। কাজ প্রথম দিকে মোটেই এগোচ্ছিল না। কিন্তু চন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর মনে হচ্ছে আজ বিকেলেই দার্জিলিং-এ ফিরে যেতে সে পারবে। তারপর পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে সোজা হোমে চলে যাবে। অবশ্য যদি লোকটা টাকা দিতে ঝামেলা করে তাহলে মুশকিল। সে ঠিক করল ছবিগুলো লিটনের কাছে রেখে সে আগে বাংলোয় গিয়ে দেখা করবে। লোকটা যদি দু-নম্বরি করে তা হলে জীবনে ছবি পাবে না। প্রদীপ দেখতে পেল এক মধ্যবয়সিনী বিদেশিনী এদিক ওদিক তাকাতে-তাকাতে এগিয়ে আসছেন। মহিলার পরনে সাদার ওপর নীল বৃত্ত আঁকা সাধারণ গাউন।

প্রদীপ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'হ্যালো।'

ভদ্রমহিলা সামনে এসে দাঁড়ালেন। লম্বায় প্রায় পাঁচ ফুট নয়, দশ। মুখের চামড়া শুধু বলছে ওঁর বয়স হয়েছে কিন্তু শরীর এখনও মজবুত, 'ইয়েস?'

প্রদীপ বলল, 'আমার নাম প্রদীপ গুরুং। আমি একজন সাংবাদিক।'

'ও। এতক্ষণে খবরটা পেয়েছেন? বসুন-বসুন। আমার নাম লিসা।' ভদ্রমহিলা বসলেন। কিন্তু ওঁর মুখ আবার চলতে শুরু করল, 'এরকম একটা ঘটনা ঘটে গেল, পুলিশকেও জানানো হল কিন্তু কেউ যে মাথা ঘামাচ্ছে তা এতক্ষণ বুঝতে পারিনি। আসলে, কিছু মনে করবেন না, আপনাদের দেশের ব্যাপার-স্যাপারগুলো আমার মাথায় ঠিক ঢুকছে না।'

'আপনি কতদিন আছেন এখানে?'

'কালই চলে যাব। একা-একা এখানে যে কী বোরিং ব্যাপার। সময় কাটাবার কোনও ব্যবস্থাই নেই। অথচ কাঠমাণ্ডুতে কিন্তু অন্য আবহাওয়া।'

'ম্যাডাম, গতকাল আপনি ক্যামেরা নিয়ে গিয়েছিলেন?'

'কপাল খারাপ। আমার ক্যামেরাটা হঠাৎই বিগড়ে গিয়েছিল। নইলে ক্যামেরা ছাড়া আমি কোথাও এক পা যাই না। খুব দামি ক্যামেরা বলে এখানে সারাতে দিতে চাই না।'

'আপনার বাসে তিনজন লোকের হাতে ক্যামেরা ছিল। তাদের মনে আছে?'

'না। আমি তো সহযাত্রীদের দেখব বলে এখানে আসিনি। বাসের জানলা দিয়ে প্রকৃতির এত কিছু দেখার জিনিস ছেড়ে সহযাত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকব তেমন বয়স আমার নেই। তবু ওই লোকটা খুব বিরক্ত করছিল।'

'কোন লোকটা?'

'তোমাকে কী বলব। অনেক মোটা মানুষ আমি দেখেছি কিন্তু অমন মোটা কখনও দেখিনি। উঃ। শুনেছিলাম বেশি মোটা হয়ে গেলে মানুষের মন থেকে কুচিন্তা চলে যায়। এর তো পুরোমাত্রায় আছে। ও ছবি তুলেছিল। আর পাশের লোকটাকে অনবরত ক্যামেরা সম্পর্কে বক্তৃতা দিচ্ছিল।'

'সেই লোকটা কেমন?'

'আমি লক্ষ করিনি। একে মনে আছে কারণ ওই চেহারা আর দ্বিতীয়ত আমাকে ডিনার খাওয়াতে চেয়েছিল বলে।'

'আপনি একাই এসেছেন ম্যাডাম?'

'নিশ্চয়ই। সারা পৃথিবী একা ঘুরে বেড়াই আমি।'

'অনেক ধন্যবাদ ম্যাডাম।' প্রদীপ উঠে পড়ল।

'পুলিশ কোনও অ্যাকশন নিয়েছে?'

'না। স্পটে গিয়ে পুলিশ কিছুই দেখতে পায়নি।'

'তা পাবে কী করে? এমন অলস মানুষ আমি কখনও দেখিনি।'

বাইরে বেরিয়ে এসে একটা টেলিফোন বুথে ঢুকে এস টি ডি করল প্রদীপ। প্রথমবারেই লাইন পাওয়া গেল। এবং ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলে তিনিই রিসিভার তুললেন। 'স্যার আমি গ্যাংটক থেকে বলছি।'

'বুঝেছি।'

'আমি ট্যুরিস্টবাসটাকে খুঁজে বের করেছি।'

'গুড।'

'একজন ফটোগ্রাফারের হদিশ পেয়েছি। তার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।'

'হু ইজ হি?'

'এখনও নাম জানি না। ড্রাইভারের কাছে জানতে পেরেছি।'

'ড্রাইভার কে?'

'চন্দ্রনাথ লোকটার নাম। এভারেস্ট ট্যুরিজমের গাড়ি।'

'ঠিক আছে। ক্যারি অন।'

লোকটার নাম রণতুঙ্গা। এত মোটা মানুষ জীবনে দেখেনি প্রদীপ। রিসেপশনে খবর দিতে ঘরেই ডেকে পাঠিয়েছিল তাকে। কোনওরকম ভনিতা না করে প্রদীপ তাকে সরাসরি বলল, 'মিস্টার রণতুঙ্গা, আপনি টিবেটিয়ান বর্ডারে যে ছবিগুলো তুলেছিলেন সেগুলো আমার চাই।'

মাংসে এবং চর্বিতে লোকটার দুকান প্রায় ঢাকা। সেই অবস্থায় যেভাবে তাকাল তাকে অবাক হওয়া নিশ্চয়ই বলা চলে।

'এখানে বুঝি চাইলেই সব কিছু পাওয়া যায়?'

'তার মানে?'

'আমি তো অনেক কিছু চাইছি অথচ কিছুই পাচ্ছি না। একটা ক্যাসিনো নেই যে জুয়ো খেলব! এমনকী একটি ভালো মহিলা এসকর্ট পর্যন্ত পাচ্ছি না। আর আপনি এসে যেই বললেন ছবিগুলো চাই আর আমি দিয়ে দেব?'

প্রদীপ বুঝল লোকটা বোকা নয়। সে বলল, 'ওই ছবিগুলো নিয়ে আপনি কী করবেন?'

'যা ইচ্ছে তাই করতে পারি।'

'আপনি কটা ছবি তুলেছেন?'

'তোলার সময় হিসেব করিনি। তাছাড়া আমার ফিল্ম এখনও শেষ হয়নি।'

'আপনার পাশে আর এক ভদ্রলোক, খুব নামী ফটোগ্রাফার বসেছিলেন—।'

'কে বলেছে নামী ফটোগ্রাফার? লোকটা ক্যামেরার সি বোঝে না। ওর উচিত ইটশটে ছবি তোলা। অ্যাপারচার লেন্স সম্পর্কে কোনও আইডিয়াই নেই।'

'তাই নাকি?'

'ইয়েস। আমি একটু কথা বলেই বুঝতে পেরেছি।' রণতুঙ্গা বলল, 'ভদ্রলোক ব্যবসাপত্তর করেন। কলকাতায় তো ছবিই তোলেন না।'

'বাঙালি?'

'হতে পারে। ড্রিমল্যান্ড না কি একটা হোটেলে উঠেছে।'

'নামটা কী?'

'জিজ্ঞাসা করিনি। ওরকম নির্বোধ ফটোগ্রাফারের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে না।' রণতুঙ্গার হঠাৎ খেয়াল হল, 'আমার কথা আপনাকে কে বলল?'

'আপনাদের বাসে এক বিদেশিনী মহিলা ছিলেন। ওঁর নাম লিসা। উনি বলছিলেন

আপনার ক্যামেরা সেন্স খুব ভালো।'

'বলছিল? অথচ আমি যখন কথা বলতে গেলাম তখন খেঁকিয়ে উঠল।' গাল চুলকাল রণতুঙ্গা, 'শুনুন মশাই, আপনি কি পুলিশের লোক?'

'না। আমি একজন সাংবাদিক।'

'তা হলে খুব ভালোই হল। আমি যে ছবি তুলেছি, মানে আমার কাছে যে ওই ঘটনার ছবি আছে তা ভুলে যান। আমি জানি পুলিশ খবর পেলেই ফিল্মটা নিয়ে যাবে। আমিও ঝুটঝামেলায় জড়িয়ে যাব। আমার আজ সকালেই চলে যাওয়া উচিত ছিল। কাল ফিরে আসার সময় আমরা আলোচনা করেছিলাম পুলিশ জানতে পারলে এই ছবির জন্যে আমরা বিপদে পড়ব। আপনাকে বলছি, এই ছবি আমাদের পত্র-পত্রিকায় ছাপাতে চাই আমি।'

প্রদীপ হাসল, 'আমাদের দেশের পুলিশের মাথা ঘামানোর মতো বিষয় অনেক আছে, এটা একধরনের মানুষের কাছে খুব মূল্যবান হলেও আমাদের পুলিশ এ নিয়ে চিন্তিত হবে না।'

'সে কি?' রণতুঙ্গা অবাক হয়ে বলল।

'হ্যাঁ। আমি আপনাকে একটা অফার করছি। ছবিগুলোর জন্যে শ-পাঁচেক দিতে পারি।'

'অসম্ভব।'

প্রদীপের খুব ইচ্ছে করছিল এই সময় পিস্তলটা বের করতে। লোকটার গোল মুখের ওপর ওটা উঁচিয়ে ধরলে ফিল্ম না দিয়ে পার পাবে না। কিন্তু পরে চিৎকার-চেঁচামেচি করতে পারে। সে বাইকে চেপে এসেছে। হোটেল থেকে পুলিশে খবর দিলে ওঁরা তাকে ঠিক খুঁজে বের করবে। অতএব তাড়াহুড়ো নয়। ধীরস্থির হয়ে কাজটা করতে হবে।

প্রদীপ হাসল। 'ঠিক আছে। তা হলে একটা সাহায্য করুন। আপনাদের বাসে তৃতীয় একজন ক্যামেরাম্যান ছিলেন। তার কথা মনে আছে?'

'হ্যাঁ। লম্বা। খুব স্বাস্থ্য ভালো। রিটায়ার্ড আর্মি অফিসার। নাম জানি না।'

'কোন হোটেলে উঠেছেন?'

'তাও জানি না। তবে লোকটা আজকেও একবার ওই স্পটে যাবে বলেছিল।'

বাইরে বেরিয়ে এল প্রদীপ। তারপর পাবলিক বুথ থেকে ফোন করে রণতুঙ্গার কথা জানিয়ে দিল। এখন কেউ ফোন ধরেনি। অ্যানসারিং মেশিন জানাল তিনি বাড়িতে নেই। প্রদীপ ঘটনাটা বলে আশ্বস্ত করল। পরে আর-একবার চেষ্টা করবে ছবি পেতে।

ড্রিমল্যান্ডে ফিরে প্রদীপ দেখল লিটন রিসেপশনের সামনে মুখ কালো বসে আছে। তাকে দেখে উঠে এল। 'তুমি গুরু অবাক করলে!'

'কেন?'

'হোটেলে এসে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করতে বলল বেরিয়েছে। ঘরে যেতে চাইলাম কিন্তু ওরা চাবি দিল না। তুমি বলে যাওনি?'

'সরি লিটন, একদম খেয়াল ছিল না।' খারাপ লাগছিল প্রদীপের।

'কিন্তু তোমার ঘরে নাকি একজন মহিলা আছে?'

মহিলা?'

'তোমার সঙ্গে একই বাইকে এসেছে। তুমি মাইরি দার্জিলিং থেকে একা রওনা হলে, পথে আবার মহিলা জোটালে কোত্থেকে?'

'জোটাইনি, নিজেই জুটে গিয়েছিল, কিন্তু এখন সে চলে গেছে।' প্রদীপ রিসেপশনে গেল। 'এক্সকিউজ মি, এক বাঙালি ভদ্রলোক, কলকাতায় থাকেন, ব্যবসা করেন, কোন রুমে আছেন বলুন তো?'

'বাঙালি কোনও ভদ্রলোক তো এখন হোটেলে নেই স্যার।'

'গতকাল ছিলেন?'

'গতকাল? না স্যার।'

'কলকাতার কোন বিজনেস ম্যান?'

'হ্যাঁ। এস. কে. শর্মা। উনি একটু আগে শিলিগুড়ি চলে গিয়েছেন।'

'শিলিগুড়ি?'

'হ্যাঁ। আজ সন্ধেবেলার দার্জিলিং মেলে ওঁর ফার্স্টক্লাসে রিজার্ভেশন করা আছে।'

প্রদীপ অসহায়ের মতো তাকাল। লোকটা হাতছাড়া হয়ে গেল। এখন চেষ্টা করলে সে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে গিয়ে লোকটাকে ধরতে পারে কিন্তু এই মুহূর্তে গ্যাংটক ছেড়ে সে যায় কী করে? লিটনকে পাঠানো যায়। সে দূরে বসা লিটনের দিকে তাকাল। লিটন ইতিমধ্যে চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করেছে। না, ওকে একা পাঠালে কাজ হাসিল না করতে পারলে গায়ের জোর দেখিয়ে ফেলতে পারে। তার চেয়ে দার্জিলিং-এ ফোন করে ব্যাপারটা জানিয়ে দিলেই হয়। সে রিসেপশনিস্টকে বলল দার্জিলিং-এ একটা টেলিফোন করবে।

রিসিভার তুললেন তিনিই, 'হ্যালো।'

'স্যার, আমি প্রদীপ বলছি।'

'নতুন কোনও খবর?'

'হ্যাঁ স্যার। দ্বিতীয় ফটোগ্রাফারকে খুঁজে পেয়েছি।'

'সো নাইস অফ ইউ। থাপা আমাকে ঠিক লোক দিয়েছে। ওর নাম?'

'এস কে শর্মা। কলকাতায় বাড়ি, বিজনেসম্যান। এখন গ্যাংটকে নেই।'

'কোথায় গিয়েছে?'

'আজই শিলিগুড়ি রওনা হয়ে গিয়েছে।'

'কোনও ঠিকানা?'

'না স্যার। ঠিকানা নেই। কলকাতার ঠিকানা জোগাড় করতে পারি কিন্তু উনি দার্জিলিং মেলের ফার্স্টক্লাসের প্যাসেঞ্জার। আজকের ট্রেন।'

'ওঃ। তোমাকে আর শর্মাকে নিয়ে ভাবতে হবে না। এবার তিন নম্বর ফটোগ্রাফারকে খুঁজে বের করতে চেষ্টা করো।' লাইনটা ডেড হয়ে গেল।

লিটনকে নিয়ে ঘরে এল প্রদীপ। চাবি খুলে খাটে গড়িয়ে পড়ল সে। অত তাড়াতাড়ি যে কাজ উদ্ধার হবে তা কে ভেবেছিল। দুজনের সম্পর্কে তার দায়িত্ব অনেকটা শেষ। শুধু রণতুঙ্গার কাছ থেকে ফিল্মের রোলটা উদ্ধার করতে হবে। তিন নম্বর লোকটি

এক্স মিলিটারি ম্যান। সহজ হবে না ব্যাপারটা। লোকটা আজও ওই স্পটে গিয়েছে। চান্স পেয়ে আরও কিছু ছবি তোলার ধান্দা নিশ্চয়ই। যেন ছেলের হাতের মোয়া। লিটনকে বাথরুমে ঢুকে যেতে দেখল সে। এবং তখনই দরজায় শব্দ হল।

প্রদীপ বলল, 'কাম ইন।'

দরজা খুলল সুজাতা। প্রদীপ উঠে বসল, 'কী ব্যাপার?'

সুজাতার অবস্থা বেশ উদভ্রান্ত। বোঝাই যাচ্ছে সারারাতের কষ্টকর বাইক-যাত্রার পর সে একটুও বিশ্রামের সুযোগ পায়নি। সুজাতা দুর্বল গলায় বলল, 'আমি আসতে পারি?'

'নিশ্চয়ই।' প্রদীপ খাট থেকে নেমে দাঁড়াল।

ঘরে ঢুকল সুজাতা। তারপর এগিয়ে গিয়ে ধপ করে বসে পড়ল চেয়ারে।

'কী হয়েছে? পিসির দেখা পেয়েছ?'

'না। পিসি শিলিগুড়িতে চলে গিয়েছে। বাড়ি তালা বন্ধ।'

'ও। এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

'আমার এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলাম। ওর স্বামীর সঙ্গে গোলমাল, আমাকে থাকতে দিতে ভরসা পেল না। আমি এখন কী করি? কোথায় যাই। আমার সঙ্গে টাকাকড়িও নেই।' দুহাতে মুখ ঢাকল সুজাতা। ওর শরীর কাঁপছিল।

বেল বাজিয়ে বেয়ারাকে ডাকল প্রদীপ। লোকটা এলে তিনটে গরম চা আর স্যান্ডউইচ আনতে বলল। তারপর সুজাতার দিকে তাকাল, 'আর যেখানেই যাও নিশ্চয়ই দার্জিলিং-এ যাবে না!'

সুজাতা মুখ তুলে তাকাল, কিছু বলল না। কিন্তু ওর দুটো চোখের দিকে তাকিয়ে প্রদীপের মায়া হল। হঠাৎই মেয়েটার অসহায়ত্ব বড় হয়ে দেখা দিল তার কাছে।

সে হুকুম করল, 'উঠে দাঁড়াও।'

চোখের দৃষ্টি পালটাল সুজাতার। তাতে প্রশ্ন।

এগিয়ে গিয়ে তার হাত ধরে দ্বিতীয় খাটের কাছে নিয়ে এল প্রদীপ। সেখানে বসিয়ে দিয়ে বলল, 'শুয়ে পড়ো। টেক রেস্ট। খাবার এলে উঠে খেয়ে নিও। তুমি ঘুমাও যতক্ষণ ইচ্ছে। না, যা বলছি তাই করো। আমি রেগে গেলে খুব খারাপ লোক হয়ে যাই।'

সুজাতার চোখে এবার স্বস্তি এল। ধীরে-ধীরে সে বিছানায় শুয়ে পড়তেই প্রদীপ তার শরীরের ওপর কম্বল টেনে দিল। দার্জিলিং-এর সন্ধেবেলায় যখন ও মতিলালের বাড়িতে এসেছিল তখন সামান্যই শীতবস্ত্র পরেছিল। তাড়াহুড়োতে পালিয়ে আসার সময় তার কিছুটা মতিলালের শোয়ার ঘরে ফেলে আসায় এখন অবস্থা বেশ কাহিল। ফলে কম্বলের আরাম এবং অনেকক্ষণ বাদে শোওয়ার আরাম পেয়ে সুজাতার চোখ জুড়ে এল। ব্যাপারটা লক্ষ করে প্রদীপ কম্বলটাকে আর-একটু টেনে দিতেই বাথরুমের দরজা খুলে বেরিয়ে এল লিটন, 'গুরু আমি শালা কানে বেশি শুনছি।'

'তাই নাকি?' প্রদীপ নির্লিপ্ত গলায় বলল।

'সত্যি বলছি। আমার মনে হচ্ছিল এই ঘরে মেয়ে কথা বলছে। যাক গে, আমি এখন পুরো ফিট। এখন হুকুম করো কী করতে হবে।'

'গ্যাংটক শহরটায় ঘুরে বেড়াও, আর কী করবে!'

রেগেমেগে কিছু বলতে গিয়ে বিছানার দিকে নজর যেতেই হকচকিয়ে গেল লিটন। কম্বলে মোড়া থাকায় শরীরের কোনও অংশ সে দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু অনুমান করতে অসুবিধে হচ্ছিল না। প্রদীপের দিকে তাকিয়ে সে নিঃশব্দে জানতে চাইল কে শুয়ে আছে? প্রদীপ বলল, 'যার কথা জিজ্ঞাসা করছিলি সে। বেচারা কাল সারারাত ঘুমায়নি, সকাল থেকে রাস্তায় ঘুরেছে, খুব টায়ার্ড।'

'টায়ার্ড?' লিটন চোখ ছোট করল।

'তাই তো মনে হল।'

'ও কি এই ঘরে থাকবে?'

'ঠিক করেনি এখনও।'

'মেয়েছেলে এই ঘরে থাকলে আমি এখানে থাকব না।'

'সেটাই তো স্বাভাবিক।'

'তার মানে?'

'ঘরে দুটো খাট আছে। তৃতীয়জনের শোওয়ার ব্যবস্থা তো নেই।'

'উঃ। তাই বলে তুমি একটা উটকো মেয়েকে এই ঘরে শুতে দেবে?'

'মেয়েটা যাকে বলে উটকো তা নয়, কিন্তু আমি তোকে বলেছি এখনও ভাবিনি কী করব।'

এই সময় বেয়ারা চা এবং স্যান্ডউইচ নিয়ে এল। লোকটা চলে যাওয়ার পর প্রদীপ দ্বিতীয় বিছানার দিকে ঝুঁকে ডাকল, 'শুনছ? এই। চটপট চা খেয়ে নাও। শরীর ভালো লাগবে।'

সুজাতা কম্বল সরাল। বোঝা গেল সে একটুও ঘুমায়নি।

লিটনের চোখ বিস্ফারিত।

'আরে! একে তো আমি দেখেছি! কোথায় যেন দেখেছি!'

মাথায় হাত দিল সে।

প্রদীপ হাসল, 'কাল রাত্রে মতিলালের বাড়িতে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, পিস্তল আনতে গিয়ে পুলিশের ভয়ে হাওয়া হয়ে গিয়েছিল? ওরেব্বাস, তখন থাপার মুখটা একরকম হয়ে গিয়েছিল। অ্যাই, তোমাকে পেলে থাপা চিবিয়ে খেয়ে নেবে। এ জীবনে দার্জিলিং-এ যেও না।' তারপর প্রদীপের দিকে তাকাল লিটন, 'ও তোমার সঙ্গে মোটরবাইকে এতটা পথ এসেছে?'

'হ্যাঁ। তুই চলে যাওয়ার পর ওর দেখা পেয়েছিলাম।'

'এলেম আছে। আরে হাঁ করে দেখছ কী, খেয়ে নাও।' স্যান্ডউইচের প্লেট এগিয়ে দিল লিটন, 'পেটে কিছু পড়লে তবেই ঘুম আসবে।'

সুজাতা কথা না বলে খাবার এবং চা খেয়ে আবার শুয়ে পড়ল। ওরা ধীরেসুস্থে চা খেয়ে ঘরের বাইরে চলে এল। লিটন বলল, 'মেয়েটাকে নিয়ে এখন কী করবে গুরু?'

'একটা লোকের কাছে তোকে যেতে হবে। লোকটা গতকাল ওর ক্যামেরায় কিছু ছবি তুলেছে। মনে হয় ফিল্মটা এখনও ক্যামেরার মধ্যেই আছে। লোকটা উঠেছে হলিডে হোটেলে। সারাদিন ঘরে বসে থাকার লোক ও নয়। যদি ক্যামেরা নিয়ে বের হয় তাহলে

ওকে ফলো করে সুবিধেমতন ক্যামেরা ছিনিয়ে নিবি। যদি ঘরে ক্যামেরা রেখে বের হয় তাহলে ওটাকে হাতিয়ে নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু কেউ যেন টের না পায়।' লিটনের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে কথাগুলো বলল প্রদীপ। লিটন হাত নাড়ল, 'কিন্তু এই মেয়েটা কোথায় থাকবে?'

'আমি তোকে এতক্ষণ যা বললাম তা কানে ঢোকেনি?'

'ঢুকেছে। লোকটার নাম কী?'

'রণতুঙ্গা।' প্রদীপ বলল, 'লোকটা প্রচণ্ড মোটা। কিন্তু মারপিট করার দরকার নেই। লোকটা যদি পুলিশের কাছে যায় তাহলে যেন তোর নামে কমপ্লেন করার সুযোগ না পায়।'

'বুঝলাম। ছবিগুলো খুব দামি?'

'না হলে আমি গ্যাংটকে আসতাম না।'

'হলিডে হোটেলটা কোথায়?'

'এখান থেকে বেরিয়ে বাঁ-দিকের রাস্তাটা ধরে মিনিট পাঁচেক এগোলেই দেখতে পাবি। বড় হোটেল। সাবধানে কাজ করতে হবে।'

'ঠিক হ্যায়।'

'কোনও প্রমাণ না রেখে ক্যামেরা নিয়ে চলে আসতে হবে।' লিটন হাসল, 'কোনও ব্যাপার নয়। কিন্তু আমি থাকব কোথায়?'

'থাকতে হবে কি না এখনই বলতে পারছি না। কাজ হয়ে গেলে আজই দার্জিলিং-এ ফিরে যাব। না যেতে পারলে ঘর নেওয়া যাবে।'

'আমরা দার্জিলিং-এ ফিরে গেলে মেয়েটা কোথায় যাবে?'

'সেটা আমাদের দুজনের চিন্তার বিষয় নয়।'

'তুমি কি হোটেলে থাকছ?'

'না। আমি যেখানেই যাই ঠিক তিনটের সময় হোটেলে ফিরে আসব।'

অসহায় মেয়েদের জন্যে লিটনের সবসময় মায়া হয়। এজন্যে জীবনে কম ঝামেলা পোয়াতে হয়নি তাকে। কিন্তু এই মেয়েটাকে দেখে তার অসহায় বলে মনে হচ্ছিল। 'হলিডে' হোটেলের দিকে হাঁটতে-হাঁটতে সে মনে করার চেষ্টা করল। ওরা যখন মতিলালের বাড়িতে ঢুকে লোকটার সঙ্গে কথা বলছিল তখন ওই মেয়েটা বেডরুম থেকে বেরিয়ে এসে দরজায় কায়দা করে দাঁড়িয়েছিল। বন্ধুরা যাকে বলে খাব-খাব চেহারা, মেয়েটাকে তখন সেইরকম দেখাচ্ছিল। ওর শরীরে পোশাকও ছিল খুব অল্প। পুলিশ আসার আগে মেয়েটা পিস্তল আনতে ঘরে ঢুকেছিল এবং তারপর আর পাত্তা পাওয়া যায়নি। থাপা বলেছিল, ও জানলা দিয়ে পালিয়েছে। কেন পালাল? ওর যদি কোনও দোষ না থাকে তাহলে পালাতে গেল কেন? তারপর রাস্তায় গুরুর সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়াটাও অদ্ভুত ব্যাপার। আচ্ছা, ওরা ওই মতিলালের ঘরে যাওয়ার আগে মেয়েটা অত অল্প পোশাক পরে বেডরুমে কী করছিল? মতিলাল যদিও বলেছে মেয়েটা তার শালি হয়, তবু—। হঠাৎই লিটনের মনে হল সে মেয়েটাকে যতটা অসহায় বলে মনে করছে ততটা ও নয়। হয়তো সম্পূর্ণ উলটো। হয়তো গুরুকে ফাঁদে ফেলার জন্যে মেয়েটাকে ব্যবহার করছে কেউ। গুরুকে সাবধান করে দিতে হবে। এতটা পথ রাত্তিরবেলায় গুরুর পেছনে বাইকে বসে এসেছিল বলে

গুরুর একটু দুর্বলতা হতেই পারে। কিন্তু সে নিজে কখনও কোনও মেয়ের শরীরের প্রতি দুর্বল হয়নি। অসহায় বলে সাহায্য করতে গিয়ে ধাক্কা খেলেও ওই বদনাম কেউ দিতে পারবে না। গুরুর সব ভালো, শুধু—।

হলিডে হোটেলটা বেশ কেতাদুরস্ত। রিসেপশনে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে রণতুঙ্গার খবরও জানা যায় কিন্তু সেটা করা ঠিক হবে না। রিসেপশনিস্ট তার মুখ মনে রাখবে। পুলিশ যদি কখনও জিজ্ঞাসা করে তাহলে বর্ণনা দিয়ে দেবে। লিটন রিসেপশনের সামনে দিয়ে এমন গম্ভীরভাবে হেঁটে গেল যেন সে এই হোটেলেই থাকে। ভাগ্যিস কাউন্টারে এখন কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে, তাই রিসেপশনিস্ট তাকে খেয়াল করল না।

দোতলায় উঠে সে একটা বেয়ারাকে দেখতে পেল। লোকটা কার্পেট পরিষ্কার করছে ক্লিনার চালিয়ে। লিটন জিজ্ঞাসা করল, 'এতে ভালো পরিষ্কার হয়?'

'একরকম হয়।'

'তা হলে একটা কিনতে হবে।'

লোকটা মাথা নাড়ল, 'না সাহেব। এর চেয়ে ঝাড়ুই ভালো। এতে মন ভরে না।'

'তুমি অনেকদিন এখানে আছ?'

'হ্যাঁ। একেবারে গোড়া থেকে।'

'তা হলে তো অনেক লোককে চেন।'

'তা চিনি না! সব ফিল্মস্টারকে চিনি। অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে আমার ছবি আছে।'

'বাঃ। আচ্ছা, এখানে এক ভদ্রলোক আছেন, খুব মোটাসোটা, মিস্টার রণতুঙ্গা—!'

'খুব মোটা?'

'খুব।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ। দুশো ছয় নম্বর ঘর।'

লিটন হেসে এগিয়ে গেল। লোকটা আবার মেশিন চালু করল।

দুশো ছয় নম্বরের সামনে পৌঁছে লিটন দেখল দরজা বন্ধ। লোকটা ঘরেও থাকতে পারে। করিডোরে এখন কেউ নেই। কিন্তু এভাবে দাঁড়িয়ে থাকাও ঠিক নয়। গুরু বলেছে হয় লোকটাকে বাইরে রাস্তায় পেলে ক্যামেরা ছিনতাই করতে নয় ও ঘরে না থাকলে ভেতরে ঢুকে ওটা হাতিয়ে নিতে। এখন লোকটা ঘরে আছে কি না সে বুঝবে কী করে?

হঠাৎ ছেলেমানুষি বুদ্ধি মাথায় এল। সে জোরে-জোরে দুবার দরজায় শব্দ করে বেশ কিছুটা দূরে চলে গেল। ওই ঘরের দরজা যদি কেউ খোলে তাহলে সে কিছু জানে না এমন ভাব করে নিচে নেমে যাবে। লিটন লক্ষ করল কেউ দরজা খুলল না।

এইসব দরজায় ল্যা' কি লাগানো, বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই ভেতরে কেউ আছে কি না। কিন্তু ওই শব্দ কেউ উপেক্ষা করতে পারে না। হয় লোকটা খুবই ঘোড়েল, ঘাপটি মেরে পড়ে আছে, নয় ঘরেই নেই। পরক্ষণেই খেয়াল হল লোকটা ঘাপটি মেরে পড়ে থাকবে কেন? এমন কোনও ঘটনা তো ঘটেনি যে ও কাউকে ধরার জন্যে অমন করতে যাবে। তার চেয়ে সরাসরি গিয়ে নক করাই ভালো। লোকটা, রণতুঙ্গা না কী যেন নাম, দরজা খুললে বলবে, 'সরি, রুম ভুল হয়ে গিয়েছে।' অবশ্য গুরু তাকে বলেনি এভাবে দরজা নক করতে। তাকে বলা হয়েছে লোকটা বাইরে বের

হলে ফলো করে ক্যামেরা ছিনিয়ে নিতে, নয় ও ঘরে না থাকলে—। লিটন মাথা নাড়ল। ধরা যাক লোকটা সে আসার আগেই বেরিয়ে গেছে। কাউকে জিজ্ঞাসা না করলে সেটা জানা যাবে না। আর জিজ্ঞাসা করলে সাক্ষি থেকে যাবে। লিটন এগিয়ে গেল। নিজেকে বোঝাল, কখনও-কখনও পরিস্থিতি বুঝে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এখনই সেইরকম অবস্থা। সে দরজায় নক করল। পরপর তিনবার। একমাত্র মড়ার মতো ঘুমিয়ে না থাকলে ধরে নেওয়া যেতে পারে লোকটা ঘরে নেই। দ্বিতীয়বার নক করল সে। তারপর দুপাশে তাকিয়ে নিল। হোটেলে যারা আছে তারা দুপুরের এই সময়টায় নিশ্চয়ই বেড়াতে বেরিয়েছে। কর্মচারীদের বিশ্রামের সময় এখন। অতএব তার পোয়া বারো। সে পকেট থেকে একটা রিঙ বের করল। চাবি, ছুরি থেকে কী নেই ওই রিং-এ। এক নজরে তাকিয়ে সরু শক্ত মুখ বেঁকানো একটা তার বের করল লিটন। তারপর চাবির গর্তে ঢোকাল। তার গুরু অনেক ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত একথা সে মানে। কিন্তু কোনও-কোনও ব্যাপারে তার নিজের যে হাতযশ আছে সেটা প্রমাণ করার সুযোগ পেলে সে গর্বিত হয়। দুটো আঙুলের মাঝখানের তারটা যখন গর্তের ভেতর ঘুরছিল তখন তার চোখ হোটেলের করিডোরে পাক খাচ্ছিল। যদিও কার্পেট পাতা তবু কেউ এদিকে আসছে বুঝতে পারলেই তাকে এখান থেকে সরে যেতে হবে।

মৃদু শব্দ হল এবং দরজাটা খুলে গেল। চটপট তারটা বের করে রিঙ পকেটে ঢুকিয়ে নিয়ে দুপাশে দেখে নিয়ে দরজার পাল্লায় চাপ দিতেই সেটা খুলে গেল। ঘর এখন অন্ধকার। তার মানে লোকটা ঘরে নেই। এখন লোকটা সঙ্গে ক্যামেরা নিয়ে বের হলে ঘরে ঢুকে কোনও লাভ হবে না। নিঃশব্দে দরজা ভেজিয়ে দিতেই লকটা আওয়াজ করল। ভেতর থেকে খুলতে কোনও অসুবিধে নেই। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সে ঘরটাকে দেখার চেষ্টা করল। তারপর দেওয়াল হাতড়ে সুইচ খুঁজে পেয়ে আলো জ্বালাল।

ধক করে হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠেছিল তার। একরাশ আলো ঝাঁপিয়ে পড়তেই ও লোকটাকে দেখতে পেল। বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। চোখদুটো বিস্ফারিত। দুটো হাত দুদিকে ছড়ানো। এত মোটা মানুষ সে আগে দেখেছে কি না মনে করতে পারল না। লোকটা মরে গেছে। লিটন থরথর করে কেঁপে উঠল। নিশ্চয়ই মরে গেছে। মৃতরাই ওইভাবে তাকিয়ে থাকে। সে পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেল। লোকটার গলায় সরু কিছু চেপে বসার ছাপ। এমনভাবে বসেছিল যে গলার ওপরে গোল হয়ে কেটেছে এবং রক্ত উপচে পড়ে গলা লাল হয়ে গেছে। লোকটাকে কেউ খুন করেছে এবং সেটা বেশিক্ষণ আগে নয়।

প্রচণ্ড নার্ভাস হয়ে গেল লিটন। গ্যাংটকের এই আবহাওয়াতে বন্ধ ঘরেও কারও ঘাম হয় না, কিন্তু ওর কপালের চামড়া চকচক করে উঠল। কেউ লোকটাকে খুন করে গেছে, এখনই এই ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে যাওয়া উচিত। দরজার দিকে এগিয়ে যেতেই তার ক্যামেরার কথা মনে এল। লিটন দাঁড়াল। খাটের ওপর কিছু নেই। টেবিলের এক পাশে পড়ে রয়েছে ক্যামেরাটা। মৃতদেহের পাশ কাটিয়ে সে চলে এল কাছে। হাত বাড়াতে গিয়ে থমকে দাঁড়াতে হল তাকে।

ক্যামেরাটা খোলা পড়ে আছে। যে এসেছিল সে ফিল্মটা নিয়ে চলে গেছে। পাশের টয়লেটের দরজাটা আধ-ভেজানো। লিটনের কেমন সন্দেহ হল। কাঁধ দিয়ে

দরজা ঠেলতেই ভেতরটা দেখতে পাওয়া গেল। কেউ নেই। ওর মনে হয়েছিল সে আসতে আততায়ী ভেতরে লুকিয়ে থাকতে পারে। এইসময় টেলিফোন বেজে উঠল ঝনঝনিয়ে। শব্দটা এমনভাবে কাঁপিয়ে পড়েছিল যে প্রায় লাফিয়ে উঠেছিল লিটন। পকেট থেকে রুমাল বের করে সে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। টেলিফোনটা বেজেই চলেছে। ধীরে-ধীরে নব ঘোরাল লিটন। দরজা ঈষৎ ফাঁক করে করিডোরের কিছুটা দেখতে পেল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেও কাউকে যাওয়া আসা করতে না দেখে বাইরে পা রেখে দরজাটা চেপে দেওয়া মাত্র সেই লোকটাকে মেশিন নিয়ে এগিয়ে আসতে দেখল। লিটনের মনে হল তার শরীর থেকে সমস্ত রক্ত কেউ শুষে নিয়েছে। লোকটা মেশিন থামিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'দেখা হয়েছে?'

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল লিটন।

'আমার কাছে একদম ঠিকঠাক খবর পাবেন।' লোকটা আবার মেশিন চালু করতেই লিটন হাঁটতে লাগল। নিচে এসে দেখল রিসেপশন ফাঁকা। রিসেপশনিস্ট টেলিফোন কানে নিয়ে অপেক্ষা করছে। সে কোনদিকে না তাকিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল।

এখন কী করা যায়? খবরটা যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি গুরুকে দেওয়া দরকার। তিনটের আগে গুরুকে হোটেলে পাওয়া যাবে না। সেই মেয়েটা শুয়ে আছে ওখানে। তাছাড়া, আততায়ী যদি কাছাকাছি থাকে, যদি তার নজরে পড়ে সে ওই ঘরে ঢুকেছিল তাহলে নিশ্চয়ই এখন তাকে অনুসরণ করবে। সেক্ষেত্রে নিজের হোটেল চিনিয়ে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। লিটন উলটোদিকে হাঁটতে লাগল। এইরকম একটা বিপদ থেকে এমন সুন্দর বেরিয়ে আসা মানে তার কার্যক্ষমতা আরও বেড়েছে। গুরুর কাছে এই নিয়ে পরে গর্ব করতে পারবে। বারংবার পেছনে তাকাচ্ছিল লিটন। লোকজন হাঁটছে। তাদের মধ্যে যে কেউ একজন হত্যাকারী হতে পারে। ও হঠাৎ রাস্তা পালটাল। চোরা সিঁড়ি ভেঙে নিচের দিকে দ্রুত হাঁটতে লাগল। এ রাস্তা ও রাস্তা ঘুরে লিটন আচমকা একটা ছোটখাটো রেস্টুরেন্টে ঢুকে পড়ল।

একটা চেয়ারে বসে সে ডবল ডিমের অমলেটের হুকুম দিতেই সামনের চেয়ারে আওয়াজ হল। লিটন চমকে তাকাতে প্রদীপ বলল, 'একটা নয়, দুটো দিতে বল।'

'আরে, গুরু তুমি?' কোনওমতে নিজেকে সামলে লিটন হাঁকল, 'একটা নয়, দুটো অমলেট।'

'হোটেল থেকে বেরিয়ে দৌড়চ্ছিলি কেন?'

'তুমি কী করে দেখলে?'

'আমি ওই রাস্তা দিয়ে আসছিলাম, হঠাৎ তোকে দেখতে পেলাম। ফিল্ম এনেছিস?'

'না।' প্রদীপের কথায় বিশ্বাস হল না লিটনের। সে যাতে বিপদে না পড়ে সেইজন্যে পেছনে ছিল গুরু, এরকম ধারণা হল তার।

'গুরু, লোকটা খতম হয়ে গেছে?'

'সে কি?' অবাক হয়ে গেল প্রদীপ।

চারপাশে তাকিয়ে নিয়ে নিচু গলায় লিটন সমস্ত ঘটনা বলে গেল।

তারপর মন্তব্য করল, 'আমাদের আগে আর কেউ ওই ফিল্মের ধান্দায় গিয়ে লোকটাকে খুন করে এসেছে।'

'ওই ঘরে ঢুকতে তোকে কে-কে দেখেছে?'

'কেউ দ্যাখেনি।'

'ভালো করে ভেবে দ্যাখ।'

কার্পেট ক্লিনারের কথা বেমালুম ভুলতে চাইল লিটন, 'আমি ঠিক বলছি।'

'যদি কেউ দেখে তা হলে তোর উচিত এক্ষুনি দার্জিলিং-এ ফিরে যাওয়া।'

'দার্জিলিং-এ?' লিটন বিচলিত হল।

'হ্যাঁ। সেখান থেকে আজ রওনা হয়েছিস, রাতের মধ্যে ফিরে গেলে ওখানে কেউ জানতে পারবে না তুই এখানে এসেছিলি। এখানকার পুলিশ তোর বর্ণনা পেলেও কিছু করতে পারবে না।'

লিটন সজোরে মাথা নাড়ল, 'দূর। তোমাকে এখানে একা ফেলে আমি যেতে পারি না।' প্রদীপ লিটনের দিকে তাকাল। ওর বিশ্বাস হচ্ছিল না। লিটন কিছু একটা চেপে যাচ্ছে এখানে থেকে যাওয়ার লোভে। সেই ব্যাপারটা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তার ওপর। সেই দৃষ্টির সামনে লিটন ক্রমশ অস্বাচ্ছন্দ বোধ করল। হঠাৎ সে বলে বসল, 'এমন কিছু ব্যাপার নয়।'

'একটা লোক খুন হয়েছে। তার কাছে গতকাল আমি গিয়েছিলাম আজ তুই তার ঘরে ঢুকেছিলি। অতএব খুব সামান্য ব্যাপারও পরে বড় হয়ে উঠতে পারে।'

'আমি যখন ওর ঘর থেকে বের হই তখন একটা বুড়ো আমাকে দেখেছিল। লোকটা হোটেলের কার্পেট পরিষ্কার করে মেশিন দিয়ে। কিন্তু ওর কোনও সন্দেহ হয়নি।' লিটন বলল, 'তা ছাড়া, ও বেশি কথা বলে। আমার বর্ণনাও ঠিকঠাক করতে পারবে না।' তারপরই মনে পড়ে গেল কথাটা, 'গুরু, আমি যখন ওই ঘর থেকে চলে আসছিলাম সেইসময় হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠেছিল।'

'টেলিফোন?'

'হ্যাঁ। কেউ ওই লোকটাকে ফোন করেছিল।'

'না করলে তুই তাড়াতাড়ি বের হতিস না।'

'তার মানে?' লিটনের কপালে ভাঁজ পড়ল।

'ওটা আমিই করেছিলাম।'

খাওয়া শেষ হয়ে গেলে প্রদীপ বলল, 'ব্যাপারটা এবার গোলমেলে বলে মনে হচ্ছে। এই রণতুঙ্গা লোকটার কোনও শত্রুর এখানে থাকার কথা নয়। ও বেড়াতে এসেছিল।'

লিটন মাথা নাড়ল, 'আরে এটা তো সহজ ব্যাপার। ফিল্মটার জন্যে খুন হয়েছে লোকটা।'

'হ্যাঁ। ব্ল্যাক লেপার্ডের মেটিং দৃশ্য কত মূল্যবান যে তার জন্যে একটা লোককে খুন করা যায়? তা ছাড়া, এখানকার ট্যুরিস্ট ব্যুরো বলছে কেউ কখনও ব্ল্যাক লেপার্ডের কথা শোনেনি।'

'ব্ল্যাক লেপার্ড?'

'হ্যাঁ, কালো চিতা। যার ছবি তোলার জন্যে লোকটা মরে গেল। তার মানে আমরা ছাড়াও আরও একটা দল গ্যাংটকে এসেছে ওই ছবিগুলোর সন্ধানে। ব্যাপারটা দার্জিলিং-

এ জানানো দরকার।' প্রদীপ ঘড়ি দেখল।

চারটে নাগাদ ট্যুরিস্ট বাসগুলো সাধারণত ফিরে আসে। আজ দুপুরের পর থেকেই এখানে ঠান্ডাটা হঠাৎ বেড়ে গেছে। ঠান্ডা বাড়লে রাস্তায় লোক কমে যায়। প্রদীপ আর লিটন বাইক নিয়ে স্ট্যান্ডে অপেক্ষা করছিল। একটার পর একটা বাস ফিরছে। প্রদীপ যাত্রীদের লক্ষ করছিল। লোকটাকে দেখেই বোঝা যাবে যে মিলিটারিতে ছিল একসময়। মুখগুলো খুঁটিয়ে দেখে হতাশ হচ্ছিল সে।

কিছুক্ষণ আগে দার্জিলিং-এ টেলিফোন করেছে সে। একটা ব্যাপার তাকে কিছুটা চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। রণতুঙ্গার খুন হওয়ার খবরটা পেয়ে ভদ্রলোক কোনও প্রতিক্রিয়া দেখালেন না। শুধু বললেন, 'তোমার এখনও অনেক কাজ বাকি। ওই হোটেলের কাছাকাছি যেও না। আমি চাই না কোনও ঝামেলায় তুমি জড়িয়ে পড়ো।'

প্রদীপ বলেছিল, 'মনে হচ্ছে আমার কোনও অ্যান্টি পার্টি এখানে কাজ করছে।'

'হতে পারে। এখনও একজন ফটোগ্রাফারকে খুঁজে বের করতে হবে তোমাকে।'

'তাহলে আমার পঞ্চাশ হাজার টাকা?'

'তুমি পাবে।'

খটকা লাগছে দুটো জায়গায়। রণতুঙ্গার ছবি অন্য লোক নিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তার সঙ্গে কথার খেলাপ করছেন না ভদ্রলোক। উনি ইচ্ছে করলে টাকার অঙ্ক কমিয়ে দিতে পারতেন। হঠাৎ এই উদারতার মানে কী? দ্বিতীয়ত, এস. কে. শর্মা এখন শিলিগুড়িতে। আজ রাত্রে দার্জিলিং মেল ধরবে লোকটা। তার কাছে ছবি আছে। তাকে ধরলে দুজন ফটোগ্রাফারকে খুঁজে বের করা বাকি। আর উনি বললেন একজনের কথা। শর্মার দায়িত্ব কি উনি অন্য কাউকে দিচ্ছেন? দিয়ে থাকলে তো তাকে ওঁর পঞ্চাশ হাজার টাকা দেওয়ার কথা নয়। প্রদীপ কিছুই বুঝতে পারছিল না।

এইসময় এভারেস্ট ট্যুরিজমের একটা বাস ফিরে এল। যাত্রীরা নামছে। হঠাৎ প্রদীপের নজর পড়ল একজনের ওপর। লম্বা, মেদহীন শরীর। পরনে গরম স্যুট। বয়স হলেও সেটা বোঝা যায় না। গোঁফ বলে দিচ্ছে মানুষটি সাধারণ কাজকর্ম কখনও করেননি। কাঁধ থেকে চামড়ার স্ট্র্যাপে ক্যামেরা ঝুলছে। বাস থেকে নেমে গটগট করে হাঁটতে লাগলেন ভদ্রলোক।

প্রদীপ লিটনকে বলল, 'আমি এখন যার সঙ্গে কথা বলব তুই তাকে ফলো করে দেখে আসবি কোন হোটেলে উঠেছে এবং কতদিন সেখানে থাকার কথা। কাজটা সাবধানে করবি।' লিটনের জবাবের জন্যে অপেক্ষা না করেই প্রদীপ এগিয়ে গেল।

পিছন থেকেই বোঝা গেল এই বয়সেও ভদ্রলোক ভালো শক্তি রাখেন। প্রদীপ একেবারে পৌঁছে বিনীত স্বরে বলল, 'এক্সকিউজ মি।'

ভদ্রলোক দাঁড়ালেন, গম্ভীর গলায় বললেন, 'ইয়েস।'

'আমার নাম প্রদীপ গুরুং। কলকাতার একটা সংবাদপত্রের লোকাল করেসপন্ডেন্ট।'

'আচ্ছা।'

'আমি বিরক্ত করছি বলে দুঃখিত। আপনি গতকাল সিকিম-টিবেট বর্ডারে গিয়েছিলেন। আবার আজও সেখানে গেলেন। এই ব্যাপারে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।'

ভদ্রলোকের কপালে ভাঁজ পড়ল, 'আমি গতকাল গিয়েছিলাম আপনি কী করে

জানলেন?'

'এটা আমি জেনেছি। আসলে আমি ওই ব্ল্যাক লেপার্ডের সম্পর্কে কৌতূহলী।'

'ব্ল্যাক লেপার্ড?'

'হ্যাঁ। গতকাল তো আপনারা ওখানে ব্ল্যাক লেপার্ড দেখেছেন।'

'কে দেখেছে জানি না, কিন্তু আমি তো দেখিনি।'

'স্যার, আমি শুনেছি গতকাল একটা ট্যুরিস্টবাসের যাত্রীরা ওখানে ব্ল্যাক লেপার্ডের মেটিং দৃশ্য দেখেছেন। ওই অঞ্চলে ব্ল্যাক লেপার্ড আছে বলে কেউ কখনও শোনেনি। বুঝতেই পারছেন খবরটা খুব চাঞ্চল্য তৈরি করবে।'

'ইয়ং ম্যান! আপনাকে ওই ব্ল্যাক লেপার্ডের গল্পটা যে শুনিয়েছে তার বাসে আমি ছিলাম না এটুকুই শুধু বলতে পারি।'

'গতকাল আপনি যে বাসে ছিলেন তাতে আরও দুজন ফটোগ্রাফার ছিলেন?'

'হ্যাঁ। এই খবরটা ঠিক। কারণ আমি আর কারও হাতে ক্যামেরা দেখিনি।'

'একজন বয়স্কা বিদেশিনী ছিলেন?'

'হ্যাঁ। বর্ডারে যাওয়ার জন্যে তাঁর কথা চেকপোস্টে বলতে হয়েছিল।'

'আর আপনি বলছেন ওখানে কোনও ব্ল্যাক লেপার্ড দেখেননি?'

'না।'

'আপনি কোনও ছবি তোলেননি?'

'হ্যাঁ। ছবি তুলেছি। সেই ছবির রোল শেষ করতে আজ আবার ওই স্পটে গিয়েছিলাম। ওটা প্রিন্ট না করা পর্যন্ত আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয় কী ছবি তুলেছি। শুধু আপনাকে বলতে পারি, গতকাল ওখানে একটা মার্ডার হয়েছিল।'

'মার্ডার?'

'হ্যাঁ।' ভদ্রলোক আর দাঁড়ালেন না।

সঙ্গে-সঙ্গে প্রদীপের দুটো পা কনকন করে উঠল। তার মনে পড়ল রণতুঙ্গা তাকে দেখে পুলিশ কি না জানতে চেয়েছিল। সেই মেমসাহেব পুলিশ সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন। সে দেখল ভদ্রলোক রাস্তার বাঁকে চলে গেছেন এবং তাঁর কিছুটা পেছনে লিটন হাঁটছে।

মোটরবাইকের কাছে ফিরে এসে সমস্ত ব্যাপারটা নতুন করে ভাবতে চাইল প্রদীপ। সে প্রথমে চন্দ্রনাথের কাছে গিয়েছিল যে ওই ট্যুরিস্ট বাস চালিয়ে নিয়ে গিয়েছে। লোকটা একবারও তাকে বলেনি যে ব্ল্যাক লেপার্ড দেখেছে। বরং ব্যাপারটা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। ওর কাছ থেকে খবর পেয়ে সে গিয়েছিল বিদেশিনী মহিলা লিসার কাছে। লিসাও একবারও বলেননি ব্ল্যাক লেপার্ডের কথা। কিন্তু তিনি খুব উত্তেজিত ছিলেন। ওঁর কাছ থেকে যায় রণতুঙ্গার কাছে। রণতুঙ্গা পুলিশের ভয়ে ভীত ছিল কিন্তু ব্ল্যাক লেপার্ড শব্দ দুটো ওর মুখ থেকেও শুনতে পায়নি সে। বরং রণতুঙ্গা এমন কিছুর ছবি তুলেছিল যা সে নিজে খবরের কাগজে ছাপতে চায়। আর এই সব মানুষের সঙ্গে কথা বলার সময় প্রদীপ ধরেই নিয়েছিল এঁরা ব্ল্যাক লেপার্ড দেখে এসেছেন। ওঁদের ওই ব্যাপারে সরাসরি প্রশ্ন করার কথা একবারও তার মাথায় আসেনি।

মোটরবাইক চালু করে ট্যুরিস্ট লজে চলে এল প্রদীপ। গিয়ে শুনল লিসা দুপুরে বেড়াতে বেরিয়েছেন, একাই। ভদ্রমহিলার দেখা পেতে তাকে অপেক্ষা করতে হল

অনেকক্ষণ। লিসা যখন ফিরছেন তখন তাঁর হাতে একটা বড় প্যাকেট। প্রদীপ হাসল, 'গুড আফটারনুন ম্যাডাম।'

'হ্যালো! তুমি আবার এখানে?'

'আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা ছিল!'

'আমি তো তোমাকে বলেছি এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। আমি বিদেশি। আগামীকাল চলে যাব। কোনও ঝামেলায় জড়াতে চাই না আমি।'

'আপনাকে আমি কোনও ঝামেলায় ফেলতে চাই না ম্যাডাম।'

লিসা একটু আশ্বস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'পুলিশ কী বলেছে?'

'পুলিশের সঙ্গে আমার কথা হয়নি ম্যাডাম। আচ্ছা, আপনি ঠিক কী দেখেছিলেন? অনুগ্রহ করে ব্যাপারটা খুলে বলুন।'

ভদ্রমহিলাকে একটু চিন্তিত দেখাল। তারপর বললেন, 'যখন খুন করা হয় তখন আমি নিচু হয়ে আমার জুতোর ফিতে বাঁধছিলাম বাসে বসে। গুলির শব্দ শুনে চমকে তাকিয়ে দেখি একটা লোক মাটিতে পড়ে আছে আর একজন অস্ত্র উঁচিয়ে একটি মেয়েকে জিপে তুলছে। আমাদের বাসটা দাঁড়িয়ে যাওয়ায় লোকটা এমন চিৎকার করে ওঠে যে ড্রাইভার আবার স্পিড তুলে বেরিয়ে যায়। জিপের মুখ আমাদের বিপরীত দিকে ছিল।'

'লোকটা অথবা মেয়েটিকে আপনার মনে আছে?'

'না। লোকটার মাথায় টুপি ছিল, মুখে মাফলার। মেয়েটির মাথা নিচু থাকায় দেখতে পাইনি তবে ওর চুলে অনেক কিছু জড়ানো ছিল।'

'কী সেগুলো?'

'সম্ভবত সাদা পুঁতি। মুক্তোও হতে পারে। দূর থেকে দেখা।'

'তারপর আপনারা কী করলেন?'

'ড্রাইভার চিৎকার করে বলল, এসব অঞ্চলে এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটে তাই কেউ যেন উত্তেজিত হবেন না। কিন্তু লোকটা নিজেই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল।'

'কী কারণে মনে হল?'

'লোকটা অত্যন্ত দ্রুত বাসটাকে নিয়ে গেল পরের পুলিশ ক্যাম্পে। সেখানে গিয়ে রিপোর্ট করে তবে যেন ঠান্ডা হল।'

'আপনাদের বাসের কেউ-কেউ যে ওই ঘটনার ছবি তুলেছিল তা আপনি জানতেন?'

'পুলিশ ক্যাম্পে যাওয়ার পরে ফটোগ্রাফাররা এ নিয়ে কথা বলছিল।'

'আপনি কবে ফিরে যাচ্ছেন ম্যাডাম?'

'আগামীকাল সকালে।'

'অনেক ধন্যবাদ।'

ট্যুরিস্ট লজ থেকে বেরিয়ে প্রদীপ সোজা ভাটিখানায় চলে এল। এসে দেখল ভাটিখানা বন্ধ। কিন্তু বেশ কয়েকজন ভাটিখানা খোলার জন্যে হইচই করছে। জিজ্ঞাসা করে জানা গেল ঘণ্টাখানেক আগে ভাটিখানার ভেতরে একটা খুন হয়ে গেছে। আততায়ীকে ধরা যায়নি। পুলিশ এসে মৃতদেহ সরিয়ে ভাটিখানা বন্ধ করে দিয়ে গিয়েছে আজকের মতো।

প্রদীপের বুকের ভেতর কেউ যেন ড্রাম বাজাতে লাগল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'লোকটা কে?'

'মানে?'

'যে খুন হয়েছে সে কি ড্রাইভার?'

'হ্যাঁ। ওর নাম চন্দ্রনাথ। আজ এখানে মাতাল হয়ে গিয়ে কী সব বলছিল। অনেকে বলছে ওই কথাগুলো বলার জন্যেই নাকি ওকে প্রাণটা দিতে হল।'

ভদ্রলোকের মুখটা মনে পড়ল প্রদীপের। পুলিশ অফিসার থাপা ওকে পাঠিয়েছিল যার কাছে তার মুখ খুব সৌম্য। তিনি মূল্যবান ফটোগ্রাফ সঞ্চয় করেন। বর্ডারে ব্ল্যাক লেপার্ডের মেটিং দৃশ্যের ছবি তোলা তিন ক্যামেরাম্যানের কাছে তাকে পাঠিয়েছিলেন তিনি। সেদিন সকালে ঘটনাটা ঘটেছিল সেইদিন বিকেলেই খবরটা পেয়ে গেছেন ভদ্রলোক। তাঁর কাছে রণতুঙ্গার খবর পাঠানোর কিছু সময়ের মধ্যেই লোকটা খুন হয়ে গেছে এবং ওর ফিল্ম চুরি হয়েছে। দ্বিতীয় যে খবরটা সে দিয়েছিল, দার্জিলিং মেলের যাত্রী এস. কে. শর্মার এখন কী অবস্থা তা সে জানে না। কিন্তু মাতাল অবস্থায় মুখ খোলার জন্যে ড্রাইভার চন্দ্রনাথকে চলে যেতে হল। প্রদীপ একটা পাবলিক টেলিফোন বুথ থেকে ট্যুরিস্ট লজে ফোন করল। লিসা লাইনে এলে সে বলল, 'ম্যাডাম, একটু আগে আপনার সঙ্গে কথা বলেছি। আপনি আগামীকাল কখন নামছেন? লিসা বললেন, 'আর্লি মর্নিং-এ। আমি বাগডোগরা থেকে প্লেন ধরব।'

'একটু রিস্কি হয়ে যাবে ম্যাডাম। আপনার সঙ্গে কথা বলে আমার ভালো লেগেছে। তাই আপনাকে অনুরোধ করছি যে করেই হোক এখনই গ্যাংটক থেকে চলে যান। একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে নিন। হয়তো রাস্তায় সন্ধে নামবে তবু এখনই রওনা হলে শিলিগুড়িতে সাতটা-আটটার মধ্যে পৌঁছতে পারবেন। ওখানে ভালো হোটেল আছে। রাতটা হোটেলে কাটিয়ে সকালের প্লেন ধীরেসুস্থে ধরতে পারবেন।'

'বাট হোয়াই? এরা তো বলছে সবাই ভোরে রওনা হয়ে প্লেন ধরতে পারে।'

'আপনি বলেছেন কোনও ঝামেলায় জড়াতে চান না, তাই। আমার অনুরোধ রাখুন।' রিসিভার রেখে দিল প্রদীপ। ওই বাসে আর কে-কে যাত্রী ছিলেন তা ওর জানা নেই। কিন্তু এই ভদ্রমহিলা যদি তার অনুরোধ রাখেন তাহলে ওঁর ভালো হবে।

গতকালের ব্ল্যাক লেপার্ডের ঘটনাটা বানানো। ধরা যাক দার্জিলিং-এর ভদ্রলোক ভুল খবর পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনজন ফটোগ্রাফারের অস্তিত্ব তাঁর জানা ছিল। আর ভদ্রলোক যদি সত্যি ব্ল্যাক লেপার্ডের ছবির আশায় তাকে পাঠাতেন তাহলে রণতুঙ্গা খুন হতো না। চন্দ্রনাথের খুন হওয়াটাকে কোনও ব্যক্তিগত বিরোধ বলে চালানো যেতে পারে। কিন্তু রণতুঙ্গা?

অর্থাৎ এই মুহূর্তে গ্যাংটকে আর-একটি হত্যাকারী দল সক্রিয় আছে। এই দলটা আজই এসে পৌঁছেছে এখানে অথবা তারা এখানকারই লোক। উলটো করে ভাবলে এমন দাঁড়ায়, গতকাল যে হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল তার ছবি ট্যুরিস্ট বাসের তিনজন ফটোগ্রাফার তুলেছিল বলে ভদ্রলোক খবর পেয়েছিলেন। অবশ্যই ওই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তাঁর স্বার্থ আছে তাই তিনি চান না ছবিগুলো অন্য কারও হাতে যাক। এত তাড়াতাড়ি প্রিন্ট করা সম্ভব নয় তাই তিনি তড়িঘড়ি প্রদীপকে পাঠিয়েছিলেন উদ্ধার করতে। কিন্তু সেখানেও

তো একটা ঝুঁকি ছিল। রণতুঙ্গার বদলে ওই মিলিটারি অফিসারের সঙ্গে প্রথমে দেখা হলে প্রদীপ জেনে যেত, ব্ল্যাক লেপার্ড নয়, ওঁরা হত্যাকাণ্ডের ছবি তুলেছিলেন। তবু তিনি এই ঝুঁকি নিলেন কেন?

প্রদীপ চারপাশে তাকাল। সন্দেহজনক কোনও কিছু চোখে পড়ল না। কিন্তু সে এখন নিশ্চিন্ত তাকে কেউ বা কারা লক্ষ করে যাচ্ছে। ভদ্রলোক তার সঙ্গে এমন একটা খেলা খেললেন কেন? থাপা জানে এই ঘটনাটা?

প্রশ্নগুলো ছোবল মারছিল মনে।

হোটেলে ফিরে এল সে। লাউঞ্জে বসছিল লিটন। এখানে আর কেউ নেই। ওর পাশে চেয়ার টেনে বসতেই লিটন বলল, 'মেয়েটা এখনও ঘুমোচ্ছে।'

'ভদ্রলোকের নাম কী?'

'কাপুর। সানশাইন হোটেলে উঠেছেন।'

'কতদিনের বুকিং?'

'পরশু দুপুরে ওঁর নেমে যাওয়ার কথা। সোজা হোটেলেই ঢুকে গেছেন।'

'তোকে এখনই শিলিগুড়িতে যেতে হবে।'

লিটন অবাক হল, 'সে কি? কেন?'

'সমস্ত হিসেব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। আমার আশংকা হচ্ছে এস. কে. শর্মা নামে যে ফটোগ্রাফার আজ দার্জিলিং মেল ধরতে নেমে গিয়েছে সে ফিল্ম নিতে বাধা দিতে গেলে জীবন্ত ফিরে যেতে পারবে না কলকাতায়।'

'কে খুন করবে তাকে?'

'যে রণতুঙ্গাকে খুন করেছে। ট্যুরিস্টবাসের ড্রাইভারটাকেও সে-ই খুন করিয়েছে বলে এখন অনুমান করছি। কিন্তু এসব এখনও অনুমান। যদি শর্মার কিছু হয়ে যায় তাহলে আর ব্যাপারটা অনুমান হয়ে থাকবে না। সেটা জানার জন্যে আমি তাকে শিলিগুড়িতে যেতে বলছি।' প্রদীপ ঘড়ি দেখল। তারপর মাথা নাড়ল, 'মুশকিল হল, তুই যখন শিলিগুড়িতে পৌঁছবি তখন দার্জিলিং মেল ছেড়ে দেবে। ট্রেনে যদি কিছু ঘটে যায় তাহলে তোর পক্ষেও জানা সম্ভব নয়। কী করা যায়?'

'তুমি যা বলবে তাই করব।'

হঠাৎ প্রদীপ মতলবটা ভাবতে পারল। হাত তুলে বলল, 'তোকে যেতে হবে না। কিন্তু আজ তুই আর হোটেল থেকে বের হবি না। পুলিশ নিশ্চয়ই এতক্ষণে তোর বর্ণনা পেয়ে গেছে।'

তখনই শিলিগুড়িতে ছুটতে হচ্ছে না বলে খুশি হল লিটন। বলল, 'কিন্তু আমি কোন ঘরে থাকব? ওখানে তো এখনও মেয়েটা ঘুমোচ্ছে।'

'সন্ধে হলেই আমরা হোটেল চেঞ্জ করব।'

'তার মানে? এই হোটেল কী দোষ করল?'

'আমরা কোথায় আছি সেটা আমি কাউকে জানাতে চাই না।'

'কে জেনেছে?'

'যারা খুন করছে তারা অন্ধ নয়।'

'তা হলে?'

'তুই এখানেই বিশ্রাম নে। আমি মেয়েটাকে তুলি।'

প্রদীপ উঠল। লিটন মাথা নাড়ল। তার গুরুর সব ভালো শুধু মহিলা সংক্রান্ত ব্যাপারটা বাদ দিলেই—। হঠাৎ তার নজরে এল একটা পুলিশের জিপ এসে দাঁড়িয়েছে হোটেলের দরজায়। একজন অফিসার জুতোর শব্দ তুলে রিসেপশনের দিকে এগিয়ে গেলেন। পুলিশ কি তার বর্ণনা পেয়ে এখানে খোঁজ করতে এসেছে? কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না লিটন। রণতুঙ্গার ঘরে সে কোনও হাতের ছাপ রেখে আসেনি। কিন্তু পুলিশ যদি একবার ধরে! এখান থেকে হুট করে উঠে গেলে সবাই সন্দেহ করবে। ও মাথা নিচু করে বসে রইল।

পুলিশ অফিসার রিসেপশনিস্টের সঙ্গে কথা বলছে। হোটেলের রেজিস্টার দেখল ভদ্রলোক। তারপর বেরিয়ে গিয়ে জিপে উঠে বসল। লিটন দেখল রিসেপশনিস্ট তার দিকে এগিয়ে আসছে সে সহজ হতে চেষ্টা করল।

রিসেপশনিস্ট সামনে এসে বলল, 'মিস্টার গুরুং কি বাইরে গেছেন?'

লিটন কোনওমতে মাথা নাড়ল, 'না।'

'একটা খুব খারাপ খবর আছে। উনি যে ভদ্রলোকের খোঁজ করছিলেন সেই মিস্টার শর্মা শিলিগুড়িতে যাওয়ার পথে কালীঝোরার কাছে অ্যাকসিডেন্টে মারা গিয়েছেন। উনি যে ট্যাক্সিতে যাচ্ছিলেন তার ড্রাইভারও বেঁচে নেই। এইমাত্র পুলিশ এসে বলে গেল। ভদ্রলোকের পকেটে আমাদের হোটেলের রশিদ পাওয়া গিয়েছে বলে পুলিশ খোঁজ করতে এসেছিল। মিস্টার গুরুংকে বলে দেবেন উনি যে ভদ্রলোকের খোঁজ করছিলেন সেকথা আমি পুলিশকে বলিনি! কী দরকার ঝামেলা বাড়ানোর।' রিসেপশনিস্ট হাসল। লিটনের ধড়ে প্রাণ আসতে-আসতেও থমকে গেল যেন। সে বলল, 'ধন্যবাদ।'

রিসেপশনিস্ট জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কোন হোটেলে উঠেছেন?'

'আমি? কেন? এখানেই।' লিটন বলল।

'এখানে মিস্টার গুরুং একটা ডাবলবেড রুম নিয়েছেন। ওখানে ওঁরা দুজন আছেন। তৃতীয় প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি হোটেলের আইন অনুযায়ী সেখানে থাকতে পারে না।'

লিটন হাত নাড়ল, 'না, না, ওই ঘরে আমরা দুজনেই থাকব।'

'তাহলে ওই মহিলা?'

'ওঁর রাত্রে এখানে থাকার কথা নয়। দাঁড়ান, আমি দেখছি।' উঠে পড়ল লিটন। দ্রুত ওপরে চলে এসে দেখল ঘরের দরজা ভেজানো। সে নক করতেই মেয়েলি গলা ভেসে এল, 'ভেতরে আসুন।'

দরজা ঠেলতেই সুজাতার পিঠ দেখতে পেল লিটন। আয়নার সামনে বসে চুল ঠিক করছে। মেয়েটা সুন্দরী। শরীর-টরীর আছে। মনে-মনে বলল সে। ঘরে প্রদীপ নেই। বাথরুমের বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে একটু স্বস্তি হল লিটনের। সে বলল, 'রেডি?'

'হ্যাঁ। এক মিনিট।'

'সন্ধে নামার আগেই তো তোমাকে যেতে হবে।

'কোথায়?' হাত থেমে গেল সুজাতার।

'মানে?' কোথায় যাব আমি?

'সেটা তো তুমিই জানো। দার্জিলিং থেকে গ্যাংটকে আসার সময় ভাবোনি?'

'না তো! কাল রাত্রে মনে হয়েছিল দার্জিলিং থেকে চলে না এলে আমি বিপদে পড়ব। আর সেটা পড়ব আপনাদের জন্যে। পুলিশ নিশ্চয়ই এখনও আমাকে খুঁজছে।'

'আমাদের জন্যে মানে?' লিটন মেয়েটার পরিবর্তন দেখে অবাক।

'হ্যাঁ মশাই। পিস্তলটাকে বাঁচাতে গিয়েই তো আমার এই হেনস্থা।'

'কে বলেছিল বাঁচাতে?' রেগে গেল লিটন। 'আমি ওসব জানি না। হোটেল থেকে বলেছে এই ঘরে তিনজন থাকা যাবে না। তা ছাড়া, তোমাকে আমরা কখনও দেখিনি, চিনিও না, তোমাকে এই ঘরে থাকতে দেব কেন?'

'ঠিক আছে। আপনার বন্ধু যদি বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে বলেন চলে যেতে তাহলে আমি চলে যাব।' সুজাতা কথা শেষ করতেই প্রদীপ ফ্রেশ হয়ে বেরিয়ে এল বাথরুম থেকে। শেষ কথাটা তার কানে গিয়েছিল।

লিটন বলল, 'রিসেপশনিস্ট বলেছে এক ঘরে তিনজন থাকা যাবে না।'

'আমরা সেটা থাকছি না।'

'অথচ এ এমনভাবে কথা বলছে যেন পিস্তলটা বাঁচানোর জন্যে—।'

লিটনকে থামিয়ে দিল প্রদীপ, 'পিস্তলটা বাঁচানোর জন্যে আমি ওর কাছে কৃতজ্ঞ লিটন। যন্ত্রটা এখন খুবই দামি হয়ে উঠেছে।'

সঙ্গে-সঙ্গে লিটনের মনে পড়ে গেল, 'গুরু খুব জরুরি কথা আছে।'

'বলে ফ্যাল।' চুল আঁচড়াচ্ছিল প্রদীপ।

'ভদ্রলোক দার্জিলিং মেলে ওঠার চান্স পেলেন না।'

'হোয়াট?' ঘুরে দাঁড়াল প্রদীপ। ওর চোখ বিস্ফারিত।'

'একটু আগে,' কথাটা বলতে গিয়েই সুজাতার উপস্থিতির জন্যে থমকে গেল লিটন। প্রদীপ এগিয়ে এল, 'আমি সুজাতাকে বিশ্বাস করছি।'

'কী করে? তুমি তো ওকে চেনোই না।'

'পাঁচ ঘণ্টার রাস্তায় পেছনে বসে থাকা একটা মেয়ের ব্যবহারে যদি তাকে না চিনতে পারি তা হলে! কী হয়েছে?'

'কালীঝোরার কাছে একটা অ্যাকসিডেন্টে ভদ্রলোক এবং তার ট্যাক্সির ড্রাইভার মারা গিয়েছে। একটু আগে পুলিশ এসেছিল হোটেলে খোঁজ খবর নিতে।'

'এই হোটেলের কথা পুলিশ জানল কী করে?'

'হোটেলের বিল মিটিয়ে রশিদ নিয়েছিলেন ভদ্রলোক। সেটা ওঁর পকেটে ছিল। রিসেপশনিস্ট আমাকে বলল, তুমি যে ভদ্রলোকের খোঁজ করেছ সেটা সে পুলিশকে জানায়নি। কেস খুব খারাপ বলে মনে হচ্ছে গুরু।'

প্রদীপ ঠোঁট কামড়াল। এই আশংকাই তার হচ্ছিল। সে যে দুটো খবর দার্জিলিং-এ পাঠিয়েছে তাদের জীবিত থাকতে দেওয়া হচ্ছে না। হয়তো সে এখন যেখানে-যেখানে যাচ্ছে সেখানেও ওরা হাজির হচ্ছে। ওই দৃশ্যের সাক্ষি বুঝলে তাকেও সরিয়ে দেবার নির্দেশ দিয়েছেন মহান ফটোগ্রাফস গ্রাহক। কিন্তু ভদ্রলোক কোনও প্রমাণ রাখেননি। দার্জিলিং-এ ফিরে গিয়ে সে ওঁকে কোনওভাবেই অভিযুক্ত করতে পারবে না। ভদ্রলোক তাকে ক্রমাগত সুতো ছেড়ে যাচ্ছেন। তাকে অভিনয় করতে হবে যতক্ষণ পঞ্চাশ হাজার হাতে না পাওয়া যায়। কিন্তু, তৃতীয় ব্যক্তির হদিশ পেলে কি উনি তাকেও পৃথিবীতে

থাকতে দেবেন? প্রদীপের শিরদাঁড়া কনকন করে উঠল।

'গুরু।' লিটন ডাকল। প্রদীপ অন্যমনস্কভাবে তাকাল।

'সন্ধে হয়ে আসছে। তুমি বলেছিলে হোটেল চেঞ্জ করবে।'

'বলেছিলাম। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে কোনও লাভ হবে না। ওই মোটর বাইকটাকে ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আর ওটা সঙ্গে থাকলেই আমাকে পেতে কারও অসুবিধে হবে না। লিটন, আমি এখানে এসেছি সুজাতাকে নিয়ে। ও যতক্ষণ থাকছে ততক্ষণ লোকে একটা ধারণা মনে রাখবে। মহিলা সঙ্গে থাকলে পুলিশও নরম ভাবে। আমরা আগামীকাল ভোরে এখান থেকে বেরিয়ে যাব। কিন্তু আজ আমি কাপুরের সঙ্গে বাসস্ট্যান্ডে কথা বলেছি। যদি ওরা আমাদের ওপর নজর রাখে তা হলে কাপুরের অস্তিত্ব জেনে যাবে। আর ওই ভদ্রলোক যেমন মুখের ওপর কথা বলেন তাতে ওদের পক্ষে জানা অসম্ভব হবে না যে উনিই তৃতীয় ফটোগ্রাফার। তারপর কাপুরের মৃত্যু তো স্বাভাবিক ঘটনা। আর কাপুর মারা গেলেই ওরা আমার জন্যে আসবে। তুই এক কাজ কর।' পকেট থেকে কয়েকটা একাশো টাকার নোট বের করে লিটনকে দিল প্রদীপ, 'সোজা সানশাইন হোটেলে চলে যা। চেষ্টা কর কাপুরের কাছাকাছি ঘর নিতে। কাপুর তোকে দ্যাখেনি। লোকটার ওপর নজর রাখতে হবে তোকে। রণতুঙ্গার মতো ওর অবস্থা যাতে না হয় সেটা তুই দেখবি। ঠিক আছে?'

'তুমি এখানে থাকবে?'

'আমরা থাকব।'

'কাল তোমার সঙ্গে কীভাবে দেখা হবে।'

'আমি সানশাইন হোটেলে তোর সঙ্গে দেখা করব।'

'যদি কাপুর বাইরে বের হয়?'

'তুই ওকে কভার করার চেষ্টা করবি।'

লিটন উঠে দাঁড়াল। দরজার দিকে এগোল। তারপর ঘুরে দাঁড়াল সুজাতার দিকে, 'আমি এখনও তোমাকে বিশ্বাস করতে পারছি না। কিন্তু গুরুর যদি কিছু হয় আমি তোমাকে ছাড়ব না।' লিটন আর দাঁড়াল না। দরজা ঠেলে বেরিয়ে গেল।

প্রদীপ হেসে ফেলল, 'বাঃ। চমৎকার দেখাচ্ছে তোমাকে। বেড়াতে যাবে নাকি?'

'ঠাট্টা করছেন?'

'মোটেই না।'

'আমি গতকাল থেকে এই পোশাক পরে আছি। শরীরে অস্বস্তি হচ্ছে।'

'ঠিক-ঠিক। আমার উচিত তোমাকে একটা ভালো পোশাক কিনে দেওয়া।' প্রদীপ বলল।

'কেন? উচিত কেন?'

'কারণ এখন থেকে সবাই জানবে আমরা স্বামী-স্ত্রী।'

'কী বলছেন আপনি?' উঠে দাঁড়াল সুজাতা।

'উত্তেজিত হয়ো না। এই হোটেলে আজ ভোরে আমরা একই বাইকে চেপে এসেছি। ওই সম্পর্কটা লোকে জানলে সহজে বিশ্বাস করবে। আর বিশ্বাস করলে গ্যাংটকে যতক্ষণ আছি একটু নিশ্চিন্তে থাকতে পারব। গ্যাংটক থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর, তুমি

যদি ইচ্ছে করো, আমরা কেউ কখনও কাউকে চিনব না। ঠিক আছে?'

'কিন্তু—'

'শোনো। এখন যদি পুলিশ এসে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে তোমার আইডেন্টিটি কী, তুমি কী বলতে পারবে? একা মেয়ে অনাত্মীয়া পুরুষের সঙ্গে একঘরে আছে যাকে কাল রাত্রের আগে দ্যাখোনি সেটা পুলিশকে জানালে ওরা তোমাকে সম্মান করবে? আমরা স্বামী-স্ত্রী জানলে ওদের অনেক কৌতূহল থেমে যাবে। ঠান্ডা পড়ছে। ওভারকোটটা পরে নাও।'

'বাইরে যাওয়ার দরকার কী?'

'কোথাও বেড়াতে এসে স্বামী-স্ত্রী চব্বিশ ঘণ্টা ঘরে বসে থাকে না।' মিনিট দেড়েকের মধ্যে ওরা দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে এল। রিশেপশনের কাছে পৌঁছে প্রদীপ গলা তুলে বলল, 'ডার্লিং, এক মিনিট, প্লিজ।' তারপর কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে নিচু গলায় বলল, 'অনেক ধন্যবাদ।'

'খুব স্যাড ব্যাপার!'

'খুব-উ-ব। ওঁর সঙ্গে একটা ব্যবসার ব্যাপারে কথা বলার ইচ্ছে ছিল, হল না। ও হ্যাঁ, আমার ভাইকে আপনি ভুল বুঝছেন। ওর মাথা সম্পূর্ণ নর্মাল নয়। ডাবল-বেড রুমে দাদা-বউদির সঙ্গে দেওরের থাকা উচিত নয় এটা চট করে ও বুঝতে পারে না।'

'তাই বলুন। ওঁর কথাবার্তা—।'

'একটু অ্যাবনর্মাল। যাক গে, আমরা দুজনেই ওই ঘরে থাকব।'

'তাহলে ওঁর জন্যে—।'

'আমাদের এক দূরসম্পর্কের আত্মীয় থাকেন এখানে। তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। একা রাত্রে হোটেলে থাকতে দিতে রাজি নই আমি। নর্মাল নয় তো!' প্রদীপ বেরিয়ে এল। দরজার বাইরে তার বাইক রয়েছে। ওকে সেদিকে যেতে দেখে সুজাতা বলল, 'আচ্ছা, এখন ওটা ব্যবহার না করলে অসুবিধে হবে?'

'না। চলো, হাঁটি। আর শোনো, সবার সামনে তুমি আমাকে আপনি বলবে না।' সুজাতার কনুই জড়িয়ে ধরে হাঁটতে লাগল প্রদীপ। ঠিক তখনই সে আবিষ্কার করল মেয়েটি স্মার্ট। সাধারণ মেয়ের মতো লাজুক নয়। অবশ্য সেটা যে নয় তার প্রমাণ সুজাতা এর আগে অনেকবার দিয়েছে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'খুব হিন্দি ছবি দেখো?' হেসে মাথা নাড়ল সুজাতা, 'খুউব।'

'ফেবারিট হিরোইন কে? শ্রীদেবী?'

'না। পূজা ভাট।'

প্রদীপ চোখ বড় করল। এখন সন্ধের অন্ধকার নেমেছে সবে। রাস্তায় মানুষের ভিড় কমছে। যদি কেউ অথবা কারা তাকে লক্ষ রাখে তা হলে এখন নিশ্চয়ই একটু ফাঁপরে পড়েছে। বউ নিয়ে বেড়াতে এসে কেউ গোলমাল চায় না।

একটা বড় পোশাকের দোকানে ঢুকল ওরা। ঢোকার আগে প্রদীপ দেখে নিল দোকানের পাশে একটা এস টি ডি করার সেন্টার আছে। শালোয়ার কামিজ এবং মোটা পুলওভার দেখাতে বলল সে সেলসম্যানকে। তারপর সুজাতার দিকে তাকিয়ে হাসল, 'ডার্লিং তুমি পছন্দ করো, আমি এক মিনিট ঘুরে আসছি। উজ্জ্বল কোনও রং নিলে

ভালো লাগবে।'

সুজাতা নিঃশব্দে মাথা নাড়ল। মেয়েটা যেন এখন হাল ছেড়ে দিয়েছে।

দোকানের পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে চারপাশে তাকিয়ে নিল প্রদীপ। সন্দেহ করা যেতে পারে এমন কাউকে দেখা গেল না। এস টি ডি সেন্টারে ঢুকে সে বুথের দরজা ভেজালো। আজ অন্তত পাঁচবার ডায়াল করতে হল। তারপর ভদ্রলোকের গলা পাওয়া গেল, 'হ্যালো।'

'বলে যাও।'

'আমি এখনও তৃতীয় ফটোগ্রাফারকে খুঁজে পাইনি।'

'বড্ড বেশি সময় নিচ্ছ। এমন হতে পারে লোকটা গ্যাংটক থেকে নেমে গেছে। এবং সেটা হলে আমি কথা রাখতে বাধ্য নই।'

'না স্যার। রণতুঙ্গা মারা যাওয়ার আগে বলেছিল লোকটা তিনদিন গ্যাংটকে থাকবে।'

'কথাটা আগে বলোনি তুমি।'

'খেয়াল ছিল না স্যার।'

'রণতুঙ্গা আর কী বলেছিল?'

'তেমন কিছু বের করতে পারিনি ওর পেট থেকে। শুধু বলে গেছে কোনও ব্ল্যাক লেপার্ড সে দ্যাখেনি। ইন ফ্যাক্ট ওই ট্যুরিস্টবাসটার ড্রাইভারও একই কথা বলেছে।'

'ওদের পক্ষে এড়িয়ে যাওয়া খুব স্বাভাবিক। তিন নম্বর লোকটার ব্যাপারে কোনও ক্লু পেয়েছ? কাউকে জিজ্ঞাসা করেছ?'

'হ্যাঁ স্যার। আজ বিকেলে যারাই ট্যুরিস্ট বাস থেকে নেমেছে তাদের সঙ্গে কথা বলেছি। এক বৃদ্ধ ট্যুরিস্টকে সন্দেহ হচ্ছে। ভদ্রলোক গতকালও বর্ডারে গিয়েছিলেন।'

'বৃদ্ধ? কীরকম বৃদ্ধ?'

'বছর পঁচাত্তর বয়স। বেঁটে ফরসা, গুজরাতি হবে।'

'কোন হোটেলে উঠেছে?'

'এখনও বের করতে পারিনি। মনে হয় আত্মীয়ে বাড়িতে উঠেছে।'

'ফাউন্ড হিম অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিব্‌ল। তুমি তাহলে আজ বিকেলে অনেকের সঙ্গে কথা বলেছ? ভালো। আচ্ছা, তুমি কি একা গিয়েছ গ্যাংটকে?'

'সত্যি কথা বলব স্যার?'

'সেটাই আমি পছন্দ করি।'

'একটি মেয়েকে আমি পছন্দ করতাম। শি ওয়াজ মাই গার্ল ফ্রেন্ড!'

'ওয়াজ?'

'আমি গত সপ্তাহে সই করে ওকে বিয়ে করেছি।'

'ও। তাই বলো। আমি তোমার কাছে কাল সকালের মধ্যে খবর চাই।'

'ও কে স্যার। শর্মাটা হাতছাড়া হয়ে গেল।'

'যে পাখি উড়ে যায় তার জন্যে বোকারাই চিন্তা করে। আসল শিকারি যে সে গাছে বসা পাখির দিকে তাকায়। গুড নাইট।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে লোকাল টেলিফোনে ট্যুরিস্ট লজে ফোন করল প্রদীপ।

খোঁজ নিয়ে জানল লিসা হঠাৎই শিলিগুড়িতে চলে গিয়েছেন। সে মনে-মনে প্রার্থনা করল ভদ্রমহিলার যেন পথে কোনও দুর্ঘটনা না হয়।

দোকানেই পোশাক পরিবর্তন করাল সে সুজাতাকে। ক্লোক রুমে গিয়ে সেটা পরে আসার পর সুজাতাকে একদম অন্যরকম দেখাচ্ছিল। পুরোনো পোশাকটা দোকানদারকে দিয়ে প্রদীপ অনুরোধ করল হোটেলে পৌঁছে দিতে। তারপর সুজাতার বাজু ধরে হাঁটতে লাগল। হাঁটতে-হাঁটতে প্রদীপ বলল, 'এরকম একজন বান্ধবী আমি খুব চাইতাম।'

'চাইতেন। এখন চান না।'

'না পেয়ে-পেয়ে চাওয়াটা ভুলে গিয়েছি।'

'আপনি মেয়েদের মন রেখে বেশ কথা বলতে পারেন।'

'ঈশ্বরের দিব্যি, এই মুহূর্তে ওটা করছি না। তবে তোমার ব্যাপারে আমি বুঝতেই পারছ, নিরাসক্ত। এখনও পর্যন্ত দুর্নাম দিতে পারবে না আশা করি।'

'কারণটা জানতে পারি?'

'আমার মনে হয় তুমি মতিলালের বান্ধবী।'

'কীসে এটা মনে হল?'

'গতরাত্রে তুমি যে পোশাক এবং ভঙ্গিতে ওর বেডরুমের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিলে সেটা স্বাভাবিক ছিল না। তাছাড়া থাপা ওর ঘরে ঢুকে কোন মেয়েলি পোশাক দেখেছিল তা জানি না।'

'না। আমি ওঁর প্রেমিকা নই। জামাইবাবু কারও সঙ্গে প্রেম করতে পারেন না। বলতে পারেন, গতকাল আমার মতিভ্রম হয়েছিল। হঠাৎ খেয়াল হয়েছিল জামাইবাবুর বাড়ির কর্তৃত্ব আমি পেতে পারি। সেটা করতে গিয়ে আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল।' সুজাতা অকপটে বলল।

প্রদীপ আর কথা বাড়াল না। এতটা পথ তারা হাঁটল কিন্তু কোনও সন্দেহভাজন মানুষকে সে দেখতে পায়নি। কেউ তাদের অনুসরণ করছে বলে মনে হচ্ছিল না। সুজাতার হাত ধরে সে চুপচাপ হেঁটে ফিরছিল। কালকে তৃতীয় ফটোগ্রাফারের নাম জানাতে হবে। সেটা জানালে ভদ্রলোক আর ফিরে যেতে পারবেন না। এবং এইসব জানার জন্যে তাকেও ছেড়ে দেওয়া হবে না।

'কী ভাবছেন?' হঠাৎ সুজাতা জিজ্ঞাসা করল।

'অ্যাঁ। কিছু না।'

'আমি জানি আপনি আমাকে খুব খারাপ ভাবছেন।'

'আমি নিজে এত খারাপ যে অন্য কাউকে তার চেয়ে বেশি ভাবতে পারি না।'

ওরা ফিরে এল হোটেলে। দরজা খুলতেই ব্যাপারটা নজরে এল। সমস্ত জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড। কেউ যেন ঘরটাকে তছনছ করে খুঁজে গেছে কিছু। সুজাতা প্রদীপের দিকে তাকাল, 'আপনার পিস্তল? ওটা নিয়ে কি বেরিয়েছিলেন?'

'না। সঙ্গে নিয়ে শহরের রাস্তায় হাঁটা বোকামি। ওর কোনও লাইসেন্স নেই। পুলিশ যদি ওটা সমেত আমায় ধরে তাহলে আর দেখতে হবে না।' কথা বলতে-বলতে বাথরুমে ঢুকে গেল প্রদীপ। ফিরে এসে বলল, 'যারা কিছু বেআইনি ভাবে খুঁজতে আসে তারা কেন যে ভাবে জিনিসটা আইনসঙ্গতভাবে রেখে দেওয়া হবে। কী রকম বোকামি। তুমি

বসো, আমি একটা নালিশ জানিয়ে আসি।' প্রদীপ বেরিয়ে গেল।

রিসেপশনে পৌঁছানো মাত্র একজন পুলিশ অফিসারকে দেখতে পেল প্রদীপ। হোটেলে ঢুকছেন। সে কিছু বলার আগেই অফিসার রিসেপশনিস্টকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রদীপ গুরুং কত নম্বর রুমে আছে?'

প্রদীপ বলল, 'আমার নাম প্রদীপ গুরুং।'

'আচ্ছা!' লোকটা তাকে আপাদমস্তক দেখে নিল, 'এখানে কেন এসেছেন?'

'বেড়াতে। সেইসঙ্গে একটু কাজও ছিল।'

'কী কাজ?'

'মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে।'

লোকটা হকচকিয়ে গেল, 'আপনি মুখ্যমন্ত্রীকে চেনেন?'

'নিশ্চয়ই। শিলিগুড়িতে ওঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল।'

'মুখ্যমন্ত্রী এখন দিল্লিতে।'

'জানি। সেই জন্যে অপেক্ষা করতে হচ্ছে।'

অফিসারকে একটু ইতস্তত করতে দেখা গেল, 'মিস্টার গুরুং, দার্জিলিং পুলিশ আপনার সম্পর্কে একটা খবর পাঠিয়েছে। আপনি বেআইনি অস্ত্র ক্যারি করছেন।'

'আপনি আমাকে এবং আমার ঘর সার্চ করতে পারেন।'

'বুঝতেই পারছেন, এটা আমার ডিউটির মধ্যে পড়ে।' ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। বেশ ভদ্রভাবে তিনি প্রদীপের দেহ তল্লাশি করলেন।

প্রদীপ হাসল, 'আপনি এখানে আছেন, খুব ভালো হল। আমি রিসেপশনে এসেছিলাম একটা কমপ্লেন করতে। আমরা যখন ছিলাম না তখন কেউ বা কারা এসে আমার ঘর লণ্ডভণ্ড করে গেছে। আমি এখনও বুঝতে পারছি না কিছু হারিয়েছি কি না।'

'সে কি? এরকম ঘটনা তো কখনও এখানে ঘটেনি।' রিসেপশনিস্ট বলে উঠল। ওরা দুজনে এগিয়ে যেতে প্রদীপ সঙ্গ নিল। ঘরের দরজা ভেজানো ছিল। নক করতে সুজাতা খুলল। ঘরে ঢুকে অফিসার বললেন, 'অদ্ভুত ব্যাপার! এখানে আপনার কোনও শত্রু আছে?'

'আমার জানত ছিল না।'

'আপনি যদি ডায়েরি করতে চান তাহলে আমার সঙ্গে থানায় আসতে পারেন।'

'যতক্ষণ কী হারিয়েছে বুঝতে না পারছি ততক্ষণ ডায়েরি করে কোনও লাভ নেই।'

'মিস্টার গুরুং, আপনি কি সত্যি মুখ্যমন্ত্রীর জন্যে অপেক্ষা করবেন?'

'সেইরকম ইচ্ছে আছে।'

'দার্জিলিং পুলিশ আমাকে যা জানিয়েছে তাতে আপনাকে আমি এখানে থাকতে দিতে পারি না। মুশকিল হল মুখ্যমন্ত্রীর নাম বলে আপনি বিপাকে ফেলে দিয়েছেন। ইনি আপনার স্ত্রী?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আপনারা গত সপ্তাহে বিয়ে করেছেন শুনলাম?'

'খবরটা ঠিক পেয়েছেন। এবং খুব দ্রুত।'

'মানে?'

'এ খবর কারও জানার কথা নয়। দার্জিলিং-এর পুলিশ অফিসার থাপার তো নয়ই। আমি কিছুক্ষণ আগে দার্জিলিং-এর এক বন্ধুকে টেলিফোন করে খবরটা দিই। বন্ধু দেখছি এরই মধ্যে থাপার কাছে খবরটা পৌঁছে দিয়েছেন।'

'পুলিশকে এভাবেই দ্রুত কাজ করতে হয়। ঠিক আছে, আপনারা বিশ্রাম নিন। প্রয়োজন হলে আমি যোগাযোগ করব। ও হ্যাঁ, আপনি তাহলে ডায়েরি করবেন না?'

'আপাতত না।'

ওঁরা চলে গেলেন। সুজাতা বলল, 'আমি ভয়ে কাঁপছিলাম।'

'কেন?'

'হঠাৎ পুলিশকে এঘরে দেখে।'

ডিনারের অর্ডার দিল প্রদীপ। সেই সঙ্গে একটা ব্র্যান্ডির বোতল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি ব্র্যান্ডি খাও?'

'না।'

'হুইস্কি?'

'আমি মদ খাই না।'

'আমি খেলে তোমার আপত্তি আছে?'

'আমার আপত্তি আপনি শুনবেন কেন?'

'ইনডাইরেক্ট কথা বলো না। আমার আজ রাত্রে ঘুম দরকার। ব্র্যান্ডি না খেলে ঘুম হবে না।'

'তাহলে তো চুকেই গেল। আমার পোশাক দোকান থেকে এসেছে কি?'

খোঁজ নিল প্রদীপ। না দোকান থেকে কোনও প্যাকেট পাঠায়নি। সুজাতা বিপাকে পড়ল। নতুন শালোয়ার কামিজ পরে রাত্রে শোওয়া অস্বস্তিকর। প্রদীপ বলল, 'এক কাজ করো। কিছুক্ষণ বাদে আমি বেঘোরে ঘুমাব। তখন জামাকাপড় ছেড়ে তুমি কম্বলের তলায় ঢুকে যেও। ভোরবেলায় উঠে আবার ওসব পরে নিও। এখন দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। লোকটা বোধহয় পাঠাতে ভুলে গিয়েছে।'

রাত বাড়ছিল, সেই সঙ্গে ঠান্ডাও। সুজাতার রাতের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। টেবিলে ব্র্যান্ডির বোতল নিয়ে বসেছিল প্রদীপ। এই মুহূর্তে ভাবনায় ডুবেছিল সে। ব্ল্যাক লেপার্ড নয়, একটি খুন হয়ে গেছে ওই বর্ডারে। একটি মানুষকে খুন করে তার সঙ্গিনী মহিলাকে জোর করে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওখান থেকে। এই খুনের ছবি বা সাক্ষি কেউ থাকুক তা ভদ্রলোকে চান না। ওই অবধি ঠিক আছে।

কিন্তু কয়েকটা প্রশ্ন আসছে পরপর। যে মানুষটা খুন হয়েছে সে এত জায়গা থাকতে ওই বর্ডারে একজন মহিলাকে নিয়ে কেন গিয়েছিল? মহিলার সঙ্গে তার সম্পর্ক কী? ওরা কীসে গিয়েছিল? যদি নিজস্ব কোনও ট্রান্সপোর্টে গিয়ে থাকে সেটা এখন কোথায়? যারা খুন করতে গিয়েছিল তারা কি জানত ওরা ওখানে যাবে? খুন করার সময় মেয়েটির ক্ষতি কেন করেনি? মৃত লোকটার শরীর কি পুলিশ তুলে নিয়ে গিয়েছে? যদি যায় তাহলে কেন পুলিশ পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছে কিছু দেখতে পায়নি? এইসব প্রশ্নের উত্তর তার জানা দরকার। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে সেই ভদ্রলোকের স্বার্থ।

মাথা ঝিমঝিম করছিল। একটু-একটু করে ভাবা আর সম্ভব হচ্ছিল না ব্র্যান্ডির প্রভাবে।

'আপনি কি ওখানে সারারাত বসে থাকবেন?' সুজাতার গলা ভেসে এল।

পাশ ফিরল প্রদীপ। মেয়েটা বসে আছে খাটের ওপর। সে বলল, 'কী অসুবিধে করছি?'

'আপনি না ঘুমানো পর্যন্ত আমি শুতে পারছি না।'

'কে নিষেধ করল?'

'আমাকে এই পোশাক ছাড়তে হবে।'

'ও। আমি তাকাচ্ছি না, তুমি আমার পেছনে গিয়ে যা ইচ্ছে তাই করো।'

'অসম্ভব। এভাবে পারা যায় না।'

'আশ্চর্য! তুমি পোশাক ছাড়ার পর আমার খাট থেকে পাঁচ ফুট দূরের একটা খাটে কম্বলের তলায় জন্মদিনের পোশাকে শুয়ে থাকতে পারবে অথচ—। আমি জেগে থাকলে তোমার লজ্জা আর ঘুমালে নয়? আমি যদি জোর দেখাই তাহলে তুমি বাধা দিতে পারবে?' প্রদীপ উঠে দাঁড়াল। 'ঠিক আছে, আমি বাইরে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি। দয়া করে যা করার তাড়াতাড়ি করে ফেলো।'

'না। আপনাকে কোথাও যেতে হবে না।' বলতে-বলতে ব্র্যান্ডির বোতলে চোখ পড়ল সুজাতার, 'ইস, এর মধ্যে কতখানি খেয়ে ফেলেছেন? কী করেছেন আপনি?'

'কেন? আমি কি মাতলামি করছি?'

'আপনি বসুন। বসুন বলছি।' সুজাতা এমনভাবে ধমকে উঠল যে প্রদীপ নিঃশব্দে বসে পড়ল।

'নিজেকে আপনি খুব সাধুপুরুষ বলে মনে করেন, তাই না?'

'এত বড় সম্মান লিটনও আমাকে দেবে না।'

'হ্যাঁ, করেন। নইলে কাল থেকে এমন ব্যবহার করছেন, যেন আমি পাঁচ বছরের মেয়ে।' সুজাতা রাগত গলায় বলল, 'আমাকে স্ত্রী সাজিয়ে আপনার লাভ হতে পারে কিন্তু আমার কোন উপকার হল? আপনি আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করেছেন আমার আপত্তি আছে কি না? আপনারা যা ইচ্ছে হচ্ছে তাই আমার ওপর চাপিয়ে দিচ্ছেন। আপনি আমাকে বাজে মেয়েছেলে ছাড়া কিছু মনে করেন না।'

'সুজাতা। তুমি কীরকম মেয়ে আমি জানি না। তবে না জেনে তুমিও একটা বিপদের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছ। আমি একটা কাজ নিয়ে এখানে এসেছিলাম। শর্ত ছিল কাজটা করতে পারলে যে টাকা পাব তা দিয়ে আমি দার্জিলিং-এর একটা অনাথ আশ্রমের শিশুদের উপকার করতে পারব। এখানে এসে ক্রমশ জানতে পারলাম আমাকে ভুল বোঝানো হয়েছে। আমাকে দিয়ে কয়েকটা খারাপ কাজ করিয়ে শেষপর্যন্ত আমাকেই সরিয়ে ফেলবে ওরা। এমন হতে পারে আমি আর গ্যাংটক থেকে ফিরে যেতে পারব না। অতএব, বুঝতেই পারছ, আমাকে এখন অনেক ভেবে পা ফেলতে হবে। শত্রুপক্ষ আমার চেয়ে অনেক শক্তিশালী।'

'আমি এ ব্যাপারে কোনও সাহায্য করতে পারি না?'

'জানি না। যদি প্রয়োজন হয় বলব।'

'আমরা যেভাবে এসেছিলাম সেইভাবে আজই এখান থেকে চলে গেলে কেমন হয়?'

'না। আমি কখনও হেরে পালাইনি। আমাকে শেষ দেখা দেখতে হবে।'

'বেশ। এটা করতে হলে রাত জেগে ব্র্যান্ডি খেয়ে কী লাভ?'

'তুমি বুঝবে না।' প্রদীপ আবার গ্লাসে ব্র্যান্ডি ঢালল।

সঙ্গে-সঙ্গে মুখের চেহারা বদলে গেল সুজাতার। কোনও কিছুর পরোয়া না করে সে পোশাক খুলতে লাগল। এতটা আশা করেনি প্রদীপ। একটার পর একটা পোশাক খুলে বিবস্ত্রা সুজাতা চলে গেল তার খাটের কাছে। প্রদীপের মনে হল তার দুটো চোখ যেন পুড়ে যাচ্ছে। পোশাক পরা অবস্থায় যাকে খুব সাধারণ মনে হয়েছিল পোশাক সরতেই সে যেন আগুনের শিখা হয়ে গেল। এমন রূপ সে কখনও দেখেনি।

সুজাতা এখন কম্বলের তলায়। মাত্র কয়েক ফুট দূরে বসে আছে প্রদীপ। ইচ্ছে করলেই সে পৌঁছে যেতে পারে আগুনের কাছে। প্রদীপ উঠে দাঁড়াল। ব্র্যান্ডির গ্লাসটাকে টেবিলে রাখল। পৃথিবীতে এখন একটুও শব্দ বাজছে না। অন্তত এই বন্ধ ঘরে সে যা ইচ্ছে তাই করতে পারে।

প্রদীপ নিজের খাটে বসে জুতো খুলল। গরম জামাগুলো সরিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল খাটে। সঙ্গে-সঙ্গে তার অন্যরকম আরাম হল। ওই মেয়েটি কে যাকে কেন্দ্র করেই হয়তো হত্যাকাণ্ডটি ঘটে গেছে; এই প্রশ্নটি হঠাৎই সব ছাপিয়ে মাথায় ঢুকে পড়ল। এইরকম ভাবতেই তার স্নায়ু শিথিল হয়ে এল। ব্র্যান্ডির প্রভাবে এক গভীর ঘুমের ঢেউ তাকে গ্রাস করে নিচ্ছিল দ্রুত। এবং এইসময় তার কানে কান্নার শব্দ পৌঁছাল। নিস্তব্ধ রাত্রে খুব নিচু স্বরের কান্নাকেও এড়িয়ে থাকা যায় না। অনেক কষ্টে ঘুমের ঢেউকে সরিয়ে চোখ মেলল সে। তারপর পাশের বিছানার দিকে তাকাল। কান্নাটা আসছে কম্বলের নিচ থেকে। প্রদীপ কোনওমতে উঠল। সুজাতার খাটের একপাশে গিয়ে বসল সে, 'কী হয়েছে? কাঁদছ কেন?'

কান্নাটা একটু কমল, সামান্যই।

প্রদীপ বলল, 'তোমাকে অপমান করার কোনও ইচ্ছেই আমার ছিল না। আমি সেটা করিওনি।'

মুখ দেখা যাচ্ছে না, সুজাতার গলা শোনা গেল, 'আমি কাল কী করব? কোথায় যাব? আমার তো কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই।' প্রদীপের মনে ঠিক কী প্রতিক্রিয়া হল সে বুঝতে পারল না। কম্বলের প্রান্ত ঈষৎ সরিয়ে সে হাত ঢুকিয়ে সুজাতাকে টেনে নিল কাছে।

তখনও ভোর হয়নি। সুজাতা বলল, 'আমি সঙ্গে যাব।'

প্রদীপ মাথা নাড়ল, 'সেটা ঠিক হবে না। আমি যে ঝুঁকি নেব তাতে তোমার থাকা ঠিক হবে না।'

'আমি তাহলে কী করব?'

'তুমি হোটেলে থাকো। যদি আজ সন্ধের মধ্যে আমি না ফিরে আসি তা হলে—' থেমে গেল প্রদীপ। সে কোথায় যেতে বলবে সুজাতাকে?

'তাহলে—?'

'কালিম্পং-এ চলে যেও। ওখানে আমার দিদি থাকে। ঠিকানাটা লিখে দিচ্ছি। আমার নাম করে বললে তুমি কিছুদিন ওদের ওখানে থাকতে পারবে।'

'আমি সঙ্গে গেলে কোনও উপকারে লাগব না?'

প্রদীপ তাকাল, 'এক কাজ করো। সাড়ে সাতটা নাগাদ হোটেল থেকে বেরিয়ে বাস টার্মিনাসে চলে যাবে। এখান থেকে ট্যুরিস্ট বাস ছাড়ে। এভারেস্ট ট্যুরিজমের বাসের টিকিট কিনবে, যে বাস বর্ডারে যায়। আমি তোমার সঙ্গে দেখা করে নেব। যদি দেখা না হয় তুমি ফিরে এসে আমার দেখা পাবে। ওরকম জায়গায় মোটরবাইকে কাউকে ক্যারি করতে চাইছি না আমি।' পকেট থেকে বেশ কিছু টাকা বের করে প্রদীপ টেবিলের ওপর রাখল। 'কেউ যদি আমার কথা জিজ্ঞাসা করে তাহলে বলবে আমি তিস্তা বাজারে গিয়েছি, বিকেলের মধ্যে ফিরে আসব। এলাম!'

'আমার খুব ভয় করছে।'

'কেন?'

'জানি না।'

'আমি কেমন বাইক চালাই তুমি দেখেছ। আমি একটা স্পট দেখতে যাচ্ছি। দেখা হয়ে গেলে চলে আসব। ভয়ের কোনও কারণ নেই।' প্রদীপ হাসল, 'তোমাকে এখন কিন্তু অন্যরকম লাগছে।' মাথা নিচু করল সুজাতা, 'আমার জীবনে কালকের রাতের মতো রাত আর কখনও আসেনি। কিন্তু নিজের কপালকে আমি জানি, পাওয়ার আগেই সব হারিয়ে যায়।'

হোটেলটা ঘুমন্ত। বাইরে বের হওয়ার সদর দরজা বন্ধ। দরজা খোলাতে গেলে ডাকাডাকি করতে হবে। নিশ্চয়ই কিচেনের দিকে বাইরে যাওয়ার আর-একটা দরজা আছে কিন্তু সেদিকে গেলে বাবুর্চিদের নজরে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। অনেক ট্যুরিস্ট ভোরবেলায় বেড়াতে যাওয়ার আগে চায়ের হুকুম করে। প্রদীপ আবার ঘরে ফিরে এল। গতকাল বাথরুমে গিয়ে সে লক্ষ করেছিল জানলায় কোনও আবডাল নেই। দুটো বড় পাল্লাই ওটাকে ঢেকে রাখে। নিঃশব্দে জানলা খুলল সে। ঝুঁকে নিচে তাকাতে রাস্তাটাকে দেখতে পেল। আধা-অন্ধকারে রাস্তাটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। কোনও মানুষ যে সেখানে নেই তা স্পষ্ট। হিমে ভেজা চারপাশ বড্ড স্যাঁতসেঁতে। সুজাতা পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল। নিচু গলায় প্রদীপ বলল, 'আমি নেমে গেলে জানলাটা বন্ধ করে দিও।'

'পিস্তলটা?'

'নিয়েছি।' ঘুরে দাঁড়াল প্রদীপ। তারপর মেয়েটাকে কাছে টেনে বেশ কিছুটা সময় ধরে ওর ঠোঁটের উত্তাপ নিল। সুজাতার সমস্ত শরীর যে কাঁপছে তা অনুভব করল প্রদীপ। কিছুক্ষণ জড়িয়ে থেকে সে আবার ঘুরে দাঁড়াল। সে স্পষ্ট বুঝতে পারছিল মেয়েটার মনে ভালোবাসা ঢুকে পড়েছে। কাল সকালে ও যেমন ছিল, এখন তেমন নেই। এক্ষেত্রে তার কিছু করার নেই।

জানলার বাইরে শরীর নিয়ে গিয়ে সন্তর্পণে পা রেখে-রেখে একসময় লাফিয়ে পড়তে হল তাকে। যে শব্দটা হল সেটা শোনার জন্যে কেউ জেগে বসে ছিল না। একটু উঁচু থেকে লাফানোর প্রথমে মনে হয়েছিল গোড়ালিতে চোট লেগেছে; পা ছুড়ে বুঝল

ঠিকই আছে। ওপরের দিকে তাকিয়ে সে তখনও সুজাতাকে দেখতে পেল জানলায়। ইশারায় বন্ধ করতে বলে সে হাঁটতে লাগল।

হোটেলের গেটের পাশে কয়েকটা গাড়ির পাশে তার বাইকটা দাঁড় করানো আছে। নিঃশব্দে সেটাকে রাস্তায় নিয়ে এল সে। তখনই মনে পড়ল তেল ভরা দরকার। এখন এই মুহূর্তে শহরের কোনও পাম্প খোলা থাকার কথা নয়। শহরের বাইরে কতদূরে পাম্প পাবে তাও জানা নেই। অতএব এখন পাম্পের সন্ধানে তাকে শহরে টহল দিতে হবে। কাজটা গতকাল সেরে রাখা উচিত ছিল। কিন্তু ভাগ্য প্রতিকূল ছিল না। বাস টার্মিনাসের কাছাকাছি পাম্পটায় আলো জ্বলছিল। দুজন মানুষ এত ভোরেও গুলতানি করছিল সেখানে। এদের বোধহয় শীতবোধ নেই।

তেল ভরতে-ভরতে একজন রসিকতা করল, 'পক্ষীরাজ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কোথায়?'

'রাজকন্যা খুঁজতে।' প্রদীপ জবাব দিল।

'নাম্বার প্লেট দার্জিলিং-এর দেখছি। বরফের ওপর বাইক চালানোর অভ্যেস আছে তো?' তেল ভরতে-ভরতে লোকটা জিজ্ঞাসা করল।

'নেই। করে নেব।'

'সামনে ঝুঁকে চালাবে না।'

দাম মিটিয়ে শহর ছাড়ল প্রদীপ। একবার ভাবল লিটনের খবর নেবে কি না। তারপর মত পালটাল। কাপুরের কিছু হলে লিটন এতক্ষণ চুপ করে বসে থাকার ছেলে নয়। মাঝরাতেও তেমন খবর থাকলে দিয়ে যেত।

এখন অন্ধকার কেটে যাচ্ছে দ্রুত। আকাশ পরিষ্কার। মনে হচ্ছে চমৎকার সূর্যের দিন আসছে একটা। যদিও এই ভোরে বাইক চালাতে বেশ কষ্ট হচ্ছে হাওয়ার দাপটে। আপাদমস্তক ঢাকা সত্ত্বেও ঠান্ডা যেন চুঁইয়ে ঢুকে পড়ছে। প্রদীপ স্পিড বাড়াচ্ছিল না। গতকাল যে ম্যাপটা দেখেছিল সেটাকে মনে করার চেষ্টা করছিল। রাস্তাটা এখন নেমে যাচ্ছে! চমৎকার পিচের মসৃণ রাস্তা। প্রদীপ এখন নিঃসন্দেহ কেউ তাকে অনুসরণ করছে না। এমন ফাঁকা পাহাড়ি রাস্তায় কেউ পেছনে এলে চট করে বোঝা যায়। মাঝে একটা ছোট্ট বসতি পড়ল। চায়ের দোকানে এর মধ্যে আগুন জ্বলছে। বাইকটাকে একপাশে দাঁড় করিয়ে সে দোকানের সামনে গেল, 'চা পাওয়া যাবে ভাই?'

বৃদ্ধ সিকিমিজ মানুষটি মাথা নাড়ল। চারপাশ সুনসান। রাস্তার ওপাশে পাহাড়। পেছনে গোটা দশেক কাঠের বাড়ি। সেখানে কেউ বিছানা ছেড়েছে বলে মনে হয় না।

প্রদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'এখান থেকে বর্ডার কত দূরে?'

'অনেক দূরে!' বৃদ্ধ জবাব দিল, 'আজ বর্ডারে কী আছে?'

'তার মানে? কিছু আছে নাকি?'

'আমি জানি না। একটু আগে যারা চা খেয়ে গেল তারাও জিজ্ঞাসা করছিল বর্ডারের কথা।'

প্রদীপ তাকাল, 'কতক্ষণ আগে?'

'এই তো।' তখনও না ধোওয়া গ্লাস দেখাল বৃদ্ধ। দুটো গ্লাস।

'ওরা কীসে এসেছিল?'

'জিপে।'

'এত ভোরে লোকে যায়?'

'খুব কম।'

চা খেল প্রদীপ। এখনও গ্যাংটক থেকে কোনও গাড়ি আসছে না। ট্যুরিস্ট বাসের আসার সময় হয়নি। লোকদুটো কারা? তার আগে যখন এপথ দিয়ে গিয়েছে তখন নিশ্চয়ই ওদের তাড়া আছে, নইলে অন্ধকার থাকতেই গ্যাংটক ছাড়ত না। পেছনে কেউ থাকলে তাকে মাপা যায় কিন্তু সামনে যে গেছে তার মতলব বোঝা মুশকিল। এমন হতে পারে ওরা আরও নির্জন কোনও পাহাড়ি বাঁকে তার জন্যে অপেক্ষা করছে। সে সতর্ক হলেও কিছু করতে পারবে না ওরা যদি আচমকা আক্রমণ করে। পরমুহূর্তেই হাসি পেল। সে যে এই সাতসকালে হোটেল ছেড়ে বের হবে তা গতরাত্রে পাশে শুয়ে সুজাতাও জানত না। শত্রুপক্ষের আন্দাজ যত শক্তিশালী হোক, তারা অন্তর্যামী নয়। অতএব যারা গিয়েছে নিজেদের প্রয়োজনেই গিয়েছে।

আবার বাইক চালু করল সে। নিজের ইঞ্জিনের আওয়াজ ছাপিয়ে অন্য কোনও শব্দ তার কানে ঢুকছিল না। এখন রাস্তা ঘন-ঘন বাঁক নিচ্ছে। আগের জিপটা কতদূরে আছে তা ঠাওর করা অসম্ভব। ঘণ্টা ছয়েক টানা চলে এল প্রদীপ। এর মধ্যে ছোটখাটো অনেকগুলো জনবসতি ছাড়িয়েছে কিন্তু কোথাও জিপটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেনি সে। ক্রমশ গাছপালার চেহারা বদলাতে শুরু করেছে। এবার রাস্তার পাশে মিলিটারিদের প্রতীকচিহ্নগুলো নজরে আসছে। অর্থাৎ বর্ডার খুব বেশিদূরে নেই।

খানিকটা এগোতেই বাঁ দিকে একটা রাস্তা নেমে যেতে দেখে দাঁড়াল সে। রাস্তার মোড়ে যেসব বোর্ড পোঁতা তাতে বোঝা যাচ্ছে এদিকে মিলিটারিদের কোনও ডেরা রয়েছে। বর্ডারের কাছাকাছি সেটা থাকা সম্ভব। তখনই তার খেয়াল হল, ট্যুরিস্ট বাসগুলোর মধ্যে যেগুলো বর্ডারের কাছাকাছি আসে তারা নিশ্চয়ই বিশেষ পারমিট সঙ্গে রাখে। নিশ্চয়ই পারমিট ছাড়া বিশেষ পয়েন্টের ওপাশে যাওয়া বেআইনি। তেমন হলে সে কী করবে?

বাইক চালাল প্রদীপ। আগের জিপের ভাগ্যে যা আছে তার ক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই একই হবে। তবে বাধা পেলে অন্য রাস্তা ধরা ছাড়া কোনও উপায় নেই। ঠান্ডা বাড়ছে। ওপর দিকে উঠতে হচ্ছে তাকে। এবং তারপরেই রাস্তায় গুঁড়ি-গুঁড়ি তুষার দেখতে পেল সে। গতি কমিয়ে পেছন দিকে ওজন রেখে সে কিছুটা চলতেই সদ্য যাওয়া জিপের চাকার দাগ দেখতে পেল। তুষারের ওপর চমৎকার চিহ্ন রেখে গিয়েছে জিপটা। একটু-একটু করে তুষার ঘন হচ্ছে। আশেপাশের গাছের পাতা সাদা হয়ে এসেছে। গাছগুলোও ঘন নয়। জিপের দাগের ওপর চাকা রেখে বাইক চালাচ্ছিল প্রদীপ। স্লিপ খাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও চালাতে সুবিধে হচ্ছিল তাতে।

একসময় বরফে চারপাশ ছেয়ে গেল। আর সেই বরফের ওপর তিরতিরে নরম রোদ যখন এসে পড়ল তখন মনে হল স্বর্গ যদি কোথাও থাকে তো সেটা এখানেই। খুব ধীরে প্রায় কুড়ি কিলোমিটার স্পিডে চালাচ্ছিল প্রদীপ। অনেকক্ষণ কোনও মানুষ বা জনপদ তার চোখে পড়েনি। এসব অঞ্চলে পাহাড়ের গায়ে যে গ্রাম থাকা খুবই স্বাভাবিক তা সে জানে। কিন্তু চোখে কিছু পড়ছিল না। আরও আধঘণ্টা যাওয়ার পর প্রদীপ বাইক

থামাল। জিপটা সামনে এগোয়নি। চাকার দাগ হঠাৎ মূল পথ ছেড়ে উঠে গেছে ডান দিকে। সেই দাগটা স্পষ্ট। দুটো বড় গাছের ফাঁক দিয়ে যে পথ আছে তা বরফের আস্তরণ ভেদ করে বোঝা মুশকিল যদি না ড্রাইভারের জানা থাকে।

জিপের ড্রাইভার আর সরাসরি এগোতে চায়নি। কিন্তু ওই চোরা পথে যখন জিপ নিয়ে যাওয়ার সাহস দেখিয়েছে তখন বোঝাই যায় বাইক যেতে পারে। কিন্তু প্রদীপ সোজা এগিয়ে যাবে বলে ঠিক করল। ট্যুরিস্ট বাস ওই পথে কিছুতেই নামতে পারবে না। অতএব যে পথে বাসগুলো যাওয়া-আসা করে সেই পথে যাওয়াই ভালো। চেকপোস্ট এলে দেখা যাবে।

খানিকটা যেতেই প্রদীপ বুঝতে পারল খুব ভুল হয়ে গিয়েছে। সঙ্গে গগলস আনা উচিত ছিল। এখন চারদিকের পৃথিবীটা কীরকম ধূসর সাদা। তার ওপর রোদ পড়ায় চোখে প্রতিফলন পড়ছে। এই রকম আলো বা বরফের দিকে বেশিক্ষণ তাকানো যায় না। অনেক দূরে বরফের ওপর কিছু একটা দৌড়ে গেল। সেই কালো জন্তুটা আর যাই হোক ব্ল্যাক লেপার্ড নিশ্চয়ই নয়। ভদ্রলোক দারুণ গল্প ফেঁদেছিলেন। তার মতো ছেলেও সেই গল্প শুনে বিশ্বাস করে ফেলেছিল।

শেষপর্যন্ত একটা পুলিশ ফাঁড়ির সামনে পৌঁছে গেল সে। পাহাড়ের গায়ে বরফে ঢাকা পুলিশ ফাঁড়ির সামনে দুটো জিপ দাঁড়িয়ে আছে। আশেপাশে কয়েক ঘর মানুষের বাস। মুদি এবং চায়ের দোকানে সদ্য ভোর হয়েছে যেন। বাইক থামিয়ে নেমে দাঁড়াল প্রদীপ। সম্ভবত এটাই সেই পুলিশ স্টেশন যেখানে বাস ড্রাইভার চন্দ্রনাথ খবরটা দিয়েছিল। আর সম্ভবত এই সেই পুলিশ স্টেশন যেখান থেকে খবরটা দার্জিলিং-এ পৌঁছে যায়। শেষের ব্যাপারটা তার অনুমান হতে পারে। হতে পারে ঘটনা অন্য। তবু সতর্ক হয়ে এগোল প্রদীপ।

কাঠের পুলিশ ফাঁড়ির সিঁড়িও বরফে ঢাকা। বারান্দায় উঠতে-উঠতে জামা এবং মাথা থেকে তুষার ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করছিল প্রদীপ। বারান্দায় কেউ নেই। প্রথম ঘরটার দরজায় দাঁড়িয়ে সে দেখতে পেল দুজন লোক ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বালিয়ে কথা বলছে। এদের দেখে নিচের দিকের পুলিশ কর্মচারী বলে মনে হল। পায়ের আওয়াজ পেয়ে ওরা তাকাল। প্রদীপ হাসার চেষ্টা করল, 'গুড মর্নিং'।

সঙ্গে-সঙ্গে দুজন সোজা হয়ে দাঁড়াল। ভাবভঙ্গিতে মনে হচ্ছিল ওরা ওপরতলার কোনও অফিসারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। প্রদীপ তৎক্ষণাৎ গলা মোটা করল, 'অফিসার ইনচার্জ কোথায়?'

'উনি খুব অসুস্থ। গতকাল বিকেলে গ্যাংটকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে স্যার।'

'কী হয়েছে?'

'জ্বর। ম্যালেরিয়াও হতে পারে। একবার আমার ভাই-এর ওইরকম কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এসেছিল।' সঙ্গী তাকে ইশারা করল ফালতু কথা না বলতে।

'সেকেন্ড অফিসার?'

'নেই স্যার। আসলে আর একটু এগোলেই মিলিটারি বসে—।'

'বুঝতে পেরেছি।'

'বসুন স্যার। চা আনব? অ্যাই রাই, জলদি চা—।'

লোকটা বলামাত্র রাই ছুটল চা আনতে।

প্রদীপ বসল না। আজ এখানে এদের অচেনা উচ্চপদস্থ কারও আসার কথা আছে। কোনওরকম জিজ্ঞাসাবাদ ছাড়া যখন এরা তাকে সেই ভূমিকায় ভাবছে তখন এদের নিয়ে তার চিন্তা করার কিছু নেই। সে তাকাল। একটা কালো বেড়াল ফায়ার প্লেসের পাশে বসে আগুন পোয়াচ্ছে। প্রদীপ বলল, 'তুমি দেখছি বেশ স্মার্ট। গুড। ডেডবডিটা কোথায়?'

'ডেডবডি? কার ডেডবডি?'

'শোনো, আমাকে সত্যি কথা বললে তোমার প্রমোশন আটকাবে না।' লোকটা ঠোঁট চাটল। তারপর বলল, 'বড়বাবু নিষেধ করেছিল বলতে। তা হোক, বলছি। আমরা ওটাকে তুলে আনিনি। বরফ চাপা দিয়ে এসেছি।'

'সে কি? কেন?'

'স্যার, ডেডবডি আনা মানেই ঝামেলা। অনেক এনক্যুয়ারি করতে হয়। পাতার পর পাতা রিপোর্ট। তারপর বডি নিয়ে গ্যাংটকে যেতে হবে পোস্টমর্টেমের জন্যে।'

'অয়ারলেস না টেলিফোন, কী আছে?'

'দুটোই, তবে টেলিফোনের লাইন প্রায়ই খারাপ থাকে।'

'এখন কীরকম আছে?'

'ভালো।'

'বডিটা কোথায় চাপা দিয়েছ?'

'যেখানে মার্ডারটা হয়েছিল স্যার।'

পেছনে টাঙানো ম্যাপের দিকে তাকাল প্রদীপ, 'ঠিক কোন জায়গায়?'

লোকটা এগিয়ে গেল ম্যাপের দিকে। আঙুল তুলে জায়গাটা দেখাল। প্রদীপ লক্ষ করল এর মধ্যে ওই জায়গাটার নিচে দাগ দেওয়া আছে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'ওখান থেকে বর্ডার কতদূরে? কতক্ষণ লাগে যেতে?'

'স্যার, আধঘণ্টার পথ।'

এই সময় চা নিয়ে রাই ফিরে এল। টেবিলের ওপর রেখে বলল, 'স্যার চেয়ারে বসে খেয়ে নিন, এখানে যত গরমই হোক চট করে ঠান্ডা হয়ে যায়।'

প্রদীপ চেয়ারে বসল। সম্ভবত অফিসার ইনচার্জের চেয়ার এটা। তার বেশ মজা লাগছিল। চা আনামাত্র বেড়ালটা চলে এল পায়ের কাছে। কোনওরকম শব্দ না করে তাকিয়ে রইল গ্লাসের দিকে।

'স্যার বিস্কুট খাবেন?' রাই জিজ্ঞাসা করল।

প্রদীপ কিছু বলার আগেই দ্বিতীয়জন খিঁচিয়ে উঠল, 'তোর মাথায় কী বুদ্ধি! একেবারে আনতে পারলি না? যাই, আমি নিয়ে আসি।' লোকটা বেরিয়ে গেল। এবার রাই বলল, 'আমি স্যার আপনার থাকার ব্যবস্থা করি।'

লোকদুটো যেন সামনে থেকে চলে যেতে পারলে বাঁচে। গ্লাসটা হাতে ধরতেই উত্তাপে আরামবোধ হল। এইসময় বেড়ালটা ডেকে উঠল, 'ম্যাঁও।'

প্রদীপ বলল, 'এতো পড়ে পাওয়া চোদ্দো আনা। নাও, তুমি একটু গেল।' সে গ্লাসের চা মেঝেতে ঢালতেই বেড়ালটা চকচক করে চেটে নিল। প্রদীপ চা মুখে দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার চোখ আটকে গেল বেড়ালটার ওপরে। ছটফট করে গড়াগড়ি খাচ্ছে

বেড়ালটা। মুখ দিয়ে লালা গড়াচ্ছে। তারপর স্থির হয়ে গেল বেচারা।

প্রদীপ সোজা হয়ে বসল। মৃত বেড়ালটার ওপর থেকে চোখ সরিয়ে সে চারপাশে তাকাল। এটা একটা পুলিশ স্টেশন। যে দুটো লোক এখানে ছিল তারা পুলিশ। কিন্তু স্যার-স্যার বলে সম্মান দেখিয়ে ওরা তাকে বিষ মেশানো চা খাওয়াতে চাইল কেন? যদি বেড়ালটা তাকে বিরক্ত না করত তা হলে এতক্ষণে তার অবস্থা ওর মতো হতো। প্রদীপ উঠল। বেড়ালটাকে তুলে ফায়ারপ্লেসের কাছে নিয়ে গিয়ে এমন ভঙ্গিতে শুইয়ে দিল যাতে মনে হবে ও ঘুমোচ্ছে। তারপর আবার চেয়ারে এসে বসল। কী করবে সে এখন? এমন ভান করবে যে লোকগুলো ফিরে এসে ভাববে সে মৃত। কিন্তু তাহলে তো বেশিক্ষণ সেই অভিনয় করা যাবে না।

পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। বারান্দা থেকে রাই তাকে দেখতে পেয়ে যেন অবাক হয়ে গেছে। বেশ হতভম্ব হয়েই লোকটা দাঁড়িয়ে পড়ল।

প্রদীপ তাকে ডাকল, 'কী হল? এসো?'

লোকটা ভূতগ্রস্তের মতো এগিয়ে এল।

'বিস্কুট পাওয়া গেছে?'

'হয়ে না, মানে, আনছি।'

'আরও দুটো গ্লাস নিয়ে এসো।'

'কেন? গ্লাস কেন?'

'এতখানি চা আমি একা খেতে পারব না। তোমরাও খাবে।'

'আমরা স্যার চা খেয়েছি।'

'তাতে কিছু হবে না। ঠান্ডায় বারংবার চা খাওয়া যায়।'

'না স্যার। খেলে আমার শরীর খারাপ হয়।'

এই সময় দ্বিতীয় লোকটি ফিরে এল। প্রদীপ তার দিকে গ্লাস এগিয়ে দিল, 'নাও চা খেয়ে নাও। আমার পেটটা ঠিক নেই।'

দ্বিতীয় লোকটা এগিয়ে আসছিল। প্রদীপ বাধা দিল না। লোকটা গ্লাস তুলে নিতে রাই ছটফট করে উঠল, 'খেয়ো না। খবরদার বলছি—।'

লোকটা অবাক হয়ে তাকাল।

প্রদীপ উঠে তার হাত থেকে গ্লাস কেড়ে নিল, 'খেলে তোমার অবস্থা ওই বেড়ালটার মতো হবে। এই গ্লাসের চা ও কিছুটা খেয়েছে।'

দ্বিতীয় লোকটা বিস্ফারিত চোখে বেড়ালটাকে দেখল। সে যেন কিছুই বুঝতে পারছিল না।

প্রদীপ গ্লাসটাকে চোখের সামনে ধরে বলল, 'আমাকে মারার জন্যে মিস্টার রাই এই গ্লাসে বিষ মিশিয়ে নিয়ে এসেছিল। তাই তো মিস্টার রাই?'

'আমি কিছু জানি না স্যার!'

'মিস্টার রাই জানে আমি কোনও সিনিয়ার পুলিশ অফিসার নই। তবু আমাকে স্যার-স্যার বলে খাতির করছে। তোমাকে ও কী বলেছিল?'

'বলেছিল একজন বড় অফিসার আসবে।' দ্বিতীয় লোকটির তখনও মাথা পরিষ্কার হয়নি।

'কখন বলেছিল?'

'আধঘণ্টা আগে। শহর থেকে টেলিফোন এসেছিল।'

'কে ধরেছিল?'

'ও স্যার।'

'তোমার কিছু বলার আছে রাই?'

'পরশুদিন যখন একটা ট্যুরিস্ট বাসের ড্রাইভার এসে এখানে মার্ডারের কথা রিপোর্ট করে তখন অফিসার ইনচার্জ ছিলেন?'

প্রদীপ রাই-এর দিকে এগিয়ে গেল।

'ছিলেন।'

'তিনি গিয়েছিলেন এনক্যুয়ারি করতে?'

'না। শরীর খারাপ বলে রাইকে পাঠিয়েছিলেন। আমিও সঙ্গে গিয়েছিলাম।' দ্বিতীয়জন বলল।

'তারপর?'

'ঝামেলা বাড়বে বলে ও ডেডবডি বরফ চাপা দেওয়ার প্রস্তাব দিল। আমি রাজি হয়ে গেলাম।'

এইসময় রাই যেন নার্ভ ফিরে পেল। আচমকা চিৎকার করে উঠল সে, 'এই মাথামোটা! কার কাছে এসব বলছিস? এই লোকটা পুলিশ নয়।'

প্রদীপ এগিয়ে গেল ঘরের আর এক কোণে যেখানে টেলিফোনটা রয়েছে। রিসিভার তুলে ডায়াল টোন শুনল। তারপর বলল, 'এখানে ফিরে যে প্রথম সুযোগেই তুমি গ্যাংটকে টেলিফোন করে খবরটা দিয়েছিলে রাই। কোন নম্বরে?'

'আমি কিছুই করিনি।'

টেলিফোনে ডায়াল করার ব্যবস্থা নেই। হঠাৎই অপারেটারের গলা শোনা গেল। প্রদীপ তাকে বলল, 'দার্জিলিং-এর লাইন চাই। জরুরি। পাওয়া যাবে?'

লোকটা বলল, 'চেষ্টা করছি। নাম্বারটা বলুন।'

প্রদীপ নাম্বার বলল। রিসিভার নামিয়ে রেখে প্রদীপ বলল, 'গ্যাংটকে তুমি যার সঙ্গে কথা বলেছ আমি তার বসের সঙ্গে কথা বলছি।'

'আমি কিছু জানি না।'

'তুমি সব জানবে।'

'আমি কাউকে ফোন করিনি।'

'তাহলে কেউ এখানে ফোন করেছিল?'

'একজন জানতে চেয়েছিল মার্ডারের ব্যাপারে কোনও রিপোর্ট কেউ করেছে কি না।'

'তুমি জানিয়ে দিয়েছিলে। এবং সে বলেছিল ডেডবডিটা হাপিস করে দিতে।' প্রদীপ কথা শেষ করা মাত্র রিঙ হল। অপারেটার বলল, 'দার্জিলিং লাইনে আছে কথা বলুন।'

একটু গলা তুলে প্রদীপ বলল, 'হ্যালো।'

ওপাশ থেকে ক্ষীণ আওয়াজ এল, 'ইয়েস। হু ইজ স্পিকিং?'

'প্রদীপ।'

'তুমি কোথায়?'

'বর্ডারের কাছাকাছি পুলিশ স্টেশনে। মনে হচ্ছে আপনার তিন নম্বর ফটোগ্রাফারকে আজই পেয়ে যাব। এখন আপনার প্রতিশ্রুতি মতো টাকাটা রেডি করুন।'

'টাকার জন্যে চিন্তা করো না। দার্জিলিং-এ ফিরে এলেই তুমি পেয়ে যাবে।'

দার্জিলিং-এ তুমি আমাকে কখনওই ফিরতে দেবে না। মনে-মনে বলল প্রদীপ। 'কিন্তু এই পুলিশ স্টেশনের একটি লোক যার নাম রাই, তাকে নিয়ে সমস্যা হচ্ছে।'

'কী রকম?'

'লোকটা বলছে এখানে ব্ল্যাক লেপার্ড কোনওকালে ছিল না। সেদিন ওই স্পটে একটা খুন হয়েছে। ড্রাইভার নাকি সেইরকম রিপোর্ট করেছিল।'

'কে বলেছে? কী নাম বললে?'

'রাই।'

'খুন নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। তুমি তিন নম্বরকে বের করে সঙ্গে-সঙ্গে আমাকে রিপোর্ট করো।' লাইনটা কেটে গেল অথবা কেটে দিলেন ভদ্রলোক।

রিসিভার নামিয়ে প্রদীপ হাসল, 'তাহলে মিস্টার রাই, এখন কী করবে?'

'আমি কিছু জানি না।'

'কিন্তু ওরা জানবে। আমার ফোন রেখেই গ্যাংটকে অর্ডার যাবে তোমাকে সরিয়ে ফেলার। যারা তোমাকে আমার এখানে আসার খবর দিয়ে বিষ মেশাতে বলেছিল তারাই তোমাকে সরাতে আসবে। পুলিশে চাকরি করে তুমি বেশ আরামে ছিলে, হঠাৎ কোন লোভের ভূত তোমার মাথায় চেপেছিল?'

প্রদীপের বলার ভঙ্গিতে এমন কিছু ছিল যে লোকটা নিজেকে সামলাতে পারল না। একটা চেয়ারে বসে পড়ে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল।

প্রদীপ অন্য লোকটিকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি এসব জানো?'

লোকটা মাথা নাড়ল পুতুলের মতো, না।

প্রদীপ এগিয়ে গেল, 'এখনও যদি বাঁচার ইচ্ছে থাকে তাহলে সত্যি কথা বলো রাই।'

লোকটা চোখ মুছল। শ্বাস টানল। তারপর বলল, 'আমি ট্রান্সফার চেয়েছিলাম। এই বরফের মধ্যে পড়ে থাকতে আমি আর পারছিলাম না। ওরা আমাকে কথা দিয়েছিল। একটা ছেলে আর একটা মেয়েকে খুঁজতে এসেছিল ওরা। বলেছিল কোনও খবর পেলেই যেন গ্যাংটকে জানিয়ে দিই। ওদের অ্যারেস্ট করা চলবে না, ভুল বুঝিয়ে ধরে রাখতে হবে। তার জন্যে টাকা তো দেবেই, বদলিও করাবে।'

'তারপর?'

'ওরা আমাকে মেরে ফেলবে। ওরা সব পারে!' আবার ককিয়ে উঠল লোকটা।

'তুমি এখনও মরোনি!'

'কেন আপনি আমার নামে মিথ্যে কথা বললেন?'

'তুমি একটু আগে আমাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলে, তাই না?'

'আমাকে ওরা টেলিফোনে সেই হুকুম করেছিল।'

'কে করেছিল?'

'লোকটার নাম আমি জানি না।'

'কোত্থেকে করেছিল?'

'বোধহয় গ্যাংটক থেকে। অন্য একটা গলায় পেট্রলের দাম চাইতে শুনেছিলাম।'

তার মানে সেই পাম্প থেকে যেখানে সে তেল নিয়েছিল। ওদের নেটওয়ার্ক বেশ মজবুত।

'বডিটাকে সরিয়েছ?'

'না। এখনও পারিনি। একা পারা যায় না।'

'তোমার এই বন্ধুটিকে সঙ্গে নিলে পারতে।'

'তাহলে ওকে সব বলতে হতো।'

'কত টাকা পেয়েছ এর মধ্যে?'

'বিশ্বাস করুন, একটা টাকাও আমি পাইনি।' লোকটা কথা বলছিল আর চমকে বাইরের দিকে তাকাচ্ছিল। প্রদীপ বলল, 'শোনো রাই, আমি নিশ্চিত তোমার জন্যে ওরা রওনা হয়ে গেছে। হয়তো আমার জন্যেও। তুমি এখনই এখান থেকে পালাও।'

'কোথায় যাব? চারপাশে বরফ।'

'যেখানে হোক গিয়ে লুকিয়ে থাকো। দুপুরে ট্যুরিস্ট বাসগুলো এলে তাতে উঠে বসো।'

'ট্যুরিস্ট বাস এখান থেকে প্যাসেঞ্জার তোলে না।'

'তুমি পুলিশ, তোমাকে তুলবে।'

'কিন্তু পারমিশন ছাড়া ক্যাম্প ছেড়ে যাওয়া নিষেধ।'

'তাহলে তোমার প্রাণ শরীর ছেড়ে যাবে।'

এবার অন্য লোকটি কথা বলল, 'রাই, যা হওয়ার তা হয়েছে। তুই এক নম্বর গুহায় গিয়ে লুকিয়ে থাক। ওরা তোকে খুঁজে পাবে না।'

রাই ছুটল। কয়েক মিনিটের মধ্যে একটা ব্যাগ আর দুটো কম্বল নিয়ে হাজির হল সে।

প্রদীপ জিগ্যেস করল, 'এক নম্বর গুহাটা কত দূরে?'

'এখান থেকে মিনিট চল্লিশ হাঁটতে হয়। ডান দিকের সরু পথ ধরে পাহাড়ের ওপরে।'

'গাড়ি যায় না?'

'একটা জিপ কাছাকাছি যেতে পারে উলটো দিক দিয়ে। আমি অনেকদিন যাইনি ওখানে। তুই গিয়েছিস?'

অন্য লোকটি মাথা নাড়ল, 'না। তবে কোনও মানুষ তো ওখানে যাবে না।'

'চলো, তোমাকে আমি এগিয়ে দিচ্ছি।' যেতে গিয়েও ঘুরে দাঁড়ায় প্রদীপ। অন্য লোকটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি এখন একা থাকবে। ওরা এসে তোমাকে জিজ্ঞাসা করলে তুমি কী বলবে?'

লোকটি বিপদে পড়ল। মাথা নেড়ে বলল, 'বলব আমি কিছু জানি না।'

'ওরা বিশ্বাস করবে না। তোমার ওপর এমন চাপ দেবে, সে সত্যি কথা বলতে বাধ্য হবে। তুমি যদি তোমায় সহকর্মীকে বাঁচাতে চাও তাহলে অন্য কথা বলতে হবে।'

'বলুন।'

'বলবে আমি এখানে আসার পর ওর সঙ্গে ঝামেলা হয়। আমি পিস্তল দেখিয়ে তোমাদের ভয় দেখাই। তারপর কোথাও ফোন করি। সেই সুযোগে আমার হাত থেকে বাঁচার জন্যে ও পালায়। কোথায় পালিয়ে গেছে তা তুমি জানো না।'

'আপনার কথা যদি জিজ্ঞাসা করে?'

'করবেই। বলবে আমি বাইক নিয়ে বর্ডারের দিকে চলে গেছি। ওরা যাই বলুক এর বেশি তুমি কিছু জানো না। এর বেশি কথা বললে ওরা তোমাকেও ছাড়বে না।'

বাইরে বেরিয়ে রাস্তার দিকে তাকাল প্রদীপ। ওরা কতটা পেছনে আছে বলা যাচ্ছে না। কিন্তু তৃতীয় ফটোগ্রাফারকে পাওয়ার আগেই ওরা তাকে সরিয়ে ফেলতে চাইল কেন? হঠাৎ মেরুদণ্ড শিরশির করে উঠল ওর। কাপুর এবং লিটনের অস্তিত্ব কি ওরা টের পেয়ে গেছে? লিটনকে অনুসরণ করে ওরা যদি সানশাইন হোটেলে পৌঁছায় তাহলে কাপুরকে খুঁজে বের করতে অসুবিধে হবে না। কাপুর সম্পর্কে লিটনের কৌতূহলই ওদের কাছে তৃতীয় ফটোগ্রাফারের হদিশ পাইয়ে দেবে। নিজের আঙুল কামড়াতে ইচ্ছে করছিল প্রদীপের। ইচ্ছে হচ্ছিল আবার ভেতরে ঢুকে টেলিফোনে সানশাইন হোটেলে খোঁজ নেয় লিটন কেমন আছে। এই সময় রাই বলে উঠল, 'স্যার!'

লোকটার দিকে তাকাল প্রদীপ। জলে ভেজা বেড়ালের মতো অবস্থা। আর দেরি করলে সে দুজনের বিপদ ডেকে আনবে। বাইক চালু করে সে বলল, 'পেছনে বসো। যদি কোনও বদ মতলব থাকে তাহলে জেনো আমি তোমাকে নিয়ে মরব।'

'না স্যার! আমি বাঁচতে চাই, সত্যি বলছি।'

'উঠে বসো। কোন দিক দিয়ে যেতে হবে বলে দাও।'

রাই-এর দেখানো পথে বাইক চালানো প্রদীপ। কিছুটা নামার পর গাড়ি যাওয়ার পথ ছেড়ে সরু পথ দিয়ে বাইক চালাতে লাগল সে। এত নরম তুষার রাস্তায় ছড়িয়ে যে বাইকে গতি তোলা যাচ্ছিল। ইঞ্জিন আওয়াজ করছিল বিশ্রীভাবে। অনেকটা ওঠার পর যখন নিচের রাস্তা অদৃশ্য তখন বাইক দাঁড় করালো প্রদীপ। লোকটা বসে আছে পেছনে পুতুলের মতো। সে জিজ্ঞাসা করল, 'লাশটাকে কোথায় ঢেকে রেখেছ?'

'নিচের রাস্তায় স্যার। এখান থেকে কিছুটা এগিয়ে রাস্তার ডান দিকে তিনটে বড় ন্যাড়া গাছ পাশাপাশি আছে। দেখলে মনে হবে তিন ভাই। তার পেছনে।'

'মার্ডারটা কোথায় হয়েছিল?

'ওখানেই।'

'এখান থেকে ওখানে পৌঁছবার কোনও শর্টকাট রাস্তা আছে?'

'আরও একটু এগোলে সোজা নিচে নেমে যেতে পারবেন। তবে বাইক যাবে না।'

'এক নম্বর গুহা আর কতদূরে?'

'এই পাহাড়ের ওপাশে। একটু এগোলেই দেখা যাবে।'

আবার বাইক চালাল প্রদীপ। তুষারে চাকা আটকে যাচ্ছে। কোনওমতে মিনিট

দশেক যাওয়ার পরে রাই বলল, 'এখানে আমাকে নামিয়ে দিন স্যার।'

বাইক থামিয়ে প্রদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'গুহাটা কোথায়?

আঙুল তুলে উঁচুতে দেখাল রাই। 'সোজা ওপরে উঠে যেতে হবে। বরফ ভেঙে ওঠা খুব মুশকিল। তারপর খানিকটা উত্তরে গেলে গুহাটাকে দেখা যাবে।'

'ঠিক আছে। তুমি ওখানে অপেক্ষা করো। ট্যুরিস্ট বাস কখন এখানে আসে?'

'দুপুর একটা নাগাদ। ফিরে যায় আধঘন্টা পরে।'

'কিন্তু সেটা নিশ্চয়ই নিচের রাস্তা দিয়ে যায়।'

'হ্যাঁ স্যার। ওপাশ থেকে নামলে রাস্তাটা কাছে পড়বে।'

'তা হলে ওই বাস ধরার চেষ্টা করে বাস গ্যাংটকে ঢোকার আগেই নেমে পড়বে। কখনওই গ্যাংটকের স্ট্যান্ডে নেমো না।'

'না স্যার। আমার বাড়ি শহরে ঢোকার আগেই।'

'ঠিক আছে। তবে দয়া করে আজ নিজের বাড়িতে যেও না। যাও।'

রাই নেমে গেল। হাত তুলে মাথায় ঠেকিয়ে সে বরফ ভেঙে পাহাড়ে উঠতে লাগল। যেহেতু রাস্তা থেকে এ জায়গাটা দেখা যায় না তাই সে নিশ্চিত ছিল।

বাইক চালিয়ে আর মাত্র দেড়শো গজ যেতে পারল প্রদীপ। বরফে এখন চাকা ঢেকে যাচ্ছে। নেমে পড়ে চারপাশে তাকাল। তার নজর পড়ল পিছনে। কাঁচা বরফে বাইকের চাকা চমৎকার দাগ রেখে উঠে এসেছে। সে দৌড়ে অনেকটা নিচে নেমে এল বাইক রেখে। তারপর পা দিয়ে দাগ মুছতে লাগল যতটা সম্ভব। আর আধঘন্টা সময় পেলে নতুন পড়া তুষার এই মোছার দাগটাও ঢেকে দেবে। মুছতে-মুছতে বাইকের কাছে পৌঁছে সে নিশ্বাস ফেলতে লাগল দ্রুত। এখন একেবারে ন্যাড়া পাহাড়ে সাদা বরফের ওপর দাঁড়িয়ে আছে সে। অল্প দূরত্ব থেকেই শত্রুপক্ষ তাকে দেখতে পারে। দূরপাল্লার অস্ত্রে তাকে টার্গেট করতে একটুও অসুবিধে হবে না। প্রদীপ চারপাশে তাকাল। এই বাইক নিয়ে নিচে আসা অসম্ভব। আবার এটাকে এভাবে ফেলে রাখাও যায় না। সূর্যের আলো পড়লে অনেকদূর থেকেও লোকে চকচকে জিনিসটা দেখতে পাবে। সে বাইকটাকে টেনে আরও একটু এগোতে চেষ্টা করল। এবং তারপরেই পাহাড়ের খাঁজটা চোখে পড়ল। ওই খাঁজে এতবড় বাইকটা খুব ভালোভাবে ঢুকে যাবে। এখানে এসে উঁকি না মারলে কারও চোখে পড়বে না। বাইকটাকে আড়ালে ঢুকিয়ে প্রদীপ চাকার দাগ মুছতে লাগল। চেপে-চেপে বরফ সমান করা বেশ পরিশ্রমের কাজ।

মোটামুটি সন্তুষ্ট হয়ে সে ওপরে তাকাল। রাই-এর শরীরটা এখন একটা আরশোলার মতো দেখাচ্ছে। বোঝাই যাচ্ছে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেছে লোকটা। একটা সাধারণ মানুষ হঠাৎ লোভে পড়ে যখন কিছু অন্যায় করে ফেলে তখন তার মাথা ঠিকঠাক কাজ করে না। রাই তাই করেছিল। আইনের চোখে ও অন্যায় করেছে। এমন সরকারি কর্মচারীর শাস্তি হওয়া দরকার। কিন্তু সেই শাস্তি দেবে সরকার। কয়েকটা ভাড়াটে খুনি নয়। নিচের রাস্তা কতটা নিচে না নামলে জানা যাবে না। বাইক লুকোনোর জায়গাটা ভালো করে লক্ষ করল সে। পাথরের একটা ফালিকে বেখাপ্পা লাগছে তীক্ষ্ণ ভাবে উঁচিয়ে থাকায়। ওটাই দিক দেখাবে। নিচের রাস্তা থেকে উঠে আসার সময় অনেকটা পথ বাইকের চিহ্ন থেকে গেছে। সে যেখান থেকে মুছতে শুরু করেছিল সেখানে এসে অনুসরণকারীরা

ধাঁধায় পড়বে। অবশ্য এই অবধি আসতে ওদের যে সময় লাগবে তার মধ্যে নতুন পড়া তুষার বাইকের চাকার দাগ মুছে ফেলবে বলে ওর বিশ্বাস হল।

ধীরে-ধীরে প্রদীপ নামতে শুরু করল। পাহাড় বরফ না থাকলে ওঠা যত সহজ নামা তার চেয়ে ঢের বেশি কঠিন। সমস্ত শরীর ব্যবহার করতে হচ্ছিল প্রদীপকে। সামান্য অমনোযোগী হলেই পা পিছলে কয়েকশো গজ নিচে পড়ে যাবে সে। সে যেখান দিয়ে নামছে তার দুপাশে পাহাড়ের আড়াল। শুধু দূরের ভ্যালিতে না দাঁড়ালে কেউ তাকে দেখতে পাবে না। আধঘন্টার প্রতিটি সেকেন্ড টানটান হয়ে নেমে প্রদীপ জিরোতে চাইল। নিচে, শ-দুয়েক গজ নিচে রাস্তাটা দেখা যাচ্ছে।

হঠাৎ আকাশে এক ঝাঁক মেঘ উড়ে আসায় ছায়া নামল বরফের ওপর। প্রদীপ শরীরটাকে একটা ন্যাড়া গাছের গুঁড়িতে আটকে চারপাশে দেখতে লাগল। মাথার ওপর মেঘ জমছে। রোদ আর কোথাও নেই। রাস্তাটা ফাঁকা। হঠাৎ পাহাড়টা যেন কেঁপে উঠল। গুলি ছোড়ার শব্দ প্রতিধ্বনিত হতে লাগল পাহাড়ে-পাহাড়ে।

প্রদীপ তাকাল। তার আশেপাশে কেউ গুলি ছোড়েনি এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত। কিন্তু গুলির শব্দ বলে দিচ্ছে এই পাহাড়ে সে এবং রাই ছাড়া অন্তত তৃতীয় কোনও ব্যক্তি রয়েছে। মিনিট পাঁচেক চুপচাপ পড়ে রইল সে। দ্বিতীয়বার কেউ গুলি ছুড়ল না। একেবারে অকারণে কোনও মানুষ গুলি ছুড়লে তাকে পাগল বলা যায়। সেরকম কোনও মানুষ এখানে আছে বলে বিশ্বাস হয় না। প্রদীপ নিজের পিস্তলটাকে স্পর্শ করল। ভাগ্যিস সুজাতা এটাকে নিয়ে মতিলালের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে পেরেছিল। তার মনে হল, সুজাতা মেয়েটা বড্ড নরম। ও এত নরম না হলেই ভালো হতো।

চওড়া রাস্তা থেকে যখন প্রদীপ কয়েক হাত ওপরে ঠিক তখনই ইঞ্জিনের শব্দ শুনতে পেল। একটা গাড়ি উঠে আসছে। বাঁ-দিকের মুখে এলেই গাড়ির আরোহীরা তাকে দেখতে পাবে। চকিতে চারপাশে তাকিয়ে নিল সে। তারপর যতটা সম্ভব দ্রুত গেল বরফের উঁচু ঢিপির পিছনে। সম্ভবত এখানে একটা বড় পাথর ছিল, তাকে ঘিরে বরফ মাথা তুলেছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জিপটাকে দেখতে পেল সে। খুব শ্লথগতিতে উঠে আসছে জিপটা। ড্রাইভার ছাড়া আরও তিনজন আরোহী রয়েছে বলে মনে হল। জিপের ছাদে তুষার পড়েছে। কিন্তু সামনের কাচ আড়াল করেনি। জিপটা ধীরে-ধীরে তার সামনে চলে এল। এক ঝলকের জন্যে সে দুটো অস্ত্র দেখতে পেল। পেছনের লোকদুটো সেগুলো সতর্ক হাতে ধরে আসে। সীমান্তের এত কাছে এইসব অস্ত্রধারীরা কী সাহসে আসতে পারে তা ঈশ্বর জানেন। জিপটা উঠে গেল ওপরে।

প্রদীপ নিঃসন্দেহ ওর খোঁজে এরা এসেছে। হয়তো পুলিশ ফাঁড়ির সেপাইটার কথা এরা বিশ্বাস করেছে। পরক্ষণেই গুলির আওয়াজটা মনে পড়ল। এরা কি লোকটাকে গুলি করে এল? অসম্ভব বলে এখন কোনও কিছুই ভাবতে পারছে না সে।

এখন কী করা যায়? তাকে যেতে হবে ওপরে যতক্ষণ না তিনটে গাছকে পাশাপাশি দেখতে না পাচ্ছে। জিপটা এগিয়ে গেছে ওই পথে। যদি ওরা কোথাও থেমে গিয়ে অপেক্ষাতে থাকে তা হলে সে বুঝতেও পারবে না। খানিকটা দোনামনা করে রাস্তায় নামল প্রদীপ। তার প্যান্ট এখন প্রায় হাঁটু পর্যন্ত ভিজে সপসপ করছে। জুতো চেপে

বসেছে পায়ে। অথচ এগুলো খুলে ফেললে এক মিনিটও হাঁটতে পারবে না সে।

পাহাড়ের ধার ঘেঁষে ওপরে উঠতে লাগল প্রদীপ। এতে সুবিধে হল। পায়ের তলায় সদ্য জমা তুষার অনেক কম। সেগুলো বেশি পরিমাণে পড়েছে খোলা রাস্তায়। দ্বিতীয়ত সরাসরি শত্রুপক্ষের মুখোমুখি পড়তে হবে না তাকে। অবশ্য সোজা যদি ওরা চলে আসে তাহলে পালাবার কোনও পথ খোলা নেই।

কিছুক্ষণ এভাবে হাঁটার পর প্রদীপ বুঝতে পারল ঝুঁকিটা বড্ড বেশি নেওয়া হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কিছু করার নেই। পাহাড়ের গা বেয়ে এই বরফে হাঁটা অসম্ভব ব্যাপার। শত্রুপক্ষ জানে সে বাইক চেপে এসেছে। নিশ্চয়ই বাইকের শব্দ শুনতে চাইবে ওরা। এভাবে হেঁটে যাওয়ার কথা কি ভাববে?

ওপরে ওঠার সময় রাস্তাটা যেখানে বাঁক নিচ্ছে সেখানে পৌঁছে উঁকি মারতেই স্থির হয়ে গেল প্রদীপ। জিপটা দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার ধারে, গাছের গা ঘেঁষে। দুজন লোক জিপের পাশে দাঁড়িয়ে। একজন সিগারেট খাচ্ছে। অন্যজন অস্ত্র হাতে সতর্ক। বাকি দুজনকে দেখা যাচ্ছে না।

এখন আর এগিয়ে যাওয়া যাবে না। ওরা ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। কেন বোঝা যাচ্ছে না। হয়তো কোনও ফাঁদ পাতছে তার জন্যে। জিপ থেকে সে মাত্র কুড়ি-পঁচিশ হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে। নিচ থেকে আর-একটা গাড়ি এই সময় উঠে এলে তাকে সহজেই দেখতে পাবে। সিগারেটটা গাছের দিকে ছুড়ে দিয়ে লোকটা কিছু বলতেই অস্ত্রধারী মাথা নাড়ল। কিন্তু নড়ল না। এখন কোনওরকম দুঃসাহস দেখানো বোকামি। প্রদীপ ওপরের দিকে তাকাল। কোনওভাবেই ওদের ডিঙিয়ে যাওয়া যাবে না।

এইসময় অন্য দুজনকে ওপর থেকে ফিরে আসতে দেখল প্রদীপ। একজনের হাতে অস্ত্র। ওরা কাছে আসার আগেই ওপরের পাহাড়ে জোর আওয়াজ উঠল। অনেকগুলো গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ। লোকগুলো নিজেদের মধ্যে দ্রুত কথা বলে নিল। একটা লোক দুটো অস্ত্র নিয়ে ছুটে গেল খানিকটা দূরে। বরফ সরিয়ে সেখানে অস্ত্র রেখে আবার বরফ চাপা দিয়ে দাগগুলো ঢাকতে লাগল। অন্য তিনজন তাকে দ্রুত কাজ সারতে বলছে। এবং সেইসময় ওপরের পাহাড়ে গাড়িগুলোর আওয়াজ আরও স্পষ্ট হল। একটা লোক জিপের বনেট খুলে ঝুঁকে পড়ল। প্রদীপের মনে হল লোকটা ইচ্ছে করে গাড়ির একটা তার খুলে ফেলল?

এবার মিলিটারি কনভয়টাকে দেখা গেল। একটার পর একটা মিলিটারি গাড়ি নেমে আসছে। প্রথম গাড়িটা জিপের পাশে পৌঁছেই থেমে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে পিছনের গাড়িগুলোও। প্রথম গাড়ি থেকে কয়েকজন সৈন্য নিচে নেমে ওদের সঙ্গে কথা বলতে লাগল। ওরা জিপের ইঞ্জিন দেখাচ্ছে। প্রদীপ অনুমান করল ওখানে দাঁড়িয়ে থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করছে সৈন্যরা। ওরা নিশ্চয়ই জিপ খারাপের অজুহাত দিচ্ছে।

প্রদীপ পেছনে হাঁটতে লাগল। মোড়টা পার হতেই মিলিটারিরা যে তাকে দেখতে পেয়ে যাবে এটা খেয়াল করেনি এতক্ষণ, সে দ্রুত পাহাড়ের ওপর উঠতে চেষ্টা করল। পাথরের খাঁজের ওপর নরম বরফে পা ঢুকে যাচ্ছে। কোনওমতে শরীরটাকে টেনে তুলতে লাগল সে। তারপর উঁচু হয়ে এগিয়ে যেতে লাগল সামনে। এখন নিচ থেকে কেউ ওপরে মুখ না তুললে তাকে দেখতে পাবে না।

একটু বাদেই মিলিটারি কনভয়টা নিচে নেমে গেল। মাথা নিচু করে বসে রইল প্রদীপ। তারপর আর-একটু এগিয়ে গেল। এখন সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে চারজনকে। যে লোকটা অস্ত্র দুটো বরফের নিচে লুকিয়ে এসেছিল সে ওগুলো ফিরিয়ে আনল। এই নিয়ে নিজেরা বেশ হাসাহাসি করল। সম্ভবত মিলিটারিদের বোকা বানানোর আনন্দে।

ওদের একজন ঘড়ি দেখে কী বলতেই এবার জিপে উঠে বসল সবাই। জিপটা উঠে গেল ওপরে। মিনিট তিনেক বাদে অনেক দূরের রাস্তায় জিপটাকে দেখতে পেল। যদি পথে কাউকে নামিয়ে দিয়ে না যায় তাহলে আপাতত কোনও বিপদ নেই।

নামতে খুব অসুবিধে হচ্ছিল। শেষ ধাপে ব্যালেন্স না রাখতে পেরে প্রায় আছাড় খেয়ে রাস্তায় পড়ল প্রদীপ। কনুই এবং হাঁটুতে বেশ চোট খেল সে। উঠে দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছিল। ফিরে যেতে হলে তাকে বাইকটার কাছে পৌঁছাতে হবে। ততক্ষণ শরীরটাকে যে করেই হোক নিটোল রাখা দরকার। পিস্তলটা ভালো করে দেখে হাতে নিয়ে ও এগোতে লাগল। জিপটায় এই মুহূর্তে কোনও আরোহী আছে কি না এতদূর থেকে দেখতে পায়নি সে। অতএব বিপদ যে-কোনও সময় ঘটতে পারে।

শেষপর্যন্ত তিনটে নিষ্পত্র গাছকে পাশাপাশি নিবিড়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেল সে। তিনটে গাছ। লোকটা বলেছিল তিন ভাই। কিন্তু প্রদীপের মনে হল তিন নিঃসঙ্গ বুড়ি। রাস্তাটা এখানে ঘোড়ার নালের মতো বাঁক নিয়েছে। গাছদুটো তার ঠিক মাঝখানে। এখানে এসেই ট্যুরিস্টবাসের যাত্রীরা হত্যাকাণ্ড দেখেছিল। তিন ফটোগ্রাফার এখানেই ছবি তুলতে পেরেছিল। ব্যাপারটা সঠিক কি না বোঝা যাবে নিহত লোকটির মৃতদেহ গাছের পাশে খুঁজে পেলে। কিন্তু গাছটা যদি মঞ্চ হয় তাহলে ছবি তোলার পক্ষে যুৎসই।

প্রদীপ রাস্তা ছেড়ে পাশের একটু সমান জায়গায় উঠে গেল যেখানে তিনটে গাছ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। বরফে চারপাশে ঢাকা। এসব অঞ্চলে হয়তো খুব কম সময় আসে যখন বরফ পড়ে না। প্রদীপ চারপাশে তাকাল। ঠিক কোন জায়গায় মৃতদেহ রয়েছে তা বোঝা যাচ্ছে না। পরশুর ঘটনার পরে অনেক বরফ জমেছে এখানে। লোকটা বলেছিল, তিনটে গাছের পাশে ওরা বরফ চাপা দিয়েছিল মৃতদেহটাকে। কয়েকমাস ওভাবেই থেকে যাবে যতক্ষণ না বরফ গলে যায়। প্রদীপ পা দিয়ে বরফ সরাতে লাগল। মিনিট দশেক চেষ্টার পর আচমকা শক্ত কিছু পায়ের নিচে পড়ায় সে ধীরে-ধীরে পা সরাল। শার্ট পরা একটা হাত বেরিয়ে এসেছে বরফ থেকে।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে মানুষটাকে বের করে আনতে পারল প্রদীপ। বছর পঁচিশের একটি যুবক। বুকে গুলি লেগেছিল। মোক্ষম একটা গুলি। বরফের নিচে থাকায় শরীরে বিকৃতি আসেনি একটুও। সময় নষ্ট না করে প্রদীপ ওর পকেটে হাত দিল। বুক পকেটে হাত ঢুকিয়ে ও রুমাল, চিরুনি এবং পার্স বের করল। পার্সের ভাঁজ খুলতেই ছেলেটির ছবি একপাশে, অন্যপাশে সুন্দর হাতের লেখায় নাম-ঠিকানা লেখা কার্ড। দিলবাহাদুর। সেবক রোড, শিলিগুড়ি। পার্সের ভেতর শচারেক টাকা এবং একটা চিঠি। চিঠিটা কোমল নামের একটি মেয়ের লেখা। লিখেছে এই দিলবাহাদুরকেই। চোখ বোলাল প্রদীপ। বাবার নামে অনেক অভিযোগ করে কোমল লিখেছে তাকে উদ্ধার করতে। সে যেমন করেই হোক তিস্তাবাজারে গিয়ে দিলবাহাদুরের জন্যে অপেক্ষা করবে। দিলবাহাদুর তাকে নিয়ে যেখানে ইচ্ছে যেতে পারে, তার কোনও আপত্তি নেই। তবে আসার আগে দিলবাহাদুর

যেন মনে রাখে পৃথিবীতে তার বাবার মতো নৃশংস মানুষ আর কেউ নেই। এখন তার ভালোবাসা আর বাবার প্রতি ভয়, এদুটো সম্পর্কে মন ঠিক করে নিক সে। তিস্তাবাজারে যদি সন্ধে নামে তা হলে ব্রিজের ওপর থেকে সে ঠিক জলে ঝাঁপ দেবে।

জিনিসগুলো পকেটে রাখার সময় প্রদীপ দিলবাহাদুরের গলায় হারটাকে দেখতে পেল। লকেট সমেত রুপোর হার। কোনওমতে মাথা দিয়ে বের করে নিল সে। এবার কী করা যায়? এই ছেলেটাকে আবার বরফ চাপা দিয়ে চলে যাওয়া ঠিক হবে না। সে মৃতদেহ টানতে-টানতে রাস্তার মাঝখানে নিয়ে এল। যে-কোনও গাড়ি এই পথে গেলে দিলবাহাদুরের জন্যে থামতে বাধ্য।

এই সময় ওপর থেকে গাড়ির আওয়াজ ভেসে এল। প্রদীপ ছুটল। যতটা পারে নিচে গিয়ে যখন ওপরে ওঠার কোনও সম্ভাবনা দেখতে পেল না তখন খাদের দিকে তাকাল। এবং তখনই চোখে পড়ল রাস্তার ঠিক নিচে চমৎকার একটা আড়াল তৈরি করেছে বরফের স্তূপ। মুখ বের করা একটি পাথরকে সর্বাঙ্গে ঢেকে ফেলেছে বরফ। প্রদীপ সন্তর্পণে পা ফেলে-ফেলে সেই স্তূপের পেছনে গিয়ে লুকোল। তার সামনে রাস্তা। অদূরে ছেলেটির মৃতদেহ পড়ে আছে। আর তার পেছনে কয়েক হাজার ফুট খাদ। একটু পা পিছলে গেলে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। সামনের বরফের ওপর চাপ দিতে গিয়ে সামলে নিল সে। বরফের স্তূপটা যেন দুলে উঠল। নিচের পাথর অবশ্যই আলগা রয়েছে।

ওপর থেকে জিপটা ফিরে আসছিল হতাশ হয়ে। রাস্তার ওপর মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে ড্রাইভার ব্রেক চাপল। ওরা যেন নিজেদের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। ঠিক তখনই নিচ থেকে গাড়ির আওয়াজ ভেসে এল। কোনও ভারী গাড়ি উঠে আসছে।

ইতিমধ্যে দুজন লোক নেমে পড়েছে জিপ থেকে। তাদের একজনের হাতে অস্ত্র রয়েছে। ওরা মৃতদেহটা খুঁজে দেখল। ওদের একটু ধাঁধায় ফেলার জন্যে প্রদীপ উপুড় করে রেখে এসেছিল মৃতদেহটাকে। যে লোকটির হাতে অস্ত্র সেই সে পা দিয়ে ছেলেটাকে চিৎ করে দিল। দিয়েই চিৎকার করল, 'একে এখানে কে আনল?'

জিপ থেকে একজন জানতে চাইল, 'কে?'

'ছানু যাকে মেরেছে। সেপাইটা বলেছিল বডি হাফিস করে দিয়েছে।'

'যাওয়ার সময় ছিল না, এখন যখন আছে, তখন কেউ ওটাকে টেনে এনেছে।'

'কে এনেছে তা বুঝতে পারছি কিন্তু সেই মালটা কোথায়? বাইকের আওয়াজ আমি একবারের জন্যেও পাইনি।'

'আমি তোকে বলছি ও আমাদের বোকা বানাবার জন্যে হেঁটে এসেছে। লোকটাকে খাদে ফেলে দে। নিচ থেকে গাড়ি আসছে। কুইক।'

কিন্তু গাড়িটা ততক্ষণে কাছাকাছি চলে এসেছে। সেটা বুঝতে পেরে লোকদুটো দৌড়ে জিপের ভেতর উঠে বসল। জিপটা ব্যাক করার সুযোগ পেল না, একটা ট্যুরিস্টবাস বাঁকের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। খানিকটা এগোতেই মৃতদেহ দেখতে পেল ড্রাইভার। সঙ্গে-সঙ্গে গাড়ি থামিয়ে দিল সে।

বাসের যাত্রীরা মৃতদেহ রাস্তার ওপর পড়ে আছে দেখে কলবল করতে লাগল।

ড্রাইভার চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করল, 'খুন?'

জিপের একজন জবাব দিল, 'তাইতো মনে হচ্ছে।'

'তাহলে পুলিশকে খবর দিতে হয়', ড্রাইভার চেঁচিয়ে উঠল।

'ও নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না। যাওয়ার পথে আমরাই দিয়ে যাব।'

মাইক হাতে নিয়ে গাইড বলল, 'ভদ্রমহোদয় এবং ভদ্রমহিলাগণ। আমি খুব দুঃখের সঙ্গে জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে এখানে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে। সামনের রাস্তায় একটি মৃতদেহ পড়ে আছে। সেটা না সরালে আমরা এগোতে পারব না।'

ঘোষণা শেষ হওয়া মাত্রই হুড়মুড় করে যাত্রীরা নিচে নামতে লাগল। বরফের মধ্যে পা রাখার মজার সঙ্গে সামনে মৃতদেহ পড়ে থাকার আতঙ্ক মিশে থাকায় ওরা ঠিক কী করবে বুঝতে পারছিল না। কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে জনা পনেরো মানুষ মৃতদেহটি দেখতে লাগল।

প্রদীপ সুজাতাকে দেখতে পেল। মেয়েটা তার কথামতো চলে এসেছে। এখন ওই ভিড়ের একজন হয়ে মৃতদেহ দেখছে। ওর কয়েক হাতের মধ্যে সে রয়েছে অথচ—। হঠাৎ জিপ থেকে নেমে দুটো লোক এগিয়ে এল। চিৎকার করে সবাইকে সরে যেতে বলল। তারপর দুজন মৃত লোকটির পোশাক ধরে টানতে-টানতে রাস্তায় একপাশে সরিয়ে দিল। যেন আপদ গেল এই রকম ভঙ্গিতে ওরা জিপে ফিরে গিয়ে হর্ন বাজাল। ট্যুরিস্টদের জটলা ভেঙে পথ করে দিতেই জিপটা স্টার্ট নিয়ে নিচের দিকে চলে গেল। প্রদীপ দেখল এবার গাইড মাইকে ট্যুরিস্টদের বাসে উঠে আসতে অনুরোধ করছে। এই সুযোগে ওদের দৃষ্টি এড়িয়ে সে বাসের যাত্রীদের সঙ্গে মিশে যেতে পারে। কিন্তু ওরা যাবে আরও ওপরে। সেখানে দ্রষ্টব্য জিনিস দেখিয়ে ফিরে আসবে বেশ কিছুটা সময় পরে। অতএব বাসটাকে চলে যেতে দিল প্রদীপ। সুজাতাকে নিজের অস্তিত্ব জানাবার কোনও সুযোগই পেল না।

একটু আগে যে জায়গাটা ছিল মানুষের ভিড়ে ভর্তি এখন সেখানে হাওয়ার শব্দ ছাড়া কিছু নেই। প্রদীপ ধীরে-ধীরে ওপরে উঠে আসতেই পাথরটা খুব জোরে নড়ে উঠে একপাশে কাৎ হতে-হতে থেকে গেল। এবার যদি কেউ ওর নিচে আশ্রয় নিতে চায় তাহলে তার ভাগ্য প্রসন্ন হবে না।

রাস্তায় উঠে এল সে। ধীরে-ধীরে দিলবাহাদুরের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। খুব বিশ্রীভাবে শুইয়ে দিয়ে গেছে ওরা ওকে; প্রদীপ মাথাটা ঠিক করে দিল। তারপর জোরে হাঁটতে শুরু করল। এবার পায়ে একটা ব্যথা টের পেল সে। হাঁটতে গেলেই লাগছে, তবে তেমন তীব্র নয়।

ঠিক যেখান দিয়ে প্রদীপ নিচের রাস্তায় নেমে এসেছিল সেখানে পৌঁছে ওপরে তাকাল। দার্জিলিং-এর লেবং রেসকোর্সে যাওয়ার পথে পাহাড়-চড়িয়েদের শেখানোর জন্যে যে খাড়াই পাথরটা রয়েছে তার থেকেও এটাকে ভয়ঙ্কর বলে মনে হল। যে সোজা পথটা সামনে রয়েছে তা ব্যবহার করলে পুলিশ ফাঁড়ি ঘুরে যেতে হবে। এবং সেটা করতে হলে জিপের চারজন তাদের ভালোবাসা জানাবে। প্রদীপ সামান্য এগোল। তারপর ধীরে-ধীরে ওঠার চেষ্টা করল। বরফের নরম চাঁই খসে পড়ায় পা হড়কাতে-হড়কাতে কোনওমতে রক্ষে পেল।

প্রদীপ যখন কিছুটা সমান জায়গায় উঠে আসতে পারল তখন এই ঠান্ডাতেও তার সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গেছে। সেই ঘামে বাতাস লাগামাত্রই শরীর কনকন করে উঠল। চুপচাপ মিনিট পাঁচেক বসে থাকল সে। এই শূন্য চরাচরে, মাথার ওপর ঘোলাটে আকাশ আর চারপাশে বরফ আর বরফ, অদ্ভুত নিঃসঙ্গ বলে মনে হয় নিজেকে। কিন্তু মানুষ রয়েছে তার সন্ধানে। প্রদীপ উঠে দাঁড়াল।

বাইকটাকে যেখানে লুকিয়ে রেখেছিল সেখানে পৌঁছেও মনে হল চারপাশ সুনসান। কোথাও কোনও মানুষ নেই। তার পকেটে এখন দিলবাহাদুরের ব্যবহার করা কিছু জিনিস আর কোমল নামের একটি মেয়ের লেখা চিঠি। কে এই কোমল যাকে ভালোবেসে দিলবাহাদুরকে প্রাণ হারাতে হল? এখন একথা স্পষ্ট যে দার্জিলিং-এর ভদ্রলোক চাননি দিলবাহাদুর বেঁচে থাকুক। এবং তিনি এও চাননি যে তার হত্যাকাণ্ডের দৃশ্য কোনও ফটোগ্রাফারের ক্যামেরায় ধরা থাক। প্রদীপের মনে হল সে বিশাল ভুল করে ফেলেছে। কোথায় কে কাকে হত্যা করেছে, তার ফটোগ্রাফ কে তুলল এই নিয়ে ভদ্রলোক বিব্রত হবেন এমন নাও হতে পারে। ফটো তোলার সময় যদি কোমলকেও ওখানে দেখা যায় তা উনি বরদাস্ত করতে পারেন না। ব্ল্যাক লেপার্ডের মেটিং মানে কি কোমল আর দিল বাহাদুরের প্রেম? তা হলে এই কোমল কে? দিলবাহাদুরকে কোমল লিখেছে যে তার বাবার মতো নৃশংস মানুষ পৃথিবীতে আর কেউ নেই। তা হলে কি কোমল দার্জিলিং-এর শ্রদ্ধেয় ভদ্রলোকের মেয়ে? দার্জিলিং-এর মেয়ে হলে সে কোনওদিন তাকে দেখেনি কেন? অথবা দেখলে চিনতে পারবে, নামে বুঝতে পারছে না।

দ্বিতীয়ত, ওরা এখানে ডেরা বেঁধেছে কেন? এখানে আসার সময় জিপের চাকাকে রাস্তা থেকে নেমে যেতে দেখেছে সে। সেই জিপটাই এই জিপ এমন নাও হতে পারে, আবার হতেও পারে। ওই নেমে যাওয়া রাস্তার কোনও এক জায়গায় কি ওদের আস্তানা? প্রদীপের মনে হল এ ব্যাপারে রাই তাকে সঠিক খবর দিতে পারে। অন্তত এই অঞ্চলের ভূগোলটা ওর জানা। ওই আস্তানায় তাকে একবার যেতেই হবে। কিন্তু হাতে সময় বড় কম। ট্যুরিস্ট বাস যখন ফিরে যাবে তখন সুজাতার সঙ্গে তার দেখা করার কথা। রাইকেও সে ওই বাসে ফিরে যেতে বলেছে। তাছাড়া সন্ধে নামলে এই খোলা আকাশের নিচে পড়ে থাকা মানে আত্মহত্যা করা। পুলিশ ফাঁড়ি ছাড়া আশ্রয় নেওয়ার কোনও জায়গা তার জানা নেই। কিন্তু সেখানে এখন কী অবস্থা চলছে তা ঈশ্বর জানেন।

প্রদীপ ওপরে উঠছিল। এই পথটা, অবশ্য পথ করে নেওয়া পথ তেমন কষ্টকর নয়। বেশ দ্রুতই সে ওপরে উঠতে পারছিল। এবার হঠাৎ চোখ ফিরিয়ে সে অনেক নিচে বাস-রাস্তাটাকে দেখতে পেল। ওখান দিয়ে কেউ গেলে তাকে কতটা বড় দেখতে পাবে তা বোঝা মুশকিল। একটা টিলার আড়াল সামনে। ওটার পাশ কাটিয়ে গেলেই সম্ভবত এক নম্বর গুহাটার কাছাকাছি পৌঁছানো যাবে। টিলার আড়ালে এসে কয়েক পা ওপরে উঠতেই দাঁড়িয়ে পড়ল প্রদীপ। পাহাড়টাকে এখনও দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু মাত্র কয়েক হাত দূরে বরফের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা মৃতদেহটি যে রাই ছাড়া আর কারও নয় এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত। ওর একটা হাতে তখনও নিয়ে আসা জিনিসগুলো রয়েছে। শরীরের পাশ দিয়ে রক্ত গড়িয়েছিল। মুখের ওপর ইতিমধ্যেই তুষার পড়তে শুরু করেছে।

আততায়ী ওপরে আছে। ওপর থেকে গুলি ছুড়ে রাইকে মারা হয়েছে। যে গুলির

শব্দ তার কানে এসেছিল সেটা রাই-এর জন্যে ছোড়া হয়েছিল। আততায়ীর বন্দুকের হাত যে নিপুণ তাতে কোনও সন্দেহ নেই। রাই-এর জন্যে একটির বেশি গুলি ছোড়ার প্রয়োজন হয়নি।

এবং লোকটা নিশ্চয়ই ওপরে আছে। কে ওই লোকটা? যারা তার খোঁজে জিপে করে ঘুরছে তাদের কেউ অবশ্যই নয়। তাদের দলের কেউ? তা হলে ওদের সংখ্যা আপাতত পাঁচ? ওই লোকটা অত ওপরে উঠে বসে আছে কেন? এক নম্বর গুহাটা কি ইতিমধ্যে দখল হয়ে গেছে যা রাই জানত না? প্রশ্নগুলোর কোনও উত্তর প্রদীপের জানা নেই। কিন্তু এই আড়াল ছেড়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি সে নিতে পারছিল না। এখান থেকে নিচে নামতে অসুবিধে হবে না কিন্তু তাতে কাজের কাজ কিছু হবে না। প্রদীপ ধীরে-ধীরে টিলার শেষ আড়ালে চলে এল। শরীরটাকে যতখানি সম্ভব বের না করে সে সামনে তাকাল। পাহাড়টাকে দেখতে পাচ্ছে সে। বাতাসের বিপরীত দিকে বলেই সম্ভবত বরফ তেমনভাবে জমেনি এপাশে। টিলা থেকে পাহাড়ের দূরত্ব অন্তত একশো গজ। আততায়ীর হাতে নিশ্চয়ই শক্তিশালী অস্ত্র রয়েছে। সে কিছুক্ষণ ধরে লক্ষ করেও কোনও মানুষের অস্তিত্ব ওখানে খুঁজে পেল না। অথচ কেউ একজন ওখানে অস্ত্র হাতে অপেক্ষা করছে। এই একশো গজ পেরিয়ে পাহাড়ের কাছে পৌঁছতে গেলে তার অবস্থা রাই-এর মতো হয়ে যাবে।

কিছুক্ষণ বাদে প্রদীপের মনে হল, পাহাড়ের গায়ে দুটো জায়গায় গুহামুখের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু তাতে মানুষ আছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। নিচ দিয়ে ঘুরে পাহাড়ের কাছে পৌঁছবার একটা চেষ্টা করা অবশ্য যায়, কিন্তু তার জন্যে যে শারীরিক শক্তি এবং সময় হাতে থাকা দরকার তা এখন তার নেই। প্রদীপ ঠিক করল নিচেই ফিরে যাবে। রাই-এর মৃত্যুসংবাদ পুলিশ ফাঁড়িতে জানিয়ে দিলে নিশ্চয়ই নিচ থেকে ফোর্স আসবে তল্লাশিতে। একজন পুলিশকর্মীর এমন মৃত্যুকে কর্তৃপক্ষ সহজে মেনে নেবেন না। সে ধীরে-ধীরে নামতে লাগল। ওপরে একটি উগ্রমস্তিষ্কের লোক অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে আছে। তার সামনে বুক চিতিয়ে এগিয়ে যাওয়ার কোনও মানে হয় না।

বাইকের কাছে পৌঁছে আবার এক সমস্যায় পড়ল প্রদীপ। ওটাকে চালু করলেই পাহাড় কাঁপিয়ে শব্দ বাজবে। আত্মগোপন করার কোনও উপায় থাকবে না। অগত্যা ওটাকে রেখে দিয়েই হাঁটতে শুরু করে সে। পুলিশ ফাঁড়িটা দেখা যাচ্ছে। সামনে কেউ নেই। জিপটাকেও দেখতে পেল না। কিছু করার নেই। জিপের আরোহীরা ওখানে নেই ধরেই এগোতে হবে।

ফাঁড়ির পাশে এসে সে দোকানগুলোর দিকে তাকাল। জীবন এখানে স্বাভাবিক। ধীরে-ধীরে আড়াল থেকে সে বেরিয়ে এসে কাঠের বারান্দায় উঠে এল! এ খুব বড় ঝুঁকি নেওয়া, দরজাটাকে কোনাকুনি রেখে প্রদীপ পৌঁছে গেল ঘরের সামনে। উঁকি মেরে দেখল দ্বিতীয় পুলিশটা টেবিলের ওপর একটা হাত আর মাথা রেখে পড়ে আছে। ঘরে কেউ নেই।

দ্রুত ঘরে ঢুকে লোকটার কাছে পৌঁছে গেল সে। লোকটার মাথা থেকে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছিল। না, গুলির চিহ্ন নেই, কোনও ভারী জিনিস দিয়ে আঘাত করা হয়েছে ওকে। লোকটা মারা যায়নি। কিছুক্ষণ চেষ্টা করে লোকটার জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে পারল

সে। ওকে দেখে লোকটা হাউ-হাউ করে উঠল। পুলিশ ফাঁড়ির ফার্স্ট এইড বক্স থেকে ওষুধ আর ব্যান্ডেজ বের করে ওর মাথায় লাগিয়ে টেলিফোনের কাছে গিয়ে হেসে ফেলল প্রদীপ। এটা তার বোঝা উচিত ছিল। টেলিফোনের রিসিভারটাকে ভেঙে তার ছিঁড়ে দিয়ে গেছে ওরা। পৃথিবীর সঙ্গে এই মুহূর্তে যোগাযোগের আর কোনও উপায় নেই।

একটু সুস্থ হতেই লোকটা হড়বড় করে যা বলে গেল সেটা নতুন কিছু নয়। প্রদীপের সন্ধানে এসে লোকগুলো ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। প্রদীপ যা শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছিল তার বাইরে একটি শব্দও বলেনি লোকটা। শোনার পর ওরা চলে গিয়েছিল প্রদীপের খোঁজে। ফিরে এসে হঠাৎই রাই-এর কথা জানতে চাইল। তাকে সে বলেছে প্রদীপের সঙ্গে ঝগড়া করে পিস্তলের ভয়ে রাই পালিয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ। কথাটা ওরা বিশ্বাস করতে চায়নি। শেষপর্যন্ত পিছনে দাঁড়ানো লোকটা তাকে আঘাত করে। আর কিছু ওর মনে নেই।

লোকটা সত্যি কথা বলছে বলেই মনে হল। সে টেলিফোনটার দুর্দশা দেখাল লোকটাকে। লোকটা বলল, 'ওরা যখন আপনার খোঁজে বর্ডারের দিকে গিয়েছিল তখন আমি গ্যাংটকে ফোন করেছিলাম। প্রথমবার এসে ওরা যদি টেলিফোনটাকে নষ্ট করে দিত তাহলে খবর পাঠাতে পারতাম না। এস পি সাহেব খবর পেয়েই রওনা হয়ে গেছেন।'

এই সময় গাড়ির আওয়াজ শোনা গেল। প্রদীপ চট করে ঘরের কোণে চলে গেল। ওরা আবার ফিরে এসেছে বোধহয়। কিন্তু পুলিশ ফাঁড়ির সামনে ট্যুরিস্ট বাস এসে দাঁড়াল। সেটা দেখে প্রদীপ গম্ভীর হয়ে লোকটার পাশে চেয়ার টেনে বসে পড়ল।

ট্যুরিস্টবাসের গাইড এবং কয়েকজন যাত্রী এগিয়ে এল। সকলেই বেশ উত্তেজিত এবং একসঙ্গে কথা বলছিল। প্রদীপ উঠে দাঁড়াল, 'আপনারা যা বলার একজন বলুন।'

তখন গাইড মৃতদেহের বর্ণনা দিতে লাগল।

প্রদীপ বলল, 'আপনাদের অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু আমাদের ফাঁড়িতে ফোর্স নেই। টেলিফোনটাও অচল। আপনাদের অনুরোধ করছি পথে কোনও পুলিশ ফাঁড়ি বা অফিসারকে পেলে ব্যাপারটা জানান। গ্যাংটকে গিয়ে বলুন ঘটনাটা। আপনাদের অভিযোগ লিখে নেওয়া হচ্ছে।'

ডায়েরিতে লিখে নেওয়ার পর প্রদীপ গাইডকে বলল, 'আপনাকে একটু অনুরোধ করতে পারি?'

'নিশ্চয়ই।'

'আমাকে একটা এনকুয়ারিতে যেতে হবে। একটু লিফট দেবেন আপনার বাসে।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আসুন।' লোকটা খুশি হয়েই বলল।

সব যাত্রী নামেনি। যারা বসেছিল তারা সম্ভবত ঠান্ডার জন্যেই চুপচাপ।

সবার শেষে বাসে উঠে যাত্রীদের দিকে তাকাতেই সুজাতাকে দেখতে পেল প্রদীপ। ফাঁড়ির উল্টোদিকের জানলায় চুপচাপ বসে আছে। ওর পাশের আসন ফাঁকা। সোজা সেখানে গিয়ে বসে পড়ে চাপা গলায় প্রদীপ বলল, 'আমার দিকে না তাকিয়ে যা বলছি তা শোনো।'

কিন্তু নিষেধ করা সত্ত্বেও না তাকিয়ে পারল না সুজাতা। তার মুখে যেন প্রাণ ফিরে এল। হাত বাড়িয়ে প্রদীপের হাত আঁকড়ে ধরল সে। প্রদীপ চারপাশে তাকাল।

এই বাসের আসনগুলো মাথা-উঁচু বলে সামনে-পিছনের যাত্রীদের নজর আটকে যাচ্ছে। কিন্তু ওপাশের দুজন মানুষ স্বচ্ছন্দে দেখতে পারে। যদিও ওই জানলায় বসা যাত্রীটি প্রাকৃতিক শোভা দেখতে ব্যস্ত এখন।

প্রদীপ বলল, 'তুমি এখন গ্যাংটকে ফিরে যাবে। তারপর—।'

'না। আমি যাব না।' চাপা গলায় বলল সুজাতা।

'তার মানে?'

'আমি তোমার সঙ্গে থাকব।'

'অসম্ভব। এখানে চারজন লোক আমাকে খুন করবে বলে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমি কিছু প্রমাণ পেয়েছি। আরও কিছু বাকি। আমার জীবন যে-কোনও মুহূর্তে চলে যেতে পারে। আমার সঙ্গে থাকলে কোনও কাজের কাজ হবে না। তার চেয়ে তুমি গ্যাংটকে ফিরে গিয়ে সানশাইন হোটেলে টেলিফোন করে লিটনের সঙ্গে কথা বলবে। তাকে ডেকে আনবে বাস টার্মিনাসে। বলবে, সন্ধে সাতটা পর্যন্ত আমার জন্যে অপেক্ষা করতে। তার মধ্যে যদি আমি না ফিরি তা হলে যেমন করে হোক গ্যাংটক ছেড়ে তোমরা নেমে যাবে।' কথা বলতে-বলতে প্রদীপ রাস্তার দিকে তাকাচ্ছিল।

'তারপর?'

'মানে?'

'তারপর আমি কী নিয়ে থাকব?'

'এতকাল কী নিয়ে ছিলে?'

'এতকালের মধ্যে গতরাতের মতো রাত আমার জীবনে তো আসেনি।'

'ওঃ, সুজাতা। বি এ গুড গার্ল। আমাকে সাহায্য করো।'

'আমি সঙ্গে থাকলে কি তোমার কোনও সাহায্য হবে না?'

'না। এই বরফের মধ্যে নিজেই নিজেকে সাহায্য করতে পারছি না যেখানে সেখানে তুমি থাকলে আরও সমস্যা বাড়বে।' স্পষ্ট বলল প্রদীপ।

'তাহলে আসতে বললে কেন?'

'এই খবরটা দেব বলে।' হঠাৎ প্রদীপের মনে হল জায়গাটা এসে গেছে। একটা জিপের পথ বাঁ-দিকে উঠে গেছে বলে মনে হল। আসার সময় ডান দিক হলে এখন তো বাঁ-দিকই হবে। সে উঠে দাঁড়িয়ে শব্দ করতেই সামনে বসা গাইড তাকাল, 'এখানে?'

'হ্যাঁ।' প্রদীপ জবাব দিতেই গাড়িটা থেমে গেল।

'অনেক ধন্যবাদ।' প্রদীপ বাস থেকে নেমে দরজা বন্ধ করে দিতেই সেটা চলতে শুরু করল। সুজাতার জন্যে খারাপ লাগছিল একটু। পৃথিবীর সব মেয়েই কি সময় বুঝে অবুঝ হয়?

একটা পাখি আচমকা ডেকে উঠতেই চমকে গেল প্রদীপ। তার সামনে সাদা ভ্যালি, পেছনে জঙ্গল। পাখিটা ডাকছে তার একটা ডালে বসে। সে বড় রাস্তা ছেড়ে জিপ-চলার পথে পা দিল। বনের মধ্যে সামান্য ঢুকতেই অদ্ভুত কাণ্ড হল। ওই তুষারমাখা গাছগুলোয় বসে থাকা পাখিরা সবাই মিলে একসঙ্গে চেঁচাতে লাগল। হয়তো এই পথে কেউ পায়ে হেঁটে যায় না বলেই ওদের এমন আচরণ কিন্তু এই চিৎকার শুনে সন্দেহ তৈরি হবে যে-কোনও মানুষের। পাথর দেখা যাচ্ছে না, একটা শক্ত বরফ তুলে ওপরে

ছুড়ল প্রদীপ। সেটা বেশিদূর গেল না কিন্তু কাজ হল। পাখিরা ধীরে-ধীরে শান্ত হয়ে এল।

গাছের নিচে রাস্তা বলেই বেশি তুষার জমেনি। জিপ স্বচ্ছন্দে যেতে পারে, কিন্তু ড্রাইভারকে বেশ দক্ষ হতে হবে। পথ বিশ্রী রকমের সরু। প্রদীপ লক্ষ করছিল তুষারের ওপর সদ্য যাতায়াত করা জিপের চাকার দাগ রয়েছে। জিপটা উঠেছে দুবার, নেমেছে একবার। অর্থাৎ ওই জিপটাই একবার ওপরে ওঠার পর খবর পেয়ে তাকে খুঁজতে নিচে নেমেছিল। না পেয়ে আবার ওপরে উঠে গেছে। এই রকম পাণ্ডববর্জিত জায়গায় জিপের আরোহীরা কী করে খবর পেল? তাকে খুঁজে বের করার নির্দেশ নিশ্চয়ই টেলিফোন অথবা অয়্যারলেসে এখানে পৌঁছেছে। তা হলে সে যেদিকে এগোচ্ছে সেখানে নিশ্চয়ই একটা বড় ঘাঁটি রয়েছে।

মিনিট পনেরো হাঁটার পর বিশ্রাম নেবে বলে দাঁড়িয়ে পড়েছিল প্রদীপ। এই সময় ওপর থেকে জিপের শব্দ ভেসে এল। জিপটা আবার নামছে। এখানে লুকোনোর জায়গার অভাব নেই। রাস্তা থেকে লাফিয়ে সরে এসে একটা বড় গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে তুষারে তার হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গেল। পা টেনে তুলতে অসুবিধে হচ্ছে। এই সময় যদি তাকে এখান থেকে পালাতে হয় তাহলে নির্ঘাৎ ধরা পড়তে হবে। আওয়াজটা এখন একদম কাছে। অতএব নড়াচড়ার চেষ্টা না করে পিস্তল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল প্রদীপ। আর তখনই পাখিদের সেই চিৎকারটা আরম্ভ হল। যেন এতক্ষণ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল বলে ওরা তাকে উপেক্ষা করেছে এখন আর সেটা করতে রাজি নয়। তুষার পাকিয়ে ঢিল বানিয়ে ওপরে ছুড়ে মারা সত্ত্বেও ওরা শান্ত হল না। জিপটা বেরিয়ে এল বাঁক ঘুরে। নামছে খুব আস্তে। প্রদীপ দেখল সেই চারজন একই ভঙ্গিতে বসে রয়েছে। সামনে এসে ওরা ওপরের দিকে তাকাল। সম্ভবত পাখিদের চিৎকার শুনে বিস্মিত হল কিন্তু দাঁড়াল না। জিপটা নেমে গেল নিচে। একসময় তার শব্দও মিলিয়ে গেল। তুষারের কাদা থেকে পা ছাড়িয়ে আনতে রীতিমতো কসরৎ করতে হল প্রদীপকে। হাঁটু থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত অসাড় হয়ে গেছে। কিন্তু জুতো খোলার সাহস হচ্ছিল না তার। একবার জুতো খুললে আর ওটাকে পায়ে গলাতে পারবে না সে।

বাঁক ঘুরে কিছুটা উঠতেই থমকে দাঁড়াল প্রদীপ। জঙ্গলের মাথা ছাড়িয়ে পাহাড়টা এখন চোখের সামনে। জিপটা পাহাড় পর্যন্ত নিশ্চয়ই যেতে পারে না। দাগ শেষ হয়ে গেছে যেখানে সেখানে পৌঁছে ও জুতোর দাগ দেখতে পেল। অনেকগুলো দাগ পাথর টপকে চলে গেছে। পাথরগুলো তুষার ঢাকা। জিপটাকে তাহলে এখানেই রেখে যেতে হয়!

প্রদীপ সন্তর্পণে এগোল। পাথরের আড়ালে-আড়লে পাহাড়ের গায়ে পৌঁছে দেখল জুতোর দাগগুলো একটা খাঁড়ির মধ্যে চলে গেছে। পিস্তল হাতে সাবধান হয়ে সে খাঁড়িতে ঢুকল। ভেতরে কেউ যেন সিঁড়ি কেটে রেখেছে পাহাড়ের গায়ে। পা ফেলে-ফেলে অনেকটা ওপরে উঠে এল প্রদীপ। এবং তারপরেই গুহাটার মুখ দেখতে পেল। মুখটা বিপরীত দিকে ফেরানো। আড়াল থেকে সে গুহাটাকে লক্ষ করতে লাগল। ভেতরটা দেখা যাচ্ছে না। কেউ ওর ভেতর থাকলে সামনে না গেলে বোঝা যাবে না। সামনে ধুধু বরফ নেমে গেছে। হঠাৎ বরফের ওপর এখান থেকে শখানেক গজ দূরে কিছু একটা পড়ে থাকতে

দেখে সে ভালো করে তাকাল। কালোমতো জিনিসটা যে মানুষের শরীর তা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল ইতিমধ্যে ওর ওপর পড়া তুষারের জন্যে।

রাই। রাই-এর শরীরটা শুয়ে আছে বরফের ওপর। ওর কিছুটা পেছনে ছোট টিলার আড়ালে সে নিজে দাঁড়িয়ে ছিল কিছুক্ষণ আগে। ওর মনে পড়ল রাই বলেছিল বিপরীত দিক দিয়ে জিপ গুহাটার কাছাকাছি যেতে পারে। সে কিছুই না জেনে একেবারে গুহার মুখে এসে গেছে।

এইসময় লোকটা বেরিয়ে এল গুহা থেকে। হাতে আধুনিক অস্ত্র। এসে সামনের বিস্তৃত বরফের দিকে তাকাল। লোকটার হাতের অস্ত্র সতর্ক ভঙ্গিতে ধরা। প্রদীপ যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে সে সহজেই গুলি করতে পারে লোকটাকে। লোকটার ডান পাশ সে দেখতে পাচ্ছে। ও ভাবতেও পারছে না বিপরীত দিক থেকে কেউ গুহার এত কাছে উঠে আসতে পারে। ওর নজর তাই সামনে, যেখানে তাকে গুলি ছুড়তে হয়েছে কয়েক ঘণ্টা আগে।

লোকটা আবার ভেতরে চলে গেল। একটা লোককে খামোকা গুলি করে মেরে ফেলতে ইচ্ছে করে না। এখনও পর্যন্ত অনেক মানুষকে সে এই পিস্তল দেখিয়ে ভয় পাইয়েছে কিন্তু কখনও কাউকে মেরে ফেলেনি। বস্তুত পিস্তলের ট্রিগার টিপে গুলি ছোড়ার অভ্যেসও তার এখন নেই। আগে লক্ষ্য ঠিক রাখতে দার্জিলিং থেকে মোটরবাইক নিয়ে দূর-দূর নির্জনে চলে যেত যে। এখন যদি সে লক্ষ্য ভেদ না করতে পারে? কিন্তু ওই গুহায় যাওয়া দরকার। কোনও মূল্যবান জিনিস ওখানে না থাকলে লোকটা খামোকা পাহারা দিত না। একটা শক্ত বরফের ঢেলা তুলে নিয়ে প্রদীপ গুহার সামনে ছুড়ে মারল। সঙ্গে-সঙ্গে শব্দ হল এবং লোকটা তীরের মতো বেরিয়ে এসে শব্দ লক্ষ্য করে অস্ত্র উঁচিয়ে ধরল। ওর আঙুল ট্রিগারে চাপ দেওয়ার অপেক্ষায়। শব্দের উৎস খুঁজতে লাগল লোকটা। প্রদীপ দ্বিধা করল না আর। লোকটার অস্ত্র ধরা হাত লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে লোকটা লাফিয়ে উঠল। অস্ত্রটা পড়ে গেল হাত থেকে। পড়ে ছিটকে গেল কিছুটা দূরে।

সঙ্গে-সঙ্গে দ্বিতীয় গুলিটা ছুড়ল প্রদীপ। এবার লোকটার পা লক্ষ্য করে। উল্টে পড়ে গেল লোকটা। প্রদীপ কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করল। গুহার ভেতর থেকে কেউ বেরিয়ে এল না। কিন্তু গুলির শব্দ বরফের ওপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে, ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলছে। অনেক দূর থেকেও এই শব্দ শুনতে চাইবে। যতটা সম্ভব দ্রুত প্রদীপ লোকটার কাছে পৌঁছে গেল। হাত এবং পায়ে গুলি লাগা সত্ত্বেও লোকটা উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছিল। প্রদীপকে এত কাছে দেখে হকচকিয়ে গেল। পিস্তলটাকে পকেটে ঢুকিয়ে প্রদীপ লোকটির অস্ত্র তুলে নিয়ে নির্দয়ভাবে ওর মাথায় আঘাত করল। ওর মনে হচ্ছিল এই লোকটাই দুটো খুন করেছে। একজনের মৃতদেহ সামনে পড়ে আছে আর দিলবাহাদুর তো শক্ত হয়ে গেছে পরশু রাত থেকেই। ধপাস করে পড়ে গেল লোকটা জ্ঞান হারিয়ে। ওকে একেবারে মেরে ফেলার বাসনা তার নেই। অস্ত্রটাকে উঁচিয়ে সে গুহার মধ্যে ঢুকে তাজ্জব হয়ে গেল।

গুহাটা বেশ বড়। মাঝখানে পার্টিশন দেওয়া হয়েছে কাঠের, চেয়ার-টেবিল এবং একটি ওয়াকিটকি যন্ত্র রয়েছে সেখানে। ওপাশে স্টোভ এবং রান্না করার জিনিসপত্র।

পার্টিশনের ওপাশে আলো জ্বলছে। অর্থাৎ ব্যাটারিচালিত বিদ্যুতের ব্যবস্থা আছে এখানে। পার্টিশন এবং দেওয়ালের মাঝখানে যে ফাঁকটুকু সেটাই দরজা হিসেবে ব্যবহৃত হতো। প্রদীপ এগিয়ে গিয়ে সেখানে দাঁড়াতেই মেয়েটি মুখ ফেরাল। চাঁদের মুখে যতই মেঘ ঘষাঘষি করুক চাঁদের ময়লা লাগে না। প্রায় উন্মাদিনীর মতো চেহারা এই মেয়েটি যে সুন্দরী তাতে কোনও সন্দেহ নেই। খাটিয়ার মতো একটা কিছুর সঙ্গে বেঁধে ওকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। ওর তাকানোর ভঙ্গিতেই হিংসা এবং ঘৃণা একসঙ্গে ফুটে উঠল।

প্রদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার নাম কোমল?'

মেয়েটি মুখ বিকৃত করে দৃষ্টি সরিয়ে নিল।

প্রদীপ বলল, 'আমাকে বোঝার চেষ্টা করো। তোমার পাহারাদারকে অজ্ঞান করে এখানে ঢুকতে পেরেছি। কিন্তু ওর সঙ্গীরা ফিরে এলে আমি বিপদে পড়ব। তুমি কি আমার সঙ্গে এখান থেকে—।'

প্রদীপকে কথা শেষ করতে না দিয়ে মেয়েটি প্রশ্ন করল, 'কে আপনি?'

'আপাতত তোমার বন্ধু বলে মনে করতে পারো। আমাকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন তোমার বাবা। তিনিই দিলবাহাদুরকে খুন করিয়েছেন। এখন তাঁর লক্ষ্য আমি।' কথা বলতে-বলতে প্রদীপ লক্ষ করল মেয়েটার মুখ-চোখ পালটাচ্ছে। হঠাৎই কেঁদে উঠল ও। সম্ভবত দিলবাহাদুরের প্রসঙ্গ শুনে নিজেকে সামলাতে পারল না। প্রদীপ এগিয়ে গিয়ে ওর বাঁধন খুলে দিল। তারপর বলল, 'চেষ্টা করো সোজা হয়ে দাঁড়াতে।'

মেয়েটি নড়বড়ে হয়ে উঠে দাঁড়াল, 'আপনার নাম কী?'

'আমি প্রদীপ গুরুং। তুমি কোমল তো?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আপনাকে আমি কী করে বিশ্বাস করব?'

'আশ্চর্য! এখানে বন্দি হয়ে থাকার চেয়ে খোলা হাওয়ায় হাঁটতে পারবে, এর পর আর বিশ্বাস-অবিশ্বাস নিয়ে কথা বলছ কেন? হাঁটতে পারবে? হাত ধরো।' কোমলকে নিয়ে গুহার মুখ পর্যন্ত আসতে একটু সময় লাগল। মেয়েটার পায়ে জোর নেই তেমন।

গুহার মুখে এসে অজ্ঞান হয়ে থাকা লোকটিকে দেখে চিৎকার করে উঠল কোমল।

প্রদীপ ধমক দিল, 'আস্তে। আমরা এখানে বেড়াতে আসিনি।'

'এই লোকটা, এই লোকটাই ওকে খুন করেছে। ওকি মরে গেছে? না হলে মেরে ফেলুন, মেরে ফেলুন। উঃ মাগো।' মুখে হাত চাপা দিয়ে ককিয়ে উঠতেই প্রদীপ ওকে টেনে নিয়ে চলল। ওর মাথায় এখন সেই চারজন মানুষ যারা যে-কোনও মুহূর্তে জিপ নিয়ে ফিরে আসতে পারে। কিন্তু কোমলের শরীরের যে অবস্থা তাতে ওকে নিয়ে বেশিদূরে যাওয়া সম্ভব নয়, দ্রুত যেতে পারবে না ও। অথচ এখান থেকে পালাতে হলে তাদের মোটরবাইকের কাছে পৌঁছতেই হবে।

প্রদীপ দাঁড়াল, 'শোনো, তুমি এখন গুহায় ফিরে যাও।'

অর্থটা বুঝতে পেরে কোমল মাথা নাড়ল, 'না। অসম্ভব।'

'আমাকে পরিস্থিতিটা বুঝতে দাও। ওখানে তুমি নিরাপদে থাকবে। আমি কথা দিচ্ছি তোমাকে আজই গ্যাংটকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব।'

'কিন্তু ওরা যদি আবার ফিরে আসে? আবার যদি—' কোমলের মুখে আতঙ্ক।

'আমি এখানে আছি। তোমার কোনও ভয় নেই। শোনো, ওই লোকটা আহত,

অজ্ঞান হয়ে আছে। গুহার ভেতরে দড়ি দেখলাম। ওকে এমনভাবে বেঁধে ফেলো যাতে জ্ঞান ফিরলে উঠে দাঁড়াতে না পারে। ওর পায়ে যদিও গুলি লেগেছে তবু বিশ্বাস নেই।'

কোমল লোকটির দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল। তারপর আবার ধীরে-ধীরে গুহার মধ্যে ঢুকে গেল। মেয়েটাকে দড়ি নিয়ে বেরিয়ে আসতে দেখে প্রদীপ পা চালাল। খাঁড়ির ওপরে এসে সে গোটা জায়গাটা দেখতে পেল। চারজন ফিরে এলে জিপটাকে যেখানে পার্ক করবে সেই জায়গাটা এখন লক্ষের মধ্যে।

এখন পালাতে হবে। কিন্তু কোমলকে নিয়ে বাইকের কাছে পৌঁছবে কী করে? হঠাৎ তার খেয়াল হল। সরল পথটার কথা সে কেন ভাবছে না? যে পথ দিয়ে উঠতে গিয়ে রাই গুলি খেয়ে মারা গিয়েছে সেই পথে নেমে গেলে বাইকের কাছে পৌঁছতে মিনিট কুড়িও লাগবে না। কিন্তু মোটরবাইক নিয়ে এই বরফের রাস্তায় জিপের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া অসম্ভব ব্যাপার। আগে জিপের জন্যে অপেক্ষা করতেই হবে তাকে।

কিন্তু জিপটা গেল কোথায়? যদি ওটা আবার তার খোঁজেই গিয়ে থাকে তাহলে অনেক সময় নষ্ট করবে। সন্ধে নেমে গেছে এইসব জায়গায় বাইক চালানো মানে আত্মহত্যা করা। প্রদীপের খুব শীত করছিল। ঠান্ডাটা উঠছে পা থেকে। সঙ্গে একটু ব্র্যান্ডি থাকলে ভালো হতো। গুহার ভেতর কী ওসব আছে? এইসময় জিপের শব্দ কানে এল ওর। জিপটা ফিরে আসছে।

ভালোরকম একটা আড়াল রেখে বসল প্রদীপ। আর কোনও মায়ামমতা নয়। যারা আসছে তারা তার জন্যে রসগোল্লা আনছে না। শেষপর্যন্ত জিপটাকে দেখতে পেল সে। অনেক আওয়াজ তুলে উঠে সে দাঁড়াতেই ড্রাইভারের পাশের লোকটা অস্ত্র হাতে নেমে দাঁড়াল। ওর ভঙ্গিতে এমন সতর্কতা ছিল যে বুঝতে অসুবিধে হল না, ওরা সন্দেহ করছে কিছু। এবং তখনই প্রদীপ লক্ষ করল জিপের আরোহী মাত্র দুজন। বাকি দুজন ফেরত আসছিল। সঙ্গে-সঙ্গে আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রের ট্রিগার টিপল প্রদীপ। খট করে শব্দ হল কিন্তু গুলি বের হল না। শব্দটা যত অল্পই হোক এগিয়ে আসা অস্ত্রধারীর কানে পৌঁছতেই সে জিপের পেছনে ছুটে গেল। সেইসঙ্গে ড্রাইভারও।

হতাশ হয়ে অস্ত্রটার দিকে তাকাল প্রদীপ। এই বস্তু সে কখনও ব্যবহার করেনি। ব্যবহার করার যে বিশেষ কায়দা আছে তা তার জানা নেই। মাঝখান থেকে শত্রুপক্ষ সতর্ক হয়ে গেল। এখান থেকে জিপটা পিস্তলের আওতার মধ্যে নেই। প্রদীপ মরিয়া হয়ে অস্ত্রটাকে সচল করতে চাইছিল। ইতিমধ্যে নতুন কোনও শব্দ না পেয়ে লোকটা আবার বেরিয়ে এসেছে আড়াল থেকে। হঠাৎ সে চিৎকার করে উঠল একটা নাম ধরে। সম্ভবত গুহার পাহারাদারের নাম। প্রতিধ্বনি বাজল। ড্রাইভারও বেরিয়ে এসেছে এবার। প্রদীপ তখনও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অস্ত্রটির মুখ যখন আকাশের দিকে তখনই গুলি বের হতে লাগল। সেই শব্দ শুনে লোকদুটো এমন হকচকিয়ে গেল যে প্রদীপ অস্ত্রের মুখ নামাবার সময় পেল। সঙ্গে-সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে স্থির হয়ে গেল লোকদুটো।

বরফের ওপর ছিটকে পড়া রক্ত দেখতে পেয়ে প্রদীপ নিশ্চিত হল ওখানে গিয়ে যাচাই করার প্রয়োজন নেই। যন্ত্রটাকে যে শেষপর্যন্ত কাজ করাতে পারল তার জন্যে মন হালকা লাগছিল এখন। কিন্তু বাকি লোকদুটো কোথায়? ওরা কি জিপটাকে এগোতে দিয়ে পেছনে আসছে?

এইসময় চিৎকার কানে এল। মেয়েলি গলার আর্তনাদটা যে কোমলের তাতে কোনও সন্দেহ নেই। প্রদীপ যতটা সম্ভব দ্রুত ভেতরে ঢুকে ওপরে উঠতেই থমকে গেল। কোমলকে সামনে রেখে একটা লোক অস্ত্র উঁচিয়ে আছে। কোমলের মাথায় ওর অস্ত্র ঠেকানো। দ্বিতীয় লোকটা অজ্ঞান হয়ে থাকা লোকটির বাঁধন খুলছে দ্রুত হাতে। প্রদীপ ঠোঁট কামড়াল। ভুল হয়ে গেছে খুব। যে পথ দিয়ে রাই এখানে আসার চেষ্টা করছিল সেই পথ দিয়েই উঠে এসেছে লোকদুটো। গুলির শব্দে ওরা নিশ্চয়ই বিপদ বুঝতে পেরেছিল তাই দুই দলে বিভক্ত হয়ে এখানে পৌঁছতে চেষ্টা করেছে।

এখন কোমল ওদের সামনে, এই অবস্থায় কোনওমতেই গুলি ছোড়া যায় না।

প্রদীপ নিজেকে আড়ালে রাখার চেষ্টা করল। ওদের সামনে না গেলে ওরা আর যাই হোক তার ওপর মানসিক চাপ তৈরি করতে পারবে না। হঠাৎ ওদের একজন চিৎকার করল, 'বেরিয়ে আয় শালা, তিন মিনিটের মধ্যে না বেরিয়ে এলে এই মেয়েটাকে খুন করব।'

প্রদীপ চুপচাপ মাথা নাড়ল। ওরা কখনওই সেটা করতে পারে না। বস্-এর মেয়েকে খুন করার হিম্মত ওদের কখনওই হবে না। তা ছাড়া, কোমলকে খুন করলে ওদের হাতে নিজেদের আড়াল করার কোনও অস্ত্র থাকবে না। সে কোনও সাড়া দিল না। মিনিট পাঁচেক চলে গেল। প্রদীপ ভেবে পাচ্ছিল না কী করবে। ওরা যদি আজ রাত্রে গুহার মধ্যে থেকে যায় তা হলে সে খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে থাকতেই পারে না। ওরা যদি বুদ্ধিমান হয় তা হলে সেই চেষ্টাই করবে।

কিন্তু এই সময় কোমল আবার চিৎকার করে উঠল। আড়ালে থেকে প্রদীপ দেখল কোমলকে সামনে রেখে, প্রায় ঠেলতে-ঠেলতে এগিয়ে আসছে লোকটা। দ্বিতীয়জন কাছেপিঠে নেই। আহত লোকটাকে গুহার মধ্যে নিয়ে গিয়েছে ওরা। প্রদীপ সরে দাঁড়াল। ধীরে-ধীরে নিচে নেমে এল সে, তারপর লোকদুটোর মৃতদেহ যতটা পারে আড়ালে নিয়ে গিয়ে জিপে উঠে বসে স্টার্ট দিল। কিছুটা পিছিয়ে গিয়ে সে অপেক্ষা করল যতক্ষণ না কোমল আর লোকটাকে দেখা যায়। ব্রেক চেপে ইঞ্জিনের আওয়াজ তুলতে লাগল যেন অনেকটা দূর থেকে উঠে আসছে। ওদের পোশাক চোখে পড়ামাত্র সে জিপটাকে তুলে নিয়ে এসে ব্রেক কষল আড়াআড়িভাবে। যেন এইমাত্র উঠে এসেছে। লোকটা চেঁচিয়ে কিছু বলল। তারপর আচমকা কোমলকে নিয়ে পাহাড়ের দিকে মুখ করে ঘুরে গেল। এবার জিপের দিকে পিছন ফিরে হাঁটছিল সে। এভাবে হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছিল কোমলের। আর এই হাঁটার সময় সমানে চিৎকার করে সঙ্গীদের ডাকছিল লোকটা। এখন ওর পিছন দিক প্রদীপের সামনে। জিপের কাছাকাছি চলে আসায় পিস্তলের আওতার মধ্যে। তবু গুলি ছুড়তে সাহস হচ্ছিল না ওর। এই সময় দ্বিতীয় লোকটাকে খাঁড়ির ওপরে দেখা গেল। লোকটা চিৎকার করে কিছু বলতে কোমলকে টেনে আনা লোকটা স্থির হয়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে গুলি চালাল প্রদীপ। দ্বিতীয় লোকটা ছিটকে পড়ে গেল খাঁড়ির মধ্যে।

প্রথম লোকটা দাঁড়িয়ে আছে শক্ত হয়ে। ওর অস্ত্র কোমলের মাথায় ঠেকানো। আঙুল ট্রিগারে। প্রদীপের সামনে ওর পিছন দিক। এক ঝটকায় ঘুরে দাঁড়িয়ে গুলি ছুড়লে প্রদীপ পাল্টা গুলি ছুড়তে পারবে না। প্রদীপ চিৎকার করল, 'আমার কাছে তুমিও যা আর তোমার বসের মেয়েটাও তাই। ওর জন্যে যদি ভাব গুলি করব না তা হলে ভুল

করবে। খাঁচার ইচ্ছে থাকলে যন্ত্রটা ফেলে দাও।'

লোকটা মাথা নাড়ল, 'আমি তোকে বিশ্বাস করি না।'

সঙ্গে-সঙ্গে হুমড়ি খেয়ে বরফের ওপর লুটিয়ে পড়ল কোমল, লোকটা ঘাবড়ে গিয়ে নিচু হতেই প্রদীপ জিপ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে অস্ত্রটা দিয়ে আঘাত করল ওর মাথায়। লোকটা ঘুরে সোজা হতে-হতে প্রদীপ দ্বিতীয়বার আঘাত করল, ওর মুখে। এবার লোকটা গড়িয়ে পড়ল। পড়ে স্থির হয়ে গেল। কোমলকে টেনে তুলল সে। মেয়েটা তখন থরথর করে কাঁপছে। এই তিন দিনের ঝড়, মেয়েটার সমস্ত শক্তি যেন শুষে নিয়েছে। প্রদীপ এক হাতে তাকে জড়িয়ে ধরল। নিচু গলায় বলল, 'আর কোনও ভয় নেই।'

'আপনি কে?' অদ্ভুত গলায় প্রশ্নটা উচ্চারণ করল মেয়েটা।

'আমি তো তোমাকে আমার নাম বলেছি। চলো, এবার আমরা ফিরে যাব।' প্রদীপ ঘুরে জিপটার দিকে তাকাল। জিপ চালিয়ে সে স্বচ্ছন্দে গ্যাংটক ফিরে যেতে পারে। কিন্তু তাহলে বাইকটার কী হবে? এই জিপ তার নয় কিন্তু বাইকটা নিজস্ব। ওটাকে এখানে বরফের মধ্যে ফেলে রেখে সে চলে যেতে পারে না।

সে মেয়েটাকে জিজ্ঞাসা করল, 'গাড়ি চালাতে পারো?'

কোমল মাথা নাড়ল, না।

'তা হলে তোমাকে কষ্ট করতে হবে। আমার হাত ধরে চলো।'

কোমলকে নিয়ে প্রদীপ আবার খাঁড়ির ভেতর দিয়ে ওপরে উঠে এল। এখন এই বরফের পৃথিবীতে ছায়া নেমেছে। দিন ফুরিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। এই রকম পরিস্থিতিতেও প্রদীপের খিদে পাচ্ছিল। ও গুহার মধ্যে ঢুকে পড়ল। স্টোভের পাশে কিছু খাবার রয়েছে। কার খাবার কে খায়।

কোমল খেতে চাইল না। প্রদীপ তাকে কয়েকবার অনুরোধ করেও রাজি করাতে পারল না। একজন স্বেচ্ছায় না খেয়ে থাকা মানুষের সামনে ভালোভাবে খাওয়া যায় না। প্রদীপ কিছুটা কোনওমতে গিলে নিয়ে পা বাড়াতে গিয়ে থমকে গেল। শব্দ হচ্ছে গুহায়। শব্দটা আসছে ওয়াকিটকি থেকে। এক মুহূর্ত চিন্তা করে সে এগিয়ে যন্ত্রটা তুলে কানের কাছে ধরে সুইচ অন করল, 'হ্যালো। হ্যালো।' খুব ক্ষীণ স্বর ভেসে এল, 'জিরো জিরো টু জিরো টু?'

'ইয়েস। জিরো জিরো টু স্পিকিং।'

'জি-ওয়ান কলিং। জি-ওয়ান কলিং। হোয়াট ইজ দ্য রেজাল্ট?'

'রেজাল্ট ইজ গুড। ভেরিগুড।'

'ও কে। কাম জি ইমেডিয়েটলি। বস উইল মিট ইউ। ওকে?'

'ও কে!'

'ওভার।' যন্ত্রটা থেমে গেল।

এই ছোট্ট অথচ শক্তিশালী যন্ত্রটার সঙ্গে গ্যাংটক শহরের একটি যন্ত্রের সরাসরি সংযোগ আছে। জি ওয়ান মানে গ্যাংটক এক তা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। গ্যাংটকে আর কতগুলো ঘাঁটি আছে ওদের? প্রদীপ ঠিক করল এই যন্ত্রটা নিয়ে যাবে সঙ্গে।

বের হওয়ার আগে সে গুহাটাকে ভালো করে দেখে নিল। একটা ছোট্ট বাক্সের মধ্যে সে ভাঁজ করা কতগুলো ম্যাপ পেল। ম্যাপের ওপর চোখ বুলিয়ে প্রদীপ অবাক

হয়ে গেল। সিকিম থেকে বেরিয়ে তিব্বতের ভেতর অনেকটা জায়গা জুড়ে এই ম্যাপ ব্যবহারকারীর যাওয়া-আসা আছে। পেন্সিল দিয়ে বেশ কিছু জায়গা চিহ্নিত করা। সীমান্তের ওপাশে এরা কী করতে যায়?

কোমলকে নিয়ে বরফের ঢাল পেরিয়ে মোটরবাইকের কাছে পৌঁছতে-পৌঁছতে সূর্য ডুবে যাওয়ার সময় চলে এল। বাইকটার ওপর ইতিমধ্যে ভালো তুষার জমে গেছে। সেসব ছাড়িয়ে ওটাকে চালু করতে বেশ কসরৎ করতে হল। ইতিমধ্যে পথে নতুন তুষার পড়েছে। পথটাও সরু। কোমলকে পিছনে বসিয়ে শক্ত করে ধরে রাখতে বলল প্রদীপ। কাদা তুষারে বাইকের চাকা আটকে যাচ্ছে। কোনওমতে পুলিশ ফাঁড়ির সামনে নেমে এল ওরা।

দোকানগুলো এর মধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে। ওরা সারাদিনে ক'টা খদ্দের পায় কে জানে। বাইকের হর্ন বাজাল প্রদীপ। সে আশা করছিল ভেতর থেকে দ্বিতীয় পুলিশটা বেরিয়ে আসবে কিন্তু কেউ এল না। অগত্যা বাইক দাঁড় করিয়ে প্রদীপ বারান্দায় উঠে এল। দরজায় দাঁড়িয়ে দেখল লোকটা পড়ে আছে মাটিতে, চিৎ হয়ে। কাছে গিয়ে বুঝতে পারল লোকটাকে আবার মারা হয়েছে, মেরে ফেলেনি। গুলির চিহ্ন নেই, রক্তপাতও হয়নি। ওর জ্ঞান ফেরাতে সামান্য সময় লাগল। প্রদীপ লোকটাকে বলল, 'বারান্দায় গিয়ে বসো। মিলিটারি ভ্যান দেখতে পেলেই থামাবে। তাদের বলবে এখনই এক নম্বর গুহায় তল্লাশি করতে। বুঝতে পারছ?'

লোকটা আচ্ছন্ন হয়েছিল। সেই অবস্থায় মাথা নাড়ল। প্রদীপ একটা চেয়ার টেনে দরজার কাছে লোকটাকে বসিয়ে দিল। কিন্তু তার ঠিক ভরসা হচ্ছিল না ওর ওপর।

মিনিট খানেকের মধ্যে মোটরবাইকটা গতি তুলল। চাকার ধাক্কায় তুষার ছিটকে যাচ্ছে। কোমল তার পেছনে বসেও আছে চুপচাপ। মুখে রুমাল জড়িয়ে নিয়েছিল প্রদীপ। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঠান্ডা ছুঁচোলো বাতাসের কামড় তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছিল। হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি চলকে উঠল। একটুও দ্বিধা না করে সে বাইক নিয়ে উঠে এল এক নম্বর গুহার পিছনে। শরীরগুলো এখনও বরফের ওপর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। যাকে সে শেষবার আহত করেছিল সেই লোকটা এখন নড়ছে। তার জ্ঞান ফিরে আসছে। কোমলকে বাইক থেকে নামতে বলল সে। তারপর জিপের পিছনের কপাট খুলে ফেলল। খুব বেশি জায়গা নেই। তার ওপর স্টেপনিটা অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে। সে টেনে-টেনে স্টেপনিটাকে বরফের ওপর নামাল। তারপর বাইকটাকে স্টেপনির ওপর তুলতে মনে হল বাকি উচ্চতাটুকু তুলতে পারবে। কিন্তু শক্তি প্রয়োগ করে বুঝতে পারল ব্যাপারটা তার একার পক্ষে সম্ভব নয়। সে বাইকটাকে খুব সামান্যই ওপরে তুলতে পারছে। এই ঠান্ডাতেও ওর শরীর থেকে ঘাম বের হচ্ছিল। এতক্ষণ কোমল চুপচাপ প্রদীপকে দেখছিল। এবার সে এগিয়ে এল। ওকে হাত লাগাতে দেখে দ্বিগুণ উৎসাহে প্রদীপ বাইকটাকে তুলতে চাইল। একটু-একটু করে বাইকটা জিপের মেঝেতে পৌঁছে দিয়েই ঠেলতে লাগল ওরা। বাইক ঘষটে গেল অনেকটা কিন্তু শেষপর্যন্ত ওটাকে ওপরে তুলতে সক্ষম হল ওরা। প্রদীপ দেখল চাকা বাইরে বেরিয়ে থাকায় জিপের কপাট তোলা যাচ্ছে না। সে দ্রুত গাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল। গুহায় পৌঁছবার মুখে সে লোকটিকে দেখতে পেল। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে। ওকে দেখামাত্র আতঙ্কিত হয়ে উঠল ওর মুখ। কোনও কথা

না বলে দড়ি কুড়িয়ে নিল প্রদীপ। তারপর বেরিয়ে আসার মুখে ব্যান্ডির বোতলটা নিচে দেখতে পেয়ে তুলে নিল।

খাঁড়ি থেকে বেরিয়ে জিপের দিকে তাকিয়ে ও লোকটাকে দেখতে পেল। এখন উঠে দাঁড়িয়েছে লোকটা। বাইকের চাকায় হাত দিয়ে কোমল লোকটার দিকে পেছনে ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। ওকে আসতে দেখে লোকটা আবার বরফের ওপর বসে পড়ল। শত্রুকে জাগিয়ে রাখতে নেই। ব্যান্ডির বোতল দিয়ে লোকটার মাথায় সামান্য আঘাত করতেই ও আবার লুটিয়ে পড়ল বরফের ওপর।

বাইকটাকে ভালো করে জিপের সঙ্গে বেঁধে অস্ত্র এবং ওয়াকিটকি নিয়ে সে চলে এল ড্রাইভিং সিটে। পাশের দরজা খুলে কোমলকে বলল উঠে বসতে। সামনের কাচে তুষার জমেছে। সেটাকে পরিষ্কার করে ইঞ্জিন চালু করল প্রদীপ। ধীরে-ধীরে জিপটাকে নামাচ্ছিল প্রদীপ। রাস্তা এত সরু যে প্রতি মুহূর্তে নিচে গড়িয়ে পড়বে বলে আশংকা হচ্ছিল। শেষপর্যন্ত নিচে পৌঁছবার আগের মুহূর্তে সে গাড়ির আওয়াজ শুনতে পেয়ে ব্রেক চেপে চুপচাপ দাঁড়িয়ে গেল। গাছের আড়ালে থাকায় ওদের দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা নিচ থেকে কম। প্রদীপ দেখল একটা মিলিটারি কনভয় ফিরছে। পরপর আটটা গাড়ি চলে গেল পুলিশ ফাঁড়ির দিকে! ওরা যাবে সীমান্তে। কিন্তু তাকে দ্রুত চলে যেতে হবে এই এলাকা ছেড়ে। মিলিটারিদের হাতে ধরা পড়লে ওরা কোনও ব্যাখ্যাই মানতে চাইবে না। সেপাইটা নিশ্চয়ই ওদের থামাবে।

চওড়া রাস্তায় পড়ে যতটা সম্ভব জোরে জিপ চালাচ্ছিল প্রদীপ। পাশে পুতুলের মতো বসে আছে কোমল। সন্ধে নেমে গেছে। জিপের হেডলাইট জ্বালিয়ে দিতে হয়েছে। প্রায় ঘন্টাখানেক আসার পরে জিপ থামাতে হল সামনের কাচ পরিষ্কার করার জন্যে। ওয়াইপারের ক্ষমতা নেই ওই তুষার সরানোর।

মাটিতে নামতেই প্রদীপের মনে হল দুটো পা নেই। এত অবশ হয়ে গেছে হাঁটুর নিচু অংশ যে সে ভালো করে দাঁড়াতে পারছিল না। জিপে ফিরে এসে সে ব্যান্ডির বোতল খুলে গলায় ঢালল। তারপর এগিয়ে ধরল কোমলের সামনে।

মাথা নাড়ল কোমল, না। প্রদীপ ধমকাল, 'একটু গলায় ঢালো। শরীর গরম হলে ডিফারেন্সটা বুঝতে পারবে। সব সময় বোকার মতো না বলো না।'

কোমল তাকাল, 'আমি কোনওদিন ওসব খাইনি।'

'এটা এখন ওষুধ। কে কবে ওষুধ খেয়েছে?'

কোমল এবার হাত বাড়াল। বোতলটাকে নিয়ে যেন প্রতিবাদ জানাতেই অনেকখানি গলায় ঢেলে মুখ বিকৃত করে কোনওমতে গিলতে লাগল। ওর হাত থেকে বোতলটা নিয়ে প্রদীপ আর এক ঢোঁক গিলতেই ওয়াকিটকি শব্দ করে উঠল। সুইচ অন করে সে গম্ভীর গলায় বলল, 'জিরো জিরো টু স্পিকিং।'

'জি ওয়ান কলিং, জি ওয়ান কলিং। আর ইউ কামিং ব্যাক?'

'ইয়েস। উই আর অন দ্য ওয়ে।'

'গুড। বস ইজ ওয়েটিং ইন আঙ্কল'স শপ। ও কে!' লাইনটা কেটে গেল। যন্ত্রটা নামিয়ে সে কোমলের দিকে তাকাল, 'আঙ্কলের শপটা কোথায় জানো?'

'না।' ব্র্যান্ডির প্রতিক্রিয়ায় কোমলকে একটু স্বাভাবিক দেখাচ্ছিল।

'তোমার বাবা সেখানে অপেক্ষা করছে।'

'ইম্পসিবল। আমি বাবার কাছে যাব না।' সোজা হয়ে গেল কোমল।

'তোমার বাবা আমাকে এতক্ষণে মৃত ভাবছেন। ভেবে খুশি হয়েছেন। তাঁর সামনে গেলে আমারও ভাগ্য ভালো থাকবে না। কিন্তু এই আঙ্কলস শপটা কোথায় সেটা জানতে হবে।'

'আপনি আমাকে এখানে নামিয়ে দিন।'

'পাগল। ঠান্ডায় জমে মরে যাবে তুমি। বিশ্বাস করতে পারছ না কেন আমাকে? পকেট থেকে দিলবাহাদুরের জিনিসগুলো বের করে সে কোমলের হাতে দিল। ওগুলো দেখা মাত্র কোমল ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। জিপ চালু করল প্রদীপ।

মেয়েটা কেঁদে যাচ্ছে দেখে সে আবার ব্যান্ডির বোতলটা এগিয়ে ধরল। একটুও দ্বিধা না করে খানিকটা খেয়ে নিল কোমল। দিলবাহাদুরের জিনিসগুলো ওর হাতে ধরা। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কোমল জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কে?'

'প্রদীপ গুরুং। দার্জিলিং-এ থাকি। একটা আশ্রমের জন্যে টাকার দরকার ছিল। তোমার বাবা সেই টোপ দিয়ে মিথ্যে কথা বলে আমাকে দিয়ে কিছু কাজ করাতে চেয়েছিলেন। আমি প্রথমে বোকার মতো বিশ্বাস করেছিলাম। এখন তিনি আমাকে সরিয়ে ফেলতে চান।'

'এখন আপনি কী করবেন?'

'দার্জিলিং-এ ফিরে যাব। তবে যাওয়ার আগে ব্যাপারটা পরিষ্কার করতে হবে।'

'আমি কোথায় যাব? আমার তো যাওয়ার জায়গা নেই। কেন আপনি নিয়ে এলেন আমাকে? আমার তো মরে যাওয়াই সবচেয়ে ভালো ছিল।'

'মরতে তো সবাইকে হবেই।'

'বাজে কথা বলবেন না।'

বাইরে এখন ঘন অন্ধকার। হঠাৎ হেডলাইটের আলোয় রাস্তার পাশে দুটো গাড়িকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল সে। বড় গাড়িটা যে ট্যুরিস্টবাস তা বুঝতে পেরে জিপের গতি কমাল। কাছে পৌঁছে বুঝতে পারল ট্যুরিস্টবাস খারাপ হয়েছে এবং একটা মিলিটারি জিপ দাঁড়িয়েছে সাহায্য করার জন্যে। বাসের যাত্রীরা সবাই ঠান্ডার জন্যে ভেতরে বসে আছে। সেই গাইডটাকে দেখতে পেল প্রদীপ। টর্চ হাতে মেকানিককে সাহায্য করছে। জিপ থেকে নামতেই পাদুটো কনকন করে উঠল। কোনওমতে কাছে গিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে?' গাইড মুখ তুলে তাকে চিনতে পারল, 'আরে আপনি? ব্যাড লাক। তবে এঁরা ঠিক করতে পারছেন।'

প্রদীপ বলল, 'আমার সঙ্গে একজন মহিলা আছেন। জিপে কষ্ট হচ্ছে। জায়গা হবে?'

'নিশ্চয়ই।'

'ধন্যবাদ। আচ্ছা, আঙ্কল'স শপটা কোথায়?'

'ওটা এখান থেকে মাইল পাঁচেক দূরে। একটা বুড়োর চায়ের দোকান।'

'ও।' প্রদীপ কোনওমতে জিপের কাছে ফিরে এল। কোমল বসেছিল চুপচাপ। সে ওকে বলল, 'নেমে এসো। জিপে যেতে হবে না তোমাকে। জিপের ওপর তোমার

বাবার লোকজন নজর রাখবে। তুমি ওই বাসে উঠে যাও। আরামে গ্যাংটক পৌঁছে যাবে।'

'তারপর?'

'ওই বাসে উঠে জিজ্ঞাসা করবে সুজাতা কার নাম। তাকে আমার কথা বলবে। মনে হয় তোমরা পরস্পরকে সাহায্য করতে পারবে।'

'বাসের ভেতরে যে ওই নামের কোনও মেয়ে আছে তা আপনি কী করে জানলেন?'

'আমি জানি। মেয়েটি একা, যাও।'

'না। আমি আপনার সঙ্গে থাকব।'

'বোকামি করো না।'

'আপনার পায়ে কী হয়েছে?'

'কিছু না। সুজাতাকে বলবে আমি যে হোটেলে উঠেছিলাম সেই হোটেলে গিয়ে উঠতে। আমি পরে দেখা করব।' প্রদীপ আর দাঁড়াল না। সোজা মিলিটারি জিপটার দিকে এগিয়ে গেল। জিপের ভেতর ড্রাইভার ছাড়া আর একজন অফিসার বসেছিলেন। সে পাশে গিয়ে বলল, 'এক্সকিউজ মি স্যার!'

আধঘণ্টা সময় চলে গেল। ইতিমধ্যে বাস ইঞ্জিন সারিয়ে চলে গেছে গ্যাংটকের দিকে। কোমল শেষপর্যন্ত বাধ্য মেয়ের মতো কথা শুনেছে। মিলিটারি অফিসারটি এতক্ষণ ব্যস্ত ছিলেন ওপরওয়ালাদের সঙ্গে ওয়ারলেসে কথা বলতে। এর মধ্যে পুলিশ ফাঁড়ির সেপাইটির কথা মতো ওরা এক নম্বর গুহা আবিষ্কার করে অনেক তথ্য পেয়ে গিয়েছেন। নিহত এবং আহত লোকগুলোকে ওঁরা ধরতে পেরেছেন। আহত পুলিশটি জবানবন্দি দিয়েছে।

শেষপর্যন্ত অফিসারটি প্রদীপের কাছে এগিয়ে এল। দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছিল বলে প্রদীপ জিপে উঠে বসেছিল। লোকটি জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার কাছে অস্ত্র আছে?'

'না।' সরাসরি মিথ্যে কথা বলল প্রদীপ। যদিও ওর পায়ের নিচে কেড়ে নেওয়া আধুনিক অস্ত্র এবং পকেটে পিস্তলটা রয়েছে তখনও। 'তা হলে ওদের সঙ্গে লড়াই করলেন কী করে?'

'ওদের অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে।'

'সেটা কোথায়?'

'ওখানেই ফেলে এসেছি।'

'বেশ। আপনি এখন এগিয়ে যান। আঙ্কল'স শপের সামনে পৌঁছে মাঝরাস্তায় দাঁড়াবেন কিন্তু জিপ থেকে নামবেন না। আমরা জায়গাটাকে ঘিরে ফেলছি। লেট দেম কাম আউট। ওরা যেন বিশ্বাস করে ওদেরই জিপ ফিরে এসেছে। ও কে?' অফিসার ঘড়ি দেখল।

প্রদীপ ঘাড় নাড়ল। তারপর জিপ চালু করল।

এ ছাড়া উপায় ছিল না। তার একার পক্ষে অতবড় সংগঠিত দলের সঙ্গে মোকাবিলা করতে যাওয়া মানে আত্মহত্যা করা এটা সে জানত। তবু কোমলকে নিয়ে জিপে করে এগিয়ে যাওয়ার সময় সে বেশ ধন্দে ছিল। তখন আঙ্কল'স শপ কোথায়

তা না জানা থাকায় সোজা গ্যাংটকে পৌঁছে যেত। এখন একটা যুদ্ধ সামনে অপেক্ষা করছে। টোপ হিসেবে জিপটাকে নিয়ে সে এগিয়ে যাচ্ছে। এই মিলিটারি অফিসারকে সে কিছু সত্য গোপন করে গিয়েছে। দার্জিলিং-এর ভদ্রলোকের টোপ গিলে যে সে এসেছিল একথা বলেনি। বলেছে ট্যুরিস্ট হিসাবে এই অঞ্চলে বেড়াতে এসে হত্যাকাণ্ড আবিষ্কার করে সে বিপাকে পড়ে গিয়েছে। সুজাতা বা লিটনের প্রসঙ্গ বলার কোনও প্রয়োজন হয়নি। ইতিমধ্যে যাচাই করে তথ্যের সত্যতা মিলিটারি অফিসার পেয়েছেন বটে কিন্তু ওঁরা তার সম্পর্কে কখনওই সন্দেহ মুক্ত হতে পারেন না। যে ঘটনাই এখন ঘটাতে থাক তারপর জীবিত অবস্থায় সে থাকলে অনেক জবাবদিহি তাকে দিতে হবে। আত্মরক্ষা করার জন্যে সে মানুষ মারতে বাধ্য হয়েছে সেটা প্রয়োগ করতে তাকে হিমসিম খেতে হবে।

হঠাৎ ওয়াকিটকির সিগন্যাল শুনতে পেয়ে যন্ত্রটাকে কানের কাছে আনল প্রদীপ, 'হ্যালো।'

'জিরো জিরো টু?'

'জিরো জিরো টু স্পিকিং।'

'জি ওয়ান কলিং। তোমার কি কোনও অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে?'

'ইঞ্জিন গোলমাল করছিল। এখন ঠিক আছে।'

'সে কি তোমাদের সঙ্গে আছে?'

'ইয়েস।'

'বস ইজ ওয়েটিং ফর ইউ। ওভার।'

অন্ধকারে বাইরেটার কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। কোনও আলো দেখা যাচ্ছে না। হেডলাইটের আলো যেন পর্যাপ্ত নয়। হঠাৎ অস্ত্রটার কথা মনে এল। পায়ের নিচে হাত দিয়ে ওটাকে তুলে গাড়ি থামিয়ে দূরের খাদে ছুড়ে ফেলল সে। একটা অস্ত্র নিয়ে অপেক্ষায় থাকা অনেক অস্ত্রের সঙ্গে লড়াই করতে যাওয়া বোকামি। বরং মিলিটারিকে দেওয়া স্টেটমেন্টকে সত্যি করতে তার কাছে অস্ত্র না থাকা উচিত। কিন্তু পিস্তলটা? জিপ চালান সে। পিস্তলটার ওপর তার বেশ মায়া পড়ে গেছে। মতিলালের পায়ের কাছে ফেলে দেওয়ার সময় সে নিতান্তই বাধ্য হয়েছিল। না। মায়া ত্যাগ করতে হবে। পিস্তলটা বের করে ছুড়ে দিল সে বাইরে। পাহাড়ের কোনও খাদে উড়ে গিয়ে পড়ল সেটা। সারা রাতের তুষার তাকে মানুষের চোখের আড়ালে রেখে দেবে, অনেকদিন। এখন সে মুক্ত। একেবারে সাধারণ মানুষ। কেউ একটা ছুরি নিয়ে এগিয়ে এলে প্রতিরোধ করার মতো কিছু সঙ্গে নেই।

পায়ের যন্ত্রণা বাড়ছে। অ্যাকসিলেটার থেকে পা সরিয়ে সেটাকে আবার যথাস্থানে নিয়ে যেতে ব্যাপারটা বুঝতে পারল প্রদীপ। দুটো পা অবশ হয়ে গেছে। যন্ত্রণাটা জন্ম নিয়েছে হাড়ে। হাড়ের বাইরে মাংস, চামড়া আছে কি না তা বোঝা যাচ্ছে না হাত না বোলালে। সে স্পিড কমাল। প্রয়োজনের সময় যদি ব্রেকে পা নিয়ে যেতে না পারে?

এবং তখনই দূরে আলো দেখল। সামনেই ছোট জনপদ। বরফ শেষ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। একটু-আধটু তুষার পড়ছে গুঁড়ো ধুলোর মতো। পাহাড়ে গরিব মানুষেরা যেভাবে থাকে। একটা দোকানের সামনে আলো জ্বলছে। দোকানটা চা-বিস্কুটের। গাড়িটা

একটু আগে দাঁড় করল। ক্লাচ এবং ব্রেকে যে সে চাপ দিয়েছে তা নিতান্তই অভ্যেস। প্রদীপ চিনতে পারল। সকালে যাওয়ার সময় এই বুড়োর কাছে সে হদিশ জানতে চেয়েছিল।

বুড়ো অবিকল একই ভঙ্গিতে বসে আছে দোকানে।

প্রদীপ চিৎকার করল, 'হ্যালো আঙ্কল! আই অ্যাম হিয়ার।'

বৃদ্ধ হাত নেড়ে ভেতরে যেতে বলল।

প্রদীপ চিৎকার করল, 'ইম্পসিবল। আমি হাঁটতে পারছি না। বরফ আমার পায়ে থাবা বসিয়েছে।'

বৃদ্ধ সেটা শোনার পর ভেতর দিকে মুখ ঘুরিয়ে কিছু বলল চাপা গলায়। প্রদীপ দেখল একটি লোক বেরিয়ে আসছে। লোকটা যদি তাকে গুলি করে তাহলে তার কিছু করার নেই। কিন্তু লোকটা সেসব কিছুই না করে ইশারায় তাকে অনুসরণ করে হেডলাইটের আলো ধরে সামনে হাঁটতে লাগল। অর্থাৎ এটা যদি আঙ্কলের দোকান হয় তা হলে বিশিষ্ট ভদ্রলোক এখানে নেই। তিনি অনেক বেশি সতর্ক।

মিনিট তিনেক যাওয়ার পর লোকটা তাকে ইশারায় দাঁড়াতে বলে বাঁ-দিকে চলে গেল। প্রদীপ দেখল ওপাশে পাহাড়ের গা ধরে একটি গাড়ি স্বচ্ছন্দে যেতে পারে। লোকটা ঢুকেছে সেই পথে। সে পিছনে তাকাল। কোনও মানুষের অস্তিত্ব নেই। সামনেও কোনও গাড়ির আলো জ্বলছে না। অথচ সেইরকম কথা ছিল। মিলিটারি অফিসার তাকে ওইরকম আশ্বাস দিয়েছিলেন।

এইসময় তিনজন লোক বেরিয়ে এল অন্ধকার ফুঁড়ে সেই রাস্তা দিয়ে। তিনজনের হাতে অস্ত্র। একজন চিৎকার করল, 'কে হাঁটতে পারছে না?'

'আমি।' গলা তুলে বলল প্রদীপ।

'বাকিদের কি পায়ে বাত হয়েছে? অ্যাই, তোর নাম কী?'

এই প্রশ্নটাই শেষপর্যন্ত ওরা করবে তা জানত প্রদীপ। সে আচমকা গিয়ার পালটে অ্যাকসিলেটারে চাপ দিয়ে জিপটাকে সরু রাস্তায় নিয়ে গেল। হেডলাইটের আলোয় তিনটে মুখ আচমকা ভয়ার্ত হয়ে উঠল। পাহাড়ের দিকে সরে যাওয়ার কোনও জায়গা নেই। পেছনের দিকে ছুটে যাওয়ার চেষ্টা করে ওরা ঝাঁপ দিল যেদিকটায়, সেদিকে শুধুই শূন্য। তিনটে মানুষের আর্তচিৎকার শোনা গেল রাতের নিস্তব্ধতা চূর্ণ করে।

আর তখনই গুলি ছুটে আসতে লাগল সামনে থেকে। সামনের কাচ ভেঙে পড়তেই প্রদীপ কোনওমতে শরীরটাকে পেছনে নিয়ে এল। সামনের সিটে তখন গুলি বিঁধছে। প্রদীপ দ্রুত হাতে মোটরবাইকের দড়ির বাঁধন খুলতে চেষ্টা করছিল। বাঁধবার সময় খেয়াল করেনি এভাবে খোলা দরকার হতে পারে। হঠাৎ একটা চিৎকার শোনা গেল। কেউ একজন ধমকে গুলি না চালাতে বলছে। গুলি যখন বন্ধ হল তখন প্রদীপের মনে হল গলার স্বর যেন একটু চেনা-চেনা।

ততক্ষণে বাইকটাকে মুক্ত করে সে নিচে নামাতে পেরেছে। লোকগুলোর সঙ্গে তার একমাত্র আড়াল এখন জিপটা। ওরা নিশ্চয়ই এগিয়ে আসছে। বাইকে বসে সে স্টার্ট নিতে চেষ্টা করল। কিন্তু পা উঠছে না তার। দুই পায়ে বিন্দুমাত্র শক্তি অবশিষ্ট নেই। বাইক চালু করতে যতটুকু শক্তি পায়ে দরকার হয় তা জোগাড় করতে না পেরে সে সাইকেলের মতো বাইরের চাকা গড়িয়ে যেতে দিল। ঢালু রাস্তা বলে মোটরবাইকটা

নিচের দিকে নেমে যাচ্ছিল। সেই অবস্থায় ইঞ্জিন চালু করার প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল প্রদীপ।

পিচের রাস্তায় পড়ে সে গ্যাংটকের দিকে বাঁক নিল। এবং তখনই পেছনে গাড়ির আলোকে ছুটে আসতে দেখল সে। ঢালু পিচের পথ পেয়ে বাইক তখন বেশ জোরে ছুটছে। এবার সামনে থেমে গাড়ির আওয়াজ ভেসে আসতেই ব্রেক চেপে গাড়ি নিয়ন্ত্রণ করল সে। বাইকটা থেমে যাওয়ামাত্র মাটিতে পা দিতেই আছাড় খেয়ে পড়ল প্রদীপ। হাঁটুর নিচ থেকে কোনও কিছু যেন তার অবশিষ্ট নেই। কোনওমতে বাইকটাকে টেনে-হিঁচড়ে রাস্তা থেকে অনেকটা সরে যাওয়ামাত্র ওপর থেকে একটার পর একটা মিলিটারি আর পুলিশের গাড়ি জায়গাটা পেরিয়ে চলে গেল। অর্থাৎ এতক্ষণে ত্রিমুখী অভিযান শুরু হল। ওরা ওকে বিশ্বাস করেনি তাই টোপ হিসেবে ব্যবহার করেছিল। এতক্ষণে গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়ার কথা ওর।

অন্ধকারে উঠে বসতে চেষ্টা করল প্রদীপ। হাত বোলাল পায়ে। তারপর জুতো খুলতে লাগল। দুটো পা দারুণ ফুলে গেছে। ভেজা জুতো বসে গেছে চামড়ায়। কোনওমতে জুতো-মোজা খুলে ফেলতেই ওপরে গুলির আওয়াজ শুরু হল। মাটিতে পা ঘষতে-ঘষতে মনে হল সাড় আসছে। কোনওমতে বাইকটাকে দাঁড় করিয়ে সে উঠে বসে স্টার্ট নেওয়ার চেষ্টা করতেই থমকে গেল। অন্ধকারে কিছু একটা নড়ছে। একটা মানুষ। পাহাড় থেকে লাফিয়ে নিচে নামল। তারপর দৌড়তে লাগল সামনে। লোকটা ভালো করে দৌড়তে পারছিল না।

চট করে হেডলাইট জ্বালাল প্রদীপ। আতঙ্কিত লোকটা ঘুরে দাঁড়াল। ওর হাতে একটা রিভলভার। ভদ্রলোকের ভয়ার্ত মুখ চিনতে অসুবিধে হল না তার। চটপট হেডলাইট নিভিয়ে দিয়ে সে শরীরের সমস্ত শক্তি জড়ো করে স্টার্ট নিতে চাইল। সঙ্গে-সঙ্গে বাইকটা চালু হয়ে গেল। প্রদীপ রাস্তায় নামল।

হেডলাইটের আলোয় লোকটাকে দৌড়তে দেখল সে।

সে বাইকের গতি বাড়াল। মুহূর্তেই লোকটি তার সামনে। রাস্তার একপাশে সরে যেতে-যেতে রিভলভার তাক করছে। কোনও চিন্তাভাবনা না করে বাইক নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে লোকটার ওপর। একটুও চিৎকার করল না লোকটা। প্রদীপ দেখল সে বাইক সমেত শূন্যে ভেসে যাচ্ছে। পরক্ষণেই রাস্তায় পড়ল বাইকটা। সে প্রাণপণে হ্যান্ডেল দুটো ধরে রাখতে চেষ্টা করছিল। দুটো চাকা একসঙ্গে পড়ার পর বাইকটা লাফিয়ে উঠতেই আবার ব্যালেন্স রাখতে চেষ্টা করল প্রদীপ। পড়তে-পড়তে শেষ মুহূর্তে সোজা হয়ে বাইকটা ছুটে যেতে লাগল সামনে। প্রদীপ দাঁড়াল না। পিছন থেকে কোনও শব্দ ভেসে আসছিল না। দুহাতে বাইকটাকে আঁকড়ে ধরে সে স্পিড বাড়াতে লাগল। মিলিটারি অথবা পুলিশ জানতে পারলেই তার পেছনে ছুটে আসবে।

গ্যাংটক শহরে সে যখন পৌঁছল তখন মধ্যরাত। বাস টার্মিনাসের পাশ দিয়ে ওপরে ওঠার সময় তার দৃষ্টি ঝাপসা। হঠাৎ যে লোকটা রাস্তার মাঝখানে চলে এসে হাত নাড়তে লাগল, তার শরীরের ওপর বাইকটা তুলে দিতে গিয়ে শেষ মুহূর্তে ব্রেক চাপল সে। সঙ্গে-সঙ্গে ছিটকে পড়ে গেল প্রদীপ বাইক থেকে। পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল।

দু-দিন পরে যখন তার জ্ঞান ফিরল তখন সে প্রথমে লিটনের মুখ দেখতে পেল।

ছেলেটার মুখে দাড়ি, চোখে রাত জাগার চিহ্ন।

'কেমন আছ গুরু?'

'ভালো।' নিশ্বাস নিল প্রদীপ।

'আর একটু হলে তুমি আমাকে খতম করে দিয়েছিলে।'

প্রদীপের মনে পড়ল। বাস টার্মিনাসের কাছে যে লোকটা সামনে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছিল সে যে লিটন তা বুঝতে পারেনি তখন, বোঝার ক্ষমতা ছিল না।

'আমার পা?' সে নিচু স্বরে জিজ্ঞাসা করল।

'বেঁচে যাবে। অল্পের জন্যে বেঁচেছে, হাঁটু থেকে কেটে ফেলতে হতো, ডাক্তার বলেছে।'

'ওঃ।' বুক থেকে স্বস্তি জড়ানো বাতাস বেরিয়ে এল।

'গুরু?'

'বল।'

'একটা ছবি দ্যাখো।' লিটন সন্তর্পণে একটা ফটোগ্রাফ তুলে ধরল। বরফের মধ্যে একটি লোক পড়ে যাচ্ছে, তার পাশে কোমল, দূরে বন্দুক হাতে একজন। লিটন বলল, 'কাপুরের ফিল্ম ম্যানেজ করে নিয়েছি আমি।'

'গুড। আমি এখন কোথায়?'

'হাসপাতালে।'

'পুলিশ?'

'সব খুলে বলেছি আমি। এই ছবি দেখার পর ওরা সব মেনে নিয়েছে।'

'সেই লোকটা?'

'কোন লোক? কোমলের বাবা? নেই। ওকে পুলিশ মেরুদণ্ড ভাঙা অবস্থায় পরদিন রাস্তার ওপর পড়ে থাকতে দ্যাখে।'

'যাচ্চলে। ফিরে গিয়ে বাচ্চাগুলোকে কীভাবে বাঁচাব জানি না।'

'বাঁচাবার দরকার হবে না। যে কিনছিল সে-ই তো নেই।' লিটন হাত ধরল প্রদীপের। বলল, 'গুরু। রেস্ট নাও এখন। কিন্তু তার আগে একটা সমস্যা আছে।'

'কী সমস্যা?'

'দুজন দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। তোমার সঙ্গে দেখা করবে বলে।'

'দুজন?' ভাঁজ পড়ল প্রদীপের কপালে।

'সুজাতা আর কোমল। কাকে আগে ঢুকতে বলব?' লিটন ফাজিল হাসি হাসল।

চোখ বন্ধ করল প্রদীপ, 'আমি এখন ঘুমাব। অনেকক্ষণ ঘুমাব। বাই।'

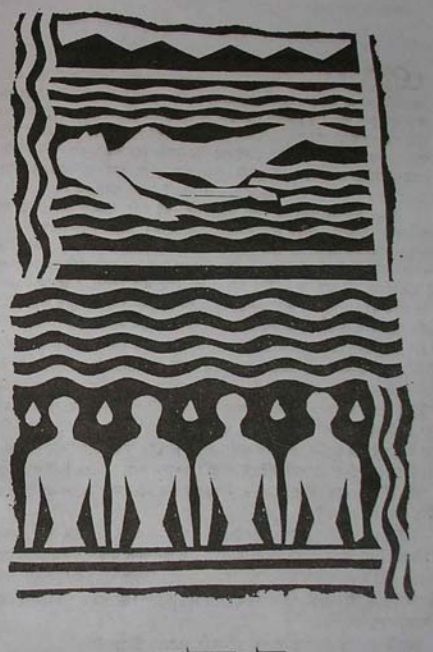

মানবপুত্র

এ রকম ঘটনা এই শহরে এর আগে ঘটেনি।

তার আগে শহরটার পরিচয় দেওয়া দরকার। আমাদের চেনাশোনা আর পাঁচটা শহরের সঙ্গে এই শহরটির পার্থক্য হল এখানে আইন-শৃঙ্খলা সবাই মানে, বয়স্কদের শ্রদ্ধা করে কনিষ্ঠরা, কারণ এই শহরটিকে ওঁরা নিজেদের রক্ত দিয়েই তৈরি করেছেন বলা যায়। শহরের জন্যে প্রত্যেকেরই মায়া আছে, তাই কোনও ত্রুটিবিচ্যুতি সচরাচর চোখে পড়ে না। অথচ মাত্র পঞ্চাশ বছর এই শহরটির আয়ু। হিমালয়ের ওপর এমন টাটকা বাতাসের রাজত্বে ছবির মতো এই শহরটা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। খুব কাছের সমতলের বড় জংশন স্টেশনে পৌঁছতে বড়জোর ঘণ্টা আড়াই মতো সময় লাগে।

হিমালয়ের এই তল্লাটের আরও কিছু নামী-দামি শহর আছে যেখানে প্রতি বছর লক্ষ-লক্ষ মানুষ আসে ট্যুরিস্ট হয়ে। কিন্তু পাহাড়ি শহরের যত আকর্ষণই থাক না কেন, বেড়াতে আসা মানুষগুলো সেখানে শরীর সারাতে আসে না। প্রথম কথা : পাহাড়ের জল অনেকেরই সহ্য হয় না, দ্বিতীয় : ওইসব শহরে কিছু দিন বেশি থাকা ব্যয়সাপেক্ষ। এই পরিস্থিতিতে কী করে যে প্রচারিত হল যে আমাদের নতুন শহরটির চারদিকে যেমন অজস্র লোভনীয় প্রাকৃতিক দৃশ্যের অভাব নেই, তেমনই এখানকার জল ঠিক আর পাঁচটা পাহাড়ি শহরের চেয়ে চরিত্রে একদম আলাদা। মধুপুর, দেওঘরের মতো এই জলে শরীর সুস্থ হয়। এখানকার হোটেলগুলো মোটেই ব্যয়সাধ্য নয়। ফলে গত বছর থেকে এখানে ট্যুরিস্টরা আসছে এবং এই শহরের মানুষেরা সারা বছরের খরচ, আশা করা যায় ট্যুরিস্টরাই দিয়ে যাবে। এ বছর ভিড় আরও বেড়েছে কিন্তু এতটুকু বিশৃঙ্খলা দেখা যায়নি। ট্যুরিস্টদের কাছে বিভিন্ন হোর্ডিং-এ আবেদন করা হয়, এই শহরটাকে নিজের বলে মনে করুন। এখানকার প্রশাসনব্যবস্থা অত্যন্ত সজাগ। দেশের সরকার ইতিমধ্যে কিছু-কিছু সাহায্য করেছেন বটে তবে তাঁরা এখানকার স্বায়ত্তশাসন যেন অনেকটাই মেনে নিয়েছেন। গণভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই শহরটিকে শাসন করেন। এখন যিনি কমিশনার তিনি সেই আদিযুগ থেকেই শহরে আছেন। নিজের রক্তের মতো মনে করেন এই শহরকে। শহরটির নাম কনকপুর।

সেই শহরে একদিন সকালে কাণ্ডটা ঘটে গেল। সবে ঘুম ভেঙেছে কিন্তু এখনও আলস্য যায়নি। এই রকম ভোরে শহরটার গায়ে কুয়াশার হালকা চাদর জড়ানো থাকে। সেই সময় একটি যুবক প্রায় ছুটতে-ছুটতে থানায় ঢুকল। রিসেপশনের অফিসারটি তখন রাত্রিজাগরণে ক্লান্ত, তাঁর বদলি অফিসারের অপেক্ষায় ছিলেন। উত্তেজিত যুবকটিকে দেখে কিন্তু সোজা হয়ে বসলেন।

যুবকটি হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, অফিসার, আমার স্ত্রীকে বাঁচান।

অফিসার চেয়ারটি দেখিয়ে বললেন, বসুন। কী হয়েছে বলুন!

আমার স্ত্রীকে পাচ্ছি না। ছেলেটির মুখ সাদা। কাল রাত্রে একসঙ্গে শুয়েছি আমরা, ভোরে উঠে আর দেখতে পাচ্ছি না।

অফিসার হাসলেন, আরে মশাই, ভোর তো সবে হল। উনি একলা একটু বেড়াতেও তো যেতে পারেন। নতুন বিয়ে করেছেন বুঝি?

যুবকটি খুব দ্রুত মাথা নাড়ল, না-না, বেড়াতে যায়নি ও। এই দেখুন, টেবিলের ওপর এই চিঠিটা ছিল।

অফিসার হাত বাড়িয়ে চিরকুটটি নিলেন। মেয়েলি অক্ষরে লেখা রয়েছে, 'এই সম্পর্ক মানতে পারছি না। তুমি এত ভালো তাই তোমাকে ঠকাব না। আমার কথা ভুলে যেয়ো, ক্ষমা চাইছি।'

এবার অফিসার নড়ে-চড়ে বসলেন। তারপর কাগজ-কলম নিয়ে যুবকটিকে জেরা করতে লাগলেন। এ রকম অভিজ্ঞতার কথা তিনি গল্পের বইতে পড়েছেন। কনকপুরের এমন ঘটনা প্রথম ঘটল।

ঠিক চল্লিশ মিনিট পরে ম্যাল রোডের ধারে নির্জন বাংলোর লনে সবে চা খেতে-খেতে কমিশনার গুপ্ত মুখ তুলে দেখলেন পুলিশের বড়কর্তা সেন গেটের বাইরে গাড়ি রেখে লনে পা ফেললেন। এত ভোরে ওঁর আসার কোনও অভ্যেস নেই। গুপ্ত কিঞ্চিৎ অবাক হলেও তা প্রকাশ করলেন না। মনের অভিব্যক্তি চেপে রাখায় নিপুণ তিনি। সামনে এসে স্যালুট করে দাঁড়াতেই গুপ্ত নমস্কার জানালেন, বসুন-বসুন, চা খাবেন?

ধন্যবাদ স্যার, আমরা একটু উত্তেজিত। এই শহরে যা কখনও হয়নি আজ তাই হয়েছে। সেন চেয়ারে শরীর রাখতেই বেতের শব্দ হল।

সঙ্গে-সঙ্গে কপালে ভাঁজ পড়ল গুপ্তর। এই শহরে কোনও খারাপ কিছু হলে তিনি সহ্য করতে পারবেন না। তবু গলায় স্বাভাবিক স্বর বের হল, কী হয়েছে?

একটি ট্যুরিস্ট দম্পতি এসে হিমালয় হোটেলে উঠেছিল। সদ্য বিবাহিতা। হানিমুনে এলে যেমন দেখায় তেমনি দেখতে ওদের। আজ সকালে মেয়েটি উধাও হয়েছে একটা চিঠি লিখে রেখে। তা ওই সকালে এখান থেকে নিচে কোনও ট্রান্সপোর্ট যায়নি। তার মানে মেয়েটি এখানেই আছে। ওকে খুঁজে বের করার জন্য লোক পাঠিয়েছি চারধারে। এটা আপনাকে জানানো কর্তব্য বলেই ছুটে এলাম স্যার। সেন নিবেদন করলেন।

চোখ বন্ধ করে কয়েক সেকেন্ড ভাবলেন গুপ্ত—স্ট্রেঞ্জ। মেয়েটিকে না পাওয়া গেলে শহরের ভীষণ বদনাম হয়ে যাবে। ট্যুরিস্টরা আসতে ভয় পাবে। নো-নো, আজ দুপুরের মধ্যে ওই মেয়েটিকে খুঁজে বের করুন। মনে রাখবেন এটা আমাদের ইজ্জতের ব্যাপার।

সেন বললেন, সে তো নিশ্চয়ই। আমি স্টাফদের বলেছি কনকপুরটাকে চিরুনির মতো আঁচড়াতে। আর হ্যাঁ, ছেলেটিকেও আমি আটকে রেখেছি। বলা যায় না, হয়তো মার্ডার কেস হতে পারে।

পারে। কিন্তু সেটা এই শহরের পক্ষে একটু খারাপ ব্যাপার। এখানে এলে বউ খুন হয় রটে গেলে আবার বিপদ হবে। তেমন খবর আমায় না জানিয়ে প্রেসকে রিলিজ করবেন না। মেয়েটিকে খুঁজে বার করে সমাজপতিকে বলবেন কালকের কাগজের প্রথম পাতায় খবরটা ছাপতে। প্রশাসনের তৎপরতার খবর পড়ে সাধারণ মানুষের আমাদের

ওপর আস্থা বাড়বে। যান, মেয়েটিকে খুঁজে বের করুন। একটু অসহিষ্ণু গলায় কথাগুলো শেষ করে হাত নাড়লেন।

সেন আর অপেক্ষায় থাকলেন না। তিনি ভালো করেই জানেন যে গুপ্ত কোনওমতেই এখন শান্ত থাকবেন না। এই শহরের গায়ে আঁচ লাগছে এমন কিছুকে গুপ্তর পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব। অতএব মেয়েটিকে খুঁজে বের করতেই হবে।

সেন চলে গেলে মনে হল আজকের সকালটা খুব বিশ্রী। এত জায়গা থাকতে তোর এখানে এসে হারাবার কী দরকার ছিল! ধরা যাক, ওকে কেউ খুন করেছে। খবরটা রটে গেলে আর ট্যুরিস্ট আসবে? সবাই ভাববে কনকপুরে গেলে মেয়েদের নিরাপত্তা থাকবে না। কত কষ্টে সবদিক আড়াল করে তিল-তিল করে শহরটাকে তৈরি করেছেন। যার জন্যে কোন ফাঁকে বয়স চলে যাওয়ায় বিয়েটা পর্যন্ত করা হল না।

ভারী মনে একটু বাদেই নিজের জিপ নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন গুপ্ত। বলা যায় না, রাস্তায় আচমকা তাঁর নজরেও পড়ে যেতে পারে মেয়েটা। যদিও তিনি ওকে চেনেন না, ছবিও দেখেননি, কিন্তু ওইরকম পালানে মেয়েদের দেখলেই তিনি চিনতে পারবেন বলেই তাঁর বিশ্বাস।

এখন কনকপুর রোদে ভাসছে। দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল গুপ্তর। কত পরিশ্রম এর পিছনে আছে। একটা ছোট্ট পাহাড়ি গ্রামকে আজ মোটামুটি আধুনিক শহরের চেহারা দেওয়া হল, এক জীবনেই। প্রায় জঙ্গল কেটেই পত্তন। আদিবাসীরা অবশ্যই খুব সন্তুষ্ট নয়, তারা আরও জঙ্গলের গভীরে চলে গেছে। কিন্তু রুজিরোজগারের জন্যে এখানেই আসতে হয়। নির্জন সকালের রাস্তায় জিপের সামনে বসে কিন্তু খুব স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। হঠাৎ ওঁর নজরে পড়ল রাস্তার ধার ঘেঁষে একটি মেয়ে খাদের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। খুব জোরে জিপ ছুটিয়ে ঠিক মেয়েটির পাশে এসে ব্রেক করতেই সে মুখ ঘোরাল। গুপ্ত মনে-মনে বললেন, যাচ্চলে। তারপর হাসিমুখে প্রশ্ন করলেন, কী খবর? কেমন আছ?

মেয়েটি সামান্য মাথা দুলিয়ে হাসল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, আপনি এত সকালে বেরিয়েছেন?

আর বলো না। ছাই ফেলতে তো এই ভাঙা কুলো। তোমার বাবা তো এখন দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে।

গুপ্ত মেয়েটিকে পছন্দ করেন।

মোটেই না। বাবা এখন হাসপাতালে চলে গেছেন—

মেয়েটি প্রতিবাদ করল সহাস্যে।

গুপ্ত বড়-বড় চোখ করলেন, হাসপাতাল! কনকপুরে কারও বড় কোনও অসুখ হয় না। তাই হাসপাতালে বসে তোমার বাবার তো মেডিকেল জার্নাল পড়া ছাড়া কোনও কাজ নেই।

সে আমি জানি না—

কিন্তু ওর মতো সিনসিয়ার মানুষ খুব কম দেখেছি। শোনো, আমার ভাই বলে বলছি না, অপরেশের মতো এমন কাজপাগল মানুষ পৃথিবীতে কমে গেছে বলেই মানুষের এই দুর্দশা। যেই আমি হাসপাতালটা করে ফেললাম, অমনি ওকে টেনে নিয়ে এলাম

এখানে। সবাই ওর প্রশংসা করে কিন্তু ওকে আবিষ্কারের কৃতিত্বটা আমার। তুমি কী বলো? সাগ্রহে তাকালেন গুপ্ত। মেয়েটি সলাজুক হাসল, নিশ্চয়ই। বাবার প্রশংসা—

কিন্তু তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কী দেখছিলে? প্রসঙ্গ পালটালেন গুপ্ত।

স্কুলে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ বাঁদিকে তাকাতেই নিচে কুয়াশাদের গলে যেতে দেখলাম। তাই—

যাচ্চলে! কুয়াশাদের গলে যাওয়া দেখতে পেলে! তোমাদের সবই উদ্ভট। শোনো, একটি মেয়েকে পাওয়া যাচ্ছে না। স্বামীর সঙ্গে বেড়াতে এসে আমাকে ঝামেলায় ফেলেছে। কোনও মেয়েকে একলা ঘুরতে দেখলেই, যদি সন্দেহ হয়, তক্ষুনি আমাকে খবর দেবে—আর দাঁড়ালেন না গুপ্ত।

তাঁর এই ভাইঝিটি খুব শান্ত। এম. এ. পাশ করে বসেছিল। তিনি এখানকার একমাত্র স্কুলে চাকরি করে দিয়েছেন। তাঁর এই ভাইটি ছন্নছাড়া। কোনও চাকরিতে বেশি দিন টিকতে পারেনি পিটপিটুনি স্বভাবের জন্য। শেষমেশ পুরুলিয়ার এক গ্রামে প্র্যাকটিস করছিল। দু-বেলা পেট ভরে ভাত জুটত না কারণ ফি-এর টাকাটা পকেটেই আসত না।

হাসপাতালের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে নিচে নামলেন গুপ্ত। ওঁকে দেখে কর্মচারীরা তটস্থ। না, চেম্বারে অপরেশ নেই। বেয়ারা বলল, সে নাকি ওয়ার্ডে। গুপ্ত সেখানেই চললেন। ওষুধের কড়া গন্ধ তিনি সহ্য করতে পারেন না। যেতে-যেতে দেখলেন প্যাসেজে একটা কাগজ পড়ে আছে। বিরক্ত ভঙ্গিতে সেটাকে তুলে নিয়ে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে ওয়ার্ডে ঢুকলেন।

অপরেশ ঝুঁকে পড়ে একজন রুগির সঙ্গে কথা বলছেন।

গুপ্ত দেখলেন কোনও বেডই খালি নেই। তবে দেহাতিদের সংখ্যাই বেশি। গুপ্তকে দেখে অপরেশ এগিয়ে এলেন, কী ব্যাপার?

এত রুগি কেন?

বাঃ, অসুখ হলে চিকিৎসার জন্যে আসবে না?

গুপ্ত অসন্তুষ্ট ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন, না-না, এ ভালো কথা নয়। একটা শহরের জলহাওয়া কীরকম তা বোঝা যায় সেখানকার হাসপাতালের রুগির সংখ্যার ওপর। আদিবাসীদের কথা আমি ধরছি না, কিন্তু ওখানে তো কিছু—! কথা শেষ না করে গুপ্ত দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেলেন।

আপনার নাম?

মোটাসোটা ভদ্রলোকটি শুয়ে ছিলেন চোখ খুলে, নাম বললেন।

আপনি এখানকার লোক?

না, বেড়াতে এসেছিলাম এখানে। পেটে এত যন্ত্রণা হচ্ছে ওঃ! আগেও ছিল—

গুপ্তর মুখ উদ্ভাসিত হল। অপরেশের কাছে ফিরে এসে বললেন, না, আমাদের দোষ নেই। এরা সব শরীরে রোগ নিয়েই এখানে এসেছে। তবে হ্যাঁ, এ খবর যেন বাইরে না বের হয়। লোকে ভাববে এখানকার জলেরই দোষ। একবার রটে গেলে আর ট্যুরিস্ট আসবে না এখানে।

অপরেশ কী একটা বলতে গিয়ে চুপ করে গেলেন। অস্বস্তি হলেই উনি চশমা

খুলে ফেলেন। গুপ্তর সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে আসতেই অবিনাশকে চোখে পড়ল। এই শহরের সত্যি উদ্যমী সাংবাদিক। সব সময় কাঁধে ক্যামেরা আর হাতে নোট বই নিয়ে ঘোরে। গুপ্ত ওকে ঠিক পছন্দ না করলেও অপরেশের বেশ ভালো লাগে। ওর মালিক-সম্পাদক সমাজপতিটা অবশ্য ধান্দাবাজ লোক।

সুপ্রভাত স্যার। সুপ্রভাত ডাক্তারবাবু। অবিনাশ একগাল হাসল। হাসপাতালে কী মনে করে? গুপ্ত থমকে দাঁড়ালেন। ওর দিকে তাকালেন। বাইরে আপনার গাড়িটাকে দেখে ভাবলাম ডেডবডি এসে গিয়েছে বুঝি! একবার দেখতে পারি ডাক্তারবাবু? শুনেছি মেয়েটি নাকি খুব সুন্দরী।

অবিনাশ অপরেশকে অনুরোধ জানাল।

ডেডবডি! হকচকিয়ে গেলেন অপরেশ।

গুপ্ত গর্জে উঠলেন, কী আজেবাজে কথা বলছ? এখানে কোনও ডেডবডি আসেনি। কনকপুরের কোনও মেয়ে খামোকা মরতে যাবে কেন?

অবিনাশ মাথা নাড়ল, কিন্তু স্যার, মেয়েটি তো ওই রকম লিখেই হাওয়া হয়েছে। আপনাকে এখানে দেখে মনে হল হয়তো—

অপরেশ ব্যাপারটা বুঝতে পারছিলেন না। তিনি দাদার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, কী হয়েছে?

গুপ্ত সামান্য ইতস্তত করে বললেন, একটি মেয়ে এখানে বেড়াতে এসে স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে হোটেল থেকে বেরিয়ে গেছে, মান-অভিমানের ব্যাপার আর কী! তা তুমি এই সকালবেলায় খবরটা পেলে কী করে? অবিনাশ হাসল, সাংবাদিককে সোর্স জিজ্ঞাসা করবেন না স্যার।

সাংবাদিক! যা না কাগজ তার আবার সাংবাদিক! তোমাকে তো পত্রিকা ডেলিভারিও দিতে হয়। গুপ্ত নাক টানলেন।

স্যার! কাগজ তুলে কথা বলাটা ঠিক হচ্ছে না।

অপরেশ তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, বেশ-বেশ। শোনো হে অবিনাশ, আমার এখানে কোনও ডেডবডি আসেনি।

অবিনাশ ঘুরে দাঁড়াল, ব্যস। চুকে গেল ল্যাঠা। আপনার গাড়িটাকে দেখে সন্দেহ হয়েছিল তাই ঢুঁ মারলাম। অবিনাশ চলে যাচ্ছিল, গুপ্ত তাকে ডাকলেন, কোন দিকে যাবে?

অবিনাশ হাসল, বাজারে।

ওইখানে এক মিনিট দাঁড়াও। আমার গাড়িতে যেতে পারবে। কথাটা বলে গুপ্ত অপরেশকে চাপা গলায় বললেন, শোনো, সত্যি যদি কোনও ডেডবডি আসে তাহলে আমাকে না জানিয়ে কাউকে কিছু বলবে না। আর ওই ট্যুরিস্টদের যত তাড়াতাড়ি পারো হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দাও।

অপরেশ মাথা নাড়লেন, কিন্তু ওদের দুজনের যে বেশ কিছুদিন চিকিৎসা করা দরকার। ছেড়ে দেব কী করে?

গুপ্ত গম্ভীর গলায় বললেন, নিজের দেশে গিয়ে করাক। পৃথিবীতে তুমিই একমাত্র ডাক্তার নও।

গুপ্ত অবিনাশকে নিয়ে গাড়িতে উঠে প্রশ্ন করলেন, রাগ করেছ?

না, আমার এ সব কথা অভ্যাস হয়ে গেছে।

তোমাদের কাগজ শুনছি খুব ভালো চলছে?

চলছে। ট্যুরিস্টরা খুব নিচ্ছে। আশেপাশের শহরেও যাচ্ছে।

ভালো, আমি চাই আমাদের এই শহর সব বিষয়ে স্বয়ং-নির্ভর হোক। কিন্তু সমাজপতি আমার কথা শুনছে না। আমি বলেছিলাম এই শহরের প্রশংসা করে কাগজে আরও বেশি লেখা হোক। তুমি ওকে বলো।

বলব, কিন্তু এই তো গতকালই ডাক্তারের আর্টিকেল বের হল এই শহরের পরিবেশ নিয়ে। পড়েছেন? অবিনাশ বলল।

গাড়ি চালাতে-চালাতে গুপ্ত জবাব দিলেন, পড়েছি। ও তো শুধু উপদেশ আর তথ্য। লোকে ইন্টারেস্ট পায় না। তুমি একটু জম্পেশ করে লেখো।

ট্যুরিস্ট মেয়েদের ছবি-টবি ছাপাও। আর যত বেশি ট্যুরিস্ট আসবে তত তোমার কাগজ বিক্রি হবে। আর হ্যাঁ, ওই মেয়েটিকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত কোনও নিউজ তুমি লিখে বসো না যেন।

বিকেলে অপরেশ একটু বেড়াতে বের হলেন। সারাদিন এই একটিবার হাঁটাহাঁটি হয়। খুব জরুরি প্রয়োজন না থাকলে ওঁকে বিকেলের পর হাসপাতালে যেতে হয় না। অপারেশন কেস থাকলে রাত্রে একবার ঘুরে আসেন।

সেজেগুজে বাইরের ঘরে আসতেই সুর্মা বলে উঠল, বাবা তুমি মাঙ্কি ক্যাপ পরোনি। ওটা না পরে কিন্তু বেরিও না।

অপরেশ একটু অসহায় ভঙ্গিতে তাকালেন। মাঙ্কি ক্যাপ তিনি একদম পছন্দ করেন না। কিন্তু মেয়েটা এমন গার্জেনগিরি করে! এই সময় কাজল ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন টুপিটা হাতে করে—নাও। অপরেশ বাধ্য হলেন। এখানে আসার পর তিনি কাজলকে অন্য রকম দেখছেন। এই সুন্দর কোয়ার্টার্স, ফুলের বাগান নিয়ে বেশ খুশিতে আছে ও। এত বছরের বিবাহিত-জীবনে কাজলকে এত প্রাণবন্ত তিনি খুবই কম দেখেছেন।

হঠাৎ সুর্মা বলে উঠল, জানো বাবা, আজ একটা ট্যুরিস্ট বউ এখানে হারিয়ে গেছে।

কাজলের মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল, ও মা তুই জানলি কী করে?

সুর্মা বলল, ভোরে যখন স্কুলে যাচ্ছিলাম তখন জেঠুর সঙ্গে দেখা হল। খুব ব্যস্ত হয়ে যাচ্ছিলেন। উনিই বললেন। জেঠু এই শহরটাকে যা ভালোবাসেন না, যেন নিজের শরীরের চেয়ে দামি।

কাজল বললেন, মেয়েটি কোথায় যাবে! এইটুকু তো শহর।

সুর্মা বলল, খবরটা এখনও চাউর হয়নি। তা এবার কিন্তু খুব ট্যুরিস্ট আসছে এখানে। রাস্তায় পা দিলেই নতুন মুখ দেখতে পাচ্ছি।

অপরেশ একটু অন্যমনস্ক গলায় বললেন, এবার ট্যুরিস্টরা অসুখেও পড়ছে বেশ। সব পেটের গোলমাল। আজই বিকেলে দুজন নতুন পেশেন্ট হাসপাতালে ভরতি হয়েছে।

কাজল বললেন, ও মা, সে কী কথা! এখানে তো পেটের গোলমাল হয় না

বলে শুনেছি। তোমার দাদা বলেন এখানকার জল নাকি অমৃত।

অমৃত কি না জানি না তবে ফুটিয়ে নিচ্ছ তো?

খাবার জল রোজই ফোটানো হয়। তোমার বাপু একটু বেশি পিটপিটুনি স্বভাব। এত লোক জলের প্রশংসা করছে আর তুমি—। কাজল কথাটা শেষ করলেন না। ওঁর নজর তখন বাইরের গেটের দিকে। ঘরে দাঁড়িয়েই জানালা দিয়ে বাগান, গেল দেখা যায়। দরজায় তখন বেশ সুন্দর চেহারার এক যুবক এসে দাঁড়িয়েছে। বললেন, এসো বাবা, এসো।

যুবক বলল, ভালো আছেন আপনারা?

অপরেশ মাথা নাড়লেন, ভালো নেই। আজ বিকেলে আবার পেটের রুগির সংখ্যা বেড়েছে হাসপাতালে।

কাজল কপট গলায় ধমক দিলেন, আঃ, সব সময় হাসপাতাল আর হাসপাতাল। অন্য কোনও চিন্তা মাথায় আসে না, বসো, তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

যুবক সুর্মার দিকে তাকিয়ে হাসল। বোঝা যায় এদের দুজনের মধ্যে বেশ বোঝাপড়া হচ্ছে। যুবক বলল, আপনি বের হচ্ছেন মনে হচ্ছে?

অপরেশ ঘড়ি দেখলেন—হ্যাঁ, বেশ দেরি হয়ে গেছে। যাই এক চক্কর ঘুরে আসি। তা, তোমার কাজকর্ম কেমন চলছে?

ভালো। আমরা নিচের দিকে জমিটা পেয়ে গেছি। টাউন কমিটি স্যাংশন করেছে। শিগগির কাজ শুরু করব। যুবক বলল।

যুবকের নাম সুব্রত। পেশায় সে ইঞ্জিনিয়ার। কনকপুর ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের সে অধিকর্তা। এই অল্পবয়সে নিজের বিদ্যাবুদ্ধির জোরে এত ভালো চাকরি পেয়েছে। সুব্রতর বাবা এই শহরের প্রথম নাগরিকদের অন্যতম। মা-মরা এই ছেলেটি এতদিন হোস্টেলে-হোস্টেলে দিন কাটিয়ে আবার নিজের শহরে ফিরে এসেছে।

ওদের বাড়িতে রেখে অপরেশ বেরিয়ে এলেন। এখনও রোদ মরেনি। তবে যে-কোনও মুহূর্তে ছায়ারা ছড়িয়ে পড়বে। পশ্চিমের পাহাড়গুলো বেশ লালচে হয়ে পড়েছে। রাস্তায় ট্যুরিস্টদের বেশ ভিড়। চৌমাথায় কন্ডাকটেড ট্যুরের অফিসগুলোর সামনে মানুষের খুব আনাগোনা। কোনও ব্যক্তিগত উদ্যোগের ফাঁদে ট্যুরিস্টদের না ফেলে কনকপুর ডেভেলপমেন্ট নিজে থেকেই ট্যুরিস্টদের বিভিন্ন বিউটি-স্পট ঘুরিয়ে দেখাচ্ছে। কে. ডি. সি. লেখা গাড়িগুলো সারাদিন ছোটাছুটি করছে চারধারে।

অপরেশ ডেয়ারি ফার্ম ছাড়িয়ে আরও ওপরে উঠে আসতেই অবিনাশকে দেখতে পেলেন। গলায় ক্যামেরা ঝুলিয়ে ওপাশ থেকে নেমে আসছে। ওকে দেখে চিৎকার করল ডাক্তারবাবু, ও ডাক্তারবাবু!

অপরেশ দাঁড়ালেন। অবিনাশ দৌড়ে কাছাকাছি হল—কোথায় যাচ্ছেন? বেড়াতে!

এখুনি তো সন্ধে হয়ে যাবে।

তা তো যাবেই। মেয়েটির কোনও খোঁজ পেয়েছ?

না, স্রেফ হাওয়া হয়ে গেছে। কী করে স্যার কে জানে!

তুমি এখানে কী করছ?

অবিনাশ প্রশ্নটা শুনে হকচকিয়ে গেল। তারপর নার্ভাস-হাসি হাসল—এই একটু ছবি তুলছিলাম।

এদিকে আবার কীসের ছবি?

একটু ইতস্তত করল অবিনাশ। তারপর অপরেশকে খুঁটিয়ে দেখল—আপনাকে কথাটা বলছি। ওপরে মিস্টার দাশগুপ্তর যে কারখানাটা রয়েছে ওটা নাকি বেআইনিভাবে তৈরি। সুব্রত ইঞ্জিনিয়ার এই রকম একটা রিপোর্ট দিয়েছে গুপ্ত সাহেবকে। কিন্তু ব্যাপারটা স্রেফ ধামাচাপা পড়ে গেছে। আপনি তো পরিবেশ দূষিত করার ওপর প্রবন্ধ লিখেছেন আমাদের কাগজে, এই ব্যাপারে লিখুন না।

অপরেশ চমকে উঠলেন। শহরের মুখটাতে এমন একটা বড় কারখানা রয়েছে এটা তাঁর নিজেরই পছন্দ হয়নি। কিন্তু ওটা যে বেআইনিভাবে তৈরি হয়েছে এ খবর তিনি জানতেন না। যদিও কারখানা থেকে ধোঁয়া চারধারে ছড়ায় না তবু বেআইনি যখন, তখন অবিলম্বে সরিয়ে ফেলা উচিত। কিন্তু বেআইনি কেন? প্রশ্নটা করলেন তিনি।

অবিনাশ বলল, এই অঞ্চলটা হাউসিং প্লট, ফ্যাক্টরির জন্যে নয়। কিন্তু দাশগুপ্ত সাহেব এখানেই ফ্যাক্টরি বানিয়েছেন। কনকপুর ডেভেলপমেন্টের উনি ভাইস প্রেসিডেন্ট। গুপ্তসাহেবের আত্মীয়, অতএব ওঁকে কে স্পর্শ করবে? কথাটা বলেই অবিনাশের খেয়াল হল দাশগুপ্ত অপরেশেরও পরম আত্মীয়। এখন হিতে বিপরীত না হয়।

অপরেশ বললেন, চলো তো ফ্যাক্টরিটা দেখে আসি।

অবিনাশ সাহস পেল না—না, আমি আর যাব না। এইমাত্র ছবি তুলে এলাম, আর যাওয়া ঠিক হবে না।

ফ্যাক্টরির ছবি তুলেছ?

হ্যাঁ।

বেশ। আমি দেখে নিই ব্যাপারটা। তারপর কাগজে লিখব। তখন ছবিটা সঙ্গে ছেপে দিও। অপরেশ মাথা নাড়লেন।

উল্লসিত হল অবিনাশ, ওফ! দারুণ হবে। একদম মৌচাকে ঢিল পড়বে। দারুণ খাবে পাবলিক। হু হু করে কাগজের সেল বেড়ে যাবে।

অপরেশ গম্ভীর গলায় বললেন, যা অন্যায় তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা মানুষের কর্তব্য। একটি খবরের কাগজের তা-ই চরিত্র হওয়া দরকার। তোমাদের মুশকিল হল ব্যবসা ছাড়া তোমরা কিছু বোঝ না।

অবিনাশকে সেখানেই দাঁড় করিয়ে রেখে অপরেশ আবার হাঁটতে লাগলেন। ডানদিকের পথটা ঘুরে উঠে গেছে ওপরে। সেখানেই দাশগুপ্তর ফ্যাক্টরি। অপরেশের খেয়াল হল একটু বাদেই সন্ধে হয়ে যাবে। তাহলে যে উদ্দেশ্যে এদিকে আসা, সেটা করা শক্ত হয়ে যাবে। রাত্রে তিনি চোখে একটু কম দেখেন। আলো থাকতে-থাকতেই সেখানে পৌঁছানো দরকার। অপরেশ ঠিক করলেন ফেরার পথে তিনি ফ্যাক্টরিটা দেখে আসবেন।

প্রায় আধমাইল উঠে এসে তিনি হাঁপাতে লাগলেন। এখন বেশ ঠান্ডা পড়েছে। ছায়ায় আর আলো মাখা নেই। একটু বিশ্রাম নিয়ে অপরেশ ধীরে-ধীরে ওপরে আসতেই

চোখ জুড়িয়ে গেল। বিরাট এলাকা জুড়ে জলরাশি টলটল করছে। চমৎকার বাঁধ এই জলকে ঘিরে রেখেছে। ঠিক বাঁধের নিচে ওই জল পরিশ্রুত করে কনকপুরে পাঠানোর ব্যবস্থা আছে। অপরেশ জানেন, এই বিরাট জলাধার পাহারা দেওয়া হয়। রক্ষীরা দশ মিনিট অন্তর বাঁধের ওপর দিয়ে পাক খায়।

অপরেশ সতর্ক হলেন। জায়গাটা নিষিদ্ধ এলাকা হিসেবে ঘোষিত। বিনা অনুমতিতে এখানে আসা নিষেধ। অপরেশকে রক্ষীরা চেনে। তাঁকে দেখলে ওঁরা কিছু বলবে না কিন্তু খবরটা কানাকানি হতে পারে। এই সময় দূরে দুজন রক্ষীকে দেখতে পেয়ে অপরেশ দ্রুত একটা পিলারের পিছনে সরে দাঁড়ালেন। ওরা যতক্ষণ না দৃষ্টির আড়ালে যায় ততক্ষণ তিনি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর দুপাশ দেখে নিয়ে সতর্ক পায়ে বাঁধ থেকে নিচে জলের ধারে চলে এলেন। অন্ধকার এখন জলের ওপরে, আকাশের পায়ে। কনকনে হাওয়ারা হঠাৎ ছুটে এল পাহাড়ের শরীর থেকে। অপরেশ পকেট থেকে বড় বোতল বের করে নিচু হয়ে লেকের জল ভরতে লাগলেন তাতে। প্রায় গলা অবধি ভরে গেলে বোতলের মুখ আটকে চোখ তুলতেই মনে হল লেকের মাঝখানে কিছু ভাসছে। হয়তো কোনও গাছের ডাল বা কাঠ স্থির হয়ে আছে। কিন্তু তার পরেই মনে পড়ল এই লেকের জলে তো ও-সব কিছু পড়ে থাকার কথা নয়। রক্ষীরা সারা দিন-রাত নজর রাখে যাতে লেকের জলে আবর্জনা না পড়ে। লোকগুলো নির্ঘাৎ ফাঁকি দিচ্ছে।

অপরেশ আবার নজর করবার চেষ্টা করলেন। আবছা আঁধারে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। হঠাৎ ওঁর শিরদাঁড়া কনকন করে উঠল। মানুষের শরীর মনে হচ্ছে! ওটা কি দুটো পা! চকিতে ওপরটা দেখে নিলেন। না, রক্ষীরা এখনও ফিরে আসেনি। দ্রুত বাঁধের ওপর ছুটে এলেন তিনি। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেও জিনিসটা স্পষ্ট হল না, কিন্তু অপরেশের সন্দেহ দৃঢ় হল, ওটি মানুষের মৃতদেহ।

বাঁধ থেকে নিচে নেমে জোরে হাঁটতে লাগলেন তিনি। ওখানে কোনও মানুষের শরীর যাবে কী করে? কাউকে মেরে জলে ফেলে দেওয়া হয়েছে? তাহলে তো রক্ষীরা টের পেত! পেত কি? এই যে তিনি চুপিচুপি গিয়ে জল নিয়ে এলেন ওরা জানতেও পারল না! দাদা খুব বড়াই করেন তাঁর অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নিয়ে, এই তো হাল। অবশ্য কেউ যদি চুপিচুপি আত্মহত্যা করতে জলে ডোবে তবে—! হ্যাঁ, সেইটেই স্বাভাবিক। অপরেশের মাথায় চমকে উঠল অবিনাশের কথাটা। সেই ট্যুরিস্ট বউটির শরীর নয় তো? সকালে যদি ডুবে যায় সন্ধেবেলায় তার শরীর ভাসতে পারে? কাল রাত্রেও ডুবতে পারে যখন ওর স্বামী ঘুমুচ্ছিল!

খবরটা গুপ্তকে দেওয়ার জন্যে অপরেশ শর্টকাটের রাস্তা ধরলেন। ওঁর কোটের পকেটে বোতলটা নড়ছে চলার ছন্দে। কদিন থেকেই মনে হচ্ছিল, কনকপুরের জলটা পরীক্ষা করা দরকার। ট্যুরিস্টরা এখানে এসে একমাত্র পেটের অসুখেই ভুগছে কেন? আগে তো এমন হতো না। বরং কনকপুরে জলের সুখ্যাতি সর্বত্র। অথচ ওই পেটের অসুখ হওয়াটা সবে শুরু হয়েছে। প্রথমে ট্যুরিস্টরা আক্রান্ত হবে। কী জন্যে এ রকম হচ্ছে এখনও জানেন না অপরেশ। শহরের মেডিক্যাল অফিসার হিসেবে এর কারণ জানা তাঁর কর্তব্য। প্রথমেই সন্দেহ এসেছে জলের ওপর। দেখা যাক এই জল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে

কি না!

চলতে-চলতে কখন যে ফ্যাক্টরির সামনে এসে পড়েছেন নিজেরই খেয়াল ছিল না। মেইন গেটে আলো জ্বলছে, বিরাট ফ্যাক্টরি এখন চুপচাপ। মৃত জন্তুর শরীর থেকে চামড়া খুলে নিয়ে এখানে তা দিয়ে অনেক কিছু তৈরি হয়। একটা উৎকট গন্ধে চারদিকের বাতাস ভারী। ফ্যাক্টরির মালিককে কোনও দিনই তিনি পছন্দ করেন না। যদিও তিনি অপরেশের ভায়রাভাই, তবু সম্পর্কটা গুপ্তর সঙ্গেই তাঁর বেশি। ওঁদের বাড়িতে মাঝেমধ্যে যখন যান তখন যেন রাজা-বাদশা এসেছে এমন ভঙ্গিতে কাজল তার জামাই-বাবুকে খাতির করে। দেখে গা জ্বলে যায় অপরেশের। শুধু চামড়া বেচে পেট মোটা করছে লোকটা।

গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলেন অপরেশ। এখান থেকেই দাদাকে টেলিফোন করে নেওয়া যায়। সন্ধে হয়ে গেছে, এখন অতটা রাস্তা হাঁটতে তাঁর ইচ্ছে হচ্ছিল না। চৌকিদার ওঁকে দেখে এগিয়ে এসে সেলাম করল। অপরেশ জিজ্ঞাসা করলেন, সাহেব আছেন?

নেই সাব। আভি-আভি ক্লাবমে গিয়া। লোকটা তাঁকে চেনে, সসম্ভ্রমে কথাটা জানাল।

বছরখানেক হল কনকপুরে একটি সান্ধ্য ক্লাব হয়েছে। বেশ মোটা চাঁদা দিয়ে লোকে সেখানে তাস খেলে, মদ খায়। সেখানে ঢোকার সুযোগ তাঁর কোনও দিন হবে না। ওখানকার সদস্য হওয়ার ক্ষমতা তাঁর নেই। অপরেশ চৌকিদারকে বললেন, আমার একটা জরুরি টেলিফোন করা দরকার। ফোন কোথায় আছে?

একটু ইতস্তত করে লোকটা তাকে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে আলো জ্বেলে দিল। জানলার কাছে টেলিফোন! কনকপুরে টেলিফোন চলে অপারেটারদের সহযোগিতায়। গুপ্তর বাড়ির লাইন চাইলেন অপরেশ। একটি লোক সাড়া দিতে অপরেশ নিজের পরিচয় দিলেন। গুপ্ত বাড়িতে নেই, কোথায় গেছে কেউ জানে না। রিসিভার নামিয়ে রেখে অপরেশনের মনে হল ক্লাবে আছেন কি না দেখা দরকার। ক্লাবেই পাওয়া গেল গুপ্তকে। গলাটা একটু ভারী এবং বিরক্ত—কী ব্যাপার, হঠাৎ টেলিফোন?

অপরেশ বললেন, আমি বিকেলে বেড়াতে এসেছিলাম লেকের দিকে। সন্ধে হয়ে এসেছিল, ভালো করে ঠাওর করতে পারিনি কিন্তু মনে হল লেকের জলে কিছু একটা ভাসছে।

গুপ্তর গলাটা তিরিক্ষি হল—কী ভাসছে?

মানুষের শরীর বলে সন্দেহ হচ্ছে।

ইম্পসিবল! তুমি ঠিক দেখেছ?

একটু সন্দেহ আছে। অন্ধকার হয়ে এসেছিল!

ঠিক আছে, আমি দেখছি। সন্দেহটা সত্যি হওয়ার আগে শহরময় বলে বেড়িও না। কোত্থেকে কথা বলছ?

দাশগুপ্তর ফ্যাক্টরি থেকে। ফেরার পথে এখানেই টেলিফোন আছে।

হুম! তুমি এখন কোথায় যাবে?

হাসপাতালে হয়ে বাড়ি।

হোয়াই? হাসপাতালে কেন?

বিকেলে আবার কিছু পেশেন্ট ভর্তি হয়েছে। দেখে যাই।

ট্যুরিস্ট?

হ্যাঁ। পেটের রোগ। আর-একটা কথা, আমার মনে হচ্ছে এক্ষুনি ঘোষণা করা দরকার, এই শহরের সবাই যেন জল ফুটিয়ে খায়। মেডিক্যাল অফিসার হিসেবে তোমাকে জানানো আমার কর্তব্য।

আঃ! দু-তিনজনের কী-না-কী হয়েছে আর শহরসুদ্ধ লোককে প্যানিকি করে ছাড়বে! ও সব করলে কাল সকালেই ট্যুরিস্টরা পালাবে। এ ব্যাপারটা নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। রাখছি। খট করে রিসিভার নামিয়ে রাখা শব্দ হল ওপাশে।

অপরেশ একটু বিহ্বল হয়ে পড়লেন। দাদা এই সমস্যাটার প্রকৃত চেহারাটা বুঝতেই পারল না। মহামারী হয়তো হবে না কিন্তু একটু-একটু করে একদিন এই শহরের মানুষগুলো মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবে। এরকম সন্দেহ কদিন থেকেই হচ্ছে কিন্তু প্রমাণ নেই বলে তিনি প্রকাশ্যে কিছু বলতে পারেন না। জানলা দিয়ে তাকাতেই দূরে মোটা-মোটা পাইপ দেখতে পেলেন। পাশাপাশি দুটো পাইপ ওপরের পাহাড় থেকে নেমে এসে ফ্যাক্টরির তলা দিয়ে চলে গেছে।

ওগুলো কীসের পাইপ? বাইরে বেরিয়ে এসে চৌকিদারকে জিজ্ঞাসা করলেন অপরেশ।

পানিকা পাইপ সাব। লেকসে নিকালকে টাউনমে যাতা হ্যায়। চৌকিদার অপরেশের অজ্ঞতায় যেন খুশি হল।

অপরেশ মাথা নাড়লেন। তারপর আস্তে-আস্তে ফ্যাক্টরি ছেড়ে বড়রাস্তা ধরলেন। বেশ কিছুটা নেমে মুখ ঘুরিয়ে আর পাইপটাকে দেখতে পেলেন না। ও দুটো মাটির তলা দিয়ে শহরে ছড়িয়ে পড়েছে! অপরেশ দেখলেন দূরে একটা মুদির দোকানে আলো জ্বলছে। দ্রুত পা চালালেন, ওখান থেকে আরও খালি বোতল নিতে হবে।

পেটের রোগে আক্রান্ত মানুষের আনাগোনা কমছে না। রোজই চার-পাঁচ জন করে লেগেই আছে। অপরেশ এখন খুবই উদ্বিগ্ন। রোজই ডাকের খোঁজ নেন। কলকাতা থেকে দুটো চিঠি যে-কোনওদিন আসতে পারে কিন্তু কেন যে আসছে না! গুপ্ত ব্যাপারটাকে কোনও গুরুত্ব দিতেই রাজি নন। শরীর থাকলেই অসুখ-বিসুখ হবে। এত বড় শহরের মাত্র জনাকয়েক লোকের পেটের অসুখ মানেই শহরটার দোষ একথা বলা বোকামি। সেই রাত্রে তাঁর বাড়িতে এসে কী ঠাট্টাটাই না করে গেলেন গুপ্ত। সুর্মাকে ডেকে বললেন, শোন, তোর বাবার চোখ ভালো করে দেখানো দরকার। সব সময় সর্ষের মধ্যে ভূত দেখছেন। এই রাত্রে আমাকে খামোকা ছোটাল—কাজল বললেন, ওর তো ওই রকম স্বভাব দাদা!

অপরেশ জিজ্ঞাসা করলেন, জিনিসটা কী ছিল?

কলাগাছ। এই শীতের মধ্যে বোট নিয়ে কাছে গিয়ে যখন গাছটাকে দেখলাম তখন তোমাকে—। মুখ বিকৃত করলেন গুপ্ত।

হঠাৎ সুর্মা বলে উঠল, কিন্তু লেকের চারপাশে কোথাও তো কলাগাছ নেই। ওখানে কী করে গেল?

গেল তো দেখছি।

অপরেশ জিজ্ঞাসা করলেন, সেই ট্যুরিস্ট মেয়েটির কোনও খোঁজ পাওয়া গেল? পুরো একটা দিন তো কেটে গেল।

গুপ্ত চোখ কুঁচকে বললেন, না, পাওয়া যায়নি। আর যতক্ষণ না পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ কোনও সিদ্ধান্তে আসতে আমি রাজি নই! বাই দি বাই, লেকের দুজন প্রহরীকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

কেন?

তুমি লেকের বাঁধে ঘুরে বেড়ালে অথচ কেউ তোমাকে দেখতে পেল না। ওরা কী জন্যে চাকরি করছে? কলাগাছটাই বা কী করে ওখানে গেল? লোক দুটোকে ওদের দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। গুপ্ত আর দাঁড়াননি। ওঁর চলে যাওয়ার পর অপরেশ নিজের মেয়ের চোখেও সন্দেহের ছায়া দেখতে পেলেন। এখানে আসা অবধি গুপ্ত যেন অস্বস্তিতে ভুগছিলেন। ওঁর কথাবার্তাগুলো থেকে কোনও বিশ্বাস জন্মায়নি ওঁদের মধ্যে। তবে একটা কথা, অপরেশ বুঝতে পারছিলেন সেই মেয়েটিকে আর কোনও দিন খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই শহরের নামের গায়ে একটু ময়লা লাগুক তা চাইবেন না গুপ্ত। এ ব্যাপারে ভীষণ স্পর্শকাতর তিনি।

বাড়ি ফেরার মুখে পিওনকে দেখতে পেলেন অপরেশ। ছেলেটি ওঁকে খামটা দিল। লম্বা খামটার কোণে ছাপানো ঠিকানা দেখে তাঁর আর তর সইছিল না। তিনি চারপাশে তাকালেন। সামনেই একটা গাছের গায়ে ঝোলানো বোর্ড নজরে এল—'এই শহর আপনার, একে যত্ন করুন।' রাস্তায় এখন বেশ লোকজন। যাঁরা তাকে চেনেন তাঁরা নমস্কার জানিয়ে যাচ্ছেন। এর মধ্যেই তিনি এই শহরে বেশ পরিচিত হয়ে গেছেন।

ধৈর্য রাখতে পারলেন না। খামের মুখটা ছিঁড়ে চিঠিটা বের করলেন অপরেশ। দুটো রিপোর্ট। রিপোর্ট নম্বর ওয়ানে কোনও কমপ্লেন নেই! সবকিছুই নিল। অপরেশের মনে আছে এইটে হল লেকের জল। দ্বিতীয়টির দিকে নজর দিলেন তিনি। এবং তৎক্ষণাৎ চমকে উঠলেন। এ কী! এ মারাত্মক বিষ! এখন অবশ্য খুবই সামান্য হারে রয়েছে কিন্তু আর একটু বাড়লেই। অপরেশের মাথা ঘুরতে লাগল।

সেই মুদির দোকান থেকে বোতল দিয়ে ফ্যাক্টরির নিচে থেকে যে জল নিয়েছিলেন এটি সেই জলেরই রিপোর্ট।

অর্থাৎ লেকের জল ভালো আছে কিন্তু সেটা শহরে ঢোকার সময় বিষাক্ত হয়ে যাচ্ছে। কেন হচ্ছে? তাহলে কি মাটির তলায় পোঁতা জলের পাইপগুলো ফেটেছে এবং সেখান দিয়ে বাইরের কিছু জলে মিশছে? কী মিশছে? যে পদার্থটির কথা রিপোর্টে পাওয়া গেছে তা জলে মিশবে কী করে? এ সব প্রশ্নের উত্তর এখনই মাথায় না ঢুকলেও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ওই পাইপে কিছু গোলমাল হয়েছে। এখন হয়তো খুব সামান্য পরিমাণে লিক করেছে আর ওই বিষ খুব অল্পই জলে মিশতে পারছে, কিন্তু ধীরে-ধীরে যখন পাইপের ফাটলের মুখ বাড়বে তখন একদিনেই শহরের মানুষ বিপর্যস্ত হয়ে যেতে পারে।

উত্তেজনায় অপরেশের ব্লাডপ্রেশার বেড়ে গেল। তাঁর মনে হল এখনই এই খবরটা সবাইকে জানানো দরকার। প্রায় দৌড়েই বাড়ি চলে এলেন তিনি। সুর্মা আর সুব্রত বাগানে

বসে ছিল। ওঁর মুখচোখ দেখে সুর্মা এগিয়ে এল—কী হয়েছে বাবা?

কী হয়েছে? শুনলে শিউরে উঠবি। এই শহরের জল সম্পর্কে তোর কী ধারণা? তোমার কী ধারণা সুব্রত? অপরেশের গলায় কাঁপুনি।

কেন? ভালো জল, ফিল্টার্ড ওয়াটার।

দ্রুত মাথা নাড়লেন অপরেশ—নো, নো, ফিল্টার্ড ওয়াটারের নামে আমরা জীবাণু ভর্তি জল খাচ্ছি।

সুর্মা চমকে উঠল—আমাদের খাবার জলে জীবাণু! কী বলছ তুমি?

ঠিকই বলছি।

সুব্রত বলল, আপনি এত বড় অভিযোগ আনছেন, আপনার হাতে তার কোনও একটা প্রমাণ আছে? আমি তো ভাবতেই পারছি না। এই শহরের জলের এত সুনাম!

এতদিন হাতে প্রমাণ ছিল না বলেই চুপ করে থেকেছি। অনেক দিন থেকে সন্দেহ হচ্ছিল, হঠাৎ এত গ্যাস্ট্রিক অ্যাটাকড পেশেন্ট আসছে কেন? এবং যারা আসছে তারাই ট্যুরিস্ট। অর্থাৎ এই শহরের অরিজিন্যাল মানুষেরা ওই সামান্য জীবাণুতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। কিন্তু ট্যুরিস্টরা এসেই অ্যাটাকড হচ্ছে। সন্দেহ করেছি কিন্তু বলতে পারিনি। কিন্তু এখন আমার হাতে অব্যর্থ প্রমাণ আছে। অপরেশের মুখ এখন আত্মবিশ্বাসে উদ্ভাসিত।

কী প্রমাণ বাবা? সুর্মা জিজ্ঞাসা করল।

এই যে। কলকাতায় জল পাঠিয়েছিলাম। লেকের জল আর কলের জল। ওখানকার ল্যাবরেটরিতে কেমিক্যাল এনালিসিস করে ওরা এই রিপোর্ট পাঠিয়েছে! লেকের জল স্বাভাবিক কিন্তু কলের জলে অর্গানিক ম্যাটার পাওয়া গিয়েছে। ইট ইজ ডেঞ্জারাসলি ইনজুরিয়াস টু হেল্‌থ।

সুর্মার মুখ হাঁ হয়ে গেল। সুব্রত কিছু বলার আগে কাজলের গলা পাওয়া গেল। কখন যেন উনি বাইরে বেরিয়ে এসেছেন এঁরা কেউ লক্ষ করেননি। কাজল বললেন, ভগবান বাঁচিয়েছেন, ভাগ্যিস তুমি ধরতে পেরেছ।

সুর্মা জিজ্ঞাসা করল, এখন কী করবে বাবা?

অপরেশ মাথা নাড়লেন—সব পালটে দিতে হবে, জলের সব ব্যবস্থা বদলে দিতে হবে, পাইপ পালটাতে হবে আর ওই কারখানাটাকে ওই জায়গা থেকে তুলে দিতে হবে।

কোন কারখানা? কাজল প্রশ্ন করলেন।

তোমার জামাইবাবুর চামড়ার কারখানা। ওরই পচা জল পাইপে ঢুকছে। সুব্রত এবার উত্তেজিত হল—আপনি সিওর?

হ্যাঁ।

ওটা তো এমনিতেই বেআইনিভাবে তৈরি, শুধু—

সুব্রত! তুমি থেমে গেলে কেন? দাশগুপ্ত আমার আত্মীয় বলে? না হে, যে নিজের স্বার্থ মেটাতে সাধারণ মানুষের ক্ষতি করছে তাকে আমি কখনই আত্মীয় বলে মনে করি না। অপরেশ দৃঢ় গলায় বললেন।

সুব্রত নিচু গলায় বলল, কিন্তু পালটে দেওয়া কি সম্ভব?

অপরেশ বললেন, আলবত সম্ভব। নতুন করে সব করতে হবে আমাদের। এই জলের ব্যবহার এখুনি বন্ধ করে দেওয়া দরকার।

কাজল চমকে উঠলেন, ও মা! জল বন্ধ করে দিলে আমাদের চলবে কী করে? এত মানুষ জল ছাড়া বাঁচতে পারে?

ধমক দিলেন অপরেশ, জলের বদলে বিষ খাচ্ছ সে হুঁশ নেই?

এই সময় এক ঝরঝরে গাড়ি বিকট শব্দ করতে-করতে গেটের সামনে এসে দাঁড়াল। এই শহরের সমস্ত মানুষ শব্দটিকে চেনে। শহরের একমাত্র খবরের কাগজের মালিক সমাজপতি এটির মালিক। গুপ্ত অনেকবার বলেছেন গাড়িটিকে বাতিল করতে কিন্তু সমাজপতির নাকি দারুণ মায়া জন্মে গেছে গাড়ির ওপরে। ভিনটেজ কার হিসেবে লোকে এটিকে দেখছে এখন।

সমাজপতির চেহারা বেশ মোটাসোটা, গাড়িতে উঠলে একটা দিক সামান্য বসে যায়। মুখে সর্বদা অমায়িক হাসি। ওঁর আবার প্রচুর অর্থ ছিল। তাই স্বচ্ছন্দে এমন কাগজ করছেন যে ট্যুরিস্ট না থাকলে ছাপার খরচ ওঠে না। গেট খুলে এঁদের দেখে তিনি অমায়িক হাসি হাসলেন, হেসে নমস্কার করলেন।

ডাক্তারবাবুর স্বাস্থ্য ভালো আছে?

অপরেশ মাথা নাড়লেন। সমাজপতিকে দেখেই ওঁর মাথায় বুদ্ধি এসে গেছে। সমাজপতি এগিয়ে এসে সুর্মাকে বললেন, তোমার স্কুল চলছে কেমন মা? সুর্মা মাথা নাড়ল, ভালো। সমাজপতি এবার সুব্রতর দিকে ফিরতেই সে হেসে বলল, আমি ভালো আছি।

সমাজপতি এবার অপরেশের দিকে তাকালেন। ডাক্তারবাবু, আমার আসার একটি গূঢ় কারণ আছে। আপনার সঙ্গে একটু নিভৃত আলোচনা করব।

অপরেশ বললেন, কী ব্যাপারে?

এই আমার কাগজের ব্যাপারেই।

অপরেশের মাথায় তখন এ সব ঢোকাতে ইচ্ছে ছিল না। তবু বিব্রত চোখে তিনি মেয়ের দিকে তাকাতেই সুর্মা বলল, তোমরা এখানেই বোসো, আমি চা দিই?

সুব্রত বলল, আমি চলি।

অপরেশের ইচ্ছে ছিল না সুব্রত এখনই চলে যাক। ওর সঙ্গে একটু আলোচনা করার ইচ্ছে ছিল ওঁর। তিনি বললেন, এখনই?

হ্যাঁ! গুপ্তসাহেব আমাকে ক্লাবে দেখা করতে বলেছেন।

ও। ঠিক আছে।

সুব্রত চলে গেলে সমাজপতি বললেন, ছেলেটি বড় ভালো। অপরেশ হাসলেন, হ্যাঁ খুব সিনসিয়ার।

আপনার মেয়ের সঙ্গে কিন্তু চমৎকার মানাবে। দিন-টিন ঠিক হল?

অপরেশের মুখে রক্ত জমল। সুব্রত এখানে আসে, বাড়ির সবায়ের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক, কিন্তু চিন্তা করার সময় তিনি পাননি। তিনি খুব গম্ভীর গলায় বললেন, আপনি কী কথা বলতে এসেছেন?

সমাজপতি সচেতন হলেন। বললেন, কাগজের বিক্রিটা বাড়ানো দরকার। শুনলাম, হাসপাতালে নাকি ট্যুরিস্টরা পেটের অসুখের জন্যে আসছে। আপনি যদি পেটের অসুখের ওপর একটা প্রবন্ধ লেখেন তাহলে ভালো হয়। কী-কী ওষুধ খাওয়া দরকার, কী সতর্কতা নেওয়া উচিত, এই আর কী!

এ সব লোকে পড়বে? অপরেশ ভেতরে-ভেতরে খুব উত্তেজিত হলেন। সেটার যদি পড়বে। মানুষ সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে তার নিজের শরীরকে। সেটার যদি গোলমাল হয় তাহলে তার জন্যে যে সব কিছু করতে পারে। আর এ তো পেট নিয়ে কথা। বিশেষজ্ঞর ভঙ্গিতে কথাগুলো বললেন সমাজপতি। অপরেশ মাথা নাড়লেন—লিখব। এমন লেখা লিখব যে সবাই চমকে যাবে।

হ্যাঁ! রোগ হলে সারানো নয়, রোগ যাতে আর না হয় তার ব্যবস্থা। সমাজপতি মাথা নাড়লেন—না, না! রোগ না হলে কেউ ওষুধের কথা শুনতে চায় না।

আপনি বুঝতে পারছেন না—অপরেশ তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, আপনি একটা আলোড়ন তোলা লেখা চান তো? পাবেন। তবে এখন নয়, কাল দুপুর পর্যন্ত আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে।

ঠিক আছে। পরশু সকালের কাগজে বেরিয়ে যাবে আপনার লেখা। সমাজপতি কথা শেষ করে বিদায় নিতে যাবেন এমন সময় গেটে আর-একটা গাড়ি এসে থামল। গাড়ি থেকে নেমে গুপ্ত ওঁদের একসঙ্গে দেখে চোখ ছোট করলেন। গেট খুলে ভেতরে এসে গুপ্ত চাপা গর্জন করলেন, কী আরম্ভ করেছ সমাজপতি?

সমাজপতি নিরীহ ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন—কিছু করিনি তো!

করোনি? আজকের কাগজে হেডিং কী? অ্যাঁ?

অপরেশের মনে পড়ল। ট্যুরিস্ট মেয়েটি কোথায় গেল? প্রশাসন জবাব দাও। এইরকম হেডিং ছিল। গুপ্ত যে উত্তেজিত হবেন তাতে সন্দেহ কি!

সমাজপতি বললেন, কী করব বলুন। পাবলিক প্রেশার দিচ্ছিল খুব। গুপ্ত গর্জে উঠলেন, এবার আমাদের প্রেশার পড়বে তোমার ওপর! পাবলিক দেখাচ্ছ আমাকে! তোমার কাগজ যাতে না বের হয় তাই ব্যবস্থা হবে। সমাজপতি দুহাত জোড় করলেন—মাপ করবেন স্যার। ও সব করলে ধনেপ্রাণে মারা যাব। আসলে মাঝে-মাঝে এক-একটা জ্বলন্ত প্রশ্ন না ছাড়লে কাগজটা নেতিয়ে যায়। অবশ্য মেয়েটিকেও পাওয়া যাচ্ছে না—

পাওয়া যাচ্ছে না তো আমি কী করব। কেউ যদি জেনেশুনে গা ঢাকা দেয় ভগবানও তাকে খুঁজে বের করতে পারবে না।

কিন্তু আপনি যে আমাকে শাসালেন স্যার, এটা কি ভালো হল? সংবাদপত্রে স্বাধীনতা হরণ করার চার্জে পড়ে যেতে পারেন। গণতন্ত্র বিপন্ন বলে প্রচার করলে এখানে ট্যুরিস্টরা আসবে?

যেন চোখের সামনে ভূত দেখছেন গুপ্ত এমন ভঙ্গিতে সমাজপতিকে দেখলেন। কয়েক মুহূর্ত তাঁর মুখ থেকে কোনও শব্দ বের হল না। তারপর খুব চেষ্টাকৃত শান্ত গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কাগজের এখন সারকুলেশন কত?

বিশ হাজার।

এই শহরে পাঁচ হাজারেরও বেশি শিক্ষিত মানুষ নেই। খবরটা যথাস্থানে জানাতে হবে, যাতে নিউজপ্রিন্টটা ঠিকমতো পাও। গুপ্ত আর কথা না বাড়িয়ে ভাইয়ের কাছে চলে এলেন—তোমার সঙ্গে কথা আছে। চলো, ঘরে বসি।

সমাজপতি ততক্ষণে করজোড়ে গুপ্তর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, স্যার, এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে এতটা উত্তেজিত হচ্ছেন কেন? আলোচনা করতে গেলে তো নানান কথা ওঠে, সবই কি মনে রাখা উচিত!

গুপ্ত ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন—উচিত নয়? বেশ, তাহলে কালকের কাগজে হেডিং দিও প্রশাসন যা চেষ্টা করছে পৃথিবীর অন্য কোনও দেশ এত তৎপরতা দেখাত না। বুঝলে?

সরাসরি এই কথাটা না লিখে, একটু উলটে-পালটে—

তাহলে কোনও কিছু সোজা থাকবে না। এবার এসো। গুপ্ত ঘুরে দাঁড়াতেই সমাজপতি পিছু ফিরলেন। মনে-মনে তিনি তখন অবিনাশকে গালাগালি দিচ্ছিলেন। পাবলিক সিমপ্যাথি পাওয়ার জন্যে বাবু জ্বলন্ত হেডিং দিয়েছেন! এখন বোঝ। ঠ্যালা সামলাবার সময় তো আর কাউকে পাওয়া যাবে না। ছোঁড়াটাকে তাড়ানোও যাচ্ছে না। কাগজটার সবকিছু ওই, জুতো সেলাই থেকে চণ্ডী পাঠ করার মতো লোক আর কোথায় পাওয়া যাবে। কিন্তু কর্তাদের চটিয়ে এই শহরে কতদিন থাকা যাবে? কিন্তু না, এই রকম মেরুদণ্ডহীন হয়ে একদল সম্পাদকের বেঁচে থাকার কোনও মানে হয় না। কালকের হেডিংটা পালটে দিয়ে শেষবার তিনি আপোস করছেন, আর নয়।

সশব্দে গাড়িটা বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত গুপ্ত অপেক্ষা করলেন। তারপর ঘরে ঢুকে দেখলেন সুর্মা চায়ের ট্রে নিয়ে ঢুকছে—ও মা, জেঠু আপনি কখন এলেন। সমাজপতিবাবু চলে গেছেন?

গেছেন। চা কি ওর জন্যে করেছিলে? গুপ্ত বললেন।

হ্যাঁ, মানে—

তাহলে আমাকে দিয়ে দাও। তোমার বাবার সঙ্গে আমার কথা আছে।

সুর্মা হাসল, বাবার সঙ্গে দেখছি আজ সবার কথা আছে।

এতক্ষণে অপরেশ কথা বললেন, ও সমাজপতির কথা বলছে।

সমাজপতির সঙ্গে কী কথা তোমার? গুপ্ত ভাইকে জিজ্ঞাসা করলেন।

ওঁর কাগজে লেখার ব্যাপারে—

কী বিষয়ে?

জনস্বাস্থ্য। অপরেশ চায়ের কাপ তুলে নিলেন। সুর্মা ভেতরে চলে গেল। গুপ্ত মাথা নাড়লেন—জেনারেল আলোচনা করো আপত্তি নেই। কিন্তু এই শহরের মেডিক্যাল অফিসার হিসাবে তুমি শহরের স্বাস্থ্য নিয়ে কোনও কথা লেখবার আগে একটু ভাববে। হ্যাঁ, যে জন্যে তোমার কাছে এলাম, তোমার চিঠি আজ কমিটি পেয়েছে।

অপরেশ জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা আলোচনা করেছেন?

হুঁ! কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে প্রথমে কথা বললে না কেন?

আপনি তো কান দিচ্ছিলেন না।

তাই বলে সরাসরি কমিটিকে লিখবে? কমিটি মানে তো আমরাই এবং আমি।

কিন্তু মেডিক্যাল অফিসার হিসাবে সেটাই আমার কর্তব্য। তাই না?

ও। শোনো, আমরা আলোচনা করে দেখলাম তুমি যা লিখেছ তার কোনও প্রমাণ নেই। তোমার সন্দেহ ট্যুরিস্টদের পেটের অসুখের কারণ এখানকার জল। কিন্তু জল নিয়ে কোনও কমপ্লেন নেই। এই জল আশেপাশে সব শহরের। সেরা ট্যুরিস্টরা এখানে আসে ওই ভালো জলের জন্যেই। তোমার কথা যদি জানাজানি হয়ে যায় তা হলে ট্যুরিস্টরা প্যানিকি হয়ে যাবে। শুধু সন্দেহের বশে এ সব কথা বললে তুমি শহরের ক্ষতি করবে। এই জন্যে তোমাকে আমি এখানে নিয়ে আসিনি। গুপ্ত চায়ের কাপে চুমুক দিলেন। গুপ্তর কথা চুপচাপ শুনছিলেন অপরেশ। এবার খুব শান্ত গলায় বললেন, না সন্দেহ নয়, নিশ্চিত প্রমাণ আছে আমার হাতে।

কী প্রমাণ? চমকে উঠলেন গুপ্ত। ওঁর কাপের চা চলকে উঠল।

এই শহরের জল জীবাণুযুক্ত। এবং এর পরিমাণ বেড়ে গেলে মহামারী দেখা দেবার আশঙ্কা আছে। স্পষ্ট গলায় বললেন অপরেশ।

কী বলছ! লেক থেকে জল তুলে শোধন করে আমরা পাইপে করে সেই জল শহরে পাঠাই। লেকের জলে যদি জীবাণু থেকেই থাকে তবে তা পরিশোধিত হয়ে যায়। তুমি এতে জীবাণু পেলে কোত্থেকে?

অপরেশ মাথা নাড়লেন—না, লেকের জলে জীবাণু নেই। খুব স্বাভাবিক আর পাঁচটা পাহাড়ি জলের মতনই। কিন্তু পাইপের জলেই জীবাণু পাওয়া যাচ্ছে।

কী করে বুঝলে?

এই কাগজগুলো দেখুন। আমার সন্দেহ হওয়াতে আমি ওই জল পরীক্ষার জন্যে কলকাতায় পাঠিয়েছিলাম। সেখান থেকে আজ রিপোর্ট এসেছে। ওরা বলছে পাইপের জল বিষাক্ত। সগৌরবে হাসলেন অপরেশ। সবিস্ময়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন গুপ্ত। ক্রমশ ওঁর মুখের পেশি শক্ত হয়ে উঠল। হাত বাড়িয়ে বললেন, কোথায় রিপোর্ট?

অপরেশ খামটা বাড়িয়ে দিলেন। গুপ্ত রিপোর্টটায় চোখ বুলিয়ে মুখ বিকৃত করলেন— এটা তো ভুলও হতে পারে।

অপরেশ মাথা নাড়লেন, না, নিচে লেখা আছে ওরা ডবল চেক করেছে। রিপোর্টটা ভাঁজ করে নিজের পকেটে রেখে গুপ্ত বললেন, আমার অনুমতি ছাড়া তোমাকে জল পরীক্ষা করার জন্যে পাঠাতে কে বলল?

আমার বিবেক।

তুমি কী চাও? গুপ্ত দাঁতে দাঁত রাখলেন।

এই শহরের জল জীবাণুমুক্ত হোক।

আমি মনে করি না জীবাণু আছে। অবশ্য তোমার এই কাগজের লেখা যদি সত্যি হয় তা হলে কীভাবে তা মুক্ত হবে বলে মনে করো?

পুরো ব্যবস্থাটাই পালটাতে হবে। প্রথমে ওই চামড়ার কারখানাটা ওখান থেকে সরানো দরকার। ওই চামড়া ধোওয়া জল চুঁইয়ে-চুঁইয়ে হয় রিজারভারে পড়ছে, না হয় ফাটা পাইপের জলে মিশছে। দ্বিতীয়ত, এই শহরের জলের পাইপগুলো পালটানো দরকার। এগুলো এখন দূষিত হয়ে গেছে। ব্যস। এই কথাগুলো বলতে পেরে অপরেশ

তৃপ্ত হলেন।

ইউ আর ম্যাড। কমপ্লিটলি ম্যাড!

কেন?

এই শহরের জলের পাইপ পালটানোর কথা বলছ, পাগল না হলে কেউ এ কথা বলে! কত খরচ পড়বে জানো? কনকপুর ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন দেউলিয়া হয়ে যাবে। অসম্ভব প্রস্তাব। আর ওই ফ্যাক্টরির জল থেকেই যে এই ব্যাপারটা ঘটছে তার কোনও নির্দিষ্ট প্রমাণ আছে?

আছে। লেকের জল একরকম আর ঠিক ফ্যাক্টরির নিচের জল অন্য রকম। এ থেকেই বোঝা যায় গোলমালটা ওখান থেকেই হচ্ছে।

তুমি ভুলে যাচ্ছ ফ্যাক্টরিটা কার!

না, মোটেই ভুলছি না। দাশগুপ্ত আমার ভায়রাভাই কিন্তু তাতে আমার কিছু এসে যায় না। যে জনস্বার্থ-বিরোধী কাজ করছে তার কোনও ক্ষমা নেই।

তোমার স্ত্রীও কি একই মত পোষণ করে?

জানি না।

গুপ্ত এবার উঁচুগলায় ডাকলেন, বউমা?

কাজল বোধহয় কাছাকাছি ছিলেন। দুবার ডাকতেই দরজায় এসে দাঁড়ালেন, আমাকে ডাকছেন দাদা?

হ্যাঁ। গুপ্ত মাথা নাড়লেন, তোমার জামাইবাবুর চামড়ার ফ্যাক্টরিটা এখান থেকে তুলে দিলে তুমি কি খুশি হবে?

ওমা! সে কি কথা! দিদির এত বড় সর্বনাশ করবেন কেন?

আমি করছি না, করছে তোমার স্বামী।

মানে? কাজল স্বামীর দিকে তাকালেন।

অপরেশ বললেন, তোমার জামাইবাবুর ফ্যাক্টরির জন্যে এই শহরের মানুষের জীবন বিপন্ন। চামড়া ধোওয়া জল পানীয় জলের সঙ্গে মিশে বিষাক্ত করছে। তা ছাড়া, ওই ফ্যাক্টরিটা বেআইনিভাবে তৈরি হয়েছে।

কে বলল? গুপ্ত জিজ্ঞাসা করলেন।

সুব্রত।

হুম। সে ছোঁড়াও পেছনে লেগেছে দেখছি। গুপ্ত স্বগতোক্তি করলেন।

না দাদা, কেউ পিছনে লাগেনি। তুমি এই শহরটাকে গড়েছ, একে সন্তানের মতো ভালোবাস, আমি জানি। তাই একে বাঁচানোর জন্যে তোমাকে কঠোর হতেই হবে। অপরেশ পরম আবেগে কথাগুলো বললেন।

কাজল বললেন, ফ্যাক্টরিটা না তুলে দিয়ে কিছু করা যায় না?

না, ওটাই সব কিছুর মূলে।

কাজল জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এত নিশ্চিত হচ্ছ কী করে?

হচ্ছি কারণ তার প্রমাণ আছে।

আমার ভালো লাগছে না। জামাইবাবু একেই তোমাকে পছন্দ করেন না, তারপর যদি শোনেন তমি এ সব কথা বলছ তা হলে—। তুমি তো দাদাকে সব বললে, এবার

যা ভালো হয় দাদাই সব করবেন, তোমার আর মাথা ঘামানোর কী দরকার। অপরেশের কাছে দাঁড়ালেন কাজল।

তা তো নিশ্চয়ই। দাদা যদি কোনও ব্যবস্থা নেন তাহলে তো সব মিটেই গেল। অপরেশ গুপ্তর দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

এতক্ষণ গুপ্ত স্বামী-স্ত্রীর সংলাপ শুনছিলেন। এবার খুব ধীর গলায় প্রশ্ন করলেন, এই ব্যাপারটা আর কে-কে জানে?

আমাদের পরিবারের বাইরে কেউ নয়। আর হ্যাঁ, সুব্রত জেনেছে।

বাঃ! চমৎকার! তা শুনছি সুব্রত নাকি তোমার পরিবারের একজন হয়ে পড়েছে। তুমি কি জানো ওর বাবা পাগল ছিল?

পাগল! কাজল চমকে উঠলেন—কই জানি না তো!

জানবে কী করে? তোমরা তো অ্যাদ্দিন বাইরে-বাইরে ঘুরেছ। যা করবে বুঝে-সুঝে করো। সুব্রত ছোঁড়াটার সঙ্গে মেয়েকে বেশি মেলামেশা করতে দেওয়া উচিত হচ্ছে না। এমনিতেই শহরে এ নিয়ে নানান কথাবার্তা চলছে। গুপ্ত উঠলেন।

অপরেশ বললেন, দাদা, সুব্রত এ বাড়িতে আসে, ভালো ব্যবহার করে। ওকে আমাদের পছন্দ হয়েছে। এ ছাড়া অন্য সম্পর্ক তৈরি করার কথা আমার মাথায় কখনও আসেনি। তবে সুর্মা যদি ওকে নির্বাচন করে তাহলে আমার আপত্তি নেই।

ওর বাবার খবরটা শোনার পরও এ কথা বলছ?

হ্যাঁ। কারণ আমি ওর মধ্যে কোনওরকম অসুস্থতা দেখছি না।

কাজল বলল, কথাটা বলে আপনি খুব ভালো কাজ করেছেন দাদা। আমাদের একটু খোঁজখবর নিতে হবে এ ব্যাপারে।

'অপরেশ স্ত্রীর দিকে তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এই সব আলোচনা তাঁর পছন্দ হচ্ছিল না। তিনি সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে দাদা, আপনি, আপনারা কি আমার প্রস্তাব মেনে নিচ্ছেন?

কী বিষয়ে? গুপ্ত খুব সহজ গলায় শুধোলেন।

অপরেশ এক মুহূর্ত চুপ করে দাদাকে দেখলেন। তারপর নিজেকে সংযত করে জবাব দিলেন, জলের ব্যাপারে?

গুপ্ত বললেন, শোনো—তোমার কর্তব্য হল হাসপাতালে যেসব মানুষ অসুস্থ হয়ে আসবে তাদের সেবা করা, সারিয়ে তোলা। এর বাইরে কোথায় কী হচ্ছে তা জানার কোনও দরকার নেই।

অপরেশের মেজাজ গরম হয়ে গেল, আপনি ভুলে যাচ্ছেন দাদা আমি শহরের মেডিকেল অফিসার। এই পদের জোরে আমি ওই বিষয়ে মাথা ঘামাতে পারি। কারণ তাতে জনস্বাস্থ্য জড়িয়ে আছে।

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকালেন গুপ্ত। তারপর কাজলের দিকে তাকিয়ে বললেন, বউমা, তোমার স্বামীকে সাবধান করে দাও। এই মুহূর্তে শহরের জলের পাইপ আর কারখানা পালটাতে হলে আমরা শেষ হয়ে যাব। আমার রক্ত জল করে গড়া শহরটায় আর কখনও ট্যুরিস্ট আসবে না। এ আমি কিছুতেই সইতে পারব না। ও অযথা ভয় পাচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে যদি বাড়াবাড়ি করে তা হলে আমি ছেড়ে

কথা বলব না।

গুপ্ত আর দাঁড়ালেন না। একটু বাদেই তাঁর গাড়ির আওয়াজ উঠল রাস্তায়। অপরেশ দু হাতে মাথা চেপে চেয়ারে বসে পড়লেন। কাজল নিঃশব্দে পাশে এসে দাঁড়ালেন—শোনো।

অপরেশ মুখ তুললেন না।

কেন মিছে অশান্তি ডেকে আনছ?

অপরেশ মুখ তুললেন—অর্থাৎ?

সারাজীবন তো ওই একগুঁয়ে মনের জন্যে কষ্ট পেলে। আজ যখন একটু স্বাচ্ছন্দে আছি তখন খামোকা গোলমালে যাওয়ার কী দরকার?

অপরেশ চিৎকার করে উঠলেন, চমৎকার! বিষ খেয়ে সমস্ত শহরে মানুষ আগামীকাল ছটফট করবে জেনেও আজ আমি চুপ করে বসে থাকব? আমি বিজ্ঞানকে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করতে শিখেছি। না, না। অন্যায়ের সঙ্গে আমি আপোস করতে পারব না।

কিন্তু তুমি একা কী করবে? দাদার কত ক্ষমতা জানো? তা ছাড়া, আর কেউ যখন এগিয়ে আসছে না তখন তোমার মাথাব্যথা কেন?

আর কেউ জানে না তাই এগিয়ে আসছে না। সবাইকে জানাতে হবে। মানুষ যখন বুঝবে ওই জল থেকে তার আশু সর্বনাশ, তখন সবাই এগিয়ে আসবে। না, তুমি আমাকে বাধা দিও না।

কাজলকে অবাক করে অপরেশ উঠে দাঁড়ালেন। তারপর আচমকা বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন। পেছন থেকে কাজল চিৎকার করে উঠলেন, কোথায় যাচ্ছ তুমি?

অপরেশ উত্তর দিলেন, ভয় পেও না। এমন কিছু আমি করব না, যাতে তোমার কোনও ক্ষতি হয়। রাত হবে ফিরতে।

এরই মধ্যে পাহাড়ে বেশ অন্ধকার নেমেছে। হু হু করে কনকনে ঠান্ডা বইছে। না বাতাস নেই, শুধু ঠান্ডার ঢেউ যেন। অপরেশের একটু কাঁপুনি এল কিন্তু তিনি জোরে হাঁটতে লাগলেন। একটু জোরে হাঁটলেই শরীর গরম হয়ে যায়।

রাস্তায় একটাও মানুষ নেই। ঠান্ডা বাড়লেই আর কেউ বাইরে থাকে না। অপরেশ ভাবছিলেন, দাদা ওকে শাসিয়ে গেলেন। হ্যাঁ, তাঁর পরিবার দাদার কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু তিনি নন। তিনি তো বেশ ভালোই ছিলেন পুরুলিয়ায়। হয়তো দুবেলা ভাত জুটত না কিন্তু গ্রামে মানুষের ভালোবাসা পেয়েছিলেন। এই শহরের সুখ-স্বাচ্ছন্দে তাঁর কোনও লোভ নেই। তিনি যতক্ষণ মানুষ ততক্ষণ অবশ্যই অন্যায়ের প্রতিবাদ করে যাবেন।

বাঁক পেরিয়ে পা ফেলতেই হঠাৎ তাঁর কানে একটা কাতরানি এল। কেউ যেন ককিয়ে-ককিয়ে গোঙাচ্ছে। জায়গাটায় রাস্তার আলো কম। শব্দটা লক্ষ করে চারপাশে তাকাতে লাগলেন অপরেশ। কোনও প্রাণীর চিহ্ন নেই কোথাও। শব্দটা যেদিক থেকে আসছে সেদিকে কান পাতলেন তিনি। তারপর সেটা লক্ষ করে পায়ে-পায়ে এগোলেন। ডানদিকে পাহাড়ের গা ঘেঁষে ট্যুরিস্টদের বসবার জন্যে একটা সিমেন্টের বেঞ্চি করা আছে। শব্দটা আসছে তার তলা থেকে। ঝুঁকে পড়ে তিনি লোকটাকে দেখতে পেলেন।

বেঞ্চির তলায় লোকটা কুঁকড়ে শুয়ে-শুয়ে কোঁকাচ্ছে। অপরেশ ডাকলেন, এই তুমি কে? কী হয়েছে?

সঙ্গে-সঙ্গে শব্দটা আরও বেড়ে গেল। অপরেশ এবার ভালো করে লক্ষ করলেন। না, পোশাক দেখে বোঝা যাচ্ছে লোকটা ভিখিরি নয়। জুতো-মোজা পরা, প্যান্টটিও অক্ষত। পরনে সোয়েটার আছে। অপরেশ এবার যেন জোরে ধমকে উঠলেন, অ্যাই চুপ করো! কী হয়েছে তোমার?

সঙ্গে-সঙ্গে লোকটা নির্বাক হয়ে গেল। গলা থেকে শব্দ বের হচ্ছে না। মুখ ঢেকেই প্রশ্ন করল, কে বাবা তুমি—ঈশ্বর?

অপরেশের এই ঠান্ডাতেও হাসি পেল—না, ডাক্তার।

ও, তা দুটো একই কথা।

কী হয়েছে?

ঠান্ডায় কষ্ট পাচ্ছি। এত কষ্ট আগে কোনও দিন পাইনি মাইরি।

তা এখানে কী করছ? বাড়িতে যাও।

কী জ্ঞান দিচ্ছ বাবা। আরে সেটা পারলে তো চলেই যেতাম।

কী হয়েছে তোমার?

হাঁটতে পারছি না। কোমর থেকে পা জমে গেছে।

এবার অপরেশের নাকে ভকভক করে মদের গন্ধ এল। লোকটা মদ খেয়ে এখানে পড়ে আছে। সঙ্গে-সঙ্গে মন বিরূপ হয়ে উঠল! কোনও কথা না বলে অপরেশ সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। এই লোকটার ওপর কোনও সহানুভূতি দেখানোর মানে হয় না।

অপরেশ পা ফেলে এগিয়ে যেতেই লোকটা আবার কোঁকাতে লাগল—যাবেন না, চলে যাবেন না, আমাকে বাঁচান।

অপরেশ ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন, মদ খেয়ে নেশা করেছ, লজ্জা করে না!

করছে। মাইরি জীবনে কখনও আউট হইনি আর শেষপর্যন্ত আজই হলাম। কী লজ্জা! তা ঈশ্বর, তুমি আমাকে ফেলে যেও না মাইরি। মিনতি করতে লাগল লোকটা। অপরেশ একটু ভাবতে গিয়েই দুর্বল হয়ে পড়লেন। তিনি আবার পিছিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন দিকে যাবে? আমি সামনের দিকে এগোচ্ছি।

আমিও পেছন দিকে এগোব না। আমার হাত ধরো ঈশ্বর!

লোকটা বেঞ্চির তলা থেকেই হাত বাড়িয়ে দিল। অগত্যা অপরেশ হাত ধরলেন। লোকটা গুঁড়ি মেরে বেঞ্চির তলা থেকে কোনওরকমে বেরিয়ে এসে অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়িয়ে নিজের মনেই বিড়বিড় করে বলল, আমার পাদুটো ঠিক আছে?

ঠিক থাকবে না কেন?

কী জানি। মনে হচ্ছিল নেই, তাই বললাম। শালা এই মনটাই সবচেয়ে বেইমান। এটাকে অপারেশন করে বাদ দেওয়া যায় না, ঈশ্বর?

অপরেশের আবার হাসি পেল। এরকম প্রশ্নের সামনে তিনি কখনও পড়েননি। তিনি নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করলেন, আমার কাঁধে হাত রেখে তুমি হাঁটতে পারবে?

লোকটার পা টলছিল। শরীর রীতিমতো ঠান্ডা। মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। কয়েক পা এগিয়েই অপরেশের হাঁফ ধরে গেল। একটু দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি ওই বেঞ্চির তলায় ঢুকেছিলে কী করতে?

লোকটা এবার হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেলল। অপরেশ এর জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। হকচকিয়ে গিয়ে ওকে জিজ্ঞাসা করলেন, কী হল?

কান্না থামতে লোকটা বলল, সেইটেই তো লজ্জা। বেশ যাচ্ছিলাম পথ দিয়ে। হঠাৎ ওইখানটায় এসে আছাড় খেলাম। মাইরি, জীবনে প্রথম। পড়ে মনে হল আমি নেই। অনেকক্ষণ পরে বুঝলাম আছি। কিন্তু কোমর থেকে পা পর্যন্ত নেই। আর পা না থাকলে আমি হাঁটব কী করে? চিৎকার করলে লোকে টের পেয়ে যাবে, পাঁচজনে ছ্যা-ছ্যা করবে। ওই সময় বেঞ্চিটা নজরে এল। গড়িয়ে-গড়িয়ে ওর তলায় চলে গেলাম। ভাবলাম পা ফিরে এলে কেটে পড়ব। মাইরি, কী বলব? মাথার ওপর বেঞ্চির ছাদ, তবু শালা এত কনকনে ঠান্ডা যে বাপের নাম খগেন হয়ে গেল। কিন্তু পা নেই যার, তার কী করার আছে! এই সময় তুমি এলে।

অপরেশের মনে হল লোকটার মন সরল। তিনি সস্নেহে বললেন, ও সব ছাইপাঁশ খাও কেন?

লোকটা সজোরে মাথা নাড়ল—যাঃ শালা! আবার জ্ঞান! আরে আমি যদি না খেতাম তাহলে কি তোমার দেখা পেতাম, ঈশ্বর?

চৌমাথায় এসে নিষ্কৃতি পেলেন অপরেশ। একটা দোকানের সামনে লোকটা নিজে থেকেই চলে গেল। অপরেশের মনে হল লোকটা মদ খাওয়ার নাম করে নিজেকে ভুলিয়ে রেখেছে। আমি নেশা করেছি এই বোধ ওকে হয়তো অনেক কিছু থেকে আড়াল করে দূরে সরিয়ে রাখে।

হাসি পেল অপরেশের, আচ্ছা দাদারও কি একই অবস্থা নয়? শহরটাকে আমি তৈরি করেছি, ভালোবাসি, এই নেশা তাঁকে বাস্তব বোধ থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে নাকি?

সমাজপতির অফিসে আলো জ্বলছিল, কিন্তু সমাজপতি নেই। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে অপরেশ দেখলেন অবিনাশ টেবিলে উপুড় হয়ে প্রুফ দেখছে। পায়ের শব্দ পেয়ে সে মুখ তুলতেই অবাক হল। তড়িঘড়ি উঠে এসে জিজ্ঞাসা করল, আরে, আপনি হঠাৎ? কী ব্যাপার?

সমাজপতি কোথায়?

ঘুমুচ্ছেন।

ঘুমুচ্ছেন! এই সন্ধেবেলায়? দেওয়াল ঘড়িতে তখন আটটা বাজে।

ফার্স্ট রাত্রে উনি লাস্ট রাত্রে আমি, এই নিয়ম।

ডাকো ওঁকে। চেয়ার টেনে বসলেন অপরেশ।

অসম্ভব। এখন ডাকা নিষেধ আছে।

কিন্তু আমার যে জরুরি দরকার ছিল!

কী ব্যাপারে বলুন? ওঁর ঘুমের সময়ে যে-কোনও ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা আমার আছে। জেগে থাকলে নেই।

অবিনাশ নিজের টেবিল-চেয়ারে ফিরে গিয়ে বসে বেল বাজাল। একটি ছোকরা ঢুকতেই সে প্রুফগুলো তাকে ধরিয়ে দিয়ে হুকুম করল, ছাপা শুরু হবে আধঘণ্টার মধ্যে, ওদের বলে দাও।

ছোকরা চলে গেলে অপরেশ বলল, অবিনাশ, আমার কাছে এমন তথ্য আছে যা ছাপা অত্যন্ত জরুরি।

ঘাড় নাড়ল অবিনাশ, ওই ওষুধের ব্যাপারে তো? ওটা অবশ্য এমন কিছু জরুরি নয়। আমার তো ওষুধ খেতে একদম ভালো লাগে না।

মাথা নাড়লেন অপরেশ, ওষুধ নয়। এই শহরকে বাঁচাতে হবে। তোমরা জানো না কী ভীষণ বিপদের মুখে এই শহর দাঁড়িয়ে। এইভাবে যদি চলে তাহলে আগামী এক বছরের মধ্যে এই শহরের প্রতিটি মানুষ রোগে আক্রান্ত হবে এবং একবার আক্রান্ত হলে শেষ হয়ে যাবে শহরটা।

সোজা হয়ে বসল অবিনাশ—কী বলছেন আপনি!

ঠিকই বলছি। আমি সমস্ত ব্যাপারটা তোমাদের কাগজে ছাপাতে চাই।

উত্তেজনা এসে ভর করল অবিনাশকে। চট করে সে তার ডায়েরি আর কলম টেনে নিল—বলুন, বলুন, আমি এক্ষুনি লিখে নিচ্ছি।

তুমি লিখবে? আমি ভাবলাম নিজেই বিস্তারিত লিখব। অপরেশ আড়ষ্ট বোধ করলেন। ডিক্টেশন দেওয়ার জন্যে তিনি ঠিক তৈরি ছিলেন না। অবিনাশ বলল, তা হলে তো কালকের কাগজে ছাপা যাবে না। আমার পেজ মেকাপ হয়ে গেছে বললেই হয়। ঠিক হ্যায়, সর্বনাশা খবর বলে অ্যানাউন্স করে দিচ্ছি। পরশুদিন তাহলে মারকাটারি সেল হবে। আগে থেকে বাজার গরম করে রাখা ভালো। কিন্তু খবরটা কী বলুন তো?

অপরেশ হাসলেন, আমাকে তুমি একটা কাগজ আর কলম দাও।

দেড়ঘণ্টা লাগল লেখাটা তৈরি করতে। সমস্ত ঘটনা স্পষ্ট ভাষায় লিখলেন অপরেশ। কিন্তু লেখাটার হেডিং তৈরি করতে গিয়ে বিপদে পড়লেন। কোনও শব্দই তাঁর পছন্দ হয় না। শেষমেশ হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন, নাও, এটা পড়ে ভালো হেডিং দিয়ে দাও। ওটা আমার আসছে না।

এতক্ষণ নিজের চেয়ারে বসে জুলজুল করে তাকিয়ে ছিল অবিনাশ। এবার এক ফাঁকে কাছে এসে লেখাটাকে তুলে নিল, নিয়ে বলল, ইস, আপনাদের মানে ডাক্তারদের, হাতের লেখা খুব খারাপ হয়। বলে পড়তে লাগল লেখাটা। পড়া শেষ করে চিৎকার করে উঠল, আই বাপ! এ সব কী লিখেছেন ডাক্তারবাবু? এগুলো সব সত্যি কথা?

হ্যাঁ, সূর্য-চন্দ্রের মতো সত্যি।

ওই কলের জলে বিষ আছে আর আমরা সবাই নিশ্চিন্তে তাই খাচ্ছি? তাই কদিন থেকে আমার পেটটা কেমন লুজ হচ্ছিল।

অপরেশ জিজ্ঞাসা করল, হেডিংটা কী হবে?

দাঁড়ান, দাঁড়ান! ওঃ, এ লেখা তো একটা আগ্নেয়গিরি। চারধারে যা হইচই পড়ে যাবে না! হ্যাঁ, প্রতিষেধক হল চটপট জলের লাইন পালটাও আর ওই চামড়ার

ফ্যাক্টরি সরাও। ওহো, এই লেখার সঙ্গে আমার তোলা সেই ফ্যাক্টরির ছবিটা ছেপে দেব। ক্যাপশন দেব—বিষ সরবরাহ কেন্দ্র। এই শহরের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যা ধাক্কা খাবে না! অবিনাশের বোধ হয় নাচতে ইচ্ছে করছিল। লেখাটা নিয়ে সে ছটফট করছিল। তারপর হঠাৎ কথাটা মনে আসতেই জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু এই সব তথ্যের যথার্থতার প্রমাণ আছে?

আছে, আমি তো লিখেছি কলকাতা থেকে জল পরীক্ষা করে এনেছি। কথাটা বলতে গিয়ে অপরেশের অস্বস্তি হল। ওঁর মনে পড়ল একটু আগে গুপ্ত রিপোর্টটা পড়ে নিজের পকেটে নিয়ে চলে গেছেন। অর্থাৎ এই মুহূর্তে কোনও প্রমাণ তাঁর হাতে নেই। সঙ্গে-সঙ্গে কথাটাকে নিজেই বাতিল করলেন। —এই জল যে-কোনও সময়ে কলকাতায় পাঠালে ওই একই রিপোর্ট আসবে। অতএব প্রমাণ নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।

অবিনাশ বলল, কিন্তু ডাক্তারবাবু, আপনার নামে এই লেখা ছাপলে আপনার দাদা খুব রেগে যাবেন। হয়তো আপনার বিপদ হবে।

অপরেশ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, দেখো অবিনাশ, পৃথিবীতে জন্মাবার পর অনেক বিপদ পার হয়ে এলাম। আর ও সবের ভয় করি না। এই শহরের মানুষ যদি এই লেখা ছাপানোর ফলে সুস্থভাবে বাঁচতে পারে তাহলেই আমি খুশি হব। আমার একার কষ্টের জন্যে হাজার মানুষের জীবন বিপদগ্রস্ত জেনেও নির্বাক হয়ে থাকব? এত বড় কাপুরুষ আমি? তা হলে আর মানুষ হয়ে জন্মালাম কেন?

অবিনাশ এতখানি আপ্লুত হয়ে পড়েছিল যে এগিয়ে এসে সে অপরেশকে প্রণাম করল, সত্যি ডাক্তারবাবু, আপনার মতো মানুষ আমি এর আগে কখনও দেখিনি!

অপরেশ হাসলেন, তা এই লেখা ছাপলে তোমাদের কাগজের কোনও অসুবিধে হবে না তো?

হোক, তবু ছাপাতে হবে। সংবাদপত্র যদি তার চরিত্র হারায় তাহলে—অপরেশ বাধা দিলেন, মনে রেখো, আমি যেমন এই শহরকে বাঁচাতে চাই, মানুষের জীবন নিয়ে ছেলে-খেলা বন্ধ করতে চাই, ওই লেখা ছাপিয়ে তোমরা সেই একই কাজ করতে চলেছ। হেডিংটা কী দেবে?

অবিনাশ চটপট জবাব দিল, মৃত্যুর মুখোমুখি কনকপুর, জল বিষাক্ত। কেমন মনে হচ্ছে? লোকে নেবে?

অপরেশ মাথা নাড়লেন। তারপর নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়লেন অফিস থেকে। অবিনাশ একটা স্লিপে লিখল, 'কনকপুর সম্পর্কে একটি ভয়ঙ্কর তথ্য আগামীকাল প্রকাশিত হবে। লক্ষ রাখুন।' তারপর স্লিপটা নিয়ে ছুটল প্রেসের দিকে। আগামীকালের কাগজের প্রথম পাতার মাঝখানে এটাকে ছাপতে হবে।

লনে বসে চা খাচ্ছিলেন গুপ্ত। এমন সময় কাগজ এল। কলকাতার কাগজ এখানে আসে একদিন পরে। তার ছাপা এবং খবরের কাছে সমাজপতির কাগজ লিলিপুটের চেয়েও ছোট। কিন্তু তবু সকালবেলায় চায়ের সঙ্গে কাগজ পড়ার অভ্যাসেই এই বদখত ছাপা কাগজটায় চোখ রাখতে হয়। গুপ্ত খুব অবহেলার সঙ্গে কাগজটা টেনে নিয়ে ওপরে নজর দিলেন। প্রধানমন্ত্রী বিদেশ যাচ্ছেন। হুম, ব্যাটারা রেডিও থেকে শুনে

ছেপেছে। আর-একটু নিচে নামতেই তাঁর চোখ স্থির হল—'কনকপুর সম্পর্কে একটি ভয়ঙ্কর তথ্য আগামীকাল প্রকাশিত হবে। লক্ষ রাখুন।' এ আবার কী ধরনের রসিকতা! ভয়ঙ্কর তথ্য! মানেটা কী?

প্রথমে ভাবলেন এটা, সমাজপতির স্টান্ট দেওয়ার চেষ্টা। যাতে কাল লোকে কাগজটা কেনে। আগামীকাল হয়তো থাকবে, বিশ হাজার বছর আগে এখানে কুমির হাঁটত। এই রকম মজা আর কী! কিন্তু তারপরেই মনে হল, অন্য কিছু যদি হয়? কী হতে পারে? সঙ্গে-সঙ্গে ভাইয়ের মুখ মনে পড়ল। গতরাতে ভালো করে ঘুমতে পারেননি তিনি। মাঝরাতে নিজে অর্ডার লিখে পাঠিয়েছেন। আজ সকালে এতক্ষণে নিশ্চয়ই অপরেশ পেয়ে গেছে। আজ থেকে তাঁকে মেডিক্যাল অফিসারের পথ থেকে বরখাস্ত করা হল। অপরেশ এখন শুধু হসপিটালের ডাক্তারের চাকরিতে থাকবে! শহর নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনও দরকার নেই। এটা প্রথম ওয়ার্নিং। এ থেকে নিশ্চয়ই শিক্ষা পাবে সে। কিন্তু গুপ্তর মনে পড়ল, সমাজপতি কাল বিকেলে অপরেশের কাছে এসেছিল। এই সব তথ্য কি সে সমাজপতিকে দিয়েছে? কালকের কাগজে কি ওই খবরটা ছাপানোর আয়োজন করছে সমাজপতি? ধীরে-ধীরে চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল গুপ্তর। যদিও খবরটা সত্যি হয় তবু তা জনসাধারণকে কখনই জানানো যাবে না। না, তিনি কিছুতেই খবরটা ছাপতে দেবেন না। ওটা যদি কাগজে বের হয় তাহলে পরশু দিনই শহরটা ফাঁকা হয়ে যাবে। ভুলেও কেউ আর কনকপুরে পা দেবে না। এই মৃত্যুপুরী নিয়ে তিনি তখন কী করবেন? এইজন্যেই কি তিনি এত বছর ধরে তিল-তিল করে শহরটাকে গড়েছেন? যতই জলের পাইপ পালটাও আর কারখানা সরাও সাধারণ মানুষের মন থেকে সন্দেহ দূর হবে না। তা ছাড়া, এই জলের পাইপ পালটাবার অর্থ তাঁর নেই। কনকপুর ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনে দাশগুপ্তর যা শেয়ার আছে তাতে ওঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কারখানা সরানোর প্রশ্নই ওঠে না। দাশগুপ্ত রাজি হবে না। সেটা করতে গেলে অবশ্যই ওঁর কয়েক লক্ষ টাকা নষ্ট হয়ে যাবে।

না, খবরটাকে বন্ধ করতে হবে। মৃত্যুর মুখোমুখি কনকপুর—! হ্যাঁ এতক্ষণে স্পষ্ট হয়ে গেল গুপ্তর কাছে। এইটেই যে খবর তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ক্রোধে উন্মাদ হয়ে উঠলেন গুপ্ত। এতবড় স্পর্ধা সমাজপতির যে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ পর্যন্ত করল না এটা ছাপার আগে? এই লেখা যে সোজা তাঁর বিরুদ্ধে যাবে এটা বুঝতে অসুবিধে হওয়ার কিছু নেই। আর তাঁর নিজের ভাই? পুরুলিয়ার গ্রামে না খেয়ে মরছিল, তিনি দয়া দেখিয়ে তাকে তুলে নিয়ে এলেন নিজের সর্বনাশ করার জন্যে? অকৃতজ্ঞ, বেইমানের দল। এই মুহূর্তে দুজনকে তিনি শহর থেকে ছুড়ে দিতে পারেন বাইরে। চাই কী পাহাড়ের কোণে খাদের গভীরে মাটি চাপা দিয়ে রাখতে পারেন ওই মৃত মেয়েটির মতো।

মেয়েটির কথা মনে আসতেই চা শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন গুপ্ত। তিনজন ছাড়া আর কেউ জানে না মেয়েটি সত্যি লেকের জলে আত্মহত্যা করেছিল। কিন্তু সেই সামান্য খবরটাও তিনি প্রচারিত হতে দেননি। বাঁধের দুই প্রহরীকে দিয়ে মৃতদেহ জল থেকে তুলিয়ে খাদের মধ্যে সমাধি দিয়েছেন। তারপর প্রহরী দুজনকে মোটা বকশিস দিয়ে তাদের দেশে পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। কেউ আর ওই দেহ খুঁজে পাবে না।

কনকপুরের চরিত্রের ওপর সামান্য আঁচড় পড়ার আর সম্ভাবনা রইল না।

ওটা তো সামান্য ব্যাপার ছিল, তাও তিনি ঝুঁকি নেননি আর এতবড় সর্বনাশ তিনি সহ্য করবেন? এখনি পুলিশ কমিশনার সেনকে ডাকবেন নাকি? একটা হুকুমে সব শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে নিজেকে সতর্ক করলেন। না, এটা একটা বড় রকমের বোকামি হয়ে যাবে। খবরটা অপরেশের স্ত্রী এবং সম্ভবত মেয়ে জানে। সুব্রত ছোকরাও জেনেছে। ওদিকে সমাজপতির সেই রিপোর্টার ছোঁড়াও নিশ্চয়ই সব জেনে গেছে। অতএব খুব ধীর মাথায় কাজ করতে হবে। কোনওরকম উত্তেজনা নয়। এই শহরটাকে বাঁচাতে প্রতিটি পদক্ষেপ ভেবেচিন্তে নিতে হবে।

মিনিট পনেরোর মধ্যে গাড়ি নিয়ে ভাইয়ের বাড়িতে পৌঁছে গেলেন গুপ্ত। গেট খুলে বন্ধ দরজায় কড়া নাড়তেই চাকরটা এসে দরজা খুলে দিল। অপরেশ নাকি হাসপাতালে আর সুর্মা স্কুলে। খবর পেয়ে কাজল ছুটে এলেন—দাদা, এ কী হল? ওকে মেডিক্যাল অফিসারের পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে! এ কী করলেন দাদা?

নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে গুপ্ত বললেন, কী আর এমন হয়েছে তাতে। মাত্র দুশো টাকা মাইনে কমবে এতে।

কাজলের গলার স্বর ভাঙছিল, দাদা, আর আমাকে কষ্ট দেবেন না।

গুপ্ত আস্তে-আস্তে বললেন, বউমা। আমি তোমাদের বাঁচাতে চেয়েছিলাম। তোমরা যখন না খেয়ে মরছিলে তখন আমি তোমাদের এখানে এনে রাজার হালে রেখেছিলাম। কিন্তু তোমার স্বামী তার বিনিময়ে কী দিলে আমাকে? সে আমার এই শহরটাকে তছনছ করে দিতে চাইছে। আমি তো আর চুপ করে থাকতে পারি না। যে আমার এই শহরটার ক্ষতি করতে চাইবে আমি তাকে সহ্য করতে পারব না।

কাজল বললেন, আমি জানি দাদা, কিন্তু ও যে বুঝতে পারছে না। ওর মতে যা অন্যায় তার প্রতিবাদ ও করবেই। কিন্তু আমি আপনার কাছে ভিক্ষে চাইছি, আমার এই সুখটুকু আপনি কেড়ে নেবেন না।

গুপ্ত বললেন, আজকের কাগজে একটা ঘোষণা রয়েছে, দেখেছ?

কাজল মাথা নাড়লেন। হ্যাঁ।

ওটা কি অপরেশ লিখছে?

কাজল একটু ইতস্তত করলেন। মিথ্যে কথা বলতে পারলেন না তিনি। নিচু গলায় জবাব দিলেন, সেই রকম শুনছিলাম।

তাহলে? তাহলে বোঝ। না, না আমি আর কিছু করতে পারি না। বউমা, তোমার বাড়ির ছাদে যদি ক্র্যাক হয় আর ছাদ সারানোর টাকা যদি তোমার না থাকে তাহলে কি বাড়িটাকে ভেঙে গুঁড়ো-গুঁড়ো করে দেবে তুমি? গুপ্ত হাসলেন, তোমার স্বামী সেইরকম পাগল। ঠিক আছে, তুমি তাকে বলো যদি সে আজই গিয়ে ওই লেখাটা তুলে নিয়ে চুপ করে থাকে তাহলে আমি কিছু বলব না। এর চেয়ে আর কোনও ভালো প্রস্তাব আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব হবে না।

কথাটা বলে গুপ্ত আর দাঁড়ালেন না। সোজা গাড়ি চালিয়ে সমাজপতির অফিসে এসে উপস্থিত হলেন। অফিসের সামনে হকারদের বেশ ভিড়। গুপ্ত বুঝলেন আগামীকালের কাগজের জন্যে অর্ডার নেওয়া হচ্ছে। অবিনাশ ছোকরাই ওই সব দেখাশোনা করে। কিন্তু

সে নেই। নতুন একটা ছেলে এই কাজ করছে। তার মানে সমাজপতি নতুন লোক রাখার মতো ক্ষমতায় এসেছে। চমৎকার।

ঘরে ঢুকে নিরাশ হলেন গুপ্ত! সমাজপতি নেই। কোথায় যে গিয়েছে তা কেউ বলতে পারল না। তার মানে গা-ঢাকা দিয়েছে লোকটা। সে ফিরলেই যেন অবিলম্বে তাঁর সঙ্গে দেখা করে এই নির্দেশ দিয়ে তিনি আবার গাড়িতে উঠলেন। ঠিক করলেন, বেলা একটা পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন আর তারপরেই সেনকে বলবেন ওকে খুঁজে বের করতে।

রাস্তায় এসে চারিদিকে তাকাতেই চোখ জুড়িয়ে গেল গুপ্তর। ওদিকে নতুন রোদ গায়ে মেখে কাঞ্চনজঙ্ঘা ঝকঝক করছে আর রাস্তায় রঙিন জামাকাপড় পরা ট্যুরিস্টদের ভিড়। আর এই ছবিটাকে ওরা নষ্ট করতে চায়, মনে-মনে বললেন গুপ্ত। না, কিছুতেই তা হতে দেবেন না তিনি।

হাসপাতালে আজ আরও চারজন ট্যুরিস্ট ভর্তি হল। অপরেশ বুঝতে পারছিলেন সময় খুব দ্রুত এগিয়ে আসছে। অবিলম্বে চামড়ার কারখানাটা বন্ধ করা দরকার। এই হাসপাতালে যেক'টা বেড আছে তা ভর্তি হয়ে যেতে বেশি সময় লাগবে না। তখন কী অবস্থা হবে চিন্তা করতে পারছেন না তিনি। দুপুরে বাড়িতে খেতে আসবার সময় মনে-মনে এই সব চিন্তা করছিলেন অপরেশ।

ওরা তাঁর কথা শুনল না। কয়েক লক্ষ টাকা মানুষের জীবনের চেয়ে বড় হল। আজ সকালে তাঁকে মেডিক্যাল অফিসারের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। হাসি পেল অপরেশের। তাতে তাঁর কী এসে যায়! দুশো টাকা আয় কমবে, তার বেশি কিছু ঘটবে না। সমাজপতি যদি লেখাটা ছাপে তাহলে নিশ্চয়ই শহরের মানুষ তাঁর পাশে এসে দাঁড়াবে। সেই জনমতের চাপে দাদারা মেনে নিতে বাধ্য হবেন দাবিগুলো।

বাড়িতে ফিরতেই কাজল কাছে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখ ফোলা এবং চোখ লাল! বোঝা যাচ্ছে কান্নাকাটি হয়েছে বেশ।

অপরেশ উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করলেন, কী হয়েছে?

কাজল স্বামীর মুখের দিকে চোখ তুলে তাকালেন, তুমি কী চাও?

মানে? বুঝতে পারলেন না অপরেশ।

বিয়ের পর থেকে একটা দিনের জন্যে তুমি আমাকে সুখ দাওনি। চিরদিন তোমার বাউন্ডুলেপনার জন্যে অতিষ্ঠ হয়ে মরেছি। তোমার ওই পরোপকারের ঠেলায় আমার সমস্ত সুখ বিসর্জন দিয়েছি। শেষপর্যন্ত এখানে এসে ঠাকুর আমাকে যখন স্বাচ্ছন্দ দিতে চাইলেন তখন তুমি আবার আমাদের সর্বনাশের পথে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছ। কেন, জবাব দাও, আমরা কী ক্ষতি করেছি তোমার! তীক্ষ্ণ গলায় প্রশ্ন করলেন কাজল। তাঁর চোখদুটো জ্বলছিল।

অপরেশ স্ত্রীর এই চেহারা আগে কখনও দেখেননি। কিছুক্ষণ ওঁর দিকে তাকিয়ে বিব্রত গলায় শুধোলেন, কী বলছ তুমি!

কী বলছি বুঝতে পারছ না? তোমার কী দরকার দাদার পেছনে লাগার? এই শহরের মানুষ তোমাকে দেখবে? তোমাকে খেতে-পরতে দেবে? না, কেউ দেবে না। তোমার দাদা সেটা দিয়েছেন। আজ উনি আমায় স্পষ্ট বলে গেলেন, তুমি যদি এসব

করো তাহলে উনি ছেড়ে কথা বলবেন না। তার ফল নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। জোরে-জোরে নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন কাজল।

অপরেশ বললেন, কাজল, এতদিন যখন তুমি আমার সঙ্গে কষ্ট ভাগ করে নিয়েছ তখন কালও পারবে। তুমি যদি আমার পাশের না দাঁড়াও তাহলে আমি অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ব কী করে?

কাজল এবার কেঁদে ফেললেন, তোমার কী দরকার একা-একা লড়াই করার! পৃথিবীতে অনেক লোক আছে, তারা করুক। দোহাই তোমার, তুমি আমার এই সুখ কেড়ে নিও না।

অপরেশ এগিয়ে এসে স্ত্রীর মাথায় হাত রাখলেন, পৃথিবীতে অনেক লোক, ঠিক কথা, কিন্তু একজনকে না একজনকে প্রথমে লড়াই শুরু করতে হয়। তাই না? কনকপুরে সেই কাজটা না হয় আমিই করলাম। তুমি এত চিন্তা করো না। আমরা তিনটে তো প্রাণী, একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হয়ে যাবে। মেয়ে তো চাকরি করছে, তোমার ভয় কী!

এইরকম মিষ্টি কথায় কাজলের মন ভরছিল না। তিনি নিশ্চিত নিরাপত্তা আর হারাতে চান না। স্বামীকে বারংবার বোঝাতে চাইলেন তিনি। কিন্তু কোনও কথা শুনতে চাইলেন না অপরেশ।

ওঁদের যখন কথা কাটাকাটি তুঙ্গে তখন সুর্মা ফিরল। হাতে দুটো বই, মুখে হাসি। কাজল তাকে দেখে এগিয়ে গেলেন, তুই তোর বাবাকে বুঝিয়ে বল, আমার কথা শুনতেই চাইছেন না।

সুর্মা ঈষৎ অবাক হল, কী ব্যাপার?

অপরেশ কথা বললেন, আমাকে অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করতে বলছে তোর মা। এই শহরের মানুষগুলো বিষে আক্রান্ত হবে জানা সত্ত্বেও আমাকে চুপ করে থাকতে হবে। না, এ অসম্ভব। ও এই বাড়ি, স্বাচ্ছন্দ হারাতে চাইছে না। আমি বললাম, তুমি শক্ত হও, আমার পাশে এসে দাঁড়াও।

তুই কী বলিস?

সুর্মা বলল, বাবা ঠিকই বলেছে মা।

কাজল ফুঁসে উঠলেন, তুইও একই কথা বলছিস?

অপরেশ পরিহাসের গলায় বললেন, এখন তোমার মেয়ে চাকরি করছে, তুমি তো আর জলে গিয়ে পড়বে না।

সুর্মা একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল, না বাবা, এই মুহূর্তে আমি আর চাকরি করছি না। আমাকে স্কুল থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

কাজল প্রায় দৌড়ে এলেন মেয়ের কাছে, কী বললি? তোর চাকরি নেই?

সুর্মা মাথা নাড়ল, না। স্কুল কমিটি আমার কাজ সম্পর্কে সন্তুষ্ট নয়, আজ একটু আগে জানিয়ে দিয়েছে আমাকে।

ফ্যাকাশে গলায় কাজল বললেন, কেন, তুই তো খুব ভালো পড়াস, সবাই কত সুখ্যাতি করে, তা হলে—? স্বামীর দিকে তাকালেন তিনি, মেয়েটার চাকরি গেল কেন? কেন তোমাকে মেডিক্যাল অফিসারের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল বুঝতে পারছ না?

এর পরেও তুমি তোমার গোঁ ছাড়বে না! দোহাই, তোমার পায়ে পড়ি তুমি একটু বুঝতে চেষ্টা করো।

কিন্তু এসব কথা অপরেশের মাথায় ঢুকছিল না। তিনি বিস্ময়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। কর্তৃপক্ষ তাহলে যুদ্ধ ঘোষণা করল! কিন্তু সুর্মা কী দোষ করল? ওর ওপর আঘাত হানল কেন ওরা? ছিছি! ক্রমশ উত্তপ্ত হতে আরম্ভ করলেন তিনি। চোখ রাঙিয়ে তাঁকে থামিয়ে রাখতে চায় ওরা? মূর্খের দল সব। কাজল বোকামি করছে, এই ঠুনকো সুখের জন্যে কান্নাকাটি করছে। কিন্তু এত বড় একটা সর্বনাশ আসছে জেনেও কী করে চুপ করে থাকবেন তিনি? নিজের বিবেকের কাছে কী জবাব দেবেন?

না, যুদ্ধ যখন শুরু হয়েছে তখন আর থামার কোনও প্রশ্ন ওঠে না। সমাজপতির কাগজে কালকে লেখাটা বের হলে ওদের টনক নড়বেই। বাধ্য হবে এই সব দাবি মেনে নিতে। অপরেশ ঠিক করলেন, খেয়ে-দেয়ে হাসপাতালে যাওয়ার আগে একবার সমাজপতির ওখান থেকে ঘুরে যাবেন।

সমাজপতি অফিসে ছিলেন না। অবিনাশও নেই। পথে আসবার সময় সিংজির দোকানে একটু দাঁড়িয়েছিলেন। সেখানে গুঞ্জন শুনছিলেন, খুব মারাত্মক কিছু ঘটতে যাচ্ছে কনকপুরে। কালকের কাগজে জানা যাবে। লোকে জল্পনা-কল্পনা করছিল কী হতে পারে। সেটা লোভ হচ্ছিল অপরেশের, বলেই ফেলবেন নাকি! তারপর ভাবলেন, না, লোকে কালকের কাগজটা নিজেরাই পড়ুক। অর্থাৎ উদ্দীপনা শুরু হয়েছে খবরটাকে ঘিরে।

বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর অবিনাশ এল। এসে তাঁকে দেখে একগাল হাসল, ওহ, সারা শহর পাগল হয়ে গেছে ওই খবরটা জানার জন্যে। আমি তো রাস্তায় হাঁটতে পারছি না পাবলিকের জ্বালায়।

অপরেশ জিজ্ঞাসা করলেন, সমাজপতি কোথায়?

অবিনাশ ওঁর চোখে চোখ রাখল। কিছু একটা বলতে গিয়ে ইতস্তত করল। শেষপর্যন্ত সত্যি কথাটা না বলে পারল না, আঙুল দিয়ে পিছনের একটা ঘর দেখিয়ে দিল। ঘরটার দরজা বন্ধ।

অপরেশ বললেন, সে কি! ওখানে আছেন কেন?

পালিয়ে আছেন। ঘন-ঘন লোক আসছে ওঁকে ধরতে। স্বয়ং গুপ্তসাহেব হানা দিয়ে শাসিয়ে গেছেন। আমরা বলেছি, উনি নেই। অবিনাশ হাসল।

আমার লেখাটা কম্পোজ করা হয়ে গেছে?

অনেকক্ষণ। প্রুফ দেখে দিয়েছি।

অপরেশের স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল। যাক বাঁচা গেল! তিনি উঠলেন, তাহলে সমাজপতির সঙ্গে দেখা করা যাবে না?

খুব দরকার আছে?

না, ওঁকে আমি ধন্যবাদ জানাতাম।

ধন্যবাদ তো আপনিই পাবেন। আপনার জন্যেই আজ কাগজের এত নাম। অবিনাশ অপরেশকে দরজা অবধি পৌঁছে দিয়ে ফিরে এসে একটা কাগজে লিখল, 'ডাক্তারবাবুর

এসেছিলেন। ধন্যবাদ জানিয়ে গেলেন। বাইরে দারুণ পাবলিসিটি হয়েছে। দশ হাজার ছাপব?' তারপর কাগজটা দরজার তলা দিয়ে ভিতরে ঢুকিয়ে দিল।

ঠিক তখনই দরজায় শব্দ হতে চমকে ফিরে তাকিয়ে অস্বস্তিতে পড়ল অবিনাশ। গুপ্ত এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর চোখ দরজার নিচে। অবিনাশ দ্রুত উঠে এল।—কী সৌভাগ্য, আসুন-আসুন!

গুপ্ত সেখানেই দাঁড়িয়ে বললেন, ওখানে কী করছিলে?

একটা পিন পড়ে গিয়েছিল, খুঁজছিলাম। চটপট মিথ্যে বলে ফেলল অবিনাশ।

পিন খুঁজছিলে?

হ্যাঁ।

পেলে?

না। অবিনাশ বুঝল গুপ্ত তাকে সন্দেহ করছেন। সে চেয়ারটা টেনে নিয়ে গেল অকারণে—বসুন।

তোমার মালিক কোথায়?

জানি না। সকাল থেকে যে কোথায় গেলেন, কী জ্বালা আমার।

সেই ট্যুরিস্ট মেয়েটির মতো অবস্থা হয়নি তো!

মানে?

মেয়েটিকে আর কখনও খুঁজে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।

অবিনাশের অস্বস্তি বেড়ে গেল। ওই মেয়েটি সম্পর্কে গুপ্ত আরও কোনও খবর জানেন নাকি! মার্ডার হয়ে থাকলে জব্বর নিউজ হবে। কিন্তু সেটা জানার কোনও উপায় নেই। সে চেষ্টা করল ভালোমানুষের মতো মুখ করতে, আপনার যা দরকার তা আমার দ্বারা মিটতে পারে না?

না। চাকর-বাকরদের সঙ্গে আমি কথা বলি না।

অবিনাশ অপমানটা হজম করল। খুব জরুরি কিছু?

গুপ্ত তাকালেন। তারপর শীতল গলায় প্রশ্ন করলেন, কালকের কাগজে কী খবর বের হচ্ছে?

এইটেই আশঙ্কা করছিল অবিনাশ। সে বুঝল মিথ্যে বলে কোনও লাভ হবে না। তবু সামান্য ব্যাপার এমন ভঙ্গিতে বলল, ও ডাক্তারবাবুর একটা আর্টিকেল। কেন বলুন তো?

সেটাই সন্দেহ করেছিলাম। কী আছে তাতে?

আমি জানি না। সমাজপতিবাবু আমাকেও পড়তে দেননি।

মিথ্যে কথা বলছ।

সত্যি-মিথ্যে জানি না। কিন্তু আপনার এভাবে জানতে চাওয়া উচিত হচ্ছে? এতে কি সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় আপনি হস্তক্ষেপ করছেন না?

তাই নাকি? খুব শীতল গলা গুপ্তর।

নিশ্চয়ই, এসব করলে সারা দেশে ঝড় উঠবে। স্বয়ং প্রেসিডেন্টও এত সাহস পান না। এটা আপনার উচিত হচ্ছে না।

হচ্ছে। কারণ যে সংবাদপত্র এতদিন ভাঁওতা আর ভণ্ডামি করে বেঁচেছিল তার

স্বাধীনতা বলে কিছু থাকতে পারে না। স্বাধীনতার কথা সে-ই বলতে পারে যে সৎ, আদর্শবান। তোমার মালিককে জিজ্ঞাসা করো অ্যাদ্দিন সে কী করেছে। ঝড় উঠবে? ওঠাচ্ছি ঝড়! বই লেখাটা দাও। গুপ্ত হাত বাড়ালেন।

আমার কাছে নেই। তা ছাড়া, সেসব ছাপা হয়ে গেছে।

ছাপা হয়ে গেছে! তোমাদের তো রাত্রে ছাপা হয়।

হয়, কিন্তু এটা ইমার্জেন্সি বলে—

কত কপি ছেপেছ সত্যি কথা বলো!

দশ হাজার।

মিথ্যে কথা।

কথাটা বলা মাত্র অবিনাশ ঘাড় ঘুরিয়ে দরজার দিকে তাকাল। সেখানে একটা ছোট ভাঁজ করা কাগজ পড়ে আছে। ওর দৃষ্টির অনুসরণ করে গুপ্ত কাগজটা দেখলেন। তারপর গম্ভীর গলায় আদেশ করলেন, ওটা তুলে আনো।

কোনটা?

ওই কাগজটা। তুমি ওটা নিয়ে তখন কিছু করছিলে। কী ওটা আমি দেখব। যাও নিয়ে এসো। গুপ্ত চেঁচিয়ে উঠলেন।

অবিনাশ হতাশ গলায় বলল, ওটা এমনি কাগজ। মূল্যহীন।

গুপ্ত নিজেই উঠলেন। নিচু হয়ে কাগজটা কুড়িয়ে ভাঁজ খুললেন, পাঁচ হাজার। তারপর হতভম্ব গলায় বললেন, পাঁচ হাজার মানে? ওহো, পাঁচ হাজার ছেপেছি। অবিনাশ ম্যানেজ করার চেষ্টা করল।

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন গুপ্ত—ওই দরজাটা বন্ধ কেন?

দরজা! ফ্যাকাশে গলায় বলল অবিনাশ, এমনি!

খোলো।

কেন?

আমি দেখব। কথাটা শেষ করেই গুপ্ত এগিয়ে গিয়ে দরজায় আঘাত করলেন। ভেতর থেকে বন্ধ, কোনও সাড়া এল না। গুপ্ত অবিনাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, পুলিশ কমিশনারকে টেলিফোন করো এখনই যেন ফোর্স নিয়ে চলে আসে। মনে হচ্ছে যে মেয়েটিকে পাচ্ছি না সে এখানে আছে।

কী বলছেন! হাঁ হয়ে গেল অবিনাশ—সেই মেয়েটি ওখানে থাকতে যাবে কেন? আমরা তো তাকে চিনিই না। দেখিনি।

সেটা খুললেই প্রমাণিত হবে। আমরা সন্দেহ করছি, সন্দেহের বশে আমরা যে-কোনও জায়গা সার্চ করতে পারি। ফোন করো।

অবিনাশ এবার হাল ছেড়ে দিল। সে বুঝল, ধরা পড়ে গেছে। নিশ্চয়ই গুপ্ত দরজায় দাঁড়িয়ে তাকে কাগজ ঢোকাতে দেখেছেন। শালা, ওটা বন্ধ না করে কী ভুলই হয়েছে। পুলিশ ডাকলে কেলোর কীর্তি হবে যখন, তখন নিজে থেকেই ধরা দেওয়া ভালো। সে একটা কাগজ টেনে নিয়ে লিখল, 'উপায় নেই বেরিয়ে আসুন।' তারপর কাগজটাকে ভাঁজ করে দরজার তলা দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল।

গুপ্ত সেটা লক্ষ করে সরে এলেন। এসে একটা চেয়ারে বসে বললেন, বাইরের

দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে তুমি বেরিয়ে যাও।

বেরিয়ে যাব? আমার যে এখানে অনেক কাজ আছে।

আমি বলছি নেই তাই যাবে। যাও—

অবিনাশের মনে হল এই মুহূর্তে সমাজপতির মুখোমুখি হওয়ার চেয়ে বেরিয়ে যাওয়াই মঙ্গল। সে আর দাঁড়াল না, দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল। একটু বাদেই ভেতরের দরজার পাল্লা নড়ল। একটু-একটু করে সমাজপতির মাথাটা বাইরে বেরিয়ে এল। তারপরেই গুপ্তকে দেখতে পেয়ে সট করে সেটা ভেতরে চলে গেল। গুপ্ত ডাকলেন সমাজপতি—

বলুন স্যার। গলায় বেশ কাঁপুনি।

ওখানে কী করছ?

ধ্যান করছিলাম। সপ্তাহে একদিন আমি দরজা বন্ধ করে ধ্যান করি স্যার। আপনি আমার ধ্যানভঙ্গ করলেন কেন, কী প্রয়োজন? আস্তে-আস্তে বাইরে বেরিয়ে এলেন সমাজপতি।

পালিয়ে আছ কেন? আমায় বাঁশ দিতে?

গুপ্তর মুখে এ ধরনের সংলাপ কখনও শোনেন নি সমাজপতি। তিনি কোনওরকমে বললেন, আপনি কী বলছেন স্যার?

কালকের কাগজ শুনলাম ছাপা হয়ে গেছে, তাই নাকি?

কী উত্তর দেবেন বুঝতে না পেরে সমাজপতি ঘাড় নাড়লেন। যার দুটো অর্থ হতে পারে।

গুপ্ত জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি চাও তোমার কাগজটা উঠে যাক?

না। আমি চাই না।

কিন্তু ওই লেখা ছাপলে তাই হবে। লেখা পড়ামাত্র শিক্ষিত মানুষরা শহর ছেড়ে পালাবে। তখন কার কাছে কাগজ বিক্রি করবে? জঙ্গলের আদিবাসীরা নিশ্চয়ই তোমার কাগজ কিনবে না। মূর্খ।

সমাজপতির মনে হল গুপ্ত বাড়িয়ে বলছেন কিন্তু তিনি প্রতিবাদ করতে চাইলেন না।

গুপ্ত কোনও জবাব না পেয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি আমার কাছে কৃতজ্ঞ?

হ্যাঁ স্যার।

তা হলে নিজেকে বাঁচাও, শহরটাকে বাঁচাও। কালকের যত কাগজ ছেপেছ তা যেন বাজারে বের হয় না। তোমার ক্ষতি হোক আমি চাই না। তোমার যত খরচ হয়েছে আমি তা পুষিয়ে দেব। টাকাটা আমার বাড়ি থেকে বিকেলে গিয়ে নিয়ে এসো। রাত্রে একটা লরি আসবে, সেখানে সব কাগজ তুলে দিও, বুঝলে?

কী করবেন ওগুলো নিয়ে?

পুড়িয়ে ফেলব।

কিন্তু আগামীকাল কাগজ না বের হলে পাবলিক আমাকে মেরে ফেলবে। কত অ্যাডভান্স নিয়ে বসে আছি জানেন? সমাজপতি প্রায় আর্তনাদ করলেন।

কাগজ বের হবে না কেন? নিশ্চয়ই হবে।

কিন্তু কী ছাপব? লোকে তো খবরটার জন্যে উৎসুক হয়ে রয়েছে।

হেডলাইন দাও, পঞ্চাশ হাজার বছর আগে কনকপুরে তিমিদের আড্ডা ছিল। সম্প্রতি লেকের জলে—না-না লেক নয়, উত্তরের পাহাড়ে তাদের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। ব্যস। গুপ্ত উঠে দাঁড়ালেন।

সমাজপতি হাঁ হয়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখলেন গুপ্ত মাথা উঁচু করে বেরিয়ে গেলেন।

বিকেলের একটু আগে একটা ঝকঝকে দামি গাড়ি অপরেশের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। ধুতি-পাঞ্জাবি এবং শাল গায়ে এক সুদর্শন মানুষ গেট খুলে ভেতরে ঢুকতেই বারান্দার চেয়ারে বসা কাজল উঠে দাঁড়ালেন। তিনি বিশ্বাস করতেই পারছিলেন না জামাইবাবু এখন আসবেন।

দাশগুপ্ত হাসলেন—কী ব্যাপার, অমন করে তাকিয়ে আছ কেন? খুব অবাক হয়েছ মনে হচ্ছে?

হচ্ছি। আজকাল তো তোমার দেখাই পাওয়া যায় না।

তা অবশ্য। ব্যবসা নিয়ে এত ব্যস্ত থাকি। আসলে আমি যদি সমতলে কারখানা করতাম তা হলে অনেক খরচ কম হতো, নিশ্চিন্তে ব্যবসা করতে পারতাম। কিন্তু এই শহরটাকে এমন ভালোবেসে ফেলেছি যে এখান থেকে চলে যেতে ইচ্ছে করছে না। তাই আর সময় পাই না। তা তোমরা আছ কেমন? আমাদের ওদিকে তো আর যাও না।

কাজলের বাড়িয়ে দেওয়া চেয়ারে সন্তর্পণে বসলেন দাশগুপ্ত। বয়স হয়েছে, অপরেশের চেয়ে বড়, কিন্তু চেহারা দেখে বোঝা যায় না।

ভালো নয়।

কেন?

তুমি জানো না!

উঁহু।

তা হলে এসেছ কেন?

ও! তা হলে তোমরা প্রস্তুত হয়েই লড়ছ। দাশগুপ্তর গলা শক্ত হল।

লড়ছি?

লড়ছ না? আমার আত্মীয় হয়ে আমার বিরুদ্ধে পাবলিককে উস্কানি দিচ্ছে তোমার স্বামী। সেটাকে কী বলে?

কাজল বললেন, আমি এসব কিছু জানি না। উনি বলছেন, তোমার কারখানার চামড়া ধোওয়া জলের জন্যে শহরের জল দূষিত হয়েছে।

অসম্ভব। হতেই পারে না। আমার কারখানার সমস্ত ব্যাপারই বৈজ্ঞানিক মতে তৈরি। আমার চামড়ার জল শহরের জলের পাইপে মিশবে কী করে? কিছু মনে করো না, তোমার স্বামী দেবতাটির মাথায় একটি বিশেষ পোকা আছে, সেটি মাঝে-মাঝেই কামড়ায়। আমি ব্যবসা করি বলে ও বোধহয় কোনওদিনই আমাকে পছন্দ করল না। তোমার দিদি এসব শোনা অবধি কান্নাকাটি শুরু করেছে। দাশগুপ্ত হাসলেন।

কাজল বললেন, কী করব জামাইবাবু জানি না। উনি তো কারও কথা শুনতে চাইছেন না। এমনকী মেয়েটার যে চাকরি গেল তাতেও ভ্রূক্ষেপ নেই।

সে কি কথা! সুর্মার চাকরি নেই! কী হয়েছে?

জানি না। আজ স্কুল থেকে ফিরে এসে বলল বরখাস্ত হয়েছে।

দাশগুপ্ত একটু যেন চিন্তা করলেন—যাক-যাক, ওরকম বকবকানির চাকরি না করাই ভালো। ওকে একটু ডাকো তো। আমি কথা বলি।

কাজল সুর্মাকে ডেকে আনতেই দাশগুপ্ত বললেন, আয় মা, কেমন আছিস?

সুর্মা সামান্য ঘাড় নাড়ল—ভালো। আপনি?

আমি? তোর বাবা কি আর আমাকে ভালো থাকতে দিচ্ছে? যাক সে কথা, শুনলাম স্কুলের চাকরি নাকি আর নেই? দাশগুপ্ত ভ্রূ কোঁচকালেন।

ঠিক শুনেছেন।

চাকরির জন্যে চিন্তা করিস না। তুই এক কাজ কর, কাল থেকে আমার কারখানায় লেগে যা। কদিন থেকে ভাবছিলাম একটা পাবলিক রিলেশন অফিসার রাখব। আমি একা সব সামলাতে পারছিলাম না। তুই আয়, তোকে সব বুঝিয়ে দেব। স্নেহের হাসি হাসলেন দাশগুপ্ত।

কাজল বললেন, সত্যি জামাইবাবু! আঃ, ভগবান তুমি কী ভালো।

দাশগুপ্ত হাত ঘুরিয়ে বললেন, বাঃ, আমি চাকরির খবর দিচ্ছি আর ভালো হয়ে যাচ্ছে ভগবান! কী রে, তুই কী বলিস?

সুর্মা নিচু গলায় উত্তর দিল, অফিসে চাকরি নেওয়ার ইচ্ছে নেই আমার।

কেন? দাশগুপ্ত অবাক হলেন—অফিস কী অপরাধ করল? ও, নিরাপত্তার কথা বলছিস? আরে আমার ফ্যাক্টরিতে তোর কোনও অসুবিধে হবে ভাবছিস কেন? ও তো তোর নিজেরই অফিস!

তা নয়। আমি বাবার সঙ্গে আলোচনা না করে কিছু বলতে পারব না।

তাই নাকি? সে যদি রাজি না হয়?

সেটাই স্বাভাবিক। বাবা মনে করেন আপনার কারখানাটা শহরের জল বিষাক্ত করছে। সেই কারখানায় আমি কাজ করলে আপনাকেই সাহায্য করা হবে। যদি আপনি অন্য জায়গায় কারখানা সরিয়ে নিয়ে যান তখন অবশ্য এই বাধা থাকবে না। সুর্মা কথাগুলো বলল কাটা-কাটা, স্পষ্ট গলায়।

দাশগুপ্ত উঠে দাঁড়ালেন, বুঝলাম। বাপ-মেয়ে সব এক পালকের।

সুর্মা জবাব দিল, শুধু পালক বলছেন কেন মেসোমশাই, রক্তও তো এক, লাল রঙের।

কাজল তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, কী বলছিস, তুই! বয়স্ক লোকের সঙ্গে এভাবে কথা বলতে হয়! আপনি কিছু মনে করবেন না জামাইবাবু। চাকরি যাওয়ার পর ওর মাথা ঠিক নেই।

দাশগুপ্ত ব্যঙ্গের হাসি হাসলেন, না কাজল, ওর মাথা ঠিক আছে। কিন্তু এই তেজ আর বেশি দিন থাকবে না। আমি তোমাদের ভালো করতে চেয়েছিলাম কিন্তু তোমরা শুনলে না।

কাজলের বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও দাশগুপ্ত আর দাঁড়ালেন না। ওঁর গাড়ি চলে গেলে কাজল মেয়ের দিকে ফিরে তাকালেন। সুর্মা দাঁতে ঠোঁট চেপে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হিসহিসে গলায় কাজল জিজ্ঞাসা করলেন, এটা তুই কী করলি?

কেন মা?

যেচে এসে চাকরি দিতে চাইল, তুই পায়ে ঠেললি?

ওটা একটা টোপ, বাবাকে ফাঁদে ফেলবার।

কাজল ফুঁসে উঠলেন, না খেয়ে শুকিয়ে মরার চেয়ে টোপ খাওয়া ঢের ভালো, ওতেও খাবার থাকে। তোরা বাপ-মেয়েতে মিলে আমাকে জ্বালিয়ে শেষ করে ফেললি। ও ভগবান, তুমি এত কষ্ট দেবে আমাকে!

সে কি! একটু আগে বললে ভগবান তুমি কি ভালো—সুর্মা হাসল।

চুপ কর! তোমাদের এই সব পাগলামি আমি সহ্য করব না। আসুক সে আজ, আমি হেস্তনেস্ত করব। এই বুড়ো বয়সে আমি আর ভিখিরি হতে পারব না!

তুমি মিছিমিছি ভয় পাচ্ছ মা! অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করে সারাজীবন মেরুদণ্ড নুইয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে এটা অনেক ভালো।

কাজলের চোখ জ্বলছিল—শোনো, তোমাকে একটা কথা স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছি। ওই সুব্রতর সঙ্গে তোমার আর মেলামেশা চলবে না। তাকে এই বাড়িতে আসতে নিষেধ করে দিও।

সুর্মা চমকে উঠল—সে কি! কেন? সে আবার কী দোষ করল?

তুমি জানো না? ওর বংশটাই পাগল। আমি চাই না তোমার ভবিষ্যত ঝরঝরে হয়ে যাক।

তা তো ঠিক। কিন্তু সুব্রত তো পাগল নয়।

পাগলের ছেলে পাগল হয়।

তা হলে তো কবির ছেলে কবি, ডাক্তারের মেয়ে ডাক্তার হতাম।

বাজে কথা ছাড়, যা বললাম তাই করবে।

না মা, সুব্রত যদি কখনও পাগল হয়েই যায় তখন ওকে সারানোর জন্যে ওর পাশেই আমার থাকা দরকার।

তা হলে তোরা কেউ আমার কথা শুনবি না! চিৎকার করে উঠলেন কাজল। সেই সময় সুর্মার চোখ বাইরের দিকে গিয়েছিল। সে নিচু গলায় বলল, চুপ করো মা, বাবা আসছে।

কাজল মুখ ঘুরিয়ে দেখলেন গেট খুলে অপরেশ ঢুকছেন। এখন তাঁর মোটেই হাসপাতাল থেকে ফেরার কথা নয়। খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাঁকে, অন্যমনস্ক। প্রায় বারান্দার কাছাকাছি এসে অপরেশ ওদের দেখতে পেলেন যেন।

সুর্মা ততক্ষণে এগিয়ে গিয়ে ওঁর হাত ধরেছে, কী হয়েছে বাবা?

অপরেশ ম্লান হাসলেন—যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে মা। আমাকে একটু বসতে দে।

সুর্মা চেয়ার টেনে আনল কাছে। অপরেশ সেটায় শরীর এলিয়ে দিয়ে সামনে তাকালেন। বিকেলের পরিষ্কার রোদ পড়েছে কাঞ্চনজঙ্ঘার ওপর। কী নির্মল দেখাচ্ছে

তাকে। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি—ভালোই হল। এখন আর কোনও বাধা রইল না।

কাজল ওঁকে এতক্ষণ দেখছিলেন। এবার কাছে এসে শুধোলেন, কী হয়েছে তোমার? ওঁর গলার স্বর এখন খুব নরম।

অপরেশ বললেন, আজ থেকে আমি বেকার হলাম। আমার কাজকর্মে অসন্তুষ্ট হয়ে কর্মকর্তা আমাকে বরখাস্ত করেছে।

সঙ্গে-সঙ্গে কাজলের মুখ থেকে আর্তনাদ বেরিয়ে এল। তিনি আর দাঁড়ালেন না, এক ছুটে ভেতরে চলে গেলেন। অপরেশ নীরবে তাঁর যাওয়া দেখলেন। তারপর দু হাতে মাথা চেপে বসে রইলেন।

একটু সময় নিয়ে সুর্মা বাবার মাথায় আলতো করে হাত রাখল—বাবা! অপরেশ মুখ তুললেন—আমি বোধহয় তোর মায়ের ওপর অবিচার করলাম। আমার হাতে পড়ে বেচারি কোনওদিন সুখী হতে পারল না।

সুর্মা গাঢ় গলায় বলল, মা এখন বুঝছেন না, পরে নিশ্চয় ওঁর ভুল ভাঙবে। তুমি তো কোনও অন্যায় করোনি বাবা।

অপরেশ এবার সোজা হয়ে বসলেন—না, আমি কোনও অন্যায় করিনি। কালকের কাগজটা বের হোক তারপর দেখবি সমস্ত শহর আমার পাশে এসে দাঁড়াবে। এদের হাত থেকে সাধারণ মানুষকে বাঁচাতেই হবে।

সুর্মা জিজ্ঞাসা করল, ওরা কি আমাদের বাড়ি ছেড়ে দিতে বলেছে?

হ্যাঁ, তবে একমাস সময় দিয়েছে। এর মধ্যে কোথাও একটা বাড়ি খুঁজে নিতে হবে। সে একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে, কী বলিস?

হ্যাঁ। আমি আজই সুব্রতকে বলব।

সুব্রতকে? ওকে আমাদের সঙ্গে জড়ালে ওর কোনও ক্ষতি হবে না তো?

আমরা জড়াব কেন? ওর যদি ইচ্ছে হয় তবে—

অপরেশ ধীরে-ধীরে উঠলেন। তারপর নিঃশব্দে ভেতরের ঘরে এলেন। সুর্মা বাবাকে একা যেতে দিল। ও জানে অপরেশ কাজলের সঙ্গে কথা না বলা পর্যন্ত স্বস্তি পাবেন না।

কাজল শুয়েছিলেন বিছানায় উপুড় হয়ে, ওঁর পিঠ কাঁপছিল। অপরেশ বিছানায় বসে ওঁর পিঠে হাত রাখতেই কাঁপুনিটা থেমে গেল। ভাঙা গলায় অপরেশ বললেন, তুমি যদি এমন করে ভেঙে পড়ো তা হলে আমি কী করে সোজা হয়ে দাঁড়াই? আমাকে তুমি অন্ধ হয়ে থাকতে বলো?

হঠাৎ কাজল ঘুরে প্রায় কাঁপিয়ে পড়লেন স্বামীর কোলে। মুখ গুঁজে হু-হু করে কেঁদে যেতে লাগলেন। ওঁর দুটো হাত স্বামীকে আঁকড়ে ধরে ছিল।

খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেল অপরেশের। তখনও অন্ধকার কাটেনি। কিছুক্ষণ ছটফট করে উঠে পড়লেন তিনি। আজ সকালের কাগজটার জন্যে বাড়িতে বসে অপেক্ষা করতে ইচ্ছে করছিল না। কাউকে কিছু না বলে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলেন তিনি। যে ছেলেটি কাগজ দেয় সে সাতটার আগে যেন আসতেই চায় না।

বেশ কনকনে ঠান্ডা এখন বাইরে, ট্যুরিস্টরাও বের হয়নি। হাঁটতে-হাঁটতে

অপরেশের এই সকলের চেহারায় কনকপুরকে নতুন করে ভালো লাগল। এত সুন্দর জায়গাটাকে কিছুতেই নষ্ট করতে দেবেন না তিনি। আজকের খবরের কাগজ বের হলেই কীরকম প্রতিক্রিয়া হবে ভাবতে পারছেন না তিনি। সাধারণ মানুষ কি ক্রুদ্ধ হয়ে ভয়ঙ্কর কিছু করে বসবে? না, সেটা করা উচিত হবে না। তিনি সবাইকে বুঝিয়ে বলবেন, যাতে কেউ মাথা গরম না করে। কর্তৃপক্ষ বাধ্য হবেন মেনে নিতে।

কাগজের অফিসের সামনে এসে দেখলেন সেখানে বেশ ভিড়। প্রচুর হকার এসেছে কাগজ নিতে। কিছু-কিছু সাধারণ মানুষও এসেছে কৌতূহলী হয়ে। সমাজপতি আজ কয়েকজন লোক রেখেছে বাড়তি কাজের জন্যে। অপরেশ দূরে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখছিলেন। একটু বাদেই কাগজ এল। হকাররা হুড়োহুড়ি করছে কাগজের জন্যে। যে লোকটা বিতরণ করছে সে চিৎকার করছে, জবর খবর! জবর খবর!

অপরেশ আর অপেক্ষা করতে পারলেন না। দৌড়ে কাছে গিয়ে পকেট থেকে পয়সা বের করে একটা কাগজ কিনে নিলেন। ভাঁজটা খুলে চোখের ওপর হেডলাইন ধরতেই ওঁর মাথাটা ঘুরে গেল। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলেন না তিনি। এ কী লেখা রয়েছে?

সমস্ত শরীর টলছিল তাঁর। আঙুলগুলো শিথিল হয়ে যাওয়ায় কাগজটা মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। আবার ঝুঁকে পড়ে তুলে নিলেন কাগজটা। 'পঞ্চাশ হাজার বছর আগে কনকপুরে তিমিরা ঘুরে বেড়াত।' ভেতরের বিস্তারিত বিবরণ আর পড়তে প্রবৃত্তি হল না। নিশ্চয়ই কিছু ভুল হয়ে গিয়েছে। সমাজপতি, অবিনাশরা আগামীকালের জন্যে কি খবরটা চেপে রেখেছে? অপরেশ প্রায় দৌড়ে, মানুষের গায়ে ধাক্কা দিয়ে কাগজের অফিসে ঢুকলেন। ঘরে তখনও আলো জ্বলছে। টেবিলের ওপর দুটো পা তুলে সমাজপতি চুরুট খাচ্ছিল। ওঁকে দেখে যেন চুপসে গেল। তাড়াতাড়ি পা নামিয়ে হাসবার চেষ্টা করল—কী ব্যাপার?

সেটাই তো জিজ্ঞাসা করছি! অপরেশের গলা বুজে আসছিল।

ও, আপনি তিমিদের কথা বলছেন? হ্যাঁ তিমি ছিল, অক্টোপাস ছিল। মানে এখানে তো ওই সময় সমুদ্রের ঢেউ খেলত। আর সমুদ্র থাকলেই—

চুপ করো। আমার লেখাটার কী হল? চিৎকার করলেন অপরেশ।

কী লেখা? সমাজপতির মুখে না বোঝার ভান।

তুমি জানো না! যে লেখা পেয়ে তোমরা কাল অ্যানাউন্সমেন্ট দিলে সে লেখা তুমি পড়োনি? আজ সেইটাই ছাপা হওয়ার কথা ছিল না?

ছিল। ছেপেছিলাম। সব বিক্রি হয়ে গেছে।

কী বলছ! ছাপা হলে এটা কী?

এটা নেক্সট এডিশন। দেখুন ডাক্তারবাবু, আমি আপনার সঙ্গে তর্ক করতে পারব না। আমাকে বেঁচে থাকতে হবে, কাগজটাকে চালাতে হবে। আপনার কল্পনার ওপর তৈরি খবর ছেপে বিপদে পড়তে চাই না। এতক্ষণে সাফ জানিয়ে দিলেন সমাজপতি।

কল্পনা! এ কী বলছ! কলকাতা থেকে পরীক্ষা করিয়ে রিপোর্ট এনেছিলাম। অবিনাশ, অবিনাশ কোথায়?

সে ঘুমুচ্ছে। রিপোর্টটা লেখার আগে দেননি কেন?

ওটা যে আমার কাছে নেই।

ডাক্তারবাবু, এসব চিন্তা ছেড়ে দিন।

ছেড়ে দেব! কক্ষনও না। আমি জনে-জনে বলে বেড়াব, মিটিং করব, কনকপুরের মানুষের কাছে নিজে যাব, তাদের বলব, ওই জলে বিষ আছে তোমরা খেও না। জল ফুটিয়ে বিষমুক্ত না করলে মহামারী হবেই। দেখি আমায় কে ঠেকায়! সমাজপতি, তুমিও শেষ পর্যন্ত বিক্রি হয়ে গেলে! ছি-ছি-ছি! পাগলের মতো মাথা নাড়ছিলেন অপরেশ।

সমাজপতির গলা আচমকা পালটে গেল, সত্যি বলছেন, জল না ফুটিয়ে আর খাব না?

অপরেশের কানে প্রশ্নটা যেতে তিনি স্থির হয়ে গেলেন। তার পরে এক ছুটে বেরিয়ে এলেন বাইরে। এদিকে সেখানে তখন চেঁচামেচি চলছে। হকাররা এর মধ্যে ভাঁওতাটা বুঝে গিয়েছে। তারা আগের অর্ডার অনুযায়ী কাগজ নিতে চাইছে না।

অপরেশ ভারী পায়ে পুরোটা পথ হেঁটে বাড়ি এলেন। ওঁর শরীর টলছিল। বারান্দায় সুর্মা দাঁড়িয়ে ছিল। ওঁকে দেখে চিৎকার করে দৌড়ে এল—তোমার কী হয়েছে বাবা!

অপরেশ হাসলেন—প্রথম রাউন্ডে হেরে গেলাম মা।

হেরে গেছ? মানে?

সমাজপতি খবরটা ছাপেনি। ভয় পেয়েছে সে। কনকপুরের মানুষকে জানানোর সহজ পথটা তোর জেঠু বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু তাতে আমি দমছি না। এর পরের রাউন্ড তো আমার হাতের মধ্যে। সেখানে আমায় কে হারায় দেখি! তুই এক কাজ করবি মা?

বলো?

দোকান খুললেই শ'খানেক পোস্টার সাইজের কাগজ কিনে আন। সেই সঙ্গে রঙ তুলি কিংবা ওই যে সব রঙিন কলম বেরিয়েছে তার কয়েকটা। আমাতে-তোতে মিলিয়ে আজ পোস্টারগুলি লিখে ফেলি। রবিবার বিকেলে চৌমাথায় আমি একটি ভয়ঙ্কর সংবাদ জানাব। সেই জন্যে সবাই যেন সেখানে আসে। তারপর পোস্টারগুলো সমস্ত শহরে ছড়িয়ে দেব। আর-একটা কাজ করতে হবে। সুধীরের দোকানে বলে দিতে হবে রবিবার বিকেলে আমার একটা ভালো মাইক চাই। পারবি তো?

নিশ্চয়ই পারব বাবা।

গুড, আমরা কনকপুরের পাড়ায়-পাড়ায় সভা করে মানুষকে বলব ঘটনাটা। খবরের কাগজ যারা পড়তে পারে না তারাও শুনবে।

ঘরময় পোস্টারের কাগজ, বাপ-মেয়েতে মিলে জনসভায় যোগদানের কথা লেখা হচ্ছিল। লেখাগুলো অগোছালো হলেও আন্তরিকতা ছিল। কাজল এসে দরজায় দাঁড়ালেন। এই সব কাণ্ড দেখে তাঁর অবাক-বোধও কাজ করছিল না। এই সময় সুব্রত এল। এসে বলল, কাকাবাবু, আমার এখানকার পাট চুকল। কাজল ওকে দেখে ভ্রূ কুঁচকে ছিলেন, কথাটা শুনে আগ্রহী হলেন।

সুর্মা বলল, তার মানে?

এতদিন কনকপুর ছেড়ে বাইরে চাকরি নিয়ে যাওয়ার কথা হলেও যেতে পারতাম

না। জায়গাটার ওপর মায়া পড়ে গিয়েছিল বড্ড, চাকরিটা পিছু টানত। আজ থেকে মুক্ত হলাম। কনকপুর ডেভেলপমেন্ট আমাকে আর চায় না। সুব্রত হাসল।

কাজল বলে উঠলেন, তোমারও চাকরি গেল?

হ্যাঁ। কর্তৃপক্ষ আমার কাছে সন্তুষ্ট নয়।

অপরেশ বললেন, পোস্টার লিখছি। এই শহরের মানুষকে বাঁচাতে হবে। ওরা আমার লেখাটা কাগজে ছাপাতে দেয়নি। কিন্তু পোস্টার লেখা তো বন্ধ করতে পারবে না।

সুব্রত ঝুঁকে পোস্টারগুলো দেখল, আর-একটু ডাইরেক্ট করলে হতো না?

কীরকম? অপরেশ বুঝতে পারলেন না।

উদ্দেশ্যটা আরও স্পষ্ট লিখলে লোকের ইন্টারেস্ট বাড়ত।

সুর্মা মুখ ঘুরিয়ে বলল, উপদেশ না দিয়ে নিজে কলম ধরলেই তো হয়। অপরেশ হেসে উঠলেন, হ্যাঁ-হ্যাঁ, এখন তো তুমি আমাদের চাকরি-হারাদের দলে ভিড়ে গেছ। অতএব এসো, বসে পড়ো, একসঙ্গে প্রতিবাদ লিখতে শুরু করি।

সুব্রত সুর্মাকে বলল, তুমি সরো, বরং এক কাপ চা করে নিয়ে এসো।

দরজায় এতক্ষণ দাঁড়িয়ে এদের কথা শুনছিলেন কাজল। এবার বললেন, না তুই থাক, আমিই করে নিচ্ছি।

সবাই হঠাৎ চুপ হয়ে গেল। তারপরেই অপরেশের উচ্চস্বর শোনা গেল, বাঃ গুড, আমাদের দলে আর-একজন সৈনিক বাড়ল, নে হাত চালা সব। যুদ্ধে আমাদের কে হারায় তা দেখব!

এইদিন বিকেলে কনকপুরে দুটো ঘটনা ঘটল। একদল উত্তেজিত যুবক সমাজপতির কাগজের অফিস আক্রমণ করে আগুন ধরিয়ে দিল। তেমন কিছু ক্ষতি হওয়ার আগেই অবশ্য দমকলবাহিনী আগুন নিভিয়েছে। সমাজপতির মাথায় পাথর পড়েছিল, ফলে দুটো সেলাই করতে হয়েছে। ছেলেরা খুব উত্তেজিত ছিল এই কারণে তারা এই ধরনের তথ্য আশাই করেনি যা ওই দিন ঢাক পিটিয়ে কাগজে ছাপা হয়েছে। গুপ্ত নিজে ঘটনাস্থলে গিয়ে তাদের বুঝিয়েছেন যে, এইভাবে সংবাদপত্র যাতে জনসাধারণকে অকারণে উত্তেজিত না করে সেদিকে তিনি বিশেষ নজর দেবেন। এ ব্যাপারে তিনি কনকপুরের জনগণের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি বলেন, আজ যে ঘটনা ঘটল তা থেকে সংবাদপত্রের মালিক ভবিষ্যতে শিক্ষা গ্রহণ করবে। যুবকরা সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে যায়। পুলিশের বড়কর্তা অবশ্য তাদের গ্রেপ্তার করতে চেয়েছিলেন কিন্তু গুপ্ত তাঁকে নিষেধ করেন।

কিছু পরে মাথায় ব্যান্ডেজ বেঁধে সমাজপতি যখন কাগজের অফিসে ফিরে এলেন তখন গুপ্তই তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন, কনকপুরের জন্যে তোমার এই আত্মত্যাগ মনে থাকবে।

আত্মত্যাগ? সমাজপতি মিনমিন করছিল, ওরা আমার কী সর্বনাশ করল। হায় কত কী যে পুড়ে গেল! এ সব আপনার কথা শোনার ফল। আজ অর্ধেক কাগজ বিক্রি হয়নি, সব ওরা পুড়িয়ে দিয়েছে। হায়-হায়, কী দুর্মতি হল আমার! এ আপনি কী করলেন স্যার!

গুপ্ত হাসলেন—ঠিকই করেছি। কনকপুরের ইতিহাসে তোমার নাম লেখা থাকবে। শোনো নার্ভাস হয়ো না, দাশগুপ্ত বলেছে তোমার যা ক্ষতি হয়েছে সব সে পূরণ করে দেবে। তুমি ক্ষতির হিসেব-নিকেশ করে কালই টাকাটা নিয়ে এসো।

কথাটা শোনামাত্রই সমাজপতির মুখ উজ্জ্বল হল—ওঃ, সত্যিই আপনি মহৎ মানুষ। কিন্তু ওই গুণ্ডাগুলোকে কখনই ছাড়বেন না, ওদের অন্তত দশ বছর করে ঘানি ঘোরাবেন।

না হে, ওদের ধরিনি।

ধরেননি!

না। কেননা এটা করতে আমিই ওদের পাঠিয়েছিলাম।

সে কি! সমাজপতি বোবা হয়ে গেল যেন।

হুম। এটা না করলে কনকপুরের যুবসমাজের প্রাণশক্তি কতটা উদ্দাম তা বোঝানো যেত না। এ সব তুমি বুঝবে না সমাজপতি। কথাটা বলে গুপ্ত চলে যাওয়ার জন্যে পা বাড়ালেন, তোমার ওই অবিনাশ ছোঁড়াটাকে যত তাড়াতাড়ি পারো বিদায় করো।

দ্বিতীয় ঘটনাটা ঘটল আর-একটু বাদে। সন্ধের অন্ধকার সামান্য গাঢ় হলে দুজন মানুষ দেওয়ালে-দেওয়ালে পোস্টার মারছে দেখা গেল। একজন আঠা লাগাচ্ছে, অন্যজন সেটাকে দেওয়ালে সাঁটছে। এখন ঠান্ডার কারণে সন্ধের পরই কনকপুর নির্জন হয়ে যায়। ফলে এদের কাজকর্ম তেমন নজর করে দেখার মতো কেউ ছিল না।

পরদিন সকালে সমস্ত কনকপুর যেন নড়েচড়ে বসল। বিকেলে চৌমাথায় জনসভা ডাকা হয়েছে। ডাক্তার অপরেশ গুপ্ত কনকপুরের মানুষকে আসন্ন বিপদ সম্পর্কে অবহিত করবেন। সেই সঙ্গে স্লোগান, জল ফুটিয়ে পান করুন। কারণ ওতে বিষ আছে।

আটটা নাগাদ গুপ্তর গাড়ি এসে থামল অপরেশের বাড়ির সামনে। একটু আগে সুর্মা শহরের একটা দিক ঘুরে এসেছে। লোক যেতে-যেতে পোস্টারগুলো পড়ছে। অপরেশ বারান্দায় বসে সেই বৃত্তান্ত শুনছিলেন। তাঁর ইচ্ছে হচ্ছিল নিজের চোখে দেখেন মানুষের আগ্রহ কতটা। শোনার পর বললেন, হুঁ, ওরা কাগজে ছাপেনি তো কী হয়েছে, আমাদের আটকাতে পারল! ঠিক সেই সময় গাড়ির শব্দ হল।

গেট খুলে গুপ্ত দেখলেন ওরা খুব অবাক চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে।

এবার কাজল এসে দরজায় দাঁড়ালেন।

বারান্দায় উঠে কেউ কিছু বলার আগে গুপ্ত চেয়ার টেনে বসে বললেন, তুমি বক্তৃতা দিতে চাও সে কথা আমাকে বললে না কেন?

অপরেশের বিস্ময় আরও বেড়ে গেল। তিনি বলতে পারলেন, মানে?

আজ বিকালে বৃষ্টি হতে পারে। তা ছাড়া, চৌমাথায় ইলেকশানের সময় ছাড়া বক্তৃতা করা নিষেধ। তুমি পুলিশের অনুমতি পর্যন্ত নাওনি। গুপ্ত অনুযোগ করলেন।

আমি জানতাম না। তা ছাড়া, সবাই ওই জায়গাতেই সভা করে থাকে।

করে। কিন্তু তুমি আমার ভাই হয়ে বৃষ্টিতে ভিজে—না, না, সেটা খুব খারাপ দেখায়। বরং এক কাজ করো, আমাদের মিউনিসিপ্যালিটির বিরাট হলঘর খালি আছে

সেখানেই আজ তোমার বক্তৃতা দাও। গুপ্ত অন্যান্যদের দিকে তাকালেন।

সুর্মা বলল, শীতকালে আশ্বিন বৃষ্টি হয়নি, আজ হঠাৎ হবে যে!

গুপ্ত কাঁধ নাচালেন—তা আমি কী করে জানব। আবহাওয়া অফিস থেকে তো এই রকমই জানিয়েছে।

অপরেশ বললেন, সবাই জেনেছে আমি চৌমাথায় বলব, হঠাৎ যদি সভার জায়গা পালটে ফেলি তাহলে লোকে জানবে কী করে?

গুপ্ত বললেন, এটা কোনও কথা হল। লোকে যাতে জানতে পারে তাই করব। মাইকে করে সারা শহরে ঘোষণা করে দিচ্ছি তোমার সভার জায়গা পালটাচ্ছি। সবাই জেনে যাবে।

হঠাৎ কাজল বললেন, আপনি যে বড় ওর সভা নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছেন। আমার সব সর্বনাশের মূলে তো আপনি!

গুপ্ত যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে বললেন, ও, শেষপর্যন্ত তুমিও! চমৎকার। তোমাকে আমি সাবধান করে গিয়েছিলাম, আমার যে সর্বনাশ করবে আমি তাকে ছেড়ে দেব না।

তা হলে এসেছেন কেন? সুর্মা ফুঁসে উঠল।

এসেছি, কারণ তোমার বাবা আমার ভাই। আমি চাই না পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করুক। ওর বিরুদ্ধে এর মধ্যেই একটা ডায়েরি হয়েছে। আজ বিকেলে কতকগুলো গুণ্ডাকে দিয়ে ও সমাজপতির অফিসে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে ওর লেখা ছাপা হয়নি বলে। সারা শহর সেই খবরটা জেনে গেছে। পুলিশ কাল রাত্রেই ওকে অ্যারেস্ট করতে চেয়েছিল, আমিই তাদের থামিয়ে রেখেছি। কথাটা বলে গুপ্ত হতভম্ব মুখগুলোর দিকে তাকালেন।

কী! অপরেশ সোজা হয়ে বসলেন, আমি আগুন লাগিয়েছি! দাদা, এ রকম মিথ্যে কথা তুমি বলতে পারলে!

আমি বলছি না, সমাজপতিই পুলিশের কাছে এ-কথা বলেছে।

মিথ্যে কথা! ষড়যন্ত্র! ওঃ ভগবান! অপরেশ চিৎকার করে উঠলেন। গুপ্ত মাথা নাড়লেন—আমিও তাই মনে করি। কিন্তু মুশকিল হল, পুলিশের কাছে কোনও অভিযোগ এলে তার তদন্ত না করে কোনও উপায় থাকে না। যাক, আমি চাই না তোমাকে নিয়ে এই শহরে কোনও কেচ্ছা হয়। ওই চৌমাথায় বক্তৃতা করাটা ঠিক হবে না। মিউনিসিপ্যালিটি হলঘরে সভা হলে তুমি তোমার বক্তব্য বোঝাতে পারবে, আমরাও আলোচনায় অংশ নিতে পারব। যদি প্রমাণ করতে পারো তুমি সঠিক তা হলে সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

অপরেশ এক মুহূর্ত ভাবলেন। তাঁর মনে হল প্রস্তাবটা ভালো। হলঘরে বক্তৃতা করতে পারলে তিনি অনেক গুছিয়ে কথা বলতে পারবেন এবং ব্যাপারটাও বেশ গুরুত্ব পাবে। তিনি বললেন, বেশ কিন্তু জনসাধারণ যেন জানতে পারে যে সভার জায়গা বদল হয়েছে।

গুপ্ত উঠে দাঁড়ালেন। তারপর কাজলের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার জন্যে খুব দুঃখ হচ্ছে বউমা। তবে হ্যাঁ, কলহ যখন, তখন আর মাথা ঘামাব না।

দুপুরবেলায় কনকপুরের মানুষ সভার নতুন জায়গাটার কথা জেনে গেল। সমাজপতির কাগজের একটা বিশেষ সংখ্যা বেরিয়েছে। তাতে ওই সভার খবর আছে এবং জনগণকে সাবধান করা হয়েছে যে অপপ্রচারে যেন না ভোলেন কেউ। এই শহরের জল পবিত্র, স্বাস্থ্যকর। এ নিয়ে কোনও মতভেদ থাকতে পারে না।

বিকেলে মিউনিসিপ্যালিটির হল লোকে লোকে ভরে গেল। অপরেশ সপরিবারে এসেছিলেন একটু আগেই। গুপ্ত, দাশগুপ্ত এসে গেছেন। এই সময় একটি মাতাল সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে লাগল, আমাকে যেতে দাও, আমি একজন সৎ করদাতা। বক্তৃতা শোনার অধিকার আমার আছে। লোকেরা তাকে নিয়ে হাসাহাসি করছিল কিন্তু কেউ পথ দিচ্ছিল না। শেষপর্যন্ত মরিয়া হয়ে লোকটা বলল, না যেতে দিলে আমি বমি করে ফেলব বলে দিচ্ছি। তখন কাজ হল। সরু প্যাসেজ তৈরি হয়ে গেল আচমকা। লোকটি সেটা দিয়ে টলতে-টলতে সামনে এসে ধপ করে বসে পড়ল।

প্রচণ্ড হট্টগোল চলছি। হঠাৎ সুব্রত মঞ্চে এসে দাঁড়িয়ে মাইকে ঘোষণা করল, আপনারা শান্ত হোন। সভার কাজ এখনই শুরু হচ্ছে।

লোকেরা তাতেও শান্ত হচ্ছিল না। কারণ তারা তখন দুপুরের কাগজটার বিষয়ে আলোচনা করছিল। এই সময় সমাজপতি সারা মাথায়, হাতে ব্যান্ডেজ বেঁধে সেঁটিয়ে উঠে এলেন। তাঁর ওই চেহারা দেখে আলো নেভার মতো সব শব্দ থেমে গেল। সমাজপতির পা টলছিল, এত লোকের সামনে কথা বলার অভ্যেস তাঁর নেই। কিন্তু সবাই ভাবল অসুস্থতার জন্যেই ও রকম টলছেন। সুব্রত ওঁকে মাইক ছেড়ে দেবে কি না ভাবছিল কিন্তু জনতা চিৎকার করে ওঁর কথা শুনতে চাইল। বাধ্য হয়ে সুব্রত সরে দাঁড়ালে সমাজপতি মাইক ধরলেন। এতে তাঁর টলানিটা কমল। প্রায় কাঁদো-কাঁদো গলায় সমাজপতি বললেন, আমার অবস্থা তো দেখছেন। মরতে-মরতে বেঁচে আছি। আপনাদের সেবা করি বলে ওরা আমাকে মেরে ফেলেছিল!

কারা-কারা? সমস্বরে চিৎকার উঠল।

মাথা নাড়লেন সমাজপতি—বলা নিষেধ, আদালত অবমাননা হবে। যা হোক, আমার আবেদন, অপপ্রচারে ভুলবেন না। এটা যখন সভা, আমাদের প্রাক্তন ডাক্তারবাবু যখন সভায় কিছু বলতে চেয়েছেন তখন এই সভার একজন সভাপতি থাকা উচিত। আমি প্রস্তাব করছি শ্রদ্ধেয় প্রবীণ নেতা গুপ্তসাহেব এই সভার সভাপতির পদ গ্রহণ করুন।

সমর্থন করছি, সমর্থন করছি। সমস্ত হল একসঙ্গে জানাল।

এরপর নতমস্তকে মঞ্চে উঠে এলেন গুপ্তসাহেব। খুব বিনীতভাবে নমস্কার করে তিনি অপরেশকে মঞ্চে আহ্বান করলেন। অপরেশ সপরিবারে এতক্ষণ একপাশে অপেক্ষা করছিলেন। এবার ধীরে-ধীরে মঞ্চে উঠে চেয়ারে বসলেন। সঙ্গে-সঙ্গে শ্রোতারা চুপ করে গেল। তারা অপরেশকে দেখছিল।

গুপ্ত মাইকের সামনে এসে বললেন, বন্ধুগণ! এখানে এই সভায় বক্তৃতা করার কোনও বাসনা আমার ছিল না। কিন্তু যে সমস্যা নিয়ে আজকের এই সভা তাকে এড়িয়ে যাওয়া আমি কর্তব্যের খাপিলতি বলেই মনে করি। কনকপুর ডেভেলপমেন্টের প্রধান হিসেবে আমি তাই এসেছি। আমার ভাই এবং প্রাক্তন ডাক্তার মনে করেন এই শহরের জল দূষিত। অথচ আমরা বেশ ভালোভাবেই রয়েছি। এই জল নিয়ে অভিযোগ পাওয়ার

পর আমি পরীক্ষা করিয়ে কোনও বিরূপ ফল পাইনি। আমি মনে করি এটা অপপ্রচার এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আপনারা তো জানেন, ভারতবর্ষের ইতিহাসে ভাই হয়ে ভাইয়ের ক্ষতি করার ঘটনা খুবই স্বাভাবিক।

শেম, শেম! চিৎকার করে উঠল জনতা।

আমি এই শহরকে রক্ত দিয়ে তৈরি করেছি। পাহাড় কেটে আমার চোখের সামনেই শহরটা গড়ে উঠল। আমি চাইব না এই শহরের সামান্য ক্ষতি হোক। জল যদি দূষিত হতো তাহলে আমিই তার ব্যবস্থা নিতাম। অতএব বন্ধুগণ, আমি প্রস্তাব করছি, এই সভা মনে করে কনকপুরের জল স্বাস্থ্যকর এবং তা নিয়ে যে-কোনও অপপ্রচার ঘৃণার যোগ্য।

সমাজপতি বলে উঠলেন, আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করছি।

সঙ্গে-সঙ্গে মনে হল লক্ষ পায়রা যেন হলঘরে উড়ছে। হাততালি থেমে গেলে গুপ্ত আবার বললেন, কিন্তু আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। আমরা মনে করি বেঁচে থাকার অধিকার যেমন সকলের সমান তেমনি কথা বলারও সমান অধিকার আছে সকলের। তাই এবার ডাক্তারের মুখে আপনারা তাঁর কথা শুনুন। অনুরোধ করছি আপনারা অধৈর্য হবেন না।

গুপ্ত অপরেশকে ইঙ্গিত করে পিছনের চেয়ারে গিয়ে বসলেন।

অপরেশ যেই উঠতে যাবেন, অমনি চিৎকার শুরু হল।

মাইকের সামনে এসে দাঁড়িয়ে কয়েক মুহূর্তে নার্ভাস ভাবটা কাটিয়ে উঠলেন তিনি। তারপর গলা তুলে বললেন, বন্ধুগণ! আপনারা আমার কথা শুনুন। আমি যে কথা বলতে এসেছি তা আমার কোনও স্বার্থ মেটাতে নয়। আপনাদের জন্যে, আপনাদের বিপদের কথা ভেবে এই সভা ডাকা হয়েছে।

কী এমন পরোপকারী রে! কে একজন চিৎকার করে উঠলেও শ্রোতারা শব্দ কমাল। অপরেশ বললেন, আপনারা জানেন আমি এই শহরের ডাক্তার ছিলাম। আপনারা আমার কাছে আসতেন চিকিৎসার জন্যে। কিছুদিন থেকে লক্ষ করছিলাম অনেকেই পেটের গোলমালে ভুগছেন। সন্দেহ হওয়ায় জল পরীক্ষা করালাম। এই জলই হল সমস্ত গোলমালের মূলে। আমাদের শহরের খাবার জল আসে লেক থেকে। পরিশ্রুত সেই জল পাইপে করে বাড়িতে-বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয়। কিন্তু ঠিক লেকের কাছেই একটি চামড়ার কারখানা আছে। তার নোংরা জল কোনওক্রমে পাইপের জলের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। এখন সেই পরিমাণ কম, কিন্তু আরও বেশি মিশলে শহরের সব জল বিষাক্ত হয়ে যাবে। অপরেশ দম নেওয়ার জন্যে থামতেই একটা বড় গুঞ্জন উঠল। কেউ একজন চিৎকার করে উঠল, মিথ্যে কথা! আমাদের কনকপুরের জলের এত সুনাম আর ডাক্তার তার উলটো কথা বলছে।

আর একজন চেঁচিয়ে উঠল, বিপ্লবী এসেছে রে!

অপরেশ আবার বলা শুরু করলেন, না, আমি বিপ্লবী নই। আমি যা বলছি তা বৈজ্ঞানিক মতে সত্যি। আমি কলকাতা থেকে জল পরীক্ষা করিয়ে এনেছি। জীবাণু দেখতে পেয়ে আমি কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি, কিন্তু তাঁরা গুরুত্ব দেননি। এইভাবে কিছুদিন চললে এখানে মহামারী দেখা দিতে বাধ্য। তাই বন্ধুগণ, আজকের এই সভায় আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করতে যাতে আমরা ভালো জল পাই। এর দুটো উপায়

আছে। এক : শহরের সমস্ত জলের পাইপ পালটে ফেলা। মনে হয় ওগুলোকে মরচে পড়ে গেছে। দুই : ওই চামড়ার কারখানাকে তুলে দেওয়া। আপনারা আমার পাশে এসে দাঁড়ান, আসন্ন সর্বনাশ থেকে শহরকে রক্ষা করতে কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করুন। সমস্ত হলঘর এবার নিশ্চুপ হয়ে গেল। অপরেশের মনে হল জনতা তাঁর বক্তব্য উপলব্ধি করতে পেরেছে।

এই সময় গুপ্ত চেয়ার ছেড়ে উঠে এলেন। ইঙ্গিতে অপরেশকে সরিয়ে মাইক হাতে নিলেন, বন্ধুগণ, আমার ডাক্তার ভাই যে এত চমৎকার বক্তৃতা করতে পারেন জানা ছিল না। আমার প্রথম প্রশ্ন, এই জল বিষাক্ত তার প্রমাণ কী? তিনি কোনও রিপোর্ট দিতে পারেননি। এরকম অপপ্রচারের ফলে টুরিস্টরা যদি এখানে না আসেন তাহলে আপনাদের ব্যবসা মার খাবে। আপনারা কী বলেন? জলের পাইপ পালটানোর কথা বলছেন উনি। আমি মনে করি না এই শহরের জলের পাইপ খারাপ হয়েছে। কোথাও হয়তো সামান্য লিক করতে পারে, কিন্তু সে তো মেরামত করে নিলেই চলবে। তা ওঁর আবদার মতো যদি জলের পাইপ পালটাতে হয় তাহলে আমাদের কুড়ি লক্ষ টাকা খরচ হবে। এই টাকাটা কোত্থেকে আসবে? জলের পাইপ পালটাতে হলে আপনাদের অতিরিক্ত ট্যাক্স দিতে হবে। তার পরিমাণ মাথাপিছু চারশো টাকা। উনি চামড়ার কারখানার কথা বললেন। আমরা দেখছি ওই কারখানা অত্যন্ত যত্নে পরিচালিত হয়। কোথাও কোনও ত্রুটি নেই। শুধু সন্দেহের বশে যদি কারখানা সরিয়ে নিতে বলা হয় তাহলে প্রায় একশো পরিবার বেকার হবে। কারণ আমাদের অনেক অনুরোধে দাশগুপ্ত এখানে কারখানা করেছেন। বিরক্ত হয়ে তাঁর পক্ষে সমতলে চলে যাওয়া স্বাভাবিক। তিনি এখানে থেকে চলে গেলে কনকপুরের ওপর ভীষণ অর্থনৈতিক চাপ আসবে। এসব সত্ত্বেও আপনারা যদি চান তো ডাক্তারের পাগলামি আমরা মেনে নেব। দু-হাত দু-দিকে বাড়িয়ে ঝুঁকে দাঁড়ালেন গুপ্ত।

এবার বিস্ফোরণ হল। যেন আগুনের হাঁকা লেগেছে শ্রোতাদের গায়ে—পাগলটাকে বের করে দাও, তাড়িয়ে দাও কনকপুর থেকে। চারধারে এমন একটা গোলমাল পাকিয়ে উঠল যে অপরেশ নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারলেন না। সুব্রত এসে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছে। তিনি আবার মাইকের সামনে যেতে চাইলে গুপ্ত তাঁকে বাধা দিলেন, কী আরম্ভ করেছ? দেখছ না পাবলিক তোমাকে অপছন্দ করছে। আমাকে সামলাতে দাও। বন্ধুগণ, আপনারা এরকম উত্তেজিত হবেন না। আমাদের ঠান্ডা মাথায় সব ভাবতে হবে। আমি অনুরোধ করছি আপনারা শান্ত হন।

বারংবার আবেদনের পর জনতা একটু ঠান্ডা হলে সামনের সারিতে বসা একটা লোক উঠে দাঁড়াল, আমি কর দিই, তাই একটা কথা বলব।

তারপরেই উত্তরে অপেক্ষা না করে বলে উঠল, আমি জল খাই না, জলে বিষ থাকল কি না থাকল তাতে বয়েই গেল। ডাক্তারবাবু যদি জলের বদলে পাইপে মাল চালান দেয় তা হলে আমি ওঁর দলে আছি। এই হল গিয়ে আমার কথা। সঙ্গে-সঙ্গে সবাই হো-হো করে হাসতে লাগল, কয়েকজন জোর করে লোকটাকে মাটিতে বসিয়ে দিল। লোকটা চেঁচাতে লাগল, আমার গণতান্ত্রিক অধিকার—

মাইকে তখন গুপ্তর গলা শোনা গেল, হ্যাঁ, গণতান্ত্রিক অধিকার। কিন্তু সেটা

প্রয়োগ করার সময় মনে রাখতে হবে অন্যের ক্ষতি যেন না হয়। ডাক্তারকে আমরা সেই অধিকার দিয়েছিলাম কিন্তু তিনি তার বদলে কী করলেন? না, মিথ্যে কথা বললেন। বন্ধুগণ, মনে রাখবেন তিনি আমার ভাই, দয়াপরবশ হয়ে পুরুলিয়ায় গ্রাম থেকে তাঁকে তুলে নিয়ে এসে এই শহরের ডাক্তারের চাকরিতে দিয়েছিলাম শুধু তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্যে। কিন্তু তিনি যখন আপনাদের ক্ষতি করতে চাইছেন তখন আমি তাঁকে ক্ষমা করতে পারি না। প্রচণ্ড হাততালির মধ্যে গুপ্ত বললেন, তাই আমি প্রস্তাব করছি, অবিলম্বে তিনি এই শহর পরিত্যাগ করুন। এই সভা তাঁকে এই জন্য আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় দিল।

শেষপর্যন্ত পুলিশের গাড়িতে তাঁদের বাড়ি ফিরতে হল। অপরেশ বিধ্বস্ত, মাথা তুলতে পারছেন না। আসার সময় জনতা তাঁকে বিদ্রূপ করেছে। মাথা নিচু করে নিজের চেয়ারে বসে ছিলেন। সুব্রত কথা বলছিল না। কাজল পাথরের মতো দাঁড়িয়ে।

সুর্মা বলল, বাবা, তুমি ভেঙে পড়ো না। চললেন কাল সকালে আমরা এই শহর ছেড়ে চলে যাই। অপরেশ উত্তর দিলেন না। সুব্রত এবার বলল, কাকাবাবু আমরা তো আছি। আপনাদের কোনও অসুবিধে হবে না।

অপরেশ এবার মুখ তুললেন—তোরা আমাকে পালিয়ে যেতে বলছিস! সুর্মা বলল, পালানোর কথা বলছ কেন? এখানকার মানুষ তোমার কথা বুঝবে না। অর্থের ওপর হাত পড়লেই এরা অন্ধ হয়ে যায়। তার চেয়ে যেখানে গিয়ে তুমি মনের মতো কাজ করতে পারবে সেখানে চলে যাওয়াই তো ভালো। এবার কাজল কথা বললেন, সে-রকম জায়গা কোথায় আছে?

জানি না। কিন্তু পৃথিবীতে ভালো মানুষও তো আছে। যেমন প্রয়োজন যদি হয় তবে আমরা জঙ্গলের আদিবাসীদের কাছে যাব। ওরা সরল। এই শহর করতে গিয়ে আমরা ওদের তাড়িয়ে দিয়েছি। সুর্মা উত্তেজিত গলায় জবাব দিল।

আর সেই সময় পাশের জানলার কাচ ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল। ঘরের মধ্যে ছিটকে এল একটা বড় পাথর। মেয়েরা আর্তনাদ করে উঠতেই সুব্রত ছুটে গেল বাইরে। আর ঠিক তখনই আর-একটা পাথর এসে পড়ল অপরেশের মাথায়। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল। কাজল চিৎকার করে ছুটে এলেন। নিজের আঁচল স্বামীর মাথায় চেপে ধরে বললেন, এ কী হচ্ছে? কে ঢিল ছুড়ছে!

অপরেশ বিহ্বল ভাবটা কোনওক্রমে কাটিয়ে উঠে বললেন, এ সব তো এখন হবেই। সুর্মা, মা, যা ব্যান্ডেজ আর তুলো নিয়ে আয়।

অপরেশের মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা হলে সুব্রত ফিরে এল। এসে চমকে উঠল, এ কী! কী হয়েছে আপনার?

ও কিছু না। কী দেখলে?

দুটো লোক। অন্ধের জন্য ধরতে পারলাম না।

চেনো?

না। সাধারণ লোক। আপনার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে ওরা?

হুম!

কাদের জন্যে আপনি এত ভাবছেন? যাদের উপকার করতে আজ আপনার চাকরি

গেল, অপদস্থ হলেন, তারাই আপনাকে আহত করল।

অপরেশ হাসলেন—সুব্রত! পৃথিবীর নিয়মই তো এটাই। কিন্তু ওরা জানে না কী সর্বনাশ আসছে ওদের। না-না, পালিয়ে যেতে পারব না আমি। ওদের বাঁচাতেই হবে আমাকে।

কাজল জিজ্ঞাসা করলেন, কীভাবে? কেউ তো তোমার কথা শুনছে না। অপরেশ উঠে দাঁড়ালেন—রাস্তা আছে। তোমরা যদি চাও তো শহর ছেড়ে চলে যেতে পারো।

সুর্মা বলল, তোমাকে ফেলে আমরা চলে যাব ভাবছ কী করে?

সুব্রত জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু রাস্তাটা কী?

অপরেশ ধীরে-ধীরে ভাঙা জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন, দেখো কী সুন্দর আকাশ, কত পবিত্র। আজও কিন্তু বৃষ্টি হয়নি। আমার তো দিন ফুরিয়ে এল, কিন্তু তোমাদের এখনও অনেক পথ যেতে হবে। চোখ খোলা রেখো, দেখবে নোংরা যেমন আছে সুন্দর পবিত্র জিনিসেরও অভাব নেই পৃথিবীতে। সুর্মা চাপা গলায় বলল, বাবা!... অপরেশ এগিয়ে এসে মেয়ের মাথায় হাত রাখলেন—তোর ওপর ভরসা আছে মা। তুই কখনও ভুল করিসনি। কাজল, তোমার কি মনে আছে কিছু দিন আগে একটা লোক হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল কোমরে গুলি খেয়ে!

কাজল বললেন, হ্যাঁ, লোকটা ডাকাত। মরে গিয়েছিল তো!

হ্যাঁ। ও না মরলে পুলিশ ওকে ফাঁসিতে ঝোলাত। সেই লোকটা মরার আগে একটা কথা বলে গিয়েছিল আমাকে। প্রতিজ্ঞা করিয়েছিল পুলিশকে যেন খবরটা না দিই। আজ আমি সেই খবরটাকে কাজে লাগাব। অপরেশের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।...কী খবর? কাজল প্রশ্ন করলেন।

কিছু গড়তে গেলে ভাঙতেই হয়। না হলে এই শহরের মানুষকে বাঁচানোর কোনও উপায় নেই। আমি চলি। অপরেশ পা বাড়ালেন।

কোথায় যাচ্ছ? কাজল এগিয়ে এসে ওঁর হাত ধরলেন।

বললাম তো, এই শহরের মানুষকে বাঁচাতে। ডাকাতটা বলেছিল, ও পাহাড় ভাঙার ডিনামাইট চুরি করতে এসেছিল। ওর সঙ্গীও ভয়ে পালিয়েছে। ও একটা বাক্স উত্তর পাহাড়ের মাঝখানে তিনটে সাদা পাথরের খাঁজে লুকিয়ে রেখেছে। সেখানে কীভাবে যেতে হয় আমি জানি। অস্বাভাবিক হাসলেন অপরেশ।

কী করবে ডিনামাইট দিয়ে? কাজল হাত ছাড়ছিলেন না।

অহিংস পথে তো হল না। ওই ডিনামাইট দিয়ে আমি চামড়ার কারখানা উড়িয়ে দেব। তাতে জলের পাইপও আস্ত থাকবে না। তখন ওরা বাধ্য হবে পাইপ পালটাতে আর কারখানা সরাতে।

কিন্তু যদি ডাকাতটা মিথ্যে কথা বলে থাকে! যদি সেখানে ওরকম বাক্স সে না লুকিয়ে রাখে! উত্তেজনায় সুর্মা এগিয়ে এল।

না মা, মৃত্যুপথযাত্রী কখনও মিথ্যে কথা বলে না।

সুব্রত বলল, কাকাবাবু, আপনি থামুন, দায়িত্বটা আমাকে দিন।

অপরেশ হাসলেন, না হে। তুমি কেন, আমিই যাব। তোমার সামনে এখন কত

উজ্জ্বল দিন, তুমি কেন যাবে?

কাজল বললেন, বেশ। তা হলে আমি যাব তোমার সঙ্গে।

তুমি! বিস্ময়ে তাকালেন অপরেশ।

হ্যাঁ। তোমার একার পক্ষে সব কাজ হয়তো সম্ভব হবে না। আমি তোমাকে সাহায্য করব। কাজল জোরের সঙ্গে বলে স্বামীর হাত ছেড়ে দিলেন।

কিন্তু পাহাড়ের পথ কষ্টকর, তা ছাড়া, ধরা পড়ার যথেষ্ট ভয় আছে।

দুজনে থাকলে সে সম্ভবনা কম। লোকে সন্দেহ করবে না।

কিন্তু এর পরিণামের কথা জানো? আমরা আর না-ও ফিরতে পারি।

সে তো খুবই ভালো। দুজনেই একসঙ্গে যাব। কেউ কারও জন্য কাঁদব না। শুধু যাওয়ার আগে জেনে যাব আমরা হাজার-হাজার মানুষকে বাঁচিয়ে গেলাম। না গো, তুমি আর না বলো না। মা হিসেবে এই দায়িত্বটুকু পালন করতে দাও।

সেই কনকনে ঠান্ডায় কনকপুরে সেদিন মানুষেরা যে যার ঘরের মধ্যে। হিম বাতাস চারপাশে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছিল। আকাশে সাদাটে চাঁদের হাড়ে হয়তো ঘুণ লেগেছিল, কারণ, কুয়াশারা ক্রমশ ঘোলাটে হয়ে উঠেছিল। দুটো প্রৌঢ় শরীর যা পৃথিবীর জল-হাওয়ায় জীর্ণ হতে চলেছে, ওই অন্ধকারে তারুণ্য নিয়ে দ্রুত যাচ্ছিল উত্তরের পাহাড়ের দিকে। এই ঘুমন্ত শহরটাকে বাঁচাবার জন্যে ডিনামাইট দরকার। এই রাত্রেই।

(হেনরিক ইবসেনের নাটক 'এনিমি অফ দি পিপল'-এর অনুপ্রেরণায় রচিত উপন্যাস)

উনিশ-বিশ

আয়নার সামনে আর ভেতরে যে দুজন, তারা কি একটুও আলাদা নয়? ওই চোখ, চোখের টান, কিংবা কপালের কোণে আধভাঙা চুল এবং সব মিলিয়ে উপচে পড়া এক আলো যা কিনা সমস্ত শরীরকে জড়িয়ে রেখেছে লাবণ্য হয়ে, এসবই কি একজনের? এই আঠারো-উনিশ বছর বয়সটার? সুর্মা অপাঙ্গে আয়নাকে দেখল। তারপর ধীরে-ধীরে কাছে এগোল। আয়নার কাছে সে-ও এগিয়ে আসছে। নাকের কাছে নাক, চোখের হাসিতে ছোঁয়াছুঁয়ি, সুর্মা বুক উজাড় করে শ্বাস ফেলল আর তখনই ঝাপসা হয়ে গেল আয়নার মুখের চিবুক, ঠোঁট। জলজ বাতাস সাদা করে দিল কাচটাকে। সুর্মা হেসে উঠে সরে এল। সরে আসতেই চোখে পড়ল দরজায় স্বপ্না দাঁড়িয়ে।

'ওমা, কী করছিস? আয়নাকে চুমু খাচ্ছিস?' স্বপ্না অবাক গলায় শুধাল।

'চুমু? চোখে কী পড়েছে দেখছিলাম।' সুর্মা চটপট কথা সাজাল।

'চোখে তোর কাজল ছাড়া আর কী পড়বে! চোখ খোলা রাখলে দেখতে পেতিস তোকে নিয়ে কী কাণ্ডটাই পাড়ায় হয়ে গেল।' স্বপ্না ঠোঁট বেকিয়ে হাসল। স্বপ্নার হাসি মাড়িকে দেখায়। এ পাড়ায় ওই সুর্মার বন্ধু। একসঙ্গে সেই ক্লাস ওয়ান থেকে টুয়েলভ ক্লাসে এসেছে। ওরা অবশ্য নিজেরা বলে সেকেন্ড ইয়ার। স্কুলের গন্ধটাকে ঝেড়ে ফেলতে চায়। স্বপ্নার চেহারা একটু স্কয়াটে ফর্সা। কিন্তু খুব বুদ্ধিমতী, ইংরেজিতে বেশ ভালো।

'কী হয়েছে রে?' সুর্মা জিজ্ঞাসা করল। আজ সকালেই ওরা ফিরেছে রাঁচি থেকে। সামারের প্রায় পঁচিশ দিন ওখানে খুব হইহই করে কাটিয়ে এল ওরা। সুর্মার বাবা স্বপ্নেন্দু মাস ছয়েক আগে রাঁচিতে বদলি হয়েছেন। তিনি একাই কোয়ার্টার্সে থাকেন, সুর্মাদের নিয়ে যাননি পড়াশুনায় বিঘ্ন হবে বলে। এবার সুর্মা মা আর বোনের সঙ্গে ঘুরে এল রাঁচি থেকে। ওখান থেকে তিনখানা চিঠি দিয়েছে সে স্বপ্নাকে, উত্তরও পেয়েছে। কিন্তু তাতে তো পাড়ার কোনও উল্লেখযোগ্য খবর ছিল না।

'অতীন পাগল হয়ে গিয়েছিল'। স্বপ্না আস্তে-আস্তে বলল।

'সে কি! কবে? কী করে পাগল হল! যাঃ, সত্যি বলছিস?' একসঙ্গে এতগুলো প্রশ্ন করে বসল সুর্মা। ওর কথাটা বিশ্বাসই হচ্ছিল না।

'তোরা চলে যাওয়ার দিন ছয়েক পরেই। এই তো গতকাল হাসপাতাল থেকে বাড়িতে ফিরেছে। পাড়ার সবাই জানে একথা।' স্বপ্নার মুখ গম্ভীর।

'তুই আমাকে লিখিসনি তো চিঠিতে?'

'লিখলে তোর ভালো লাগত না।'

'কেন?'

'ও তোর জন্যেই পাগল হয়েছিল।'

কথাটা কানে যাওয়ামাত্র সুর্মার শরীর অবশ হয়ে গেল। প্রথমে সে কথাটার কোনও মানে খুঁজে পেল না। অতীন তার জন্যে কেন পাগল হবে? সে কখনও

অতীনের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেনি। অতীনরা আগে ওদের পাশের বাড়িতে থাকত। এখন পাড়ার মোড়ে মিষ্টির দোকানের ওপরে উঠে গেছে। কলেজে পড়ে অতীন, পড়াশুনায় খুব একটা ভালো নয়। জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই ওকে দেখে আসছে সুর্মা। ছেলেবেলায় নাকি এই বাড়িতেই সারাদিন পড়ে থাকত। ছিপছিপে লম্বা, বয়সের তুলনায় বেশ লম্বা, ইদানীং লালচে লোমে মুখ ঢাকা, চোখদুটো খুব সুন্দর। সুর্মার সঙ্গে এককালে খুব মারপিট হতো, সেই কোনকালের ছেলেবেলায়। তার জন্যে এখন পাগল হওয়ার কোনও মানে হয় না। বড় হয়ে যাওয়ার পর অতীন কেমন গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। এ বাড়িতে মাঝেমধ্যে আসে, সুর্মার মায়ের সঙ্গে কথা বলে, সামনে পড়লে সুর্মাকে দু-একটা প্রশ্ন করে এবং চলে যায়। এমনকী যেদিন রাত্রে ওরা রাঁচিতে গেল সেদিনও তো এসেছিল। সেই বিকেলে স্বপ্নেন্দু চা খাচ্ছিলেন আর সুর্মা কোন-কোন গল্পের বই সঙ্গে নেবে তাই ভাবছিল। দরজায় শব্দ হতেই কাজল বললেন, 'যা তো, দ্যাখ কে এল?'

সুর্মা দরজা খুলতেই দেখল পাজামা-পাঞ্জাবি পরে অতীন দাঁড়িয়ে। ওকে দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'কি, এর মধ্যেই রেডি?'

'বাঃ, এখনই রেডি হব কেন? ট্রেন তো সেই রাত্তিরে।'

'বাচ্চা মেয়েরা সকাল থেকে তৈরি হয় যাওয়ার জন্যে।'

সুর্মা একটা কড়া কথা বলতে যাচ্ছিল এমন সময় মায়ের গলা শোনা গেল, 'কে এল রে?'

সুর্মা কিছু বলার আগেই অতীন চেঁচাল। 'আমি মাসিমা।'

অতীনের পিছু-পিছু ঘরে ঢুকতেই সুর্মা শুনতে পেল স্বপ্নেন্দু বললেন, 'এই যে অতীন, কেমন আছ?'

'ভালো। আপনি?'

'ওই আর কী! ওখানে একা থাকতে কি আর ভালো লাগে! এবার ওরা যাচ্ছে, কদিন বেশ হইচই করা যাবে।'

সুর্মার মা এসে দাঁড়ালেন, 'হ্যাঁরে অতীন, আমাদের পাড়ার মোড়ে রাত্রে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে থাকে না?'

'হ্যাঁ, কেন?'

'উনি চিন্তা করছেন ট্যাক্সি পাওয়া যাবে কি না।'

'ও, এই ব্যাপার। কটায় বের হবেন আপনারা? আমি ট্যাক্সি ডেকে দেব।'

স্বপ্নেন্দু যেন এইটেই চাইছিলেন, 'বাঃ, খুব ভালো। আটটায় বেরিয়ে পড়ব।'

সুর্মার মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'দ্যাখ, পারবি তো?'

অতীন হাসল, 'বাঃ, আমি কি আর ছোট আছি?' তারপরে সুর্মার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুই কিন্তু মাসিমার কাছছাড়া হবি না, হারিয়ে যেতে পারিস।'

স্বপ্নেন্দু বললেন, 'না-না মেয়ে আমার লেডি হয়ে গেছে, ওখানে আমি একটা খুব ভালো ছেলে দেখে রেখেছি। এবার গিয়ে লাগিয়ে দেব বিয়ে।'

সঙ্গে-সঙ্গে সুর্মা চেঁচিয়ে উঠল নাকিসুরে, 'বাবা তুমি না। ওমা দ্যাখো বাবা কী বলছে।'

সুর্মার মা হাসলেন, 'সে তো ভালোই হয়। পছন্দমতো অল্পবয়সি ছেলে যদি পাওয়া যায় তো দায় চুকিয়ে ফেলাই ভালো। সব মেয়েকেই তো একদিন না একদিন বাপের বাড়ি ছেড়ে যেতেই হবে, কী বলিস অতীন?'

এখন মনে পড়ছে তখন অতীন কোনও উত্তর দেয়নি। শুধু সুর্মার মুখের দিকে তাকিয়েছে। তার খানিক বাদেই দু-একটা কথা বলে সে চলে গেল। অন্তত সেদিন ওর কোনও পরিবর্তন চোখে পড়েনি। তবে হ্যাঁ, রাত আটটায় ট্যাক্সি নিয়ে অতীন আসেনি। স্বপ্নেন্দুকেই ট্যাক্সি ডেকে আনতে হয়েছিল। স্বপ্নেন্দু রেগে গিয়ে বলেছিলেন, 'ইরেসপনসিব্‌ল। করবি না তো আগ বাড়িয়ে বললি কেন? কলকাতার ছেলেদের মধ্যে কোনও ডিসিপ্লিন নেই।'

সুর্মার মা অস্বস্তি নিয়ে বলেছিলেন, 'অতীনটা তো এরকম নয়! ওকে সেই ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি। কিছু হল কি না কে জানে!'

স্বপ্নেন্দু বলেছিলেন, 'কিছুই হয়নি। কোথাও আড্ডা মারছে। এখনকার ছেলেদের তুমি চেনো না। শোনো, ওকে অত ঘনঘন বাড়িতে আসতে দিও না।'

সুর্মা বন্ধুর দিকে তাকাল। এইতো সেদিনের ঘটনা এগুলো। এই ঘটনার জন্যে কোনও মানুষ পাগল হয় নাকি? সে এগিয়ে এসে স্বপ্নার হাত ধরল, 'কী হয়েছে আমায় খুলে বল।'

স্বপ্না ইতস্তত করল। একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দরজার দিকে তাকাল। তারপর বলল, 'এখানে নয়। মাসিমা এলে শুনে ফেলবে। তার চেয়ে তোদের ছাদে চল।'

সুর্মাদের এই ফ্ল্যাটবাড়ির ছাদটায় বিকেলে যেন হাট বসে যায়। সব ফ্ল্যাটের মেয়ে-বাচ্চা সেজেগুজে চলে আসে এখানে। এক-এক দলের পৃথক আড্ডা বসে। আশেপাশের নিচু ছাদগুলোকে পরিষ্কার দেখা যায়। সুর্মা ইদানীং ছাদে উঠত না। আজেবাজে কিছু ছেলে অন্য ছাদ থেকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে এইদিকে। ছেলেদের এইরকম অসভ্যতা ভীষণ খারাপ লাগে ওর। বুড়ো-বুড়ো লোকগুলো পর্যন্ত ওর দিকে এমন ভঙ্গিতে তাকায় যে গা জ্বলে যায়।

ছাদের ঠিক মাঝখানে ওরা বসল। এখন রোদ্দুর নেই কিন্তু ছায়াতে আলো মাখানো। আকাশটা আজ কাচের মতো ঝকমকে।

সেদিক থেকে চোখ সরিয়ে সুর্মা বলল, 'এবার বল কী হয়েছিল?'

স্বপ্না বলল, 'তোরা রাঁচি চলে যাওয়ার তিনদিন পর ঘটনাটা ঘটল। রবিবার দিন দুপুরবেলায় আমাদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে অতীন চিৎকার করতে লাগল তোর নাম করে। মুখচোখ লাল হয়ে গেছিল, কী বীভৎস দেখাচ্ছিল ওকে।'

সুর্মা অবাক হয়ে গেল, 'আমার নাম ধরে? কী বলছিল?'

হেসে ফেলল স্বপ্না, 'আই লাভ ইউ সুর্মা, আই লাভ ইউ সুর্মা।'

'যাঃ।' সুর্মার দুই গাল বিকেলের আকাশ।

'হ্যাঁরে। আমরা তো সবাই অবাক। পাড়ার ছেলেরা ধরাধরি করে ওকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এসেছিল। শুনলাম খুব ভয়ঙ্কর হয়ে গেছে ও, দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছে, সারাক্ষণ গালাগালি করছে আর মাঝে-মাঝে ওই কথা বলছে। শেষ পর্যন্ত হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল ওর মা।' একটু থেমে স্বপ্না বলল, 'যাই বলিস,

ওর মাকে আমার একদম পছন্দ হয় না।' সুর্মা অবশ হয়ে গিয়েছিল। কোনওরকমে কথা বলল, 'কেন?'

'কেমন যেন স্বার্থপর-স্বার্থপর। নিজের ছেলের দোষ দিল না। উলটে তোর বাবার নামে সাত-পাঁচ বলে বেড়িয়েছে।'

'আমার বাবার নামে? সেকি! কী বলেছে?'

'তোরা অ্যাদ্দিন মেশামিশি করার পর এখন তোর বাবা রাঁচিতে নিয়ে গিয়ে তোর বিয়ে দিচ্ছে। এইসব। আমি তো শুনে একদম বিশ্বাস করিনি। তোর বিয়ে হলে আমি জানতে পারতাম না, বল?' স্বপ্না তাকাল।

হাসবে না কাঁদবে, বুঝতে পারছিল না সুর্মা। রাঁচিতে যাওয়ার দিন বাবা স্রেফ রসিকতা করে যে কথাটা বলেছিল তা শুনে অতীন পাগল হয়ে গেল? এরকম কখনও হয়?

হঠাৎ স্বপ্না জিজ্ঞাসা করল, 'একটা কথা সত্যি বলবি?'

'বল।'

'তোর সঙ্গে অতীনের, মানে, লাভটাভ হয়েছিল বলিসনি কেন?'

'যাঃ।' তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করে উঠল সুর্মা, 'তোকে ছুঁয়ে বলছি স্বপ্না, আমার সঙ্গে ওর কিছুই হয়নি। ওকে তো ছেলেবেলা থেকে আমি দেখছি, কিন্তু কখনও মনের মধ্যে অন্য চিন্তা আসেনি। ইদানীং তো আমার সঙ্গে কথাও বলত না অতীন, খুব মুখোমুখি না পড়লে আমিও বলতাম না। ও যে এইসব যা-তা ভাবছে তাও আমাকে কখনও বলেনি। আমার এমন লজ্জা করছে এখন, পাড়ার সবাই কী ভাবছে বল।' সুর্মার সত্যিই লজ্জা করছিল। পাগল হয়ে রাস্তায় তার নাম ধরে চেঁচামেচি করেছে ভাবলেই গায়ে কাঁটা দিল।

স্বপ্না বলল, 'ছেড়ে দে এসব কথা। এখন তো অতীন ভালো হয়ে গিয়েছে। আজ সকালেই দেখলাম খুব গম্ভীর মুখে হেঁটে যাচ্ছে। তুই যখন এসবের সঙ্গে জড়িত নোস, তখন তুই ভাববি কেন?' স্বপ্না বোঝাল।

সন্ধে ঘন হতে ওরা নেমে এল ছাদ থেকে। কদিন বাদেই একটা পরীক্ষা। স্বপ্না আর বেশিক্ষণ থাকল না। দরজা অবধি পৌঁছে দিয়ে ফিরে এল সুর্মা। ওর খুব ইচ্ছে করছিল মায়ের কাছে এইসব কথা খুলে বলে। অতীনের সঙ্গে তার যে কোনও সম্পর্ক নেই, বা ওইসব ভাবার মতো মন তার তৈরি হয়নি, একথা আর কেউ না জানুক মা জানে। কিন্তু কথাটা বলতে যে তার খুব সঙ্কোচ হচ্ছিল। সে অপেক্ষা করছিল, মা যদি কারও কাছে ঘটনাটা শোনে, তা হলে নিজে থেকেই জিজ্ঞাসা করবে, তখনই বলা সহজ।

আজকাল বাবা বেশিরভাগ সময় রাঁচিতে থাকেন। বাবার জন্যে আমার খুব মন কেমন করে! আমরা তো দুই বোন। ছোট বোন এত ছোট যে আমার বন্ধু হতে পারে না। মায়ের কাছে আমি অনেক কথা বলি, কিন্তু সব কথা বলতে পারি না। পারলে তো স্বপ্নার কথাটা বলতে পারতাম। কাল রাত্তিরে মায়ের পাশে শুয়েও যখন ঘুম আসছিল না তখনও বলতে পারিনি। একথা ঠিক, বাবাকেও কথাটা বলতে পারতাম

না। কিন্তু কিছুদিন থেকে বাবাকে আমার খুব কাছের মানুষ বলে মনে হচ্ছে। আমি যেই বড় হয়ে উঠলাম অমনি মনে হল বাবার অনেক কিছু আমার ভালো লাগে। আজকাল বাবা যখন আমার সঙ্গে রসিকতা করেন তার মধ্যে একটি বয়স্ক মত কাজ করে। এই সেদিন সন্ধেবেলায় আমরা গাড়িতে বেরিয়ে রাঁচিতে ফিরছিলাম, বাবা বললেন, 'দ্যাখ সুর্মি, আকাশটাকে দ্যাখ। যেন কলজে ফেটে রক্ত ঝরছে।'

আমার খুব ভালো লাগল। আমি বুঝলাম খুব কষ্টের রঙ মাঝে-মাঝে লাল। সূর্যের জন্যে আকাশের যে কষ্ট সেটা যে দেখছে তার মধ্যেও ছড়িয়ে গেল। বাবা এভাবে আমাকে ভাবতে সাহায্য করেন। কিন্তু মা আমার আটপৌরে, এমনিতে খুব ভালো, যতটা ভালো একজন মা হতে পারে। কিন্তু মায়ের সঙ্গে কথা বললে মনের বয়স বাড়ে না। আর এই সময়টায় বাবা রাঁচিতে চলে গেলেন বদলি হয়ে। কদিন রাঁচিতে আমি খুব সুন্দর কাটিয়েছি।

জীবনে এরকম রাত ওই প্রথম, যে রাতে আমার চোখে ঘুম আসেনি। অতীনটা এমন কাণ্ড করল কেন? আমি তো ওর সঙ্গে কখনও তেমন ব্যবহার করিনি। আমার ক্লাসের অনেক মেয়ের লাভার আছে। ব্যাপারটায় শুধু একটা ছ্যাবলামি বলে আমার মনে হল। আমাদের এই বয়সে ওসব মানায়? বাবা বলেন, সব কিছুর একটা নিয়ম প্রকৃতি বেঁধে দিয়েছে। ভোরের ছায়ার সঙ্গে বিকেলের কেমন একটা মিল আছে কিন্তু তাই বলে কি ও দুটো এক! ভোরের ছায়ায় একটা শিরশিরে আনন্দ মেশানো থাকে আর বিকেলের ছায়ায় তিরতিরে দুঃখ। কিংবা ফলের মতো। অকালে কারবাইড দিয়ে পাকালে আসল স্বাদ কি মেলে? আমাদের এখন পড়াশুনার সময়। ক্লাসের পড়া ছাড়া পৃথিবীতে এত বই আছে যা না পড়লে মানুষ হিসাবে জন্মানোর কোনও মানে হয় না। একথাটাও বাবার কাছ থেকে শেখা। পশুর সঙ্গে মানুষের প্রভেদ হল মানুষ রিলে রেসের মতো সভ্যতাকে বয়ে নিয়ে যায়, আর পশু একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। আমার তাই ওসব মোটেই পছন্দ হয় না।

কিন্তু অতীনটা এমন কাণ্ড করল কেন? ও কি আমার কথা ভাবত? আমাকে, যাকে বলে ভালোবাসা, তাই বাসত? আমি তো কখনও সেরকম বুঝতে পারিনি। কাউকে ভালোবাসার কথা আমার মনেই আসেনি। অতীন এত কাছের ছেলে যে ওর সম্পর্কে এসব চিন্তা আমার মাথায় আসেনি! কোনও রক্তমাংসের পুরুষকে যদি আমি ভালোবাসি তো তিনি হলেন আমার বাবা। তারপরেই দুজন, আগে-পরে। একজন রবীন্দ্রনাথ অন্যজন জীবনানন্দ দাশ। এই দুজন মনের আকাশে একটার পর একটা তারা জ্বেলে দিয়ে যান আর বাবা সেই আকাশটাকে গড়ে দিয়েছিলেন। আমি যদি কাউকে ভালোবাসি তাহলে তাকে হতে হবে ওই তিনজনের সমান মনের মানুষ। অতীন তো সেরকম নয়। ও তো খুবই বলেছিল, একটু চোয়াড়ে। বইপত্র খুব পড়ে বলে জানি না। দুদিন সাদামাটা সিরিজ না কি ছাই ওরকম বই হাতে দেখেছিলাম। মাকে বলে মোহন দারুণ বই, ধরলে ছাড়া যায় না। তখন বাবা এখানে ছিলেন। জিজ্ঞাসা করায় বলেছিলেন, 'নাবালক মানসিকতার মানুষের খাদ্য ওগুলো।'

কিন্তু সেই অতীন রাস্তায়-রাস্তায় চিৎকার করবে আই লাভ ইউ সুর্মা? কোনও কারণ ছাড়াই? একি সেই খেলাঘর বাঁধতে লেগেছি আমার মনের ভিতরে? যেই শুনল

রাঁচিতে গিয়ে আমার বিয়ে দেওয়া হবে অমনি সব ওলট-পালট হয়ে গেল? সেইজন্যেই কি কথা দিয়েও ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে এল না? আর ওই চিন্তায় পাগল হয়ে গেল? ও কি গোপনে আমাকে এতখানি ভালোবাসত। পাগল! এরকম একতরফা ভালোবাসার কী মূল্য? কিন্তু বুঝতে পারছিলাম অতীনের জন্যে মনে কেমন একটা মায়া মিশছে। আহা বেচারা। একে কি করুণা বলে? জানি না। তবে ওকে সামনে পেলে আমি সুন্দর করে বুঝিয়ে সহজ করতাম। তার পরেই মনে হল, এসবের কী দরকার। এই ঘটনাকে খামোকা এত গুরুত্ব দিচ্ছি কেন! আমি যেমন আছি তেমন থাকব। আমার তো ওর ওপর কোনও দুর্বলতা নেই। তা ছাড়া, অতীন তো আবার সুস্থ হয়ে গিয়েছে। ভালো থাক এই যথেষ্ট।

সুর্মাদের এই বাড়িটা কলকাতার আর পাঁচটা মধ্যবিত্ত সংসার থেকে পৃথক নয়। স্বপ্নেন্দুর ভালো চাকরির কল্যাণে এখানে কখনও অভাব ঢোকেনি বটে কিন্তু সবকিছুই একটা গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সুর্মার মায়ের ওপরই এখন সংসারের পুরো দায়িত্ব। স্বপ্নেন্দু মাসে একবার আসেন হয়তো। ছোটবোন উর্মিকে সামলাতেই মায়ের সময় কেটে যায়। সুর্মা যেমন শান্ত, উর্মি ঠিক তার বিপরীত। বড় মেয়ে সম্পর্কে সুর্মার মায়ের দুশ্চিন্তা নেই। সারাদিন বই মুখে নিয়ে ব্যস্ত আছে। প্রথম-প্রথম বড়দের বই পড়া নিয়ে রাগারাগি করতেন সুর্মার মা। এই বয়সে এত পাকা বই পড়বে কেন? সেই ক্লাস এইটে বঙ্কিমচন্দ্র শেষ করেছে বাবার প্রশ্রয়ে। প্রথম-প্রথম স্বামীর ওপর খুব রাগ হতো। মেয়েকে এত লাই দেওয়া ঠিক হচ্ছে না মনে হতো। কিন্তু এখন ধারণা পালটাচ্ছেন। সুর্মা যে আর পাঁচটা ফাজিল মেয়ের মতো নয় উপলব্ধি করে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। এটা খুব বড় রকমের শান্তি।

আজ রবিবার। দুপুরে খেয়েদেয়ে মায়ের পাশে শুয়ে পড়েছিল সুর্মা। উর্মিকে জোর করে ঘুম পাড়াতে হয়েছিল কিন্তু সুর্মা কখন নিজেই ঘুমিয়ে কাদা। কদিন থেকে মেয়েটা বলছিল চোখ ব্যথা করে। ভাবছিলেন এবার একজন চোখের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবেন। দিনরাত বই মুখ করে বসে থাকলে চোখের আর কী দোষ।

বিকেলে মেঘের ডাকে ঘুম ভাঙল। দুই মেয়ে তখনও ঘুমিয়ে। ঠেলা দিয়ে সুর্মাকে তুললেন তিনি, 'সন্ধে হয়ে আসছে ওঠ।'

আলস্যে শরীর বেঁকাল সুর্মা, 'উম্‌ম। আর-একটু ঘুমুই।'

'না, আর আলসেমি করতে হবে না। উঠে পড়।'

বাধ্য হয়ে সুর্মা উঠল। উঠে বারান্দায় মোড়ায় বসে মেঘ দেখতে লাগল। হাতের কাজ সারতে তাড়া দিলেন সুর্মার মা, 'এই তুই এখনও বসে আছিস। যা চুল বাঁধ, জামা ছাড়।'

সুর্মা বলল, 'দ্যাখো মা, মেঘগুলো কী ভীষণ রাগী।'

সুর্মার মায়ের কপালে ভাঁজ পড়ল, 'তোর চোখ নিশ্চয়ই খারাপ হয়েছে। কালই ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে দেখছি। নইলে মেঘের রাগ দেখতে পাস।'

সুর্মা বলল, 'চোখ থাকলে সব দেখা যায়। দুই চোখের মধ্যে আর-একটা চোখ।'

সুর্মার মা বললেন, 'দরকার নেই আমার তৃতীয় নয়নের। তুমি আর তোমার বাবা নেই নয়নেই দেখো। এখন দয়া করে ওঠ।'

চুলটুল বেঁধে হঠাৎ খুব সাজতে ইচ্ছে করল সুর্মার। এরকম মেঘের বিকেলে মন ভীষণ ভালো হয়ে যায় ওর। রাঁচি থেকে কেনা জিনসের প্যান্ট আর শার্টটা পরে ফেলল ও। সচরাচর প্যান্ট পরে না সুর্মা। স্বপ্নেন্দু রাঁচিতে কিনে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'বাইরে বেড়াতে গেলে এটা পরবি। আজকাল তো সব মেয়েই প্যান্ট পরে। তা পাহাড়ে ওঠা-নামা করতে সুবিধে হবে বেশ। প্যান্ট পরলে তোকে বেশ স্মার্ট দেখাবে।'

মজা লেগেছিল সুর্মার। কদিনের আড়ষ্টতা ঘুচেছিল। নিজেকে ঠিক ছেলে-ছেলে লাগে প্যান্ট পরলে। শুধু হিপের ওপর লাগানো কোম্পানির ধাতব লেবেলটি খুলে ফেলেছিল প্যান্ট থেকে। অন্যের বিজ্ঞাপন অকারণে শরীরে বইবে কেন? সুর্মার মা-ও প্যান্ট দেখে মজা পেয়েছিলেন। ভাবখানা এরকম, আর তো পরতে পারবে না, এইবেলা পরে নিক।

তা শার্ট-প্যান্ট পরে চুল আঁচড়ে ঘরে আসতেই উর্মি বলল, 'এই দিদি তুই কোথায় যাচ্ছিস রে?'

'কেন?'

'এত সেজেছিস, তোকে দেখে সবাই হাঁ হয়ে যাবে।'

'মারব এক থাপ্পড়।' কপট রাগে হাত তুলল সুর্মা। সঙ্গে-সঙ্গে উর্মি চেঁচাল, 'মা দ্যাখো, দিদি আমাকে মারছে।'

উর্মির মুখের দিকে তাকিয়ে সুর্মা হেসে ফেলল, 'তুই বড় হলে বিরাট ক্রিমিনাল হবি। এখন থেকে যা মিথ্যে বলিস!'

পড়ার টেবিলে এসে সুর্মার মনে পড়ল আজ স্বপ্না আসেনি। অথচ স্বপ্নাকে পইপই করে সে বলে দিয়েছিল ডায়েরিটা ফেরত দিতে। আগামী কালই একটা টেস্ট আছে। সেটার জন্যে ডায়েরিটা দরকার। সমস্ত ক্লাস-নোট রয়েছে ওটাতে।

সুর্মা চেঁচিয়ে বলল, 'মা, উর্মিকে স্বপ্নাদের বাড়িতে পাঠাবে?'

সুর্মার মা বললেন, 'কেন?'

'আমার ডায়েরিটা ফেরত আনতে। ও দিয়ে যায়নি।'

ওপাশ থেকে উর্মি চেঁচাল, 'আমি যেতে পারব না। ওদের একতলায় বিরাট কুকুর এসেছে। ভয় লাগে।'

সুর্মা বলল, 'ফের মিথ্যে কথা!'

উর্মি মাথা ঝাঁকাল, 'মিথ্যে তো মিথ্যে। তোর দরকার তুই যা না।'

সুর্মা অনুযোগ করল, 'শুনলে মা, ও কীভাবে কথা বলছে!'

সুর্মার মা ঘরে এলেন, 'থাক ওর গিয়ে দরকার নেই, বৃষ্টি আসছে। সুযোগ পেলেই ভিজে এসে জ্বর বাধাবে। তার চেয়ে তুই যা, সন্ধের আগেই ঘুরে আয়।'

সুর্মার বাড়ি থেকে বের হতে একটুও ইচ্ছে করছিল না। এখনও শরীর থেকে আলসেমিটা যায়নি। আর-একটু ঘুমোতে পারলে বেশ হতো। তা ছাড়া, এই শার্ট-প্যান্ট পরে পাড়ার চেনা লোকদের সামনে হাঁটতে একদম ইচ্ছে করছিল না। কেউ যদি কিছু

বলে সেটা খুব লজ্জার হবে। আবার এগুলোকে ছাড়তেও আলিস্যি লাগছিল। এছাড়া আর-একটা লজ্জা লুকিয়ে আছে। সবাই তো এখন তার দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকবে। কেউ কি বিশ্বাস করবে অতীনের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক কখনও ছিল না? ভীষণ রাগ হচ্ছিল ওর অতীনের ওপর।

কিন্তু তারপরেই ও মত বদলাল। সে যত ঘরের মধ্যে বসে থাকবে তত তো লোকে সন্দেহটাকে সত্যি ভাববে। তা ছাড়া, তাকে কলেজে যেতে হবেই যখন, তখন লজ্জা করে কী লাভ! বরং সবাইকে দেখিয়ে দেওয়াই ভালো এসব সে গ্রাহ্য করে না। কেউ জিজ্ঞাসা করলে মুখের ওপর বলে দেবে ওসব নোংরা ব্যাপারের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। সুর্মা ঘর থেকে বেরিয়ে এল, 'মা, আমি স্বপ্নাদের বাড়িতে যাচ্ছি।'

'তাড়াতাড়ি আসিস। আর হ্যাঁ, বৃষ্টি আসতে পারে, তুই ছাতাটা নিয়ে যা।' সুর্মার মা ছাতা খুঁজতে লাগলেন।

সুর্মা বাধা দিল, 'দূর, এখান থেকে এটুকু, ছাতা নেব না।'

বলে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে তরতর করে নেমে এল। বড়রাস্তা দিয়ে মিনিট তিনেক গেলেই স্বপ্নাদের বাড়ি। দোতলার ফ্ল্যাটে ওরা থাকে। মেঘের জন্যেই আকাশ বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছিল। রাস্তায় লোকজন কম। এক-আধজন ছাড়া চেনা লোক চোখে পড়ছিল না। চারধারে একটা পালানো-পালানো ভাব দেখে মজা লাগছিল ওর। এখন অন্তত কলকাতার এই পাড়ার কেউ কারও দিকে নজর দিচ্ছে না।

স্বপ্নাদের একতলার দরজায় বিকেল বেলায় কিছু মেয়ে ভিড় করে থাকে। ওরা বোধহয় পেছন দিকের ফ্ল্যাটের বাসিন্দা। মিছিল দেখতে বা বাজনা শুনতে যেমন ওখানে ছুটে আসে তেমনি মেঘ জমতে দেখাও বুঝি একটা কাজ ওদের। সুর্মা কোনওদিকে না তাকিয়ে সদর দরজা দিয়ে ঢুকতেই একটা বিস্মিত কণ্ঠ কানে এল, কেউ কাউকে সচেতন করিয়ে দিচ্ছে, 'এই!' আর একটি মেয়ে শব্দ করে হেসে উঠল। কিন্তু সুর্মা কিছুই পরোয়া করে না এমন ভাব দেখিয়ে উঠে এল।

স্বপ্নাই দরজা খুলল। ওকে দেখে ও একেবারে হতভম্ব, 'ওমা তুই প্যান্ট পরেছিস! ইস, কী সুন্দর দেখাচ্ছে তোকে। রাঁচিতে গিয়ে বানিয়েছিস না?'

সুর্মা ভেতরে ঢুকে এমন ভঙ্গিতে হাসল যেন প্যান্টটা কোনও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়ই নয়। কিন্তু ও স্বপ্নার চোখের লোভ পড়তে পারল। স্বপ্না এখন চাইবে দ্রুত একটা ভালো প্যান্ট হোক। সুর্মা বলল, 'তুই গেলি না যে বড়! ডায়েরিটা দে।'

ওরা কিছুক্ষণ গল্প করার পর স্বপ্নার মা এলেন, 'বাবা কিনে দিল বুঝি।'

সুর্মা বুঝতে পারেনি, 'কী মাসিমা?'

'ওই পোশাক!'

'হ্যাঁ। রাঁচিতে গিয়ে বললেন এটা পরলে পাহাড়ে ওঠার সুবিধে হয়।'

'তা কলকাতাতেও বুঝি পাহাড় বয়ে নিয়ে এসেছিস। কী যে সব রুচি হচ্ছে।' স্বপ্নার মা উদাস মুখে তাকালেন।

সুর্মার খুব লজ্জা করছিল। ঠিক এইরকম আঘাত দিয়ে স্বপ্নার মা কখনও কথা বলেন না। ও বলল, 'স্বপ্না, আমি চলি।'

স্বপ্না ঘাড় কাত করল। ওই মুহূর্তে ওকে কেমন দুঃখী-দুঃখী দেখাচ্ছিল। দরজার কাছে পৌঁছতেই স্বপ্নার মা বললেন, 'হ্যাঁরে অতীন আজ তোদের বাড়িতে গিয়েছিল?'

সুর্মার মুখে রক্ত জমল। সে কোনওরকমে ঘাড় নাড়ল, 'না তো।'

'কী যে করিস তোরা! স্বপ্না অবশ্য বলছিল তুই ইনভলভড নস। কিন্তু পাড়ার লোকে সেকথা বিশ্বাস করবে কেন? এক হাতে তো আর তালি বাজে না। তা একটু সাবধানে যাস, পাগলটা নাকি প্রায়ই ঘোরাফেরা করে। আমার তো বাবা পাগল দেখলেই বুক হিম হয়ে যায়।' স্বপ্নার মায়ের কথা শেষ হওয়া মাত্র সুর্মা দরজা ডিঙিয়ে গেল। উঃ মানুষ কী দ্রুত পালটে যায়। সে ঠিক করল আর কখনও স্বপ্নাদের বাড়িতে আসবে না। চোখে জল এসে গিয়েছিল সুর্মার। দ্রুত মুছে নিয়ে নিজেকে শক্ত করল। না, কে কী বলল তাই নিয়ে কষ্ট পাওয়ার কোনও মানে হয় না।

দরজায় সেই মেয়েরা তখনও দাঁড়িয়ে। তাদের একটুও পাত্তা না দিয়ে সুর্মা রাস্তায় নামল। ডায়েরিটা বাঁ হাতে নিয়ে ফুটপাত দিয়ে একটু এগোতেই চমকে উঠল। সুর্মার সমস্ত শরীরে কাঁপন এল। ও কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। মুহূর্তেই অসাড়তা কেটে গেলে সে অন্য ফুটপাতের দিকে তাকাল। না, কোনওভাবেই পাশ কাটানোর উপায় নেই! পরক্ষণেই মনে হল আশপাশের বাড়ির লোক জানলা দিয়ে তাকে দেখছে কি না! স্বপ্নাদের বাড়ির সদর দরজা এখান থেকে দেখা যায় না এটুকু বাঁচোয়া। সে ঠিক করল পাশ কাটিয়ে চলে যাবে।

অতীনের এক হাতে কিট্‌স ব্যাগ, অন্য হাত মুঠো করা, মাথা নিচু করে আসছিল। মুখোমুখি হতেই যেন দুচোখ জ্বলে উঠল ওর, 'আরে তুই? কবে এলি?

উত্তর দেবে কি দেবে না বুঝতেই ঠোঁট থেকে শব্দ বের হল, 'আজ।' তারপরেই পা বাড়াল সুর্মা।

'দাঁড়া, তোর সঙ্গে কথা আছে।'

'না, কোনও কথা নেই।'

'আছে কি না আছে সে আমি বুঝব। রাঁচিতে পাত্র জুটল না?'

'আমার পথ ছাড়।'

হঠাৎ অতীনের গলার স্বর পালটে গেল, 'তুই এমন কেন রে?'

সুর্মার সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল। ওর মনে হচ্ছিল অতীন বোধহয় এখনও পুরোপুরি সুস্থ নয়। ওর কথাগুলো কেমন যেন নিঃশ্বাস জড়ানো।

'আমি যাই।'

'যাবিই তো। আমার জন্যে তুই থাকবি কেন?' অতীনের কণ্ঠস্বর ক্রমশ উঁচু পর্দায় উঠল। সুর্মা দেখল ওর চোখের আলো নিভে গেছে। কেমন ঠান্ডা স্যাঁৎসেতে ভাব সেখানে। যদি এখনই আচমকা চিৎকার করে ওঠে, যদি পাগল হয়ে যায় ফের। সে যদি দৌড়ে বাড়ি যাওয়ার চেষ্টা করে তাহলে কি অতীনও পেছনে দৌড়াবে? ঠিক সেই সময় রাস্তার ওপাশের বাড়িটার জানলা খুলে গেল। একটা বউ হাঁ করে তাদের দেখতে লাগল সেখানে দাঁড়িয়ে।

অতীন বলল, 'যাক আমি চলে যাচ্ছি আজকে।'

'কোথায়?'

'দার্জিলিং-এ। ওখানে আমার এক নেপালি বন্ধু চাকরি দেবে বলেছে। আর তোকে কখনও বিরক্ত করব না আমি। শুধু যাওয়ার আগে কয়েকটা কথা বলতে চাই।'

'বাড়িতে চল।'

'না ওসব কথা বাড়িতে বসে বলা যায় না।'

'কী কথা?'

'আমি কেন পাগল হয়েছিলাম।'

'আমি তার কী জানি!'

'তোর জন্যে। শুধু তোর জন্যে। আমার বেশি সময় নেই, তুই আমার কথা শুনবি কি না বল!' কথা শেষ করতে না করতেই হাত তুলে একটা ট্যাক্সিকে থামাল অতীন। তারপর দরজা খুলে ডাকল, 'উঠে পড়, যেতে-যেতে কথা বলব।'

'আমি কোথায় যাব?'

'স্টেশনে। আমাকে তুলে দিয়ে ফিরে আসবি। নইলে তোকে আর কোনওদিন আমার বলা হবে না। আয় তোর পায়ে পড়ি, আয়।' ভিক্ষে চাওয়ার গলায় বলল অতীন।

'বাড়িতে রাগ করবে। আমি যেতে পারব না।'

'আধঘণ্টার জন্যে, কেউ টের পাবে না! আয় সুর্মি!'

সুর্মা মুখ তুলতেই দেখতে পেল দূরে পাঁচ-ছয়জন ছেলে আসছে! ওরা যদি এই দৃশ্য দেখে তাহলে আর দেখতে হবে না। ওর হঠাৎ মনে হল যদি আধঘণ্টা ওর সঙ্গে থেকে ও শান্ত হয় তাহলে একটা ঝামেলা থেকে বাঁচা যায়। সে তো কোনও বিরাট অন্যায় করছে না। আর এই সময়ে টুপটুপ করে বৃষ্টি ঝরতে শুরু করল। যারা রাস্তায় ছিল তারা ছুটোছুটি করে মাথায় ছাদ খুঁজতে লাগল। প্রায় চিৎকার করে উঠল অতীন। 'আয় ভিজে যাবি!'

বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্যেই কিংবা দায় এড়ানোর ভঙ্গিতে সুর্মা ট্যাক্সিতে উঠল। অতীন দরজা বন্ধ করে বলল, 'শেয়ালদা স্টেশন!'

ট্যাক্সিতে উঠেই সুর্মার মনে হল, এ কী করল সে! কেন সে আচমকা উঠে পড়ল। এখন যদি পাড়ার কেউ দেখে তাহলে হাজার বললেও বিশ্বাস করবে না। মায়ের কানে গেলে তো আর আস্ত রাখবে না। সে আসতে চায়নি এ কী কাউকে বোঝানো যাবে? গাড়িটা ততক্ষণে ট্রাম লাইনের ধার ঘেঁসে ছুটছে। সুর্মা নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে জানলা ঘেঁসে বসল। বাইরে তখন ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি পড়ছে। সাদা দেখাচ্ছে চারধার। ট্যাক্সির ছাদে চটর-পটর শব্দ হচ্ছে।

একটু বাদে সুর্মা মুখ ঘোরাল। ওপাশের জানালার গায়ে প্রায় নেতিয়ে শুয়ে আছে অতীন। এই কদিনেই কী ভীষণ রোগা হয়ে গেছে, মুখে দাড়ি থাকা সত্ত্বেও শীর্ণ-ভাবটা চোখে পড়ছে। চুলগুলো উস্কোখুস্কো, একদৃষ্টিতে বাইরে তাকিয়ে আছে। ওদের বাড়ি থেকে ট্যাক্সিতে শিয়ালদায় পৌঁছতে মিনিট দশেক লাগে। এই সময়ের মধ্যে অতীন কী বলবে বলে নিতে পারে। কিন্তু ওর তো কোনও ব্যস্ততা দেখতে পাচ্ছি না ট্যাক্সিতে ওঠার পর। সুর্মা জিগ্যেস করল, 'কী বলবি বলছিলি?'

অতীন ঘোলাচোখে তাকাল। ওর চোখের পাতা কাঁপতে লাগল। তারপর সুর্মাকে চমকে দিয়ে হঠাৎ হাউমাউ করে কেঁদে উঠল দুহাতে মুখ ঢেকে। কান্নার বেগটা এমন

ঢেউ-এর মতো আসছে যে মনে হচ্ছিল মোচার খোলার মতো ভাসছে ও। সুর্মা এত নার্ভাস হয়ে পড়ল যে কী করবে বুঝতে পারছিল না। ওর প্রথমে মনে হল অতীন কি আবার পাগল হয়ে গেল? পাগলরা কি এমন আকস্মিক কাঁদে! কিন্তু এরকম কান্না খুব গভীর দুঃখ না পেলে বুক থেকে উঠে আসে না। এই সময় ট্যাক্সিওয়ালা মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ক্যা হুয়া?'

অতীনের পক্ষে জবাব দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না, বিব্রত মুখে সুর্মা বলল, 'কিছু না।' লোকটা কী বুঝল কে জানে, আবার গাড়ি চালাতে শুরু করল। অতীন-এর অবস্থা এমন যে সুর্মার ভয় হল ও বোধহয় ট্যাক্সি থেকে নামতেই পারবে না। ক্রমশ ছেলেটার ওপর ভীষণ মায়া হল সুর্মার। শৈশব থেকে ওকে কখনই এমন করে কাঁদতে দেখেনি। একবার দোতলা থেকে পড়ে গিয়ে পায়ের হাড় ভেঙেছিল অতীন, তখন বছর সাতেক বয়স বোধ হয়, তখনও তো এমন করে কাঁদতে দেখেনি সুর্মা। সে একটু সরে বসে অতীনের বাহুতে হাত রাখল, 'এই কাঁদছিস কেন?'

অতীন জবাব দিল না। ও যেন একটা কান্নার নেশায় আচ্ছন্ন সুর্মা আবার ডাকল, 'এই অতীন, প্লিজ কাঁদিস না। আমাকে কী বলবি বলেছিলি বল।'

একটু-একটু করে নিজেকে সামলাল অতীন, কিন্তু ততক্ষণে স্টেশন এসে গিয়েছে। চোখের জল মুছে সোজা হয়ে বসল যখন তখন ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে এসে দাঁড়াল। সুর্মা দেখল অতীন পকেট থেকে এক গোছা টাকা বের করে ভাড়া মেটাল। অত টাকা সুর্মা একসঙ্গে কখনও হাতে নেয়নি। ওদের বাড়িতে ছোটদের হাতে টাকা দেওয়ার নিয়ম নেই। অতীনের কাছে অত টাকা এল কী করে?

দরজা খুলে অতীন ওকে ইঙ্গিতে নামতে বলে স্টেশনের ওপরের ঘড়ির দিকে তাকাল। ওর গলার স্বরে তখনও কাঁপুনি। ভিজে-ভিজে, 'এখনও আধঘণ্টা আছে, তুই আমার সঙ্গে প্ল্যাটফর্মে চল।'

সুর্মা বলল, 'না। আমি বাড়ি যাব।'

'এই বৃষ্টি না থামলে যাবি কী করে? মিনিট পনেরো অপেক্ষা করে না হয় চলে যাস।' অতীনের গায়ে বৃষ্টির জল পড়ছে। বাধ্য হয়ে সুর্মা ট্যাক্সি থেকে নেমে প্রায় দৌড়ে স্টেশনের ভেতরে ঢুকে পড়ল। চারধারে মানুষরা বৃষ্টির জন্যে আটকে থাকায় গমগম শব্দ হচ্ছে। ওদের ভিজে যাওয়া চেহারার দিকে অনেকেই তাকিয়েছিল। সুর্মা আড়ষ্ট হল। এই ভিড়ের মাঝে পাড়ার কেউ নেই তো! থাকলে আর মুখ দেখাতে হবে না! হঠাৎ ওর খেয়াল হল পকেটে একটা পয়সাও নেই। ফিরে যাওয়ার সময় বাসে টিকিট কাটতে হবে! এতদূরে সে কখনও একা আসেনি। কিন্তু চেনা বাস তো এ পাড়াতে আসে। অতীনের কাছে চাইবে নাকি! না চেয়ে কোনও উপায় অবশ্য নেই। সে হঠাৎ আবিষ্কার করল একা দাঁড়িয়ে আছে। রাত্রের আলোগুলো জ্বলছে এবং অতীন নেই! নিজেকে খুব অসহায় মনে হচ্ছিল ওর। চারপাশে তাকিয়ে অতীনকে দেখতে পেল না। এইভাবে তাকে ফেলে কি অতীন চলে যাবে? তাহলে নিয়ে এল কেন? সুর্মা কী করবে বুঝতে পারছিল না। মিনিট পাঁচেক দাঁড়িয়ে থাকার পর যখন দূরে অতীনকে দেখতে পেয়ে প্রায় দৌড়ে গেল ও, 'কোথায় গিয়েছিলি না বলে?'

অতীনের যেন কোনও বোধশক্তি নেই এমন ভঙ্গিতে বলল, 'চল।'

'কিন্তু আমার কাছে বাড়ি ফেরার পয়সা নেই।'

'দিয়ে দেব।'

প্ল্যাটফর্মের বাইরে দাঁড়িয়ে ট্রেনটা ভিজছে। বৃষ্টির জন্যে কি না কে জানে যাত্রীরা এখনও অল্প। একটা বেঞ্চিতে ব্যাগ রেখে অতীন বসল। সুর্মা সামনে দাঁড়িয়ে ট্রেনটাকে দেখে জিগ্যেস করল, 'সত্যি চলে যাচ্ছিস?'

মাথা নাল অতীন। 'হ্যাঁ।'

'চাকরি করবি?'

'হুঁঃ।'

'যদি না পাস?'

'পাবই। সুনীল আমাকে কথা দিয়েছে।'

'বাড়িতে জানে?'

'না।'

'তাহলে টাকা পেলি কোথায়?'

'পেয়েছি।'

'সত্যি বলতো কেন যাচ্ছিস?'

'তুই কি বুঝিস না? আমি যে তোকে ভালোবাসি তুই জানিস না?'

'কিন্তু আমি তো তোকে—। বিশ্বাস কর—। এরকম পাগলামি।'

'ও। এখন তো তুই আমাকে পাগল বলবি। জানি আমি তোর যোগ্য নই। আমার চেয়ে অনেক ভালো ছেলে পাবি। ও ভগবান।'

'অতীন। এরকম করে বলিস না। তোর সঙ্গে আমার কোনওদিন কিছু হয়নি।'

'কে বললে কিছু হয়নি? আমি তো তোকে ভালোবেসে এসেছি। প্রতিদিন তোর কথা ছাড়া অন্য চিন্তা করতাম না। আমি জানি তুই আমার চেয়ে অনেক মূল্যবান। কিন্তু আমি যে তোকে ভালোবাসি, কী করব বল? না, ওখানে আমি যাব না। তোকে আমি পাব না এটা আমি ওখানে বসে ভাবতে পারি না। সুর্মি, তুই আমাকে একটু ভালোবাস।'

সুর্মা কী বলবে বুঝে উঠতে পারছিল না। হঠাৎ অতীন ওর দুটো হাত আঁকড়ে ধরল, 'তুই আমার সঙ্গে চল সুর্মি। আমি চাকরি করব, বিয়ে করে আমরা খুব সুখে থাকব। আমি বেঁচে যাব সুর্মি।'

সুর্মা দ্রুত মাথা নেড়ে চিৎকার করে উঠল, 'না, সে হয় না, না।' ওরা এতক্ষণ লক্ষ করেনি দু-একজন করে মানুষ জমছিল কাছাকাছি। সুর্মা চিৎকার করে উঠতেই একজন এগিয়ে এল, 'কী হয়েছে?'

সুর্মা ততক্ষণে হাত ছাড়িয়ে নিয়েছে। লোকটি আবার কড়া গলায় বলল, 'কী ব্যাপার? তখন থেকে দেখছি একটা গোলমাল হয়েছে মনে হচ্ছে।'

সুর্মা কী বলবে বুঝতে পারছিল না। ওর সমস্ত শরীর হিম। অতীন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'কিছুই হয়নি। আপনার কী দরকার?'

লোকটি শক্ত চোখে ওর দিকে তাকাল, 'আপনাদের আমার সঙ্গে আসতে

হবে।'

'কেন, কোথায়?' অতীনের গলা কাঁপছিল না।

লোকটা পকেট থেকে কার্ড বের করে দেখাল। এই সময় আর-একটি মোটা মতন বয়স্ক লোক কাছে এলেন, 'কী হয়েছে শ্যাম?'

'এদের মধ্যে একটা গোলমাল আছে স্যার।' লোকটি জানাল।

আশেপাশে তখন বেশ ভিড় জমে গেছে। সুর্মার মনে হল সে অজ্ঞান হয়ে যাবে। এরা নিশ্চয়ই পুলিশের লোক। ওদের যদি অ্যারেস্ট করে নিয়ে যায় তা হলে আত্মহত্যা করা ছাড়া কোনও উপায় থাকবে না। পাড়ার লোক দূরের কথা, মা-বাবাকেই মুখ দেখাতে পারবে না সে। মোটা লোকটি ওদের সামনে এসে দাঁড়াল, 'কী নাম?'

'আমি অতীন সেন আর ও সুর্মা।'

'কোথায় যাচ্ছ?'

'শিলিগুড়িতে।'

'কেন?'

'মাসিমার বাড়িতে।'

'এখানে কোথায় থাকো?'

'বাহান্নর এ বাই টু চক্রবেড়িয়া।'

'ও কে হয় তোমার?'

একটুও ইতস্তত না করে অতীন বলল, 'আমার বোন।'

'কীরকম বোন?'

'নিজের।'

লোকটা সুর্মার দিকে ঘুরে বলল, 'ও সত্যি কথা বলছে?'

সুর্মা সম্মোহিতের মতো মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

'মাসিমার বাড়িতে একা-একা যাচ্ছ কেন?'

'মাসতুতো বোনের বিয়ে তাই। বাবা-মা দুদিন পরে আসবেন।' অতীন জবাব দিল। প্রথম লোকটা এবার জিগ্যেস করল, 'তাহলে তখন তুমি চেঁচাচ্ছিলে কেন?' প্রশ্নটা সুর্মাকে উদ্দেশ্য করে।

'ও একা যেতে চাইছিল না তাই!' অতীন বলে উঠল। মোটা লোকটা জিজ্ঞাসা করল, 'একা কেন? তুমি তো আছ?'

অতীন বেমালুম বলল, 'আমাদের তো রিজার্ভেশন নেই। তাই আমি ওকে বললাম তুই জেনারেল কম্পার্টমেন্টে উঠতে পারবি না, যা ভিড়! বরং লেডিজ কম্পার্টমেন্টে গিয়ে বোস। সঙ্গে-সঙ্গে ও চিৎকার করতে লাগল একা-একা সারা রাত্রি যেতে পারবে না।'

সুর্মা এরকম অবাক কখনও হয়নি। অতীন এত চমৎকার মিথ্যে অনায়াসে বলতে পারে! ওর মনে হচ্ছিল এই মিথ্যেটা লোকগুলো বিশ্বাস করুক তাহলে আর হাঙ্গামা হবে না। এখন কোনওরকমে বাড়ি ফিরে যেতে পারলেই সে বাঁচে। মোটা লোকটা ঘাড় বেঁকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তাই নাকি?'

সুর্মা নীরবে মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

এই সময় ট্রেনটা হুইসল দিয়ে উঠল। অতীন ব্যস্ত চোখে সেদিকে তাকাতে মোটা লোকটা সঙ্গীকে বলল, 'না হে মনে হচ্ছে ভালমে কোই কালা নেহি, তুমি এক কাজ করো, প্রিটায়ারের টি টি-কে আমার নাম করে বলো ওদের একসঙ্গে জায়গা করে দিতে! এই সময় ট্রেনটা ঘনঘন নিঃশ্বাস ছাড়ছিল! যাত্রীরা যে যার কামরায় ওঠার জন্যে ব্যস্ত। প্রথম লোকটি ওদের তাড়া দিল, 'চলো, এক্ষুনি গাড়ি ছাড়বে' প্রায় তাড়িয়ে নিয়ে এল লোকটা প্রিটায়ারের কাছে। দরজায় দাঁড়ানো টি টি-কে উদ্দেশ্য করে বলল, 'স্যার আপনাকে এদের দুটো জায়গা দিতে বলেছেন।' টি টি ঘাড় কাত করতেই অতীন লাফিয়ে উঠে পড়ল। লোকটি প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো সুর্মাকে তাড়া দিল, 'ওঠ, ওঠ, এক্ষুনি ছেড়ে দেবে গাড়ি।'

সুর্মা চিৎকার করে বলতে গেল আমি যাব না, আমার যাওয়ার কোনও কথা নেই। কিন্তু সেই মুহূর্তে ট্রেনটা দুলে উঠল। লোকটা তাকে যেন সাহায্য করার জন্যেই পেছন থেকে ঠেলে দিল আর অতীন তৎক্ষণাৎ হাত বাড়িয়ে ওকে টেনে তুলল গাড়িতে। স্থির হয়ে দাঁড়াবার মুহূর্তে সুর্মা বুঝল প্ল্যাটফর্মের আলো ছাড়িয়ে ঘন অন্ধকারে ট্রেনটা ঢুকে পড়েছে। হঠাৎ তার মনে হল সে অন্ধ হয়ে গিয়েছে, কিছুই চোখে পড়ছে না। তারপর অনুভব করল অতীনের হাতে তার হাত। সে ক্রমশ অতীনের মুখ দেখতে পেল। কী শান্ত এবং আনন্দিত। চলন্ত ট্রেনের দরজায় দাঁড়িয়ে সুর্মা বাইরে মুখ ফেরাল। কলকাতায় বাড়িঘরের আলো দূরে-দূরে ছিটকে যাচ্ছে। আর তক্ষুনি বাবা, মা এবং উর্মির মুখ একসঙ্গে মনে পড়তেই সে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। অতীন চাপা গলায় অনুনয় করছিল, 'কাঁদিস না, লোকে সন্দেহ করবে।'

টি টি ভেতরে চলে গিয়েছিল। করিডোরে কেউ নেই। সুর্মা পাগলের মতো কাঁদছিল। তার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। কাঁদতে-কাঁদতে ও হাঁটু গেড়ে নিচে বসে পড়ল।

আমি কী করব বুঝতে পারছি না। আমার এত আনন্দ হচ্ছে, জীবনে এরকম কখনও হয়নি। ভগবান সুর্মিকে পাইয়ে দিলেন কী অদ্ভুতভাবে। অন্তত আজকের রাতটার জন্যে তো বটেই। এবং আজকের রাত হলে আমি চিরজীবন ওকে ছাড়ব না। অথচ আজ সকালেও আমি চিন্তা করিনি ব্যাপারটা এমনভাবে ঘটবে! ওদের বাড়িতে তো যাওয়ার কোনও প্রশ্নই উঠছিল না। ওর সঙ্গে দেখা হবে তাও ভাবিনি। কিন্তু ভগবান সেটা করিয়ে দিলেন এবং এই যে ও এখন ট্রেনের মেঝেতে বসে কাঁদছে সেটাও তাঁরই ইচ্ছায়। সত্যি কথা বলতে কী আজকের আগে আমি ভগবানকে পছন্দই করতাম না!

দরজাটা নড়ছে। হাওয়া ঢুকছে হুহু করে। বৃষ্টি কমে এসেছে। আমি ধীরে-ধীরে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম, বেশ ঘরের মতো হয়ে গেল। সুর্মি এখনও কাঁদছে। অন্য সময় হলে এবং জায়গাটা নিরিবিলি হলে ওকে কাঁদতে দিতাম। শুনেছি খুব কাঁদলে মন হালকা হয়ে যায়। কিন্তু এখন, যে কেউ এসে পড়লে বিশ্রী ব্যাপার হবে। আমি ওর কাঁধে হাত রেখে ডাকলাম, 'সুর্মি, এই সুর্মি প্লিজ কাঁদিস না।'

সুর্মি আমার দিকে তাকাল। দুটো চোখ ফুলে উঠেছে, গাল জলে মাখামাখি। অদ্ভুত করুণ গলায় বলল, 'তুই আমার এ কি সর্বনাশ করলি? আমি এখন মুখ দেখাব কী করে?'

কথাটা শুনে আমার মন কেঁপে উঠল। আমি ওর সর্বনাশ করলাম? যাকে আমি নিজের চেয়েও ভালোবাসি; তার সর্বনাশ করা যায়? তবু বললাম, 'উপায় ছিল না, আমি তো তোকে নিয়ে যেতে চাইনি, পুলিশরাই তো জোর করে তোকে তুলে দিল।'

সুর্মি উঠে দাঁড়াল। এবং এতক্ষণে আমার খেয়াল হল ওর পোশাক ছেলেদের মতো। শার্ট-প্যান্ট পরতে এর আগে আমি কখনও দেখিনি। আমার অস্বস্তি হলেও বুঝতে পারলাম না এই পোশাকে ওকে চমৎকার মানিয়েছে, বেশ স্মার্ট দেখাচ্ছে। দাঁতে ঠোঁট চেপে সুর্মি আমাকে দেখল, তারপর বলল, 'তুই মিথ্যেবাদী!'

'তার মানে? এই কথা মিথ্যে?' আমি অবাক গলায় বললাম।

'তুই ওই লোকগুলোর কাছে কীরকম মিথ্যে বললি! ছি-ছি!'

'ও, তখন মিথ্যে না বললে এতক্ষণ থানায় পচতিস তা জানিস? বেশ, আমি তো তোর মুখ বন্ধ করে রাখিনি, তুই কেন পুলিশকে বললি না সব কথা। তাহলে তো এখন আফসোস করতে হতো না?'

সুর্মি কথাটা শোনামাত্র মুখ নামাল। ওর ঠোঁট কাঁপছে। আমার ভয় হচ্ছিল ও যেন ফের না কেঁদে ফেলে। ও যে আমাকে মিথ্যেবাদী বলল তার জন্যে রাগ হল না আমার। আমি বললাম, 'ঠিক আছে, তুই এক কাজ কর, এর পরে ট্রেন দক্ষিণেশ্বরে থামবে, সেখানে নেমে চৌত্রিশ নম্বর বাসে চেপে বাড়ি ফিরে যা।' কথাটা বলার জন্যে বললাম, আমি কিছুতেই চাইছিলাম না ও ফিরে যাক।

সুর্মির চোখ যেন চট করে প্রাণ ফিরে পেল। ও সোজা হয়ে বলল, 'দক্ষিণেশ্বর। এখন ফেরা যাবে?'

'যাবে। সেখাই তুতক্ষণ চুপ করে থাক। 'আমি মুখ ফিরিয়ে নিজেকে গালাগাল দিতে লাগলাম মনে-মনে। কী দরকার ছিল রাস্তাটা বলে দেওয়ার। সত্যি যদি ও চলে যায়? আমার মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। শরীর টলতে লাগল। সেই মাসখানেক আগে যেমন হয়েছিল।

আমি জানি আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। পাগল হওয়ার পর কী করেছিলাম সেকথা আমার মনে নেই। পরে শুনেছি বন্ধুদের কাছে। কিন্তু পাগল হয়েছিলাম বলেই বোধহয় কেউ চট করে আমার সামনে ও বিষয়ে আলোচনা করত না। সুর্মিদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমার বুকে সেদিন অদ্ভুত চাপ বোধ করেছিলাম। সুর্মিকে বাঁচিতে নিয়ে যাচ্ছে বিয়ে দেওয়ার জন্যে? ওইদিন প্রথম বুঝতে পারলাম ওকে আমি কতখানি ভালোবাসি। ইদানীং তো ওর সঙ্গে তেমন কথা হতো না। ওদের বাড়িতে সেই ছেলেবেলা থেকে যাচ্ছি, এক সময় কত খেলেছি, কিন্তু বড় হয়ে যাওয়ার পর দেখতাম ও কেমন গুটিয়ে নিয়েছে নিজেকে। পড়াশুনার খুব ভালো, তারপর নানান রকম বই পড়ে সারাদিন। আমার আবার বইপত্তর একদম ভালো লাগে না। ওরা যেদিন বাঁচিতে গেল সেদিন আমি কেমন ঘোরের মধ্যে কাটিয়েছিলাম। সারাক্ষণ মনে হয়েছিল

সুর্মিকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। একবার ভেবেছিলাম ওদের বাড়িতে গিয়ে সুর্মিকে ডেকে সেকথা বলি। বাড়ির কাছে দুবার গিয়েও ফিরে এসেছি। সুর্মি যদি ওর বাবাকে ওই কথা বলে দেয়! ভদ্রলোক আমাকে ঠিক পছন্দ করেন না। অবশ্য মুখে কখনও সেকথা বোঝাননি। কিন্তু আমি জানি মেয়ের স্বামী হিসেবে তিনি আমাকে স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না। সুর্মির স্বামী হবে কোনও অধ্যাপক অথবা বেশ সম্পন্ন মানুষ। আমার তো সেরকম যোগ্যতা কখনও হওয়ার নয়। আমার ট্যাক্সি ডেকে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কিছুতেই তা পারলাম না। আমারই ডেকে দেওয়া ট্যাক্সিতে সুর্মিকে বিয়ে দিতে নিয়ে যাবে ওরা? অসম্ভব! দূরে দাঁড়িয়ে দেখলাম সুর্মি ওর মা-বাবার সঙ্গে ট্যাক্সিতে উঠল তারপর আমার সামনে দিয়ে হুস করে বেরিয়ে গেল। আমার দিকে একবার ফিরেও তাকাল না। আর আমার মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল। মনে হচ্ছিল আচমকা আমার খুব জ্বর হয়েছে, গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। পাড়ার একটা রকে চুপচাপ বসে রইলাম। সমস্ত আকাশ জুড়ে তখন সুর্মির মুখ ছাড়া কিছু নেই। তারপর হঠাৎ বুঝতে পারলাম আমার পায়ের তলায় মাটি নেই, আমি শূন্যে ভাসছি।

সেই সময়টা থেকে নাকি আমার পাগলামি শুরু হয়েছিল। আমি নাকি তারপর রাস্তায়, বাড়িতে সর্বক্ষণ চিৎকার করতাম ওর নাম ধরে।

পাড়ার লোকজন এই নিয়ে হাসাহাসি করত। আমি অবশ্য টের পেতাম না কারণ কোনও বোধ আমার কাজ করত না। তারপর হাসপাতালে শুয়ে-শুয়ে একসময় সেই মাটিটা পায়ের তলায় ফিরে এল। ডাক্তার বলেছে সাময়িক ডিসব্যালেন্স। কিন্তু তারপর থেকে আমার কথা বলতে ইচ্ছে করত না। সুবিধা ছিল এই যে আমাকে কেউ ঘাঁটাত না। হয়তো ভয় পেত, আবার যদি পাগল হয়ে যাই!

এখন আমার ঠিক সেইরকম হল। চোখের সামনেটা সাদা হয়ে যাচ্ছে। মাথার ভেতরে অদ্ভুত যন্ত্রণা হচ্ছে, পা টলছে। আমি দুহাত বাড়িয়ে দেওয়াল ধরতে চাইলাম। আমার কাঁধ থেকে ভারী ব্যাগটা পড়ে গেল, কিন্তু ওটাকে তোলার কথা মনে এল না। সুর্মির চিৎকার কানে এল, 'এই কী হয়েছে তোর? অমন করছিস কেন?'

কিন্তু ততক্ষণে আমার হাঁটুটা ভেঙে গেছে, আমি ট্রেনের মেঝেটায় শুয়ে পড়েছি। সুর্মি আমার ওপর ঝুঁকে পড়ে বারবোর ডাকছে কিন্তু আমি সাড়া দিতে পারছি না। এই সময় অনেকগুলো পায়ের আওয়াজ পেলাম। বুঝতে পারছিলাম আমার চেতনা আছে, কিন্তু আমি প্রকাশ করতে পারছি না। আমি শূন্যে ভাসছিলাম না, এবার আমার পায়ের তলায় মাটিটা নড়েনি। একটা গলা কানে এল, 'কী হয়েছে?'

সুর্মির নার্ভাস গলা শুনতে পেলাম, 'হঠাৎ শরীর খারাপ হয়ে গেছে।' এই সময় সুর্মিকে খুব আপন মনে হল, আন্তরিকতার সুর গলায় স্পষ্ট। একটা আঙুল আমার নাকের সামনে এল, 'না, নিঃশ্বাস পড়ছে। এরকম প্রায়ই হয়?'

সুর্মি বলল, 'না।'

আর-একটা গলা বলল, 'অম্বলে এরকম করে। উঁইড চাপ দিলে সেন্স থাকে না।'

প্রথম গলা বলল, 'একটু ধরুন তো ভাই, ওকে বাথে শুইয়ে দিই। আপনি মাথায় জল বুলিয়ে হাওয়া করুন, যদি সেন্স না আসে তাহলে বর্ধমানে কিছু করা যাবে।'

সুর্মি বলল, 'ওখানে তো ডাক্তার নেই।'

'নামিয়ে দিতে পারি যদি চান। তবে মনে হয় জল দিলে সেন্স আসবে।'

ওরা আমাকে ধরাধরি করে একটা বেঞ্চির উপর শুইয়ে দিল। লোকটা, সম্ভবত টি টি বলল, 'আপনাদের লাগেজ কোথায়?'

সুর্মির গলা শুনলাম, 'এই ব্যাগটাই শুধু। জল কোথায় পাব?'

'ওই তো ওখানে। বাইরে বেসিন থেকে নিয়ে আসুন।'

আর-একজন বলল, 'এই মগটা নিয়ে যাও ভাই।' কণ্ঠটি মহিলার।

একটু পরে সুর্মির নরম ভিজে হাত কপালে অনুভব করলাম। আঃ, কী আরাম। সুর্মি খুব যত্ন করে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে জল দিয়ে। ও আমার পেছনে রয়েছে। ট্রেনটা ছুটছে হু হু করে। এক সময় সুর্মি ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করল, 'এই অতীন, এখন কেমন লাগছে?'

আমি ঠোঁট খুলেই বন্ধ করলাম। না, উত্তর দেব না। যে দক্ষিণেশ্বরে নেমে যাবে তার সঙ্গে কোনও কথা বলব না। ওপাশের মহিলাটি বললেন, 'এখন কথা বলো না ভাই, সেন্স আসতে দাও।' আর-একজন জিজ্ঞাসা করল, 'মৃগী নেই তো?'

সুর্মি উত্তর দিল, 'না।'

আমি কপাল, গাল, গলায় সুর্মিকে অনুভব করছিলাম। আমি এখন এই অবস্থায় যদি মরেও যাই তাহলে এক ফোঁটা দুঃখ হবে না। সুর্মি আমাকে এমন করে ভালোবাসুক। এমন সময় ট্রেনটার গতি কমে আসছিল। এতক্ষণ আমি মড়ার মতো পড়েছিলাম। ট্রেনটা যখন থামব-থামব করছিল তখন টি টি-র গলা পাওয়া গেল, 'কী, কেমন আছে, সেন্স আসেনি? তাহলে এখানে—'

আমি আর দেরি করলাম না। মাথা নেড়ে 'আঃ-আঃ' বলে উঠলাম। তাতেও শান্ত না হয়ে বললাম, 'মা মাগো!' সঙ্গে-সঙ্গে টি টি বলল, 'বাঃ, এই তো সেন্স এসে গিয়েছে। এই যে ভাই, কেমন আছ?'

আমি লক্ষ করলাম লোকটা সুর্মিকে আপনি বললেও আমাকে তুমি বলল, আমি খুব ধীরে-ধীরে চোখ খুললাম। আমার চোখের পাতা কাঁপছিল। কোনওক্রমে যেন ঘাড় নাড়লাম, ভালো। টি টি জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছিল? কী খেয়েছিলে?'

'নিমকি!' কোনওরকমে বললাম।

ব্যস। সঙ্গে-সঙ্গে সবাই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল, নিমকি খেয়েই আমার অম্বল হয়েছে। যা-তা তেলে ওসব ভাজা হয়, এই আলোচনা চলল। টি টি বলল, 'এখন যেতে পারবে তো?' আমি মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললাম।

টি টি বলল, 'যাক, আর কোনও চিন্তা নেই। ওকে একটু ঘুমুতে দিন।' যখন আর কেউ ধারেকাছে নেই, সুর্মির একটা হাত আমার কাঁধের ওপর তখন ওর চাপা গলা শুনতে পেলাম, 'আমি নামব!'

এই মুহূর্তটির জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। চোখ খুললাম। সুর্মি উঠবার জন্যে সোজা হয়ে বসেছে। ওর চোখে চোখ রেখে বললাম, 'আমাকে ফেলে চলে যাবি?' সুর্মি আমার চোখের দিকে তাকাল। একটু যেন কেঁপে উঠল। তারপর ধীরে-ধীরে ওর চোখ জলে ভরে গেল। আমি দেখলাম ও চোখ বন্ধ করে একটু-একটু করে দেওয়ালে হেলান

দিয়ে মাথাটা বেঁকিয়ে দিল। এক ফোঁটা জল টপ করে গাল বেয়ে নেমে আমার কনুইতে পড়তেই ট্রেনটা দুলে উঠে চলা শুরু করল। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের পাশের গঙ্গার ওপর ট্রেনটা যখন গমগম করতে-করতে উঠে এল তখন সেই জলের ফোঁটাকে আমি অনুভূতিতে পাচ্ছিলাম না। আমি স্থির জানি সেটা কনুই বেয়ে গড়িয়ে পড়েনি।

আমি চোখ বন্ধ করে শুয়েছিলাম। কাঠের বেঞ্চিতে শুতে বেশিক্ষণ ভালো লাগে না। আমার ব্যাগটাকে মাথার বালিশ হিসাবে ব্যবহার করা যায় কিন্তু সেটা নিজে থেকে টেনে আনি কী করে। এখন উঠে বসলে সুর্মি নিশ্চয়ই সন্দেহ করবে। ভাববে এতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে থাকার ব্যাপারটাই ভাঁওতা। একেই অনেক মিথ্যে কথা অন্যলোকের সঙ্গে বলে ওর মনে অবিশ্বাস এনে দিয়েছি। এখন এমনিভাবে কিছুক্ষণ পড়ে থাকা যাক।

ট্রেনের দুলুনিতে চোখ বন্ধ করা থাকলে ঘুম এসে যায়। আমি সত্যি বিশ্বাস করতে পারছি না যে আমি শুয়ে আছি আর আমার মাথার পাশে বসে সুর্মি কাঁদছে। যদিও ওর এখনকার কান্নার কোনও শব্দ নেই কিন্তু আমি সেটা টের পাচ্ছি। আচ্ছা, ও দক্ষিণেশ্বরে নেমে গেল না কেন? আমি তো উঠিনি, বাধাও দিতাম না। লোকজন, যারা আমার দিকে তাকিয়েছিল উদ্বেগ নিয়ে তারা তো জ্ঞান হয়েছে জেনে নিজের-নিজের কথায় ফিরে গিয়েছিল। সেইসময় টুক করে উঠে পায়ে-পায়ে দরজার কাছে গিয়ে নেমে পড়লেই হতো। স্টেশন থেকে নেমে একটা ট্যাক্সি ধরে সোজা বাড়ি ফিরে গিয়ে এসব কথা বলে মায়ের কাছ থেকে টাকা নিয়ে ভাড়া মেটাতে পারত। আমি কোনও কারণ বুঝতে পারছি না। আমি সত্যি কাতর গলায় বলেছিলাম, 'আমাকে ফেলে চলে যাবি,' কিন্তু সেটা শুনে ও যেন পোড়া কলাগাছ হয়ে গেল। তবে কি সুর্মিও আমাকে ভালোবাসে। আমার খুব জিগ্যেস করতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু এখন উঠে কথা বললে—।

সুনীল প্রধানের সঙ্গে ভাগ্যিস বন্ধুত্ব ছিল নইলে আজ আমি ট্রেনেও উঠতাম না আর সুর্মিও আমার মাথার পাশে বসত না। সুনীল আমার সঙ্গে একবছর পড়েছিল। কার্শিয়াং-এর ছেলে, খুব হাসিখুশি, নেপালিরা শুধু বেঁটেই হয় না তা ওকে দেখে জেনেছিলাম। সুনীলের বাবার বেশ টাকাপয়সা আছে, নইলে ও ওইরকম পোশাক আর ঠাটে হোস্টেলে থাকতে পারত না। সুনীলের সঙ্গে প্রথম বন্ধুত্ব হয়েছিল দিলীপের। দিলীপ আর আমি ছেলেবেলার বন্ধু। আমি পাগল হয়ে যাওয়ার পর, ওই শুধু আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরে আসার পর আমি যখন আর কলকাতায় থাকতে চাইছিলাম না, একটা চাকরি নিয়ে কোথাও যাওয়ার পরিকল্পনা আঁটছিলাম তখন দিলীপই আমাকে সুনীলের কথা মনে করিয়ে দিল। কার্শিয়াং-এ সুনীলদের যা প্রতিপত্তি, ওখানে গেলে আমার চাকরির অভাব হবে না। সুনীলের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল দিলীপ। বেশ ভাব হয়েছিল আমাদের। এবছর ওর বাবা ওকে কলকাতা থেকে সরিয়ে দার্জিলিং-এ নিয়ে গেছে। ওখানকার কলেজে পড়ে ওর বাবার ব্যবসায় সাহায্য করবে। সুনীলকে চিঠি দিয়েছি আমি সব কথা জানিয়ে। সব কথা মানে, আমি যাচ্ছি, একটা চাকরি চাই। সুর্মির জন্য কলকাতা ছেড়ে যাচ্ছিলাম, সেকথা লিখিনি। আমার কলকাতা ছেড়ে চলে যাওয়ার খবর মাত্র

দুজন জানে। দিলীপ আর সুনীল। দিলীপ কাউকে বলবে না বলে কথা দিয়েছে। এমনকী আজ সকালেও স্টেশনে এসে টিকিট কিনে দিয়ে গেছে আমার জন্যে। আর সুনীতার খোঁজ কলকাতার কেউ পাবে না। এখন সুর্মি সঙ্গে থাকায় খুব হইচই হবে নিশ্চয়ই। সুর্মির বাবা পুলিশে খবর দেবেন কি? হয়তো দেবেন। কিন্তু পুলিশ খুঁজে পাবে কী করে? সুর্মি যে আমার সঙ্গে দার্জিলিং যাচ্ছে কেউ ভাবতে পারে না।

সুনীল যদি চেষ্টা করে তা হলে দিন সাতেক হোটেলে থেকে যে কোনও একটা চাকরিতে ঢুকে পড়তে পারব। আমার পকেটে এখন বারোশো টাকা আছে। এতটাকা আমি কখনও দেখিনি। বারোশো টাকায় দুজন মানুষের কতদিন যাবে? নিশ্চয়ই তার মধ্যে আমার রোজগার শুরু হয়ে যাবে। আজই সোওয়া এক ভরি হার বিক্রি করে আমি তেরোশো টাকা পেয়েছি। উফ্, বিক্রি করতে গিয়ে কী ঝামেলায় না পড়া গিয়েছিল। সোনার দোকানের লোকটা কিছুতেই বিশ্বাস করবে না ওটা চুরি করা নয়। আমরা বেশ নার্ভাস ছিলাম, তাই লোকটা আমাদের ঠকিয়ে দিল। তা তেরোশো টাকা কম কীসে। দিলীপকে একশো টাকা দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু দিলীপ নেয়নি। বলেছিল, 'তোর এখন খুব দরকার হবে টাকার, তুই রাখ।' দিলীপের কথাই ফলে গেল। সুর্মি সঙ্গে থাকলে টাকার তো দরকার হবেই। বাড়িতে অবশ্য এখনই খুব হইচই হবে না। আমি পাগল হয়ে যাওয়ার পর দাদারা খুব লজ্জিত এবং বিরক্ত হয়েছিল আমার জন্যে। হাসপাতাল থেকে ফিরে আমি গম্ভীর হয়ে থাকলেও সেটা বুঝতে পারতাম। অতএব আমার চলে আসাতে ওদের কিছু ক্ষতি হবে না। মা তো জন্মাবধি দেখছি সব ব্যাপারেই নির্লিপ্ত, তবে সেটা থাকবে কোনও বিয়ের নেমন্তন্ন না আসা অবধি। ততদিন মা নিশ্চয়ই তার হারের খোঁজ করবে না।

ট্রেনটা এখন হু হু করে ছুটছে। আমার বেশ ঘুম-ঘুম পাচ্ছে। একবার ঘুমিয়ে পড়লে সারারাত আমার হুঁশ থাকে না। সুর্মিকে একা বসিয়ে রেখে সেটা উচিত হবে না। তাছাড়া আজ দুপুরের পর খাওয়া হয়নি। নিমকির কথাটা মিথ্যে হলেও এখন সত্যি-সত্যি খিদে পাচ্ছে। সুর্মি কী খেয়েছে জানি না, তবে আজ রাত্রে খাবে না নিশ্চয়ই। জোর করে ঘুম তাড়াবার জন্যে উঠে বসব ভাবছি ঠিক সেই সময় সুর্মি ডাকল, 'অতীন, এই অতীন!'

আমি খুব ধীরে-ধীরে চোখ খুললাম। সুর্মি একটু ঝুঁকে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমার চোখ স্পষ্ট হতেই বলল, 'এখন কেমন লাগছে? কষ্ট হচ্ছে?' আঃ, এর চেয়ে আনন্দ আমার আর কী হতে পারে। বুক জুড়িয়ে গেল। আমি সামান্য মাথা নেড়ে উঠে বসতে গেলাম। সঙ্গে-সঙ্গে সুর্মি বাধা দিল, 'না না ওঠার দরকার নেই। তুই শুয়ে থাক।'

আমি সোজা হয়ে বসে বললাম, 'না, আমি ঠিক হয়ে গেছি। তুই চোখ মোছ সুর্মি, এখনও জলের দাগ লেগে আছে।'

অতীন উঠে বসলে ওকে অস্বাভাবিক দেখাচ্ছিল। যদিও বলল ঠিক আছে কিন্তু আমার মনে হল কথাটা সত্যি নয়। ও অবশ্য একটু আগের জলের মতো মিথ্যে কথা বলেছে আর আমি অবাক হয়েছি। কিন্তু এখন তো মিথ্যে বলার দরকার ছিল না। প্রায়

দুঘণ্টা হল আমরা ট্রেনে উঠেছি। যাত্রীরা নিজের বাঙ্কে বিছানা করে রাত্রের খাওয়া শুরু করেছে। আমাদের সঙ্গে ওসব কিছুই নেই বলে সবার চোখে পড়ছি। এই সময় টি টি কাছে এসে দাঁড়াল, 'ঠিক আছ ভাই?'

অতীন মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। লোকটি বলল, 'আমি মালদায় নেমে যাব। তবে তোমাদের ভয় নেই, আমি ওখান থেকে যে টি টি উঠবে তাকে বলে যাবে, মানে এই বার্থ দুটোর জন্যে বুঝলে?'

অতীন আবার ঘাড় নাড়ল। এবং সেই সময় ট্রেনটার স্পিড কমে আসতে টি টি বলল, 'বর্ধমান আসছে।' বলে চলে গেল।

অতীন উঠে দাঁড়াল। আমি এটা একদম চাইছিলাম না। ওর চোখের রং এখনও লালচে। সেটা তো মিথ্যে নয়। আর-একটু শুয়ে থাকতে পারত। কিন্তু ও ততক্ষণে এগিয়ে গেছে বেসিনের দিকে। জলে মুখ ধুয়ে নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। মুখে জল চকচক করছে। এগিয়ে এসে বলল, 'ব্যাগটা দে তো, তোয়ালে বের করব।'

পেছন থেকে ব্যাগটা বের করে এগিয়ে দিতে গিয়ে নিজেই সেটাকে খুললাম। তোয়ালেটা একদম ওপরেই ছিল। সেটা তুলে নিয়ে ওর হাতে দিলাম। মুখ মুছে পরিষ্কার হয়ে আমায় ফেরত দিতে আমি ওটাকে স্বস্থানে রেখেছিলাম। অতীন বলল, 'এর পরে কোথায় থামবে জানি না, তাই রাতের খাবার বর্ধমান থেকেই কিনে নেব। কী খাবি?'

আমার খিদে লাগছে না, খাব না। সত্যি আমার ওসব বোধ ছিল না।

'বোকার মতো কথা বলিস না। অতটা রাত সামনে, না খেলে শরীর খারাপ করবে। আমার ওপর রাগ করে নিজের শরীরটাকে কষ্ট দেবার কোনও মানে হয় না।'

'আমি কারও ওপর রাগ করিনি।'

'করেছিস।'

কী বলব আমি। মুখ ফিরিয়ে নিলাম। ভাগ্য ছাড়া আমি কার ওপর রাগ করতে পারি। এইসময় ট্রেনটা প্ল্যাটফর্মে ঢুকতেই যাত্রীরা দরজার দিকে ছুটল। অতীনও আর দাঁড়াল না। আমি বেঞ্চের ওপর পা তুলে ঠেস দিয়ে বসলাম। প্যাসেঞ্জার পাশের ডবল বার্থটা আমাদের দেওয়া হয়েছে। ফলে গায়ের ওপর দিয়ে লোক যাচ্ছে ঘনঘন। এই কদিন আগে বাবার সঙ্গে রাঁচিতে গিয়েছিলাম ফার্স্টক্লাসের কুপে। অফিস থেকে বাবা খরচ পান। একটা ঘরে আমরা ছাড়া আর কেউ ছিল না। কী আরামেই সেই যাওয়া। তারপরেই মনে পড়ল আমার ক্লাসটেস্ট। সেই পরীক্ষা আমি দিতে পারব না। আমার জন্যে হয়তো কোনও ভালো জিনিস আর কখনও অপেক্ষা করবে না। এই সময় কানে এল মাইকে ঘোষণা করছে—ডাউন হাওড়া লোকাল দু-নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে এখনই ছাড়বে। মনের মধ্যে আনচান করে উঠল, ওই ট্রেনে গিয়ে উঠলে আজকের রাত্রেই নিশ্চয়ই কলকাতা পৌঁছে যেতে পারি। উঠে দাঁড়ালাম তড়াক করে। আর তখনি অতীন বিরাট ঠোঙা হাতে নিয়ে এগিয়ে এসে বলল, 'ধর। আমি হাত ধুয়ে আসি।'

ঠোঙাটা নিয়ে আমি ধীরে-ধীরে বসলাম। জানালা দিয়ে দেখলাম ওপাশে দাঁড়ানো একটা খালি ট্রেন বিপরীত দিকে চলতে শুরু করল। শক্ত চোখে ট্রেনটার

চলে যাওয়া দেখলাম। আমি কাঁদলাম না। কী হবে কেঁদে। আমার ভাগ্যে কী হবে আমি জেনে গেছি।

হাত ধুয়ে এসে অতীন বলল, 'খুব খিদে পেয়েছে। তুই হাত ধুবি না?'

একটুও ইচ্ছে করছিল না। খাওয়ার কোনও বাসনাই নেই। কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম উলটোদিকের বেঞ্চিতে বসে সেই মহিলা এবং অন্যান্যরা আমাদের দেখছেন। অতএব আমি উঠলাম। বেসিনে হাত ধুয়ে এসে ঠোঙা খুললাম। গরম পুরি-তরকারি আর জিলিপি এনেছে অতীন। বেশিরভাগ ওকে দিয়ে নিজের জন্যে সামান্য রাখলাম। খাওয়া শেষ হলে হাত ধোওয়ার পর অতীন বলল, 'যাঃ, জল খাব কী করে? এই জল তো খাওয়া যাবে না।'

মহিলাটি বললেন, 'তোমরা আমাদের জল নিতে পারো।' বলে একটা জলের বোতল এগিয়ে দিলেন। অতীন একটুও দ্বিধা না করে তা থেকে কয়েক ঢোক খেয়ে ঢেঁকুর তুলল। আমি সামান্য খেয়ে বোতলটা এগিয়ে দিতে মহিলা বললেন, 'তোমরা একদম খালি হাত হয়ে এসেছ, কী ব্যাপার?'

অতীন বলল, 'একটা বাস্কেটে ওসব ছিল। তাড়াহুড়োতে ট্যাক্সি থেকে নামবার সময় ফেলে এসেছি।'

'ওমা! পুলিশকে খবর দিয়েছ?'

'দিলে তো আর পাওয়া যেত না এখনই। সুর্মি, তুই এখনই শুয়ে পড়বি?'

আমি বুঝলাম ও কথা ঘোরাচ্ছে। অতীন এখনও কী সুন্দর মিথ্যে কথা বলল। ও যে এ ব্যাপারে এত পোক্ত তা আমি জানতাম না। বললাম, 'তুই শুয়ে পড়।'

'আমি ওপরে শুচ্ছি, তুই নিচে শো।' ব্যাগটা ওপরের বাঙ্কে রেখে অতীন তা থেকে একটা চাদর বের করে নিচের বেঞ্চিতে পেতে দিয়ে বলল, 'এই ব্যাগে মাথা রেখে শুয়ে পড়।'

আমি অবাক গলায় বললাম, 'তুই?'

ও হাসল, 'আমার দরকার হবে না। আমার আরাম আমি পেয়ে গেছি।'

বুঝলাম না কথাটা। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোথায়?'

চাপা গলায় ও উত্তর দিল, 'এই তো আমার সামনে দাঁড়িয়ে। এখন আমার চেয়ে সুখী পৃথিবীতে আর কেউ নেই। বালিশের, চাদরের তাই দরকার হবে না।'

দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে আমি শুয়েছিলাম। ট্রেন হু হু করে ছুটছে। ওপরে ওঠার আগে জানলাটা বন্ধ করে দিয়েছে অতীন। ও যে আমার কোনও কষ্ট না হয় তার জন্যে সজাগ রয়েছে। ও যা বলছে তা কি ঠিক? ও কি সত্যি আমাকে এরকম ভালোবাসে? হঠাৎ আমার বুকের ভেতর কাঁপুনি এল। পাগল হয়ে অতীন রাস্তায় চিৎকার করেছিল, আই লাভ ইউ সুর্মা। পাগলরা নিশ্চয়ই মিথ্যে কথা বলে না।

চোখ বন্ধ করতেই বাবার মুখটা ভেসে উঠল। বাবা এখন কী করছেন? মা? উর্মি? এখন রাত কত আমি জানি না। নিশ্চয় স্বপ্নাদের বাড়িতে খোঁজ নেওয়া হয়ে গেছে। বাবা এতক্ষণে পাগলের মতো চারধারে খুঁজছেন আমাকে। মা কান্নাকাটি করা ছাড়া আর কী করতে পারেন। বাবার মুখ মনে পড়তেই চাপা কান্নাটা ছিটকে এল। আমি দাঁতে দাঁত চেপে শুয়ে রইলাম। দেওয়ালের দিকে মুখ ফেরানো বলে কেউ

আমাকে দেখতে পাচ্ছে না। আমাদের দুজনকে যদি কেউ ট্যাক্সিতে দেখে থাকে তাহলে বাবা নিশ্চয়ই অতীনের বাড়িতে যাবেন। বাবা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারবেন না আমি অতীনের সঙ্গে এভাবে কোথাও চলে যাব! আমার এতদিনের শিক্ষা, রুচির সঙ্গে মিলিয়ে এটা কখনও হতে পারে না। আমি জানি আজ রাত্রে ওরা কেউ ঘুমুতে পারবেন না। হয়তো পুলিশে খবর দেবেন বাবা। কিন্তু অতীন যে দার্জিলিং যাচ্ছে সেটা তো কেউ জানতে পারবে না। আমি যেভাবে চলে এসেছি খালি হাতে তাতে আমার পক্ষে বেশি দূর যাওয়া তো সম্ভব নয়। আমি যেন দেখতে পেলাম বাবা বলছেন, 'সুর্মি আমাকে না বলে চলে গেল! কী দুঃখ ছিল ওর যে আমাকে একবার বললও না।'

আমি বাবাগো বলে ডুকরে উঠতে গিয়ে কোনওরকমে নিজেকে একটু সামলালাম। ঠিক করলাম যেখানে যাচ্ছি সেখানে পৌঁছেই বাবাকে একটা চিঠি লিখব। সব কথা স্পষ্ট করে লিখে বলব, 'বাবা তুমি এসো' কথাটা ভাবতে বুকের ভেতরটা একটু সহজ হল। আমি স্থির হলাম।

হঠাৎ হাতের ওপর স্পর্শ পেতে চমকে সোজা হলাম। ট্রেনের ভেতর এখন ঘুমের রাজত্ব। কোথাও মানুষের শব্দ নেই। একটানা গাড়ির চাকার ধাতব আওয়াজ ছাড়া কিছু নেই। আমার পায়ের কাছে অতীন বসে আছে। কখন নেমে এসেছে জানি না, চোখাচোখি হতেই বলল, 'সুর্মি, প্লিজ, প্লিজ, কাঁদিস না। তুই বিশ্বাস কর, তুই ছাড়া আমার কেউ নেই। তোকে আমি—।' ও আমার হাত আঁকড়ে ধরল, 'তুই আমার ওপর একটু আস্থা রাখ, দেখবি তোকে কখনও কষ্ট দেব না। সুর্মি আমাকে একটু ভালোবাসা দে, আমি আর কিছু চাই না।'

কেন জানি না, এখন এই রাত্রে যে আমি একটু আগে বাবার জন্য কাঁদছিলাম সেই আমার মনে ক্রমশ একটা মায়ার আকাশ তৈরি হয়ে গেল। আমার এই বয়স পর্যন্ত কোনও পুরুষের মুখে এমন আকুতি শুনতে পাইনি। অতীন ভিক্ষে চাওয়ার মতো আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। আমি কোনওরকমে বললাম, 'ঠিক আছে। আমি আর কাঁদব না, যা তুই শুয়ে পড়।'

সুর্মার মা স্বপ্নাদের বাড়ি থেকে নেমে এসে কী করবেন বুঝতে পারছিলেন না। একটু আগে স্বপ্নেন্দু ফিরেছেন। ওঁর আজ রাঁচিতে যাওয়া হয়নি। অফিসের কাজ শেষ হয়নি এখনও। একটু আগে বৃষ্টিতে ভিজে বাড়ি এসে সুর্মাকে না দেখে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। বৃষ্টি ধরতেও যখন এল না তখন সুর্মার মা নিজে এসে খোঁজ নিয়েছিলেন স্বপ্নাদের বাড়িতে। সুর্মা নাকি সেই বিকেলবেলায় ডায়েরি নিয়ে বেরিয়ে গেছে, বেশিক্ষণ বসেওনি।

বাড়ি গিয়ে দেখলেন সুর্মা আসেনি। বৃষ্টিতে পথে আটকে থাকলে এতক্ষণে ফিরে আসা উচিত ছিল। স্বপ্নেন্দু বললেন, 'ও তো এরকম কখনও করে না। দিনকাল ভালো নয়, অ্যাক্সিডেন্ট হল কি না কে জানে।'

সুর্মার মা বললেন, 'পাড়ার মধ্যেই ছিল, সেরকম কিছু হলে জানতাম না?'

নটা বেজে গেলে অস্থির হয়ে স্বপ্নেন্দু বের হলেন। দুবার পাড়াটা পাক দিয়ে

ইয়াং বুলেটস-এর সামনে এসে দাঁড়ালেন। কয়েকটি ছেলে বারান্দায় এসে আড্ডা মারছে। এদের তিনি খুবই অপছন্দ করেন। তবু মনে হল এরা দেখে থাকতে পারে সুর্মাকে। ওদের মধ্যে একটি পরিচিত মুখকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, তোমরা এখানে কতক্ষণ ধরে আছ?'

'কেন বলুন তো!'

'আমার মেয়ে সুর্মাকে তো চেনো। ও বাড়ি ফেরেনি ভাই—।'

স্বপ্নেন্দুর কথাটা শেষ করতে অস্বস্তি হচ্ছিল। এখনই কথাটা হাওয়ায় ভেসে বেড়াবে।

'না তো ওকে দেখিনি। কোথায় গিয়েছিল?' ছেলেরা উৎসুক হল।

'ওর বন্ধু স্বপ্নার বাড়িতে। তা সেখান থেকে বিকেলেই বেরিয়ে পড়েছে। কোথায় যে গেল। ওর মা কান্নাকাটি করছে। আচ্ছা ভাই চলি!' স্বপ্নেন্দু পা বাড়াতেই ছেলেটা বলল, 'আমরা তো বৃষ্টির পর এসেছি। ঠিক আছে, আমরা দেখছি।'

স্বপ্নেন্দু বড় রাস্তা অবধি এসে আবার ফিরে গেলেন। মনে হল বাড়িতে ফিরে নিশ্চয়ই মেয়েকে দেখতে পাবেন। দরজায় স্ত্রী দাঁড়িয়ে, ওঁকে দেখেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'পেলে?'

'বাড়িতে আসেনি?'

'না।'

'তাহলে—?' স্বপ্নেন্দুর ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। আর তখনই সুর্মার মা ডুকরে কেঁদে উঠলেন, 'কী হল মেয়েটার! তুমি খোঁজ নাও, আমার ভয় করছে।'

পাশের ফ্ল্যাটের লোকজন বেরিয়ে এল। মুহূর্তেই সমস্ত পাড়াময় খবরটা চাউর হয়ে গেল। সুর্মাকে পাওয়া যাচ্ছে না, বিকেলে বেরিয়ে বাড়ি ফেরেনি। এক-একজন এক-একরকম পরামর্শ দিতে লাগল। পুলিশে খবর দেওয়ার আগে একবার ওর মাসির বাড়িটা দেখে আসা দরকার। কোনও অভিমান করে মেয়ে যদি সেখানে গিয়ে বসে থাকে। অবশ্য সেরকম মেয়ে সুর্মা নয়, তবু স্বপ্নেন্দু কোনও চান্স নিতে চাইলেন না। বাড়ি থেকে বের হতেই ইয়াং বুলেটস-এর ছেলেগুলোকে দেখতে পেলেন তিনি। ওরা বোধহয় তাঁর কাছেই আসছিল। পরিচিত ছেলেটি বলল, 'কাকাবাবু, একটা হদিশ পেয়েছি।'

বুকের মধ্যে ঢেউ উঠল যেন ছলাৎ করে। স্বপ্নেন্দু তাকালেন।

'বৃষ্টির জন্যে পাড়ার ফুচকাওয়ালা পালিয়ে যাচ্ছিল তাড়াতাড়ি, তখন ও দেখতে পেয়েছে সুর্মা ফুটপাথে দাঁড়িয়ে অতীনের সঙ্গে কথা বলছিল।'

'অতীনের সঙ্গে!' স্বপ্নেন্দু অবাক হলেন।

'হ্যাঁ। আপনি অতীনের কেসটা জানেন তো?'

'না।'

'অতীন আপনারা রাঁচি চলে যাওয়ার পর পাগল হয়ে গিয়েছিল। রাস্তায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করত সুর্মার নাম ধরে।'

'সেকি! কেন?'

ছেলেগুলো উত্তর না দিয়ে নিজেদের মধ্যে হেসে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

'না-না, এ তোমরা ঠিক বলছ না।' স্বপ্নেন্দুর পায়ের তলার মাটি যেন টলছিল। সুর্মা এই বয়সে অতীনের মতো ছেলেকে কখনই প্রশ্রয় দেবে না। এরা সত্যি কথা বলছে না।

ছেলেটি বলল, 'সুর্মার দোষ আছে কি না জানি না, কিন্তু অতীনের ঘটনাটা সত্যি। আমাদের মনে হয় একবার অতীনের বাড়িতে গিয়ে খোঁজ করলে সুর্মা কোথায় আছে জানা যাবে। আপনি আমাদের সঙ্গে চলুন।'

স্বপ্নেন্দু কিছুতেই মানতে পারছিলেন না। সুর্মার সঙ্গে অতীনের কোনও যোগ থাকতে পারে না। হয়তো পথে দেখা হয়েছে, দু-একটা কথা বলেছে আর তখন ফুচকাওয়ালা দেখে থাকতে পারে। তার মানেই সুর্মা আর অতীন কোথাও গিয়েছে এ তিনি মানতে পারেন না। ফুচকাওয়ালা অবশ্য সুর্মাকে অনেকদিন থেকেই চেনে কিন্তু তার কথাটাই...ছেলেটিকে বললেন, 'তুমি একা গিয়ে অতীনকে ডেকে আনো। দলবেঁধে যেও না, আমি এখন অপেক্ষা করছি।'

ছেলেটি একটু বাদেই একা ফিরে এল। এসে বলল, 'অতীন বাড়িতে নেই কাকাবাবু। আজ বিকেলে কোথায় চলে গেছে।'

স্বপ্নেন্দু চিন্তিত হলেন, 'অতীন বাড়িতে নেই!' তাহলে—! আর অপেক্ষা করতে পারলেন না তিনি। সোজা চলে এলেন অতীনের বাড়িতে। এদের সবাইকে তিনি চেনেন। একসময় পাশের বাড়িতে থাকতেন এঁরা।

অতীনের মা, প্রৌঢ়া এবং সাদাসিধে মহিলা, বললেন, 'সে বাড়িতে নেই।'

স্বপ্নেন্দু বললেন, 'শুনলাম। আমার মেয়েকেও পাচ্ছি না। খবর পেলাম আজ বিকেলে ওদের দেখা হয়েছিল। অতীন কোথায় গিয়েছে?'

'বলে যায়নি।'

'কখন ফিরে আসবে বলেছে?'

'না। একটা ব্যাগে জিনিসপত্র নিয়ে চলে গেছে।'

'কী আশ্চর্য! আপনার ছেলে কোথায় যাচ্ছে জিজ্ঞাসা করলেন না?'

'আজকাল আমাদের সঙ্গে কথা বলত না ও। আপনার মেয়ের জন্যেই তো এই দশা!'

'আমার মেয়ে? কী বলছেন আপনি?'

'ঠিকই বলছি। আপনার মেয়ের জন্যেই আমার ছেলে পাগল হয়ে গিয়েছিল। ওইটুকু ছেলের মনে দুঃখ দিলে ভগবান সইবেন না।' অতীনের মা মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। স্বপ্নেন্দু বিরক্ত হলেন, 'আপনি কিছু না জেনে কথা বলছেন। আপনার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের কোনও সম্পর্ক ছিল না। ইদানীং কথাও বলত না ওরা। অতীন যদি মনে কিছু ভাবে তার জন্যে কেউ দায়ী নয়। কিন্তু আপনি মা হয়ে ছেলেকে একবার জিজ্ঞাসাও করলেন না সে কোথায় যাচ্ছে! কোথায় যেতে পারে সে?'

'আমি জানি না। ইদানীং কেউ ওকে পছন্দ করত না। কাল রাত্রে বলছিল কোথায় গেলে চাকরি পাবে। হয়তো দুর্গাপুরে গিয়েছে।' অতীনের মা জানালেন।

'দুর্গাপুরে কে আছেন?'

'ওর কাকা।'

'ওখানে কখনও অতীন এর আগে গিয়েছে?'

'না।'

স্বপ্নেন্দু কী করবেন বুঝতে পারছিলেন না। এইসময় ইয়াং বুলেটস-এর একটি ছেলে বলে উঠল, 'মাসিমা, অতীন যাওয়ার সময় কী-কী জিনিস নিয়ে গেছে?'

'তোয়ালে, সোয়েটার বের করে নিল আলমারি থেকে।'

'সোয়েটার? এখন সোয়েটার নেবে কেন? দুর্গাপুরে তো প্রচণ্ড গরম! ব্যাপারটা ভালো লাগছে না। কাকাবাবু আপনি থানায় খবর দিন।' ছেলেটি বলল।

সেই রাত্রেই থানায় এলেন স্বপ্নেন্দু। এসে অবাক হলেন। ওঁর কলেজজীবনের সহপাঠী প্রণব এখন ওই থানায় পোস্টেড। এত বছর বাদেও চিনতে কোনও অসুবিধে হয়নি। স্বপ্নেন্দু সব খুলে বলার পর প্রণব ডায়েরিতে লিখে নিল। তারপর বলল, 'আমার মনে হচ্ছে তোমার মেয়েকে ছোকরাই লোপ করেছে।'

'কিন্তু কী করে করবে? ওরা তো সমবয়সি বলা যায়। পাড়া থেকে ধরে নিয়ে গেলে সে একা পারবে কেন? আর পাড়ার লোক জানবে না?' স্বপ্নেন্দু প্রতিবাদ করলেন। প্রণব হাসল, 'কিছু মনে করো না, তুমি কী করে নিশ্চিন্ত হচ্ছ যে তোমার মেয়ে ছোকরার প্রেমে পড়েনি?'

'আমি আমার মেয়েকে চিনি।'

'তোমার মেয়ে কোনও লাগেজ নেয়নি সঙ্গে?'

'কিছু না। সত্যি কথা কী ও বাড়ি থেকে বের হতেই চায়নি।'

'এই জায়গাটায় আমার গুলিয়ে যাচ্ছে। প্ল্যান করে গেলেও সঙ্গে জামাকাপড় নিত। ছেলেটার কোনও বন্ধুবান্ধব আছে?' প্রণব জিজ্ঞাসা করল।

'আমি জানি না। তুমি যে করেই হোক মেয়েটাকে ফিরিয়ে আনো ভাই।' স্বপ্নেন্দু সহপাঠীর হাত জড়িয়ে ধরলেন। প্রণব বলল, 'একটু শক্ত হও। আমাদের চেষ্টার ত্রুটি হবে না। এখন চলো তো ছেলেটার সম্পর্কে খোঁজ নিই।'

পুলিশের গাড়ি করে স্বপ্নেন্দু পাড়ায় ফিরে এলেন। রাত দশটা বেজে গেছে তবু রকে-রকে ভিড়। শুধু মেয়ে নয় সঙ্গে একটি ছেলেও উধাও, এই রসময় বার্তা সবাইকে বেশ তপ্ত করেছিল। অতীনের পাগল হওয়ার পেছনে সুর্মার সক্রিয় হাত ছিল তা এতদিনে প্রমাণিত হল পাড়ার লোকের কাছে। প্রণব স্পপ্নেন্দুকে তাঁর বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে অতীনের বাড়িতে চলে গেল। স্বপ্নেন্দুর নিজের বাড়িতে ঢুকতে ভয় করছিল। সুর্মার মা এখন কী অবস্থায় আছে কে জানে! সামনের বাড়ির এক বৃদ্ধ দাঁড়িয়েছিলেন সামনে, বললেন, 'আপনাদের সতর্ক হওয়া উচিত ছিল।'

স্বপ্নেন্দু ক্লান্ত গলায় বললেন, 'আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'আজকালকার ছেলেমেয়ে, এদের জোর করে বাধা দিলে এইরকম হয়!'

স্বপ্নেন্দু অনেক কষ্টে নিজেকে সামলালেন। তিনি কী করে এদের বোঝাবেন যে সুর্মা তেমন মেয়ে নয়। বাধা দেওয়ার কোনও কথাই ওঠেনি। এই মুহূর্তে তাঁর প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল মেয়ের ওপর। এতদিন ধরে তিলে-তিলে মনের মতো করে যাকে গড়েছেন সব ভালোবাসা, রুচি দিয়ে, সে এইভাবে শাস্তি দিল?'

একটু বাদেই প্রণব ফিরে এল গাড়ি নিয়ে। নেমে জিজ্ঞাসা করল, 'দিলীপ কে?

কোথায় থাকে জানো?'

ইয়াং বুলেটস-এর একটি ছেলে বলে উঠল, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, দিলীপ গাঙ্গুলামের পাশের বাড়িতে থাকে। অতীনের বন্ধু।'

দিলীপ বাড়িতেই ছিল। পুলিশ দেখে মুখ শুকিয়ে গেছে ছেলেটার। বড়জোর বছর সতেরো বয়স হবে। ওর বাড়ির লোক হতভম্ব। প্রণব তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার নাম তো দিলীপ। অতীনের বন্ধু?'

দিলীপ কিছু বলল না। বোধহয় ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করছিল।

'অতীন কোথায় গিয়েছে?'

'জানি না।'

'সঙ্গে কে গিয়েছে?'

'আমি কিছুই জানি না।'

'জানো না! তোমার সঙ্গে ওর কবে দেখা হয়েছিল?'

একটু ইতস্তত করে দিলীপ বলল, 'গতকাল।'

'কী কথা হয়েছিল?'

'তেমন কিছু না। ও হাসপাতাল থেকে এসে খুব কম কথা বলত।'

'কোথায় চাকরি করতে যাবে বলেনি?'

'না। বিশ্বাস করুন, আমি কিছু জানি না।'

'সুর্মাকে চেন?'

'চিনি। কিন্তু কখনও কথা বলিনি।'

'সুর্মার কথা অতীন তোমাকে বলত?'

'এখন বলত না।'

প্রণব খানিক ভাবল তারপর বলল, 'হুম। তুমি আমার সঙ্গে চলো।'

'কোথায়?'

'থানায়। কারণ তুমি সত্যি কথা বলছ না।' প্রণব ওর হাত ধরল।

'বিশ্বাস করুন, আমি কিছু জানি না।' প্রায় ককিয়ে উঠল দিলীপ।

স্বপ্নেন্দু এতক্ষণ শুনছিলেন, এবার বললেন, 'ভাই, তুমি যা জানো বলে দাও, খামোকা দেরি করলে মেয়ের বিপদ হতে পারে!'

'আমি কিছু জানি না।' দিলীপ শরীর বেঁকাচ্ছিল।

প্রণব একজন কনস্টেবল ডাকতেই দিলীপ বলে ফেলল, 'ও দার্জিলিং-এ গিয়েছে। আজকের ট্রেনে।'

সবাই একসঙ্গে বলে উঠল, 'দার্জিলিং!'

প্রণব কড়া গলায় ধমকাল, 'এতক্ষণ মিথ্যে কথা বলছিলে কেন?'

'অতীন আমাকে শপথ করিয়েছিল যেন কাউকে না বলি। বিশ্বাস করুন এর বেশি কিছু জানি না!' প্রায় কেঁদে ফেলল দিলীপ।

'দার্জিলিং-এ কার কাছে গিয়েছে?'

'আমাদের সঙ্গে পড়ত একটি নেপালি ছেলে, তার কাছে।'

'কী নাম তার?'

'সুনীল প্রধান। ওখানকার কলেজে পড়ে। কার্শিয়াং-এ থাকে।'

'দার্জিলিং না কার্শিয়াং?'

'কার্শিয়াং।'

'অতীন একা গিয়েছে?'

'হ্যাঁ। আজ সকালে টিকিট একটা কিনেছে ও।'

'টাকা পেল কোথায়?'

দিলীপ আর-একবার চেষ্টা করল মিথ্যে কথা বলতে কিন্তু সে এমন ভেঙে পড়েছিল যে পারল না। শেষে স্বীকার করল তেরোশো টাকায় সে হারটা কিনেছে। মাঝরাত্রে স্বপ্নেন্দুকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে প্রণব বলল, 'মনে হচ্ছে মেয়েটা অতীনের সঙ্গেই গিয়েছে। আমি এখনই লালবাজারে খবর দিচ্ছি যাতে এন. জে. পি. স্টেশনে ওদের ধরে ফেলতে পারে। তুমি চিন্তা করো না কিছু।'

বাড়িতে ঢুকে স্তব্ধ হয়ে গেলেন স্বপ্নেন্দু। সুর্মার মা ডুকরে-ডুকরে কাঁদছে অন্ধকার ঘরে। স্খলিত পায়ে পাশের ঘরে ঢুকলেন তিনি। আলো জ্বালাতেই দেওয়ালের দিকে চোখ চলে গেল। পেছন থেকে তাঁকে জড়িয়ে ধরে সুর্মা ঘাড়ে মুখ রেখে হাসছে। সহজ ঝকঝকে হাসি। একটু মলিনতা নেই কোথাও। সহ্যে থেকে যা হয়নি, নিজেকে সামলে রেখেছিলেন প্রাণপণে, ওই ছবির দিকে তাকিয়ে আর পারলেন না। হাউহাউ করে কেঁদে উঠলেন স্বপ্নেন্দু। ওই উজ্জ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে কান্না জড়ানো গলায় বলতে লাগলেন, 'এ তুই কী করলি মা, আমি যে তোকে—!'

ভোরবেলায় ঘুম ভেঙে গেল। কাল অনেক রাত অবধি জেগেছিলাম। সুর্মা কথা রেখেছিল, আর কান্নাকাটি করেনি। ঘুম ভাঙতেই চেয়ে দেখলাম, ও জোড়াটি হয়ে ঘুমুচ্ছে। ভীষণ মায়া হল দেখে। তারপরেই মনে পড়ল ওর টিকিট নেই। রাত্তিরে আমার অসুস্থতা কিংবা রেলপুলিশের অনুরোধে, যাই হোক না কেন, টি টি আমাদের কাছে টিকিট চায়নি। মালদা থেকে যে উঠেছিল তাকে আমাদের কথা বলে গিয়েছিল লোকটা। কিন্তু মেইন গেট পেরোতে গেলেই তো টিকিট দেখাতে হবে। আমি নামলাম। নতুন টি টি বসে ঢুলছিল। তার কাছে গিয়ে বললাম, 'শুনুন, আপনাকে একটা কথা বলব।'

লোকটা চোখ খুলে আমায় দেখল। তারপর বলল, 'কী কথা?'

আমি অম্লান বদনে বললাম, 'আপনার আগের টি টি আপনাকে পনেরোটা টাকা দিতে বলে গেছেন।' কথা শেষ করেই ওর হাতে টাকাটা গুঁজে দিলাম। লোকটা সেটাকে বেমালুম পকেটে ঢুকিয়ে বলল, 'আমার সঙ্গে বের হতে হবে। ট্রেন থামলেই নেমে পড়বে।'

একটা ফাঁড়া কাটল। বাইরে তখন আলো ফুটছে। বেশ ঠান্ডা-ঠান্ডা ভাব। দূরে পাহাড়ের রেখা দেখা যাচ্ছে আকাশের গায়ে। এদিকে আমি কখনও এর আগে আসিনি। ঠিক করলাম, কোনও ঝুঁকি নেব না।

সুর্মার পায়ের পাশে বসতেই ওর ঘুম ভেঙে গেল। মুখচোখ ফোলা, কপালের ওপর ভাঙা চুল, চট করে উঠে বসল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেমন লাগছে এখন?'

প্রশ্নটা করার কোনও মানে নেই, তবু কিছু বলতে হবে তো। ও আমার দিকে তাকাল। ট্রেনটাকে দেখল, তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'কটা বাজে?' আমার হাতে ঘড়ি নেই। আন্দাজে বললাম, 'ছটা বেজে গেছে মনে হয়।'

ও উদাস চোখে কামরার ভেতরে তাকাল। ও কী ভাবছে এখন? এই সময় কলেজে যাওয়ার কথা, ওর কি তাই মনে পড়ছে? আমি উঠে জানলার খড়খড়ি তুলে দিলাম। টাটকা বাতাস এসে শরীর জুড়িয়ে দিল। দূরে পাহাড়ের আদল এখন অনেকটা স্পষ্ট। অতি দ্রুত বলে উঠলাম, 'দ্যাখ-দ্যাখ কী সুন্দর পাহাড়!'

সুর্মা মুখ ফিরিয়ে তাকাল। ওর চোখে মুখে ভালোলাগা ছড়িয়ে পড়তেই আমার মন ভরে গেল। মুগ্ধ হয়ে সুর্মা উত্তর বাংলার প্রকৃতি দেখছে। উলটো দিকে সূর্য উঠছে কিন্তু তার আলো মাখছে এদিকের আকাশ। মাঠ-জঙ্গলকে দুপাশে ছুড়ে ফেলে আমাদের ট্রেনটা ছুটছে। কিছু দূরে ভিজে পিচের রাস্তায় ভারী-ভারী লরি চলেছে একের পর এক।

হঠাৎ আমার মনে হল কাল রাত থেকে একবারও আমি বাড়ির কথা ভাবিনি। মা কিংবা দাদাদের মুখ একবারের জন্যেও মনে পড়েনি। আর সে কথা একটুও ভাবতে চাই না। নিজের পায়ে না দাঁড়িয়ে কখনও ভাবব না। আমার অতীত আমি এই মুহূর্তে একদম ভুলে যেতে চাই। দার্জিলিং কিংবা কার্শিয়াং-এ আমি চাকরি পেলেই একটা বাড়ি ভাড়া নেব। সুর্মার যদি ইচ্ছে হয় তাহলে পড়াশুনা করবে, আমি কোনও আপত্তি করব না। ব্যাপারটা ভাবতেই আমার খুব ভালো লাগছিল।

ট্রেনের স্পিড কমে আসতে আমি দূরে লোকালয় পেলাম। সুর্মা চুপচাপ বসেছিল। আমি তোয়ালেটা বের করে বললাম, 'যা, বেসিন থেকে মুখ ধুয়ে আয়।'

ও ক্লান্ত চোখে আমার দিকে তাকাল, কী ভাবল, তারপর ধীরে-ধীরে উঠে গেল টয়লেটে। আমি ব্যাগটা গুছিয়ে নিয়ে অন্য টয়লেট থেকে পরিষ্কার হয়ে বেরিয়ে আসতেই দেখলাম সুর্মা ব্যাগটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে। যাত্রীদের ঠেলাঠেলির মধ্যে আমরা চেকারের পেছন-পেছন বেরিয়ে এলাম। সবাই যেদিকে যাচ্ছে চেকার সেদিকে গেল না। বাঁদিকের একটা ঘরের মধ্যে ঢুকে বলল, 'ওই দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাও।' সেখানে আরও কিছু কালোকোট পরা লোক ছিল তারা আমাদের দেখে হাসল। আমি আর কথা বাড়ালাম না। সুর্মাকে নিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে একটু ঘুরে ওভারব্রিজ পেরিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। এক দঙ্গল রিকশা আর ট্যাক্সির সঙ্গে কয়েকটা বাস দাঁড়িয়ে আছে। এদিকে চায়ের স্টল দেখে সুর্মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'চা খাবি?'

সুর্মা মাথা নাড়ল, 'আমি চা খাই না।' তারপর একটু থেমে বলল, 'আমরা কোথায় যাব?'

'কার্শিয়াং।'

খোঁজাখুঁজির পর একটা ছোট বাস আমরা উঠলাম। বাসটা দার্জিলিং যাচ্ছে। বেশিরভাগ লোকই নেপালি, দু-তিনজন বাঙালি অবশ্য আছে। আমরা জানলার ধারে জায়গা পেয়ে গিয়েছিলাম। গাড়িটা যখন ছেড়েছে ঠিক তখনই নজরে পড়ল একটা পুলিশের জিপ দ্রুত এসে স্টেশনের বাইরে থামল। জিপটাকে দেখেই আমার বুক হাঁৎ

করে উঠেছিল। আমি জানি না কী জন্যে জিপটা স্টেশনে এল, কিন্তু মনে হল আমরা যে সময়মতো বাসে উঠে বসেছি সেটা ভাগ্য ভালো বলেই। কথাটা সুর্মাকে বলব কি না বুঝতে পারছি না। ও যদি নার্ভাস হয়ে যায় কিংবা পুলিশে কাছে ধরা দেয়? আমি এখনও ওকে এ ব্যাপারে বিশ্বাস করব না। একটু বাদেই বুঝলাম এই বাসটাতে টুরিস্টদের ভিড় নেই কেন। এমন লড়কড়ে বাস পাহাড়ে উঠতে পারবে কি না আমার সন্দেহ হচ্ছিল।

মনের মধ্যে পুলিশ দেখার পর যে ভয়টা জন্মেছিল সেটা তাড়বার জন্য সুর্মার সঙ্গে কথা বললাম, 'এই তুই এর আগে কখনও দার্জিলিং যাসনি তো, না?

সুর্মা মাথা নাড়ল, 'না'।

আমি বললাম, 'আমাকে একটু ভালোবাসতে পারবি তো?'

ওর ঠোঁটে একটুকরো হাসি উঁকি দিয়েই মিলিয়ে গেল। আমার খুব ইচ্ছে করছিল ওর হাত ধরি, কিন্তু সাহস পাচ্ছিলাম না। আজ সকাল থেকেই কেন জানি না মনে হচ্ছে সুর্মা আমার চেয়ে অনেক বেশি বোঝে, আমার চেয়ে ও অনেক গম্ভীর। নিজেকে ছোট মনে হচ্ছে ওর তুলনায়। অথচ ও তো আমার চেয়ে দশ মাসের ছোট।

বেশ জমজমাট একটা শহরে আমরা এলাম। প্রচুর লোক আর রিকশা দাঁড়িয়ে আছে এখানে-ওখানে। সুর্মাকে বললাম, 'কিছু খাবি না? খুব খিদে পেয়েছে।'

'কী খাবি?'

'দাঁড়া, তুই বোস আমি দেখে আসি কী পাওয়া যায়! ব্যাগটাকে লক্ষ রাখিস।'

বাস থেকে কোনওমতে নামলাম। কারণ প্রচুর নেপালি ওঠার জন্যে ঠেলাঠেলি করছে। বেশ ঠান্ডা লাগল মাটিতে নেমে। জায়গাটা মোটেই পাহাড়ি নয়। আমি একটা মিষ্টির দোকানে ঢুকে সিঙাড়া আর জিলিপি কিনলাম। তারপর চট করে এক গেলাস চা নিয়ে চুমুক দিলাম। সুর্মা খায় না তাই খাবার খাওয়ার আগেই চা খেয়ে নিই।

বাসটা হর্ন দিচ্ছিল আর কন্ডাক্টর চেঁচাচ্ছিল। আমি তাড়াতাড়ি বাসের দরজায় পা রাখলাম। মানুষের ঠাসাঠাসি হয়ে গিয়েছে ভেতরটা। একে ঠেলে ওকে ঠেলে কোনওরকমে যখন সুর্মার পাশে বসলাম তখন দমবন্ধ হয়ে যাওয়ার জোগাড়! আমার ঘাড়ের কাছে একটি নেপালি বউ ঝুঁকে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে আছে যে খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। সুর্মার হাতে ঠোঙাটা দিতে ও নিচু গলায় বলল, 'পুলিশ এসেছিল।'

নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল আমার। বললাম, 'কখন?'

'তুই নামবার পরেই। জানলা দিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করল কী নাম আমার?'

'তুই কী বললি?'

'মিথ্যে বললাম। তারপর জিজ্ঞাসা করল, সঙ্গে কে আছে? আমি বললাম, মামা। লোকটা আমাকে ভালো করে দেখে জিজ্ঞাসা করল, কোথায় যাচ্ছি?'

'তুই কার্শিয়াং বললি?'

'না, শুকনা বললাম।'

আমি অবাক হলাম। শুকনা যে এই রাস্তার কোনও জায়গার নাম আমিই জানি না। সুর্মা হেসে বলল, 'কন্ডাক্টর জায়গার নাম ধরে চেঁচাচ্ছিল তাই জেনেছিলাম।'

'লোকটা কী বলল?'

'আর কিছু না বলে চলে যাচ্ছিল। আমিই জিজ্ঞাসা করলাম, কেন প্রশ্ন করছেন? ও উত্তর দিল, আমরা দুটো বাচ্চাকে খুঁজছি। মনে হয় আমার কথা অবিশ্বাস করেনি।'

কথাটা শোনামাত্র আমার ভয় কেটে আনন্দ হল। গাড়ির চাকা ঘুরতেই আমি খপ করে ওর হাত চেপে ধরলাম খুশিতে। সুর্মা হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'আঃ লাগছে।'

খাবারটা খেয়ে নিয়ে আমি চোখ বন্ধ করলাম। তাহলে সত্যি পুলিশ আমাদের খুঁজছে। আমরা যে এদিকে এসেছি তাও টের পেয়ে গেছে। তার মানে দিলীপ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। অথচ ও শপথ করেছিল—কোনওদিন যদি ব্যাটাকে পাই আমি দেখে নেব। দিলীপ যদি সব কথা বলে থাকে তাহলে সুনীল প্রধানের নামও পুলিশ জেনে যাবে। অথচ ওর ওখানে না গিয়েও তো আমাদের কোনও উপায় নেই। কী যে করি বুঝতে পারছি না। তবে পুলিশ যখন শিলিগুড়ি কিংবা স্টেশনে আমাদের সন্ধান পায়নি তখন হয়তো ভাবতে পারে আমরা দার্জিলিং-এ যাচ্ছি না। সেইটুকুই যা চান্স। দেখি, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হবে।

তবে আমার যেটা লাভ হল সেটার সঙ্গে এই দুশ্চিন্তার কোনও তুলনা হয় না। সুর্মা আমার দলে এসে গিয়েছে। পুলিশের লোকটাকে ও যেভাবে কাটিয়েছে তার তুলনা হয় না। ও তো স্বচ্ছন্দে পুলিশকে সব কথা বলে দিতে পারত। কিন্তু তা করেনি। এতেই বোঝা যাচ্ছে ওর কাছ থেকে আমার কোনও ভয় নেই। কাল রাত্রে আমি ভাবছিলাম স্টেশনে চমৎকার অভিনয় করেছি রেলের পুলিশের সঙ্গে। কিন্তু তখন ও যা করেছে তা আমার চেয়ে কম কিছু নয়। আমরা দুজনে একসঙ্গে যদি ফন্দি আঁটতে পারি তাহলে পুলিশকে এড়ানো সম্ভব হবেই।

এই সময় সুর্মা বলল, 'দ্যাখ কী সুন্দর!'

আমি বাইরে তাকালাম। যদিও নেপালি বউটা আমায় খুব চাপ দিচ্ছে তবু পাহাড়টাকে এগিয়ে আসতে দেখে খুব ভালো লাগল। আমরা এখন লোকালয় ছাড়িয়ে এসেছি। চারধারে গাছপালা এবং সূর্য বেশ ওপরে। সুর্মা বলল, 'ওগুলো নিশ্চয়ই চায়ের গাছ, না রে?'

চা-গাছ আমি কখনও দেখিনি। তবে ছবিতে চা-তোলা কামিনদের ছবি দেখেছি। বললাম, 'হ্যাঁ।'

সুর্মা বলল, 'বিউটিফুল! এরকম জায়গায় আমি সারাজীবন থাকতে পারি!' সুর্মার কথা বলার ভঙ্গি এখন বেশ সহজ, সাবলীল। তার মানে ও এতক্ষণে মন ঠিক করে নিতে পেরেছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখানে তাহলে নামি, কী বল?'

ও চকচকে চোখে হাসল, 'তুই না—'

'আমি কী?'

'মিথ্যেবাদী।' বলে মুখ ঘুরিয়ে নিল সুর্মা।

আমি বললাম, 'নিজে কী? পুলিশটাকে যা বললি তাতে আমার চেয়ে কম যাস না।' আমি কী শেষপর্যন্ত সুর্মার মন পেয়ে গেছি! ব্যাস, আমার মনের সব কষ্ট দূর হয়ে গেল।

লালবাজার থেকে দুপুরে খবর এল নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে দার্জিলিং মেল থেকে যারা নেমেছে তাদের মধ্যে সুর্মাদের পাওয়া যায়নি, শিলিগুড়ি শহরেও চেক করা হয়েছে। দার্জিলিং-এর এস.পি.কে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে, যদি কোনও ফাঁকে ওরা ওখানে পৌঁছে যায় তাহলে লোকেট করতে। কিন্তু সেই সঙ্গে প্রণব যে খবরটা আনল তাতে স্বপ্নেন্দু উত্তেজিত হলেন। গতকাল সন্ধেবেলায় শিয়ালদার প্লাটফর্মে দুটি তরুণ-তরুণী ঝগড়া করছিল। রেলের পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করে জানে তারা ভাইবোন। মেয়েটিও একই কথা বলায় পুলিশ তাদের ট্রেনে তুলে দিয়েছে। পোশাকের বর্ণনা শুনে কারও বুঝতে বাকি রইল না মেয়েটি সুর্মা।

প্রণব বলল, 'ওরা পুলিশকে ধাপ্পা দিয়েছে। তোমার মেয়ে যদি ছেলেটির সঙ্গে প্ল্যান না করে থাকে তা হলে সে-ও মিথ্যে বলল কেন?'

স্বপ্নেন্দু নার্ভাস গলায় বললেন, 'আমি বুঝতে পারছি না। হয়তো লজ্জা কিংবা আমাদের অপমান হবে ভেবে, কী জানি। সুর্মি এত সেন্টিমেন্টাল, চাপা, যে ওর মনে কী হচ্ছে বোঝা মুশকিল। কিন্তু ওদের যদি ট্রেনে তুলে দেওয়া হয়ে থাকে তা হলে কোথায় গেল? নিউ জলপাইগুড়িতে পাওয়া যায়নি বলছে!'

প্রণব বলল, 'সেটাই কথা। হয়তো মাঝখানের কোনও স্টেশনে নেমে গেছে। যাই বলো, এখন মনে হচ্ছে তোমার মেয়ের সহযোগিতা আছে।'

স্বপ্নেন্দু কথাটাকে কিছুতেই মানতে পারছেন না, অথচ প্রতিবাদ করার কোনও উপায় নেই। সুর্মা তো স্বচ্ছন্দে পুলিশকে সব কথা বলতে পারত।

স্বপ্নেন্দু অসহায় চোখে স্ত্রীর দিকে তাকালেন। কাল সারারাত কান্নাকাটির পর আজ সুর্মার মা অনেক শক্ত হয়ে গেছেন। তিনি চুপচাপ এঁদের কথা শুনছিলেন। এবার বললেন, 'পুলিশ তো ভুল করতেও পারে। আমার মনে হচ্ছে ওরা দার্জিলিং-এ গেছে। তুমি আমাকে আজই সেখানে নিয়ে চলো।'

স্বপ্নেন্দু বিহ্বল গলায় বললেন, 'দার্জিলিং-এ যাবে?'

সুর্মার মা বললেন, 'হ্যাঁ। আমি নিজে গিয়ে ওকে নিয়ে আসব। আজকেই কোনওমতে ওখানে পৌঁছনো যায় না?' প্রশ্নটা প্রণবের উদ্দেশ্যে।

প্রণব ঘড়ি দেখল, 'না, আজ ওখানে পৌঁছনোর কোনও উপায় নেই। প্লেন ধরতে পারবেন না। যদি যেতেই হয় তা হলে দার্জিলিং মেল ধরাই ভালো।'

স্বপ্নেন্দু বললেন, 'টিকিট পাওয়া যাবে?' বলেই লজ্জিত হলেন। কাল ওই বাচ্চা মেয়েটা তো বিনা টিকিটেই হয়তো ট্রেনে উঠেছে আর তিনি টিকিটের কথা চিন্তা করছেন।

প্রণব উঠল, 'আমি ব্যবস্থা করছি। তুমি একবার থানা ঘুরে যেও।' প্রণবকে গাড়ি অবধি পৌঁছে দিয়ে ফিরছেন এমন সময় স্বপ্নেন্দু দেখলেন অতীনের বড়দা আসছে। যতীন বোধহয় ভদ্রলোকের নাম, স্বপ্নেন্দু গুলিয়ে ফেললেন।

যতীন কাছে আসতেই স্বপ্নেন্দু বললেন, 'আমরা খবর পেয়েছি যে ওরা দার্জিলিং গিয়েছে। পুলিশ ওদের খুঁজছে যদিও, তবু আজ আমরা ওখানে রওনা হচ্ছি। আপনারা কেউ আমার সঙ্গে যাবেন?'

যতীন বিরক্ত হল, 'পুলিশে খবর দিতে গেলেন কেন? ঘরের কথা খবর কাগজে

বের হবে। না, আমাদের যাওয়ার সময় নেই।'

স্বপ্নেন্দু অবাক হলেন, 'ওরা অল্পবয়সি, যে কোনও মুহূর্তে বিপদে পড়তে পারে, আপনাদের দুশ্চিন্তা হচ্ছে না?'

'দুশ্চিন্তা করে কী করব বলুন! ওইটুকু ছেলে একটা মেয়ের জন্যে পাগল হয়ে যাবে ভাবা যায়? তা ছাড়া, হাসপাতাল থেকে বলেছে ও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়নি। ওর মনের চাহিদা পূরণ না হলে হয়তো আবার পাগল হয়ে যেতে পারে। আপনার মেয়ে সঙ্গে যাওয়ায় মা খুব নিশ্চিন্ত হয়েছেন। ওঁর ধারণা যে অতীন যদি বিয়ে করতে পারে সুর্মাকে, তা হলে আর পাগল হবে না। সে ক্ষেত্রে খামোকা চেজ করতে যাব কেন?'

যতীন চলে গেলে স্বপ্নেন্দু খানিকক্ষণ আচ্ছন্ন হয়ে রইলেন। এ কী যুক্তি তিনি শুনলেন? তারপরেই খেয়াল হল মেয়েটা একটা পাগলের সঙ্গে রয়েছে। যদিও ওই পাগলের হাতে বেশ কিছু টাকা আছে এই মুহূর্তে, তবু কোনওমতেই বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু এই মুহূর্তে তিনি কী করতে পারেন! যদি যাওয়ার চিন্তাটা আর-একটু আগে মাথায় আসত তা হলে আজই প্লেন ধরতে পারতেন। গত রাতটা ওরা ট্রেনে কাটিয়েছে, আজ কোথাও ওঠার আগেই যদি ধরতে পারতেন! সুর্মার যা অভ্যেস, তাতে ও এখন একা-একা কী করছে কে জানে। যে মেয়ে রাত্তিরে একা শুতে পারে না সে কী করে—! কথাগুলো যত ভাবছিলেন তত বুকের মধ্যে হিম করছিল। তিনি চেয়ে দেখলেন সকালের কলেজ ছেড়ে পাড়ার মেয়েরা বাড়ি ফিরছে। দাঁতে ঠোঁট চাপলেন স্বপ্নেন্দু। তারপর কিশোরীদের দিকে তাকিয়ে নিজের মনেই বললেন, 'বোকা মেয়েরা।'

পাহাড় যে এত সুন্দর হয় জানতাম না। অনেকের কাছে শুনেছি পাহাড়ে উঠতে গেলে মাথা ঘোরে, বমি হয়, কিন্তু আমার কিছুই হয়নি। জানলা অবশ্য বন্ধ করে দিতে হয়েছিল খানিক পরেই, কারণ ঠান্ডা বাতাস আসছিল। আমার সঙ্গে তো কোনও দ্বিতীয় রুমাল পর্যন্ত নেই। কী করে পাহাড়ের ঠান্ডায় থাকব বুঝতে পারছিলাম না। বাসি জামাকাপড় কাল থেকে পরে আছি, কিন্তু মনে কোনও বিকার হচ্ছে না। মা থাকলে হয়ে যেত আমার! আজ সকাল থেকে মা-বাবার জন্য কষ্ট হচ্ছে যদিও, তবু বুঝতে পারছি আর আমার ফেরার কোনও উপায় নেই। বাবাকে সব কথা খুলে চিঠি লিখব, আমি ঠিক জানি বাবা আমাকে বুঝতে পারবেন। উনি বলেন, মানুষ ভুল করে এবং মানুষ বলেই সেটা শুধরে নেয়। কিন্তু আমি তো কোনও ভুলই করিনি। একথা, জানি এখন কেউ বুঝবে না। বাবাও কি বুঝবেন না?

অতীন সেই পাহাড়ে ওঠার পর থেকেই সিটে মাথা এলিয়ে ঘুমুচ্ছে। ওর ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে আমার কেন জানি না অন্যরকম লাগছিল। কী সরল, এবং ভালো মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে খুব অসহায়ও। আসলে অতীন তো ঠিক ক্রিমিনাল কিংবা লম্পট নয়। এটুকু বুঝতে পেরেছি, আমি না চাইলেও ও আমাকে পাগলের মতো ভালোবাসে। কী জানি কেন, এতে আমার বেশ গর্ব হচ্ছে। আমার জন্যে একটা ছেলে এরকম ঝুঁকি নিচ্ছে। বোধহয় এই কারণেই আমি শিলিগুড়িতে মিথ্যে কথা বললাম পুলিশের কাছে।

মিথ্যে কথা একবার বলতে আরম্ভ করলে আর অসুবিধে হবে না। বেশ নাটক-নাটক মনে হয়।

এবার আমার বেশ শীত করছে। শীত-শীত ভাবটা অনেকক্ষণ থেকেই ছিল, এবার জাঁকিয়ে এল। আমার তো গরম জামাকাপড় নেই, বাসে যায় দিকেই তাকাই তার গায়ে কিছু না কিছু রয়েছে। এভাবে দার্জিলিং-এ নিশ্চয়ই কেউ যায় না। অতীনের বোধহয় শীত করছিল কারণ ও বেশ কুঁকড়ে আছে। হঠাৎ চোখ মেলে বলল, 'খুব শীত করছে রে!' তারপর দ্রুত ব্যাগটা টেনে নিয়ে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে সোয়েটার বের করল। তারপর আর-একটা। বলল, 'ভাগ্যিস আসার সময় দুটো এনেছিলাম। ময়লা হলে অন্যটা পরব ভেবেছিলাম। তুই এই লালটা পর।'

দুটোই ফুল-স্লিভ। আমি আর দ্বিরুক্তি করলাম না। সোয়েটারটা মাথা গলিয়ে নিলাম। একটু টাইট হলেও বেশ ভালো লাগছে। আমারটা গলা তোলা, আর শীত লাগছে না। নিজেকে দেখতে খুব ইচ্ছে করছিল কিন্তু উপায় নেই। অতীন হাঁ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। বুঝলাম আমাকে নিশ্চয়ই সুন্দর দেখাচ্ছে। আমি মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। গাড়িটা এখন এঁকেবেঁকে শুধু উঠছে তো উঠছেই। মাঝে-মাঝে জনবসতি পেলেই কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিচ্ছে। বাঁ দিকে গভীর খাদ আর ডান দিকে খাড়া পাহাড়, একটু বেঁকে গেলেই নিচে গড়িয়ে পড়ব। হঠাৎ হাতস্পর্শ পেতেই ফিরে তাকালাম। অতীন একটা ছোট চিরুনি এগিয়ে দিচ্ছে। মনে পড়ল আমি সকাল থেকে চুল আঁচড়াইনি। কৃতজ্ঞ হলাম, অতীনের ওপর মনটা খুশিতে ভরে গেল। অত ছোট চিরুনিতে আমার চুল ম্যানেজ করা যায় না ভালো করে, তবু গুছিয়ে নিলাম। অতীন ফিসফিস করে বলল, 'আমি তোকে ভীষণ ভালোবাসি সুর্মি!'

ওর গলার স্বরে কী যেন ছিল, আমি সোয়েটারের ভেতরেও কেঁপে উঠলাম। আমি জানি না কেন, ওর দিকে আর তাকাতে পারলাম না। অতীন চোখ বন্ধ করল। আমার হাত ধরল না কিংবা অন্যভাবে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল না। শুধু শরীরটাকে বাসের সিটে এলিয়ে দিল। যেন ডুবে থাকল।

কার্শিয়াং-এ আমরা নামলাম না। তার আগের একটা ছোট্ট বাজারমতো এলাকায় বাস দাঁড়াতেই অতীন উঠে বসল। তারপর ওপাশে দাঁড়ানো একটা নেপালিকে জিজ্ঞাসা করল, 'কার্শিয়াং আর কতদূর?'

'দো মাইল।'

অতীন বলল, 'এই সুর্মি, উঠে পড়। আমরা এখানেই নামব।'

'এখানে? এটা তো কার্শিয়াং নয়।' আমি অবাক হলাম।

'জানি। কিন্তু কার্শিয়াং-এ নামলে বিপদ হতে পারে। এখানে নেমে তারপর ভাবব কী করে যাওয়া যায় ওখানে।' ব্যাগটাকে হাতে নিয়ে অতীন ভিড় সরিয়ে আমাকে নামিয়ে আনল কী সুন্দর। কুয়াশারা দল বেঁধে নেমে আসছে আমাদের দিকে। ছোট-ছোট টিনের ছাদ-ওয়ালা কাঠের ঘর। দু-তিনটে সবজির দোকান। সবাই নেপালি নয়, কয়েকটি মাড়োয়ারি আছে। বাস ছাড়িয়ে আমরা একটু এগোতেই অতীন বলল, 'দ্যাখ-দ্যাখ, ওঃ কী সুন্দর।'

ততক্ষণে আমারও চোখ পড়েছে। বাঁদিকে আকাশের গায়ে ঝকঝক করছে বরফের

চূড়া। ওখানে মেঘ নেই, কুয়াশা নেই। এত নীল আকাশ, ওরকম সোনালি বরফের পাহাড় আমাকে পাথর করে দিল। নিশ্চয়ই ওটা কাঞ্চনজঙ্ঘা। আমার হঠাৎ ওই দিকে তাকিয়ে কান্না পেয়ে গেল। কেন পেল জানি না। অতীন আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সুর্মি, তুই কাঁদছিস?'

আমি দ্রুত চোখ মুছে নিলাম। তারপর বললাম, 'কোথায় যাবি এখন?'

অতীন চারপাশে তাকিয়ে চাপা গলায় বলল, 'তোর চোখে জল দেখলে আমার নিজেকে ক্রিমিনাল মনে হয়! কিন্তু বিশ্বাস কর, আমি তোকে ভালোবাসি।'

আমি হাসবার চেষ্টা করলাম, 'না, আর কাঁদব না। তবে তুই যত তাড়াতাড়ি পারিস আমাকে একটা খাম আর কলম এনে দিবি?'

'কেন?'

'বাবাকে সবকথা খুলে একটা চিঠি লিখব।'

'কেন?'

'বাবার কাছ থেকে আমি কিছুই লুকোতে পারব না।'

'ঠিক আছে।' অতীন কথাটা বলল বটে কিন্তু বুঝতে পারছিলাম যে ও মন থেকে কথাটা বলল না। সামনেই একটা খাবারের দোকান দেখে ও এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে ডাকল, 'আয়, এখানে আমরা খেয়ে নিই।'

এরকম মোটা রুটি আর তরকারি আমি কখনও খাইনি। কোনওরকমে যা পারি খেয়ে হাত ধুতেই মনে পড়ল ডায়েরিটার কথা। কাল স্বপ্নাদের বাড়ি থেকে বের হবার পর ওটা হাতে ছিল। কোথায় ফেললাম? ট্যাক্সিতে না ট্রেনে? ওতে অনেক জরুরি নোটস, ঠিকানা লিখেছিলাম। তারপরেই ভাবলাম যাক, এখন ওই ডায়েরিতে আর আমার কী দরকার!

বিকেলবেলায় আমরা সোজা দার্জিলিং-এ চলে এলাম। অতীনের এরকম ইচ্ছে ছিল না। খাওয়ার পর ও আমাকে একটা কালভার্টের ওপর বসে সব কথা বলছে। সুনীল প্রধান-এর বাড়ি যদিও কার্শিয়াং-এ কিন্তু ও পড়ে দার্জিলিং কলেজে। সুনীলের বাড়িতেই ওঠার পরিকল্পনা ছিল অতীনের। কারণ দার্জিলিং-এ সবাই বেড়াতে যায়, সেখানে চেনা লোকের দেখা পাওয়া যাবেই। আমরা ঠিক করলাম বাসে উঠব না। কারণ বাসস্ট্যান্ডে পুলিশ থাকতে পারে। অতীন বিদেশের কায়দায় হাত দেখিয়ে গাড়ি থামাচ্ছিল। আমাদের কপাল ভালো তাই দ্বিতীয় গাড়িটাই দাঁড়িয়ে গেল। একটা নেপালি মেয়ে গাড়ি চালাচ্ছে। খুব স্মার্ট এবং সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে। মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'লিফট্ চাও?'

আমরা দুজনেই একসঙ্গে ঘাড় নাড়তে সে পেছনের দরজা খুলে দিল। গাড়িতে উঠে আমি বুঝলাম যাকে আমি মেয়ে ভেবেছি সে আসলে মহিলা। ত্রিশের অনেক বেশি বয়স। গাড়ি চালাতে-চালাতে জিজ্ঞাসা করল, 'কোত্থেকে আসছ?'

আমি জবাব দিলাম, 'কলকাতা।'

'কোথায় উঠবে?'

অতীন উত্তর দিল, 'হোটেলে।'

মহিলা সামনের আয়নার আমাদের দেখে নিল কিন্তু কিছু বলল না। একটু

বলেই কার্শিয়াং-এ এসে গেল। আমরা সাইনবোর্ডে জায়গার নাম দেখতে পেয়ে নড়েচড়ে বসলাম। একটা চৌমাথার মোড়ে ভিড়ের জন্য গাড়িটা আটকে গেল। চারজন পুলিশ দুটি অল্পবয়সি ছেলেমেয়েকে জেরা করছে। ওরা প্রচণ্ড প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও পুলিশরা বোধহয় বিশ্বাস করছে না। রাস্তার লোক এই দেখে মজা পেয়ে ভিড় জমিয়েছে। মহিলা গাড়ি ছাড়লে অতীন যেন নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। আমাকে ফিসফিসিয়ে বলল, 'কার্শিয়াং-এ নামব না, দার্জিলিং-এই চল।' ভাগ্যিস মহিলাকে আমরা গন্তব্যস্থল বলিনি তাই তিনি প্রশ্ন না করে গাড়ি চালাতে লাগলেন একমনে। ছায়া ঘনিয়ে আসছে। শীত সোয়েটারের মধ্যে ঢোকার চেষ্টা করছে। হঠাৎ মহিলা কথা বললেন, 'তোমরা নিশ্চয়ই ভাই-বোন নও! তাই না?' উনি আমাদের দিকে মুখ ফেরাননি। আমি অস্বস্তি বোধ করলাম, 'কী করে বুঝলেন?'

'তোমরা আমার বয়সে এলেই বুঝতে পারবে। দার্জিলিং-এ এর আগে এসেছ?'

'না?'

'কোন হোটেলে উঠবে ঠিক করেছ?'

'গিয়ে খুঁজে নেব একটা।'

'দ্যাটস নট সো ইজি মাই ফ্রেন্ড! এখন দার্জিলিং-এ হেভি রাশ, তার ওপর সন্ধে হয়ে যাবে পৌঁছাতে। ইউ উইল বি ইন রিয়েল ট্রাবল।'

ভয় পেয়ে যাচ্ছিলাম। শীতের মধ্যে দার্জিলিং-এ রাত্রে কোথায় থাকব? আর তারপরেই বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। রাত্রে আমি কখনও একা শুতে পারি না। ছেলেবেলা থেকেই এইরকম অভ্যেস হয়ে গেছে! আজকে আমার সঙ্গে কে শোবে? আমি অতীনের দিকে তাকালাম! অতীন? না, অসম্ভব। আমি ওর সঙ্গে এক ঘরে শুতে পারব না। আবার কান্না পাচ্ছিল কিন্তু সেই সময় অতীন চাপা গলায় বলল, 'ভয় পাওয়ার কিছু নেই! সুনীল ঠিক ম্যানেজ করে দেবে।'

দার্জিলিং-এ পৌঁছে মহিলা বলল, 'তোমাদের কোথায় নামাব?'

অতীন জবাব দিল, 'এখানেই নামিয়ে দিন না।'

'এখানে নেমে কী করবে? এখানে কোনও হোটেল নেই। এখানে তোমার জানাশোনা কেউ আছে?' মহিলাকে চিন্তা করতে দেখলাম।

'হ্যাঁ। কলেজ হোস্টেলে—।'

'দ্যাটস্ গুড। তোমরা এক কাজ করতে পারো। আমার ওখানে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে তুমি ফ্রেন্ডকে খুঁজে বের করে হোটেল দেখে ওকে নিয়ে যেও। ওকে নিয়ে হোটেলে-হোটেলে ঘোরা ঠিক হবে না।' বলে সম্মতির অপেক্ষা না করে গাড়ি চালাতে লাগলেন। অতীনের এই ব্যবস্থা পছন্দ হল না বুঝতে পারছি, কিন্তু আমার মন্দ লাগল না। আমার এখন বাথরুমে গিয়ে ফ্রেশ হওয়া একান্তই দরকার।

মহিলার বাড়ি স্টেশন ছাড়িয়ে অনেকটা দূরে। এটা বলতে পারছি কারণ আসার সময় স্টেশনটাকে দেখতে পেয়েছিলাম। সুন্দর লন পেরিয়ে গাড়িটা থামল। মহিলা জানলার কাচ তুলে দিয়ে বললেন, 'এবারে এসো।' বাড়িটাকে স্পষ্ট বুঝতে না পারলে বুঝতে পারলাম এঁরা বেশ বড়লোক। একটা দারোয়ান গোছের লোক মহিলাকে সেলাম করল। প্রথমেই একটা বিরাট হল ঘর। পায়ের তলায় পুরু কার্পেট। মহিলা বলল, 'তোমরা

এখানে বিশ্রাম করো। ওপাশে একটা টয়লেট আছে। ইচ্ছে করলে ব্যবহার করতে পারো। আমি চেঞ্জ করে আসছি।'

অতীন খুব নার্ভাস হয়ে গেছে, আমারই মতন। কী সুন্দর সোফা, ঘরে একটা হালকা নীল আলো জ্বলছে। অতীন বলল, 'যাচ্চলে! কোথায় এলাম!' তারপর সোফায় বসল। দেখলাম অনেকখানি ডুবে গেল ও। আমি একটু দ্বিধা করে টয়লেটে গেলাম। এমন সুন্দর টয়লেট আমি জীবনে দেখিনি। ইংরেজি সিনেমার মতন। ইচ্ছে করছিল গরম জলের শাওয়ার খুলে স্নান করে নিই। কিন্তু নতুন জায়গায় সাহস পেলাম না। আয়নায় নিজেকে দেখলাম। ইস, মাত্র চব্বিশ ঘণ্টায় আমার চেহারা কতখানি পালটে গেছে!

চা খেতে-খেতে মহিলা জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার পরিচিতজন কোথায় থাকেন, ঠিকানাটা কী?'

অতীন সুনীল প্রধানের ঠিকানা জানাল। মহিলার কপালে ভাঁজ পড়ল, 'একে তুমি কী করে চিনলে? ছেলেটি তো নেপালি।'

অতীন জবাব দিল, 'আমরা একসঙ্গে পড়তাম।'

চা-খাওয়ার পর মহিলার কাছ থেকে পথের নির্দেশ নিয়ে অতীন উঠল। আমার হঠাৎ মনে হল অতীন চলে গেলে আমি খুব একা হয়ে যাব। আমিও তো ওর সঙ্গে যেতে পারি। কিন্তু অতীনটা আমাকে নিয়ে যাওয়ার কথা বলছে না। অতএব এই অপরিচিত মহিলার বাড়িতে আমি একাই রয়ে গেলাম।

চা খেতে নামার সময় মহিলা পোশাক পাল্টে এসেছে। ম্যাক্সির ওপর সোয়েটার মনে হয়েছিল, কিন্তু লক্ষ করে বুঝলাম ওটা ঠিক ম্যাক্সি নয়। কলকাতায় ভুটানিদের পরতে দেখেছি। ছুবা না কী একটা বলে ওটাকে। মহিলা বলল, 'এসো, তোমার সঙ্গে আলাপ করা যাক।' বলে উঠে দাঁড়ালেন। আমি ওঁকে অনুসরণ করে কাঠের রঙিন সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় এলাম। পাশাপাশি চারটে ঘরের একটায় ঢুকে আলো জ্বাললেন। একটা ডাবল বেড সোফা এবং টি ভি সেট।

সোফায় বসে মহিলা জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার নাম কী?'

একটু ইতস্তত করে সত্যি কথা বললাম। আমার নামটা কয়েকবার উচ্চারণ করল মহিলা তারপর বলল, 'বাঃ দারুণ নাম। পড়াশুনা করো!'

'হ্যাঁ, কলেজে।' কলেজ বলতে ভালো লাগল।

'ওকে তুমি ভালোবাস?'

কী বলব? গতকাল কেউ জিজ্ঞাসা করলে আমি চিৎকার করে না বলতে পারতাম কিন্তু এখন সেকথা বলতে পারছি কি। মহিলা হাসল, 'বুঝেছি, কিন্তু তোমরা যে এখানে এসেছ তা তোমাদের মা-বাবা জানেন?'

আমি বললাম, 'আমি জানাবার সুযোগ পাইনি।'

'আই সি। কী নাম ওর?'

'অতীন।'

'এখানে কি শুধুই বেড়াতে এসেছ?'

'না। অতীন চাকরির খোঁজে এসেছে।'

'আচ্ছা! সুনীল ওকে কথা দিয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি একটা বোকা, ভীষণ বোকা মেয়ে। এইভাবে অনিশ্চয়তার ভেসে পড়তে হয়? জানো না, আমাদের মেয়েদের জন্যে পায়ে-পায়ে বিপদ হাঁ করে বসে আছে। এত ইমোশনাল হলে চলে! তোমার সঙ্গে তো একটাই ব্যাগ দেখছি। জামাকাপড় ওতে আছে?'

'অতীনের আছে, আমার নেই!'

'গ্রেট, তুমি নিশ্চয়ই বলবে না এক কাপড়ে চলে এসেছ!'

মাথা নামালাম, 'হ্যাঁ, তাই।'

মহিলা বোধহয় কিছুক্ষণ আমায় দেখল, তারপর উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, জানি না এসব কথা এঁকে বলে ভালো করলাম কি না! অতীন জানলে হয়তো রেগে যেতে পারে। কিন্তু ওঁর কথা বলার ভঙ্গিতে এমন আন্তরিকতা মাখানো যে না বলে পারিনি। একটু বাদেই মহিলা সুন্দর একটা ম্যাক্সি আর শাল নিয়ে ফিরে এল। 'যাও ওই টয়লেট থেকে এগুলো পরে এসো। এক জামাকাপড়ে বেশিদিন থাকতে নেই।'

আমি কখনও অন্যের জামা-কাপড় পরিনি এক অতীনের এই সোয়েটারটা ছাড়া। তবু মনে হল ওগুলো পরলে আমি ফ্রেশ হব। এ ঘরের লাগোয়া টয়লেটে চেঞ্জ করে এলাম। মহিলা বলল, 'বাঃ, চমৎকার। তোমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। নাইস্! বসো। তুমি তো আমার নাম জিজ্ঞাসা করলে না? আচ্ছা বলো তো আমার বয়স কত?'

আমি সত্যি অনুমান করতে পারিনি ওর বয়স এখন চল্লিশ। কথাটা মোটেই মানতে ইচ্ছে করে না অবশ্য। চব্বিশ-পঁচিশ বছরের হলে মানিয়ে যায়। কিন্তু ওর মেয়ের বয়স নাকি আঠারো। কলকাতার লরেটো কলেজে পড়ে। আজ দুপুরে বাগডোগরা এয়ারপোর্টে তাকে তুলে দিয়ে ফেরার পথে আমাদের সঙ্গে দেখা। মেয়ের ছবি আছে ওর লকেটে, দেখলাম। এতক্ষণে আমি ওঁকে বেশ শ্রদ্ধা করতে লাগলাম। মহিলার নাম জিনা দোরজি। সিকিমের মানুষ। তাই অমন লম্বাটে, নাক-চোখও চাপা নয়। স্বামী বছর তিনেক হল মারা গিয়েছে। এই বাড়িটায় মহিলা একা থাকে। ইচ্ছে করেই দার্জিলিং-এ পড়ায়নি মেয়েকে। সে নাকি পড়াশুনায় ভালো কিন্তু চেহারা এত সুন্দর যে ছেলেরা ওর মাথা খারাপ করে দিচ্ছিল। বিশেষ করে ওই সুনীল। কলকাতায় গিয়ে রপ্ত হতে-হতে কলেজটা শেষ করে ফেলবে বলে ওর বিশ্বাস। আমি আর অতীন তো প্রায় মহিলার মেয়েরই বয়সি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি একা থাকতে পারেন?'

'অ্যাদ্দিন পারছিলাম। ঝি-চাকর, এর সঙ্গে মেয়ে ছিল। কিন্তু এখন আর ওরা থাকতে দেবে না!' জিনা হাসলেন।

'কারা?'

'ওই যারা আমাকে বিয়ে করার জন্যে উদগ্রীব হয়ে রয়েছে। আসলে, আমার এই শরীরটাও চায় না যে আমি একা থাকি। মেয়ে পর্যন্ত বলে গেল, মা তুমি বিয়ে করো। থাক আমার কথা। তোমাকে আমার বেশ লেগেছে। আমি বলি কী, তোমরা আজ

রাত্রে এখানেই থেকে যাও! কাল দিনের আলোয় না হয় শিফট করো।' প্রস্তাবটা আমার খুব পছন্দ হল এখন। এই মহিলার কাছে থাকলে আমি নিরাপদে থাকব—এইরকম মনে হচ্ছিল। জানি না অতীন এসে কী বলবে।

সুনীল আমাদের অনেকটা পথ এগিয়ে ফিরে গেল। বাইরে এত ঠান্ডা যে আমি কাঁপছিলাম। এই সোয়েটারে কোনও কাজ হচ্ছে না এখন। রাস্তায় একটাও লোক নেই। দোকানপাটও বন্ধ হচ্ছে। সন্ধেবেলায় যখন মহিলার বাড়ি থেকে বেরিয়ে পথে নেমেছিলাম তখন দার্জিলিংকে দেখে চোখ জুড়িয়ে গিয়েছিল। আলোর হীরে গলায় দুলিয়ে দার্জিলিং তখন হাসছে। জিজ্ঞাসা করে-করে সুনীলের হোস্টেলে গিয়ে পৌঁছেছিলাম ঠিকই। ওদের দারোয়ান আমাকে সুনীলের খোঁজ দিল। সুনীল তখন হোস্টেলে নেই। ম্যালের কাছে একটা রেস্তঁরার ঠিকানা দিয়ে সেখানে খোঁজ নিতে বলল। ম্যালের পথে সাজুগুজু লোকের ভিড়। বেশিরভাগই বাঙালি। যদি চেনা-লোকের মুখোমুখি হতে হয় তাই সাবধানে হাঁটছিলাম।

রেস্তরাঁ যে বেশ বড়লোকি তা দূর থেকে বুঝতে পারলাম। ওটা আসলে বার। বেশ ঝকমকিয়ে বাজনা বাজছে এবং একদল নারী-পুরুষ সেই বাজনার সঙ্গে নৃত্য করছে। আমি দরজার সামনে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে সুনীলকে খুঁজতে লাগলাম। ওই আলো-আঁধারিতে চট করে কাউকে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তা ছাড়া, সিগারেটের ধোঁয়ায় হল ভরতি। আমাকে একটা টেবিল দেখিয়ে বসতে বলল বেয়ারা। আমি তাকে সুনীলের নাম বললাম সে মাথা নেড়ে দ্রুত ভেতরে চলে গেল। আমি আর অপেক্ষা না করে তাকে অনুসরণ করলাম। নাচিয়ে নারী-পুরুষের শরীর বাঁচিয়ে এগিয়ে গেলাম ভেতরে। কোণের দিকে জনাপাঁচেক ছেলেমেয়ে প্রায় নেতিয়ে বসে রয়েছে। সুনীলকে বেয়ারা কিছু বলামাত্র সে মুখ তুলে আমাকে দেখে প্রথমে যেন চিনতেই পারল না। তারপর বোধহয় খেয়াল হতে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'হাই! কবে এসেছ?'

বললাম, 'একটু আগে।'

'কোথায় উঠেছ?' ও আমার সঙ্গে হাত মেলাল।

'ঠিক কোথাও উঠিনি এখনও। আমার চিঠি পেয়েছ?'

'পেয়েছি। সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি বসো তো আগে। কী খাবে বলো?'

চেয়ার টেনে বসলাম। 'কিন্তু আমার থাকার জায়গাটা—।'

'আরে তুমি দার্জিলিং-এ আছ, কলকাতায় নয়। আজ রাত্রে তুমি আমার হোস্টেলে থাকবে। এই বেয়ারা, আউর এক হুইস্কি।' সুনীল চেঁচিয়ে হুকুম করল। ওরা মদ্যপান করছিল বুঝতে পারছি। সুনীলের এই অভ্যাসটার কথা আমার জানা ছিল না। অন্য চারজন আমায় দেখছে। এই পরিবেশে কী কথা বলব বুঝতে পারছি না। আমার বাঁ-পাশের মেয়েটা বলে উঠল, 'এক নেহি টু।' সুনীল হাত নাড়ল, 'নো। তোমার প্রচুর হয়ে গেছে। মিট মাই ফ্রেন্ড ফ্রম ক্যালকাটা, অতীন। এরা আমার বন্ধু। শ্যাম, লিলি, হ্যারি আর লায়লা।'

ওরা একসঙ্গে বলে উঠল, 'হা-ই!'

আমি কী করব বুঝতে না পেরে বোকার মতো হাসলাম।

আমার বিস্ময় কমার আগেই বেয়ারা হুইস্কি আর জল রেখে গেল। আমি বললাম, সুনীল, আমি ড্রিঙ্ক করিনে।'

সঙ্গে-সঙ্গে আমার বাঁ পাশের মেয়েটি ছোঁ মেরে গেলাসটা তুলে নিয়ে ঝুঁকে আমাকে আলটপকা চুমু খেল, 'ওঃ হাই নাইস য়ু আর। আই অ্যাম হেল্পিং য়ু আর।' বলে সামান্য জল মিশিয়ে ঢক করে গিলল মদ।

সুনীল চিৎকার করে উঠল, 'ইউ বিচ্!' অন্য সবাই খিলখিল করে হাসতে লাগল সুনীলের চিৎকার শুনে। এই সময় একটি নেপালি ছেলে দ্রুত আমাদের টেবিলে এসে সুনীলের পাশে গিয়ে তার কানে-কানে কিছু বলল। সুনীলকে খুব অবাক দেখাচ্ছে। সে চাপা গলায় কিছু জিজ্ঞাসা করল। ছেলেটি চটপট উত্তর দিয়ে বেরিয়ে গেল।

তৎক্ষণাৎ সুনীল উঠে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে দুটো একশো টাকার নোট বের করে টেবিলে ফেলে বলল, 'এনজয় ইওরসেলফ। কেউ যদি আমাকে খোঁজে, বলবে দ্যাখোনি।' তারপর আমাকে ইশারা করে বাঁ-দিকে চলে গেল। আমি যেদিক দিয়ে ঢুকেছিলাম এটা তার উলটো দিক। একটা দরজা ঠেলে করিডোর দিয়ে এগিয়ে আর-একটা দরজার সামনে পৌঁছে সুনীল দাঁড়াল, 'কী ব্যাপার তোমার?'

'মানে?'

'তোমার সঙ্গে জড়িয়ে পুলিশ আমাকে খুঁজছে কেন?'

'পুলিশ তোমাকে খুঁজছে?'

'হ্যাঁ, এইমাত্র জানতে পারলাম। তুমি কি আমার হোস্টেলে গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ। দারোয়ানের কাছে শুনলাম তুমি এখানে।'

'তুমি চলে আসার পরই পুলিশ সেখানে গিয়েছে। যদি দারোয়ান তাদের বলে দেয় জায়গাটার কথা। নাউ, লেটস মুভ।' পেছনের সিঁড়ি দিয়ে সুনীল আমাকে নিচে নামিয়ে আনল। তারপর জোরে পা চালিয়ে বেশ কয়েকটা গলি পেরিয়ে একটা দর্জির দোকানে ঢুকে পড়ল। দোকানে তখন বুড়ো বসে ঢুলছে। তাদের বিদেয় করে সুনীল বলল, 'কী হয়েছে বলো, শুনি।'

আমি তখন তাকে সবকথা খুলে বললাম। সুর্মাকে আমার সঙ্গে আনার কোনও পরিকল্পনা ছিল না। ওকে আনার ফলেই এক সমস্যা এসেছে। আমরা পুলিশ স্টেশনে, শিলিগুড়িতে এবং সম্ভবত এখানকার বাসস্ট্যান্ডে ফাঁকি দিয়েছি। পুলিশ কিছুতেই জানতে পারেনি আমরা দার্জিলিং-এ এসেছি।

সুনীল হাসল, 'তুমি তো দারুণ রোমান্টিক। মেয়েটি দেখতে কেমন?'

'আমার চোখে ওর মতো সুন্দরী কেউ নেই।'

'ইজ ইট? কিন্তু এই রাত্তিরে তাকে রেখেছ কোথায়?'

তখন আমি ওই মহিলার কথা বললাম। আমি তার নাম জানি না কিন্তু চেহারা, আর গাড়ির বর্ণনা দিতেই সুনীল বুঝে ফেলল, 'আই সি। শি ইজ কলড দার্জিলিং কুইন। বিরাট লাইন ওর পেছনে। ইউ আর লাকি! ওই যে শ্যামকে দেখলে, ওর মেয়েকে শ্যাম সিডিউস করেছিল।'

'ওর মেয়ে? ওর বড় মেয়ে আছে?'

'ইয়েস। সি ইজ অ্যারাউন্ড আওয়ার এজ। তুমি কি কচি খুকি ভেবেছিলে? ছেড়ে

দাও। চেষ্টা করো ওখানে আজকের রাতটা থেকে যেতে।'

'কী করে বলব?'

'বলবে আমার দেখা পাওনি। ট্রাই টু ম্যানেজ হার। তোমার ভাগ্য খুবই ভালো যে হোটেলে ওঠনি। আর হ্যাঁ, ওকে আমার নাম বলবে না। আমি আজ রাত্রেই কার্শিয়াং-এ নেমে যাচ্ছি। তুমি কাল সকালে তোমার প্রেমিকাকে নিয়ে কার্শিয়াং চলে এসো। স্টেশনের বাঁ দিকে পানবাহার নামে একটা দোকান আছে। সেখানে আমার কথা বললে তুমি পৌঁছে যাবে। ও কে?'

'কিন্তু সুনীল, আমার একটা চাকরি চাই।' আমি ওর হাত ধরলাম।

'সিওর। আমি ব্যবস্থা করব। কিন্তু আগে হাওয়াটাকে ঠান্ডা হতে দাও। আমার বাড়িতে তোমরা স্রেফ থাকবে। চলো তোমাকে এগিয়ে দিই।'

আমরা একটু ঘুরপথ হয়েই বোধহয় বড় রাস্তায় এলাম। আর আসতেই ওর দলটার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। লায়লা বলে মেয়েটি একটা ছেলেকে খুব সাধছিল কিন্তু সে আপত্তি করছে। সুনীলকে দেখামাত্র লিলি ছুটে এল, 'তুমি বেরিয়ে যাওয়ামাত্র পুলিশ এসেছিল।'

'কী বললে?'

'বললাম তোমায় আমরা দেখিনি। কী ব্যাপার?'

'কিছু না। গুডনাইট।'

লায়লা বলল, 'সুনীল, আই অ্যাম নট ফিলিং ওয়েল, একটু এগিয়ে দেবে?'

সুনীল একমুহূর্ত চিন্তা করে বলল, 'বাঃ, ভালোই হয়েছে। তুমি যেদিকে যাবে সেদিকেই লায়লা যাচ্ছে। তোমরা একসঙ্গে যাও, সুবিধে হবে। লায়লাকে সবাই চেনে এখানে। আমার আর দেরি করা উচিত নয়। চলো, তোমাদের ওই মোড় অবধি আমি এগিয়ে দিচ্ছি।' লায়লা আর আমি পাশাপাশি ওর সঙ্গে মোড়ে আসতেই ও হাত নেড়ে বলল, 'কাল সকালে।' বলে ডানদিকের রাস্তা দিয়ে চলে গেল।

লায়লার পায়ের ব্যালান্স ছিল না। আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কোথায় যাবে?' আমি তো নাম জানি না, তাই জবাব দিলাম, 'মিনিট দশেকের রাস্তা।'

'গুড। তাহলে আমার বাড়ি আগেই পড়বে। তুমি একটু ধরো আমাকে। আমি টিপসি হয়ে গেছি। কী যেন নাম তোমার, অতীন? ইজন্ট ইট?'

'হ্যাঁ।' আমাকে ধরতে হল না। লায়লা আমাকে জড়িয়ে ধরল তারপর আমার শরীরের ওপর সমস্ত ভর দিয়ে হাঁটতে লাগল। এভাবে আমার হাঁটা অভ্যাস নেই। তারপর এরকম রাস্তায় এর আগে হাঁটিওনি। ভাগ্যিস রাস্তায় এখন একদম লোক নেই। দোকানপাটও বন্ধ। এই ঠান্ডায় লায়লা একটা স্কার্ট আর জ্যাকেট পরেছে।

আমি বললাম, 'অত ভর দিও না।'

লায়না বলল, 'উম্। তুমি ভার বইতে পারো না? ঠিক আছে, আমাকে জড়িয়ে ধরে হাঁটো। তোমার পক্ষে ইজি হবে। আই অ্যাম রিয়েল টিপসি।'

মনে হল সেইটেই সহজ। আমি ওর পিঠের ওপর একটা হাত দিয়ে ধরে হাঁটতে শুরু করতে ও আর একটা হাতে আমার কোমর জড়িয়ে ধরল। একরকম ভঙ্গিতে অচেনা অজানা পুরুষের সঙ্গে হাঁটতে ওর একদম সঙ্কোচ হচ্ছে না। হঠাৎ আমার শরীরের মধ্যে কী রকম করতে লাগল। ওর শরীরের সঙ্গে যতই ঘর্ষণ হচ্ছে ততই এই অনুভূতিটা

বাড়তে লাগল। কান-মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে। এরকম আমার কখনই হয়নি। গলা শুকিয়ে গেল। হঠাৎ লায়লা বলল, 'তুমি কাঁপছ কেন?' আমার হাত সত্যি কাঁপছিল এবং তা ঠান্ডায় নয়। আমি কোনও কথা বলতে পারলাম না। ও হঠাৎ আমাকে জড়িয়ে ধরল, 'ইউ আর বিউটিফুল। আই নেভার হ্যাড ইট উইথ এ বেঙ্গলি। আমি তোমাকে তখন চুমু খেয়েছি তুমি এখন রিটার্ন দাও।'

সেই নির্জন রাত্রে উন্মুক্ত আকাশের তলায় প্রচণ্ড শীতে দাঁড়িয়ে আমি ঘেমে উঠলাম। আমি বুঝতে পারছিলাম এটা অন্যায়, আমার কিছুতেই এরকম করা উচিত নয়। কিন্তু শরীরে একটুও শক্তি ছিল না। বলতে কী আমার শরীর যে বিদ্রোহ করতে পারে সেই সময় আমি আবিষ্কার করলাম। লায়লার ঠোঁট আমার ঠোঁটের কাছে। উচ্চতায় আমার সমান। ওর নিশ্বাসের হল্কা লাগছে আমার নাকে। জোঁকের মতো ওর ঠোঁট আমার ঠোঁটে আটকে গেল। কতক্ষণ ওই অবস্থায় ছিলাম জানি না। হঠাৎ লায়লার গলা শুনতে পেলাম, 'আমার বাড়ি ওইটে। তুমি ঠিক আধঘণ্টা পরে ডানদিকে জানালায় নক করো, কেমন? উই উইল এনজয় দ্য নাইট। কিন্তু একদম শব্দ করো না। আমার মা একটি হাউন্ড। আধঘণ্টা পরে। গুডবাই!' আমি দেখলাম ও ধীরে-ধীরে নিচে বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। পরপর চারটে জানলা বাড়িটার।

হঠাৎ যেন হু-হু করে ঠান্ডা বাতাস আমার শরীরে ঢুকতে লাগল। নিজের অজান্তেই আমি চিৎকার করে উঠলাম, 'না।' তারপর ছুটতে লাগলাম। খুব নোংরা লাগছিল নিজেকে। চোখের সামনে সুর্মার মুখটা চলে আসতেই ভীষণ কষ্ট হতে লাগল। এ কী করলাম আমি। আমি সুর্মাকে মুখ দেখাব কী করে! রাস্তার পাশে একটা কল থেকে জল পড়ছিল। একটুও ভ্রূক্ষেপ না করে সেই ঠান্ডা জলে মুখ ধুলাম! ঠোঁট ঘষতে লাগলাম! কনকনে শীতও আমার উপযুক্ত শাস্তি নয়। আমি কিছুতেই শান্তি পাচ্ছিলাম না।

বাড়ির গেট পার হতেই একটা লোক আমার পথ আটকাল, 'কিসকো চাহিয়ে?' সেই বিকেলের দারোয়ানটা নয়, নতুন লোক। আগাগোড়া শীতবস্ত্রে মোড়া এই লোকটাকে কী করে বোঝাই কাকে চাই। বিকেলের ঘটনাটা বললাম। লোকটা হাসল 'নিকাল যাইয়ে হিঁয়াসে, নেহিতো—।' লোকটার একটা হাত কোমরে। সেখানে কুকরি ঝুলছিল।

আমি হতভম্ব হয়ে বললাম, 'এ কী বলছ? তোমার মেমসাহেব আমাদের নিয়ে এল—!'

'ফির ঝুট বাৎ, কোই মেমসাব ইয়ে কুঠিমে নেহি রহতা হ্যায়।' প্রায় আমাকে ঠেলে বার করে দিল সে রাস্তায়। আমি কী করব বুঝতে পারছিলাম না। সুর্মা ভেতরে আছে অথচ—! এই রাত্রে আমি কার কাছে সাহায্যের জন্যে যাব? ভীষণ ভয় করতে লাগল আমার! ভাবলাম এখানে দাঁড়িয়ে সুর্মার নাম করে চেচাই। একটু সরে আসতে পাশের বাড়িটার দিকে নজর পড়ল। হুবহু এক রকমের গেট, একই রকমের বাড়ি। সঙ্গে-সঙ্গে ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ল। আমি ভুল বাড়িতে গিয়েছি! হঠাৎ একধরনের আনন্দে শিহরিত হলাম। এবার আর আমাকে বাধা দিল না। সটান ভেতরে দরজায় পৌঁছে বেল বাজালাম। সেই দারোয়ানটা দরজা খুলে আমায় দেখে সেলাম করল। আমি হলঘরের উত্তাপে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকালাম। সুর্মা এখানে নেই। দারোয়ানটা বলল, 'উপরমে যাইয়ে সাব!'

কাঠের রঙিন সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে-উঠতে বুঝলাম মহিলা খুব বড়লোক। একটি অল্পবয়সি মেয়ে আমাকে দেখে এগিয়ে এল, 'আইয়ে, ডিনার রেডি।' নিজেকে হঠাৎ নবাব মনে হচ্ছিল। কিন্তু আমি সুর্মাকে দেখার জন্যে ভেতরে-ভেতরে ছটফট করছিলাম। ওরা সোফায় বসে গল্প করছিল। ওদিকে টেবিলে খাবার সাজানো হচ্ছে। মহিলা আমায় দেখে উঠে দাঁড়ালেন, 'এসো অতীন, সুনীলকে পেলে?'

বুঝলাম সুর্মার সঙ্গে ওর এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আমি বললাম, 'না! ও দার্জিলিং-এ নেই।'

'বাঃ গুড। আজকের রাতটা তাহলে এখানেই থেকে যাও। এসো, খেয়ে নিই আমরা।'

খাওয়ার টেবিলে বসে আবিষ্কার করলাম আমি সুর্মার মুখের দিকে কিছুতেই তাকাতে পারছি না। একটু আগে লায়লার সঙ্গে যে ঘটনা ঘটল তা কিছুতেই ভুলতে পারছি না। আমরা প্রায় নিঃশব্দেই খেয়ে নিলাম। যা কিছু কথা মহিলার সঙ্গে হচ্ছিল।

খাওয়া-দাওয়ার পর মহিলা বললেন, 'তোমাদের কি ওয়াইন খাওয়ার অভ্যেস আছে?' আমরা দুজনে একসঙ্গে মাথা নাড়ালাম। উনি হেসে সেলার থেকে ওয়াইন গ্লাসে ঢেলে একটা সিগারেট ধরিয়ে সোফায় ফিরে এলেন, 'তোমরা নিশ্চয়ই খুব টায়ার্ড। ঘুম পাচ্ছে?'

সত্যি ক্লান্ত লাগছিল। উনি সেই মেয়েটিকে ডেকে আমাকে ঘর দেখিয়ে দিতে বললেন। আমি উঠে দাঁড়াতে বললেন, 'আমার স্বামীর একটা স্লিপিং গাউন আছে ও ঘরে, চেঞ্জ করে নিও! আর হ্যাঁ, গুডনাইট!'

আমি এবার সুর্মার দিকে তাকালাম। নতুন পোশাকে ওকে বেশ দেখাচ্ছে। আর হঠাৎ আমার শরীরে সেই উত্তাপটা ফিরে এল। আমি কোনওরকমে বললাম, 'কাল খুব ভোরে আমাদের বেরিয়ে যেতে হবে।' তারপর আর দাঁড়ালাম না।

ঘরে এসে নিজের বিছানায় আলো নিভিয়ে শুয়েও আমার ঘুম এল না। লায়লা আমার শরীরে আগুন জ্বেলে গিয়েছে। বারংবার সুর্মার মুখ মনে পড়ছে। সুর্মাকে আমি ভালোবাসি। অমরা এক বাড়িতে আছি অথচ—। আমার খুব ইচ্ছে করছিল সুর্মাকে চুমু খেতে। কিন্তু ওই মহিলা, সুর্মা মহিলাকে কতটুকু বলেছে কে জানে! সুর্মাকে কোন ঘরে শুতে দিতে পারে আন্দাজ করার চেষ্টা করলাম! ওপরে তো তিনটে শোওয়ার ঘর লক্ষ করেছি। নিশ্চয়ই পরেরটা। মাঝখানে একটা দরজা আছে এবং সেটা ভারী পর্দাতে ঢাকা। দরজাটা কি খোলা? আমি বিছানায় উঠে বসলাম। আমার কিছুতেই ঘুম আসছে না।

প্রায় ঘণ্টাখানেক আমি নিঃশব্দে বসে থাকলাম। সুর্মাকে এবার দেখার বাসনা তীব্র হয়ে উঠেছে। পা টিপে-টিপে পর্দাটা সরালাম। সামান্য চাপ দিয়ে বুঝলাম দরজাটা ওপাশ থেকে বন্ধ। এটা কি কখনও খোলা হয় না। ভাবলাম বাথরুমে গিয়ে মুখে জল দিলে ঘুম আসবে। ঝকঝকে বাথরুমে ঢুকে নীলচে আলো জ্বালাতেই নজরে পড়ল ওপাশে আর-একটা দরজা আছে। দুটো ঘরের জন্য কমন বাথরুম? খুব সন্তর্পণে ঠেলতেই দরজা খুলে গেল। আমি চোরের মতো অন্য ঘরটিতে প্রবেশ করলাম। কোনও আলো জ্বলছে না। অন্ধকারে নিজের চোখকে অভ্যস্ত করতে কিছু সময়

দিলাম। ঘরের ঠিক ডানদিকে একটা খাট আর তাতে গলা অবধি কম্বল ঢাকা দিয়ে কেউ শুয়ে আছে। এগিয়ে যেতেই চমকে উঠলাম। খাটের ওপাশে কাঠের মেঝেতে বিছানা করে আর একজন শুয়ে। অনুমানে বুঝলাম সেই মেয়েটি নিশ্চয়ই সুর্মা। কিন্তু সুর্মা না হয়ে যদি ওই মহিলা হন, বুকে কাঁপুনি এল। এই ঘরে রাত্রে ওর কাছে ধরা পড়লে কী পরিণতি হবে বলা মুশকিল। তবু আমি শেষবার খাটে শোওয়া শরীরটির মুখ দেখতে চাইলাম। অন্ধকার মানুষের মুখকে এত আড়ালে রাখে কেন? আমি আবার নিঃশব্দে আমার ঘরে ফিরে এসে বিছানায় আছড়ে পড়লাম।

নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে ট্রেনটা বেশি দেরিতেই পৌঁছেছিল। স্বপ্নেন্দু সুর্মার মাকে নিয়ে একটা ট্যাক্সি করলেন। বললেন, 'ভাই খুব বিপদে পড়ে এসেছি কার্শিয়াং-এ পৌঁছে দিন।'

ড্রাইভার নেপালি হলেও পরিষ্কার বাংলা বোঝে এবং বেশ বয়স্ক বলেই বিপদের কথা শুনে একটু সচকিত হল। গাড়ি চালু করে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেউ হাসপাতালে আছে?'

'না ভাই। আমার কলেজে পড়া মেয়েকে ওই বয়সি ছেলে ভুলিয়ে নিয়ে এসেছে এখানে গতকাল। আমরা তাকে খুঁজতে যাচ্ছি।' স্বপ্নেন্দু বললেন।

অন্যসময় হলে চট করে কাউকে এরকম কথা তিনি বলতে পারতেন না। কিন্তু এখন বলে-বলে এই বলাটা তাঁর কাছে সহজ হয়ে গিয়েছে।

ড্রাইভার বলল, 'পুলিশে খবর দিয়েছেন?'

'হ্যাঁ।'

হঠাৎ ড্রাইভারের কিছু মনে পড়ল। সে সামনের কাচে চোখ রেখে শুধোল, 'আপনার মেয়ে কি প্যান্ট পরে? সুন্দরী?'

সুর্মার মা এতক্ষণ এদের কথা শুনছিলেন এবার সোৎসাহে বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ও প্যান্ট-শার্ট পরেই এসেছিল। আপনি দেখেছেন?'

ড্রাইভার বলল, 'ছেলেটি ওর চেয়ে অল্পবয়সি? মুখে দাড়ি আছে?'

স্বপ্নেন্দু বললেন, 'না অল্পবয়সি নয়, তবে দাড়ি আছে। ঠিকই দেখেছেন আপনি। ও ভগবান! যাক তাহলে আমরা ভুল জায়গায় যাচ্ছি না। ভাই, ওদের আপনি কোথায় দেখেছেন?'

ড্রাইভার জানাল, কাল বিকেলে সে যখন কার্শিয়াং যাচ্ছিল তখন ওই দুটি ছেলেমেয়ে হাত তুলে তার গাড়ি থামাতে চেয়েছিল। ওরকম সাধারণ পাহাড়ি গাঁয়ে এইরকম চেহারার বাঙালি ছেলেমেয়ে দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু সঙ্গে যাত্রী থাকায় সে আর থামেনি। এই ছেলেমেয়ে দুটিকে ফেরার পথে কিন্তু চোখে পড়েনি। তার মানে ওরা গাড়ি পেয়ে গিয়েছিল।

স্বপ্নেন্দু উৎসাহ পেলেন। মেয়েকে তিনি ফিরিয়ে নিয়ে যাবেনই।

পাহাড়ে যখন গাড়িটা উঠছিল তখন স্বপ্নেন্দুর মন খারাপ হয়ে গেল। অনেক জায়গায় সুর্মাকে নিয়ে তিনি বেড়াতে গিয়েছেন, কিন্তু এই দার্জিলিংটা হয়ে ওঠেনি। সেই এলেন, কীভাবে এলেন? গাড়ির সিটে হেলান দিয়ে ভাবছিলেন, দুটো রাত কেটে গেল।

কীরকম আছে সুর্মা কে জানে!

কার্শিয়াং পুলিশ স্টেশনে পৌঁছে ট্যাক্সিটাকে ছেড়ে দিলেন না স্বপ্নেন্দু। স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে অফিসারের সঙ্গে দেখা করলেন। অফিসার ইন চার্জ বাঙালি, রিটায়ার্ড হতে আর বেশি দেরি নেই। স্বপ্নেন্দু ওঁর সমস্যার কথা বলতে ভদ্রলোক বললেন, 'হ্যাঁ তারা তো কার্শিয়াং আসেনি।'

'আপনি কি এ ব্যাপারে নিশ্চিত?'

'সিওর। এখানাকার সব হোটেলে সার্চ করেছি। গতকাল অল্পবয়সি ছেলেমেয়ে পেলেই জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। তাই নিয়ে কী ঝামেলাটাই না হল। উহ্। না, কার্শিয়াং-এ আপনার মেয়ে আসেনি।'

'সুনীল, সুনীল প্রধানের বাড়িতে—।'

অফিসার বললেন, 'সুনীল দার্জিলিং-এর হোস্টেলে। কাল বিকেলে খোঁজ নেওয়া হয়ে গিয়েছে। না মশাই, আমার মনে হচ্ছে আপনার মেয়ে এদিকে মোটেই আসেনি। এলে স্টেশন, বাসস্ট্যান্ড এবং এই কার্শিয়াং-এর বাস স্টপেজে ধরা পড়ে যেতই। আজকালকার ছেলেমেয়েরা বড্ড ব্লাফ দেয়।'

স্বপ্নেন্দু মাথা নাড়লেন, 'না, ওরা এদিকেই এসেছে। আমাদের ট্যাক্সি ড্রাইভার গতকাল ওদের দেখেছে হাত নেড়ে লিফট চাইতে। আমি একবার সুনীলের বাড়িতে যেতে চাই। কীভাবে যাব?'

অফিসার খুব জোরে মাথা নাড়লেন, 'সে চেষ্টা একদম করবেন না। খুব ডেঞ্জারাস এলাকায় ওদের বাড়ি। আমি ফোর্স না নিয়ে যাই না। ওর বাবার খুব পয়সা আছে, কিন্তু এই শহরের এক নম্বর কুখ্যাত লোক, খুনজখম ওই বস্তিতে লেগেই আছে। আপনি বরং এক কাজ করুন, সোজা দার্জিলিং-এ গিয়ে সুনীলের সঙ্গে দেখা করুন।'

স্টেশনের পাশে একটি হিন্দুস্থানীর দোকান থেকে ওরা সকালের চা খেলেন। তারপর ট্যাক্সিতে ফিরে গিয়ে বললেন, 'দার্জিলিং-এ যেতে হবে।' লোকটা সম্মতি জানাল। সুর্মার মাকে গাড়িতে বসিয়ে দুটো পান কিনে নিয়ে স্বপ্নেন্দু যখন ফিরছেন তখন উল্টোদিকে একটা শাট্‌ল জিপ থেকে ওরা নামল। অতীন পানের দোকানের ওপর ইংরেজিতে পানবাহার কথাটা লক্ষ করে সুর্মাকে দাঁড়াতে বলে এগিয়ে এল। আর তখনই স্বপ্নেন্দু ট্যাক্সির দরজা বন্ধ করে স্ত্রীর হাতে পান দিলেন। ট্যাক্সিতে বসে ঘাড় ঘোরালেই মেয়েকে দেখতে পেতেন কিংবা সুর্মা চলে যাওয়া ট্যাক্সিটার দিকে আর-একটু আগে তাকালেই বাবাকে দেখতে পেত। দুজনের কেউ জানল না, জানতে পারল না।

অতীন সুনীল প্রধানের নাম বলতেই পানের দোকানের লোকটা একটা ছোকরাকে ডাকল, 'এ কাঞ্চা, এক্তা আও।'

ছোকরা যেন নির্দেশিত ছিল। সে অতীনকে বলল, 'চলিয়ে।' অতীন সুর্মাকে ইশারায় ডেকে ওর সঙ্গে চলতে শুরু করল। দার্জিলিং থেকে এসে এই জায়গাটাকে তেমন পছন্দ হচ্ছিল না সুর্মার। অবশ্য দার্জিলিং-এর কিছুই সে দেখতে পায়নি। তবু জিনা দোরজির জন্যে দার্জিলিংটাকে ওর বেশ পছন্দ হচ্ছিল! আজ ভোরে ঘুম ভেঙে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে যখন আকাশের দিকে তাকিয়েছিল তখন সেদিকটা ছিল ঘোলাটে আচ্ছন্ন। তারপর

হঠাৎ একটা লালচে সোনার মুকুট উঁকি দিল কুয়াশা ফুঁড়ে। তখনি চট করে সরে যেতে লাগল কুয়াশারা, আর ঝকমকিয়ে উঠল কাঞ্চনজঙ্ঘা। সুর্মা এক অনির্বচনীয় আনন্দে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঠিক সেই সময় পেছনে হাতের ছোঁয়া পেয়ে চমকে দেখল জিনা পেছনে দাঁড়িয়ে। হেসে বলল, 'ওই দিকে তাকালে পৃথিবীর সব অহঙ্কার ভেঙে যায় তাই না? কেমন ঘুম হয়েছে?'

ঘাড় কাৎ করে সুর্মা বলেছিল, 'ভাল।'

'আজ তো তোমরা কার্শিয়াং-এ চলে যাবে?'

সুর্মা মাথা নাড়ল। কী বলবে সে!

'শোনো, এভাবে পালিয়ে থেকে জীবনে সুখী হওয়া যায় না। যা সত্যি তার মুখোমুখি হওয়া সবচেয়ে ভালো। তুমি যদি চাও আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি। তোমাদের কলকাতার বাড়িতে টেলিফোন আছে?'

সুর্মা মাথা নেড়ে না বলল।

'ভেবে দ্যাখো, তুমি চাইলে আমি পুলিশকে খবর দিতে পারি যাতে তোমার বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করে।'

'কিন্তু—?' অতীনের মুখ মনে পড়ল সুর্মার। বাবা কি কখনও তাকে ক্ষমা করবেন? করলেও অতীনকে মেনে নেবেন? সে যতদূর জানে কখনও তা সম্ভব নয়। সে মাথা নাড়ল, না। আর অতীনকে ছেড়ে যাওয়ার কোনও প্রশ্ন ওঠে না। এখন যা হোক তা একসঙ্গেই হবে। জিনা দোরজি হেসেছিল, 'জীবনটা কখনই অ্যাডভেঞ্চার নয়। আমার উচিত ছিল তোমাদের এইভাবে ছেড়ে না দেওয়া, কিন্তু তোমরা যখন নিজেই চাইছ। যা হোক, দার্জিলিং-এর কাছাকাছি থেকে যদি বিপদে পড় তাহলে সোজা আমার কাছে চলে এসো।'

কার্শিয়াং-এ আসার পথে সুর্মা ভাবছিল কেন জিনা দোরজি তাদের পুলিশে না ধরিয়ে দিয়ে এমন যত্ন-আত্তি করল? কিছুতেই একটা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা তৈরি করতে পারল না সে।

কিন্তু এখন অতীনের সঙ্গে হাঁটতে-হাঁটতে ওর ক্রমশ ভালো লাগছিল। বেশ উত্তেজনা আছে এইভাবে পালিয়ে বেড়ানোর মধ্যে। বিদেশি বইতেই শুধু এইরকম অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ পাওয়া যায়।

বড় রাস্তা থেকে অনেকটা নিচে নেমে এল ওরা। খুব গরিব এলাকা দিয়ে কিছুটা হাঁটার পর ছেলেটা বলল, 'আ গিয়া।'

খুব সাধারণ একটা কাঠের বাড়ির বারান্দায় সুনীল দাঁড়িয়েছিল। ওদের দেখে নেমে এল সহাস্যে, 'হ্যালো, গুড মর্নিং।'

অতীন হাসল। তারপর সুনীলের প্রসারিত হাতে হাত রাখল, 'তোমার বাড়ি?' সুনীল মাথা নাড়ল, 'ইয়েস। তোমার গার্ল ফ্রেন্ডের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দাও!' অতীন তাড়াতাড়ি সুর্মাকে বলল, 'এই হল সুনীল, তুই তো নাম জানিস। আর এই হল সুর্মা।'

'সুর্মা! বাঃ দারুণ নাম। অতীন ইউ আর লাকিয়েস্ট ম্যান অফ ওয়ার্ল্ড। আপনি খুব সুন্দরী, রিয়েলি।' সুনীল হ্যান্ডশেক করার জন্যে হাত বাড়ালে সুর্মা কী করবে বুঝতে

পারল না। এইভাবে তাকে কখনও সামনাসামনি কেউ রূপের প্রশংসা করেনি। সে কোনওরকমে হাত ছুঁইয়ে নামিয়ে নিল।

সুনীল বলল, 'নাউ, লেট্‌স মুভ। আমার বাড়িতে পুলিশ আসতে পারে তাই তোমাদের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা করেছি।' ছোকরাটিকে বিদায় করে সে ওদের নিয়ে চলল। সুর্মা লক্ষ করল সুনীল খুব সেজেছে। জিন্‌স-এর প্যান্টটা এত চাপা যেন ওর শরীর আঁকড়ে আছে। ভালো করে তাকাতে লজ্জা করল সুর্মার। ওপরে একটা চামড়ার জ্যাকেট, মাথায় কায়দা করা টুপিতে খুব স্মার্ট লাগছে ছেলেটাকে। কিন্তু প্রথমবার দেখেই সুর্মার ওকে পছন্দ হয়নি। ছেলেটার চাহনির মধ্যে এমন কিছু আছে যা অতীনের নেই। ছেলেটিকে ঈশ্বর সরলতা দেননি।

সুনীল দুঘরের একটা বাড়িতে ওদের তুলল। একজন বুড়ি নেপালি মহিলা সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ছিল, সুনীল তাকে বলল, 'দিদি এরা আমার বন্ধু, তোমার কাছে কদিন থাকবে।'

বুড়ি ফোকলা বাঁধানো দাঁত দেখিয়ে হাসল। ঘরে ঢুকে সুর্মা দেখল একটা খাটের ওপর পাতলা তোষক, চাদর আর টেবিল ছাড়া আর কোনও সরঞ্জাম নেই। সুনীল বুড়িকে বলল, 'কম্বল ছইনা?'

'ছ।'

সুনীল বলল, 'পাশেই বাথরুম আছে। দিদি তোমাদের খাবার তৈরি করে দেবে। ওকে রোজ বিশ টাকা দিতে হবে। তোমার কাছে টাকা আছে অতীন?'

অতীন বলল, 'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে। আমি এখন যাচ্ছি, তোমরা ঘর থেকে বেশি বেরিয়ো না। যত কম লোকে তোমাদের দেখে তত ভালো। আই হোপ য়ু উইল লাইক টু স্টে ইন দিস কোজি রুম! বাই।' সুনীল একটা চোখ টিপে চলে গেল।

দার্জিলিং থানার অফিসার ইনচার্জ-এর বক্তব্য শুনে হতভম্ব হয়ে গেলেন স্বপ্নেন্দু। না, সুর্মারা এখানেও আসেনি। প্রতিটি হোটেল চেক করা হয়েছে কিন্তু ওদের পাওয়া যায়নি। এবং সুনীল প্রধানকে কাল বিকেলের পর ওর হোস্টেলে পাওয়া যাচ্ছে না। স্বপ্নেন্দু কী করবেন প্রথমে ভেবে পেলেন না। তিনি অফিসারকে ট্যাক্সি ড্রাইভার যা দেখেছিল তাই বললেন। শুনে ভদ্রলোকের কপালে ভাঁজ পড়ল। তিনি বললেন, 'আমার সঙ্গে চলুন আপনারা। উই শুড ফাইন্ড হিম ফার্স্ট। ছেলেটির মোটেই সুনাম নেই। আপনার মিসেস ইচ্ছে করলে এখানে অপেক্ষা করতে পারেন।'

কিন্তু সুর্মার মা বেঁকে বসলেন, 'না, আমিও যাব।'

অফিসারের সঙ্গে হেঁটে ওরা হোস্টেলে এলেন। সুনীলের রুমমেট কিছুই বলতে পারল না। অনেক প্রশ্ন করে ক্লান্ত হয়ে ওঁরা যখন বেরিয়ে আসছেন তখন স্বপ্নেন্দু দারোয়ানকে দেখতে পেলেন। তিনি দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা ভাই, সুনীল কোথায় গিয়েছে জানো?'

'নেহি সাব।'

অফিসার প্রশ্ন করলেন, 'কাল কোথায় গিয়েছিল?'

'শায়েদ ব্লু বয় রেস্টুরেন্টে। ওহি জায়গাতে চৌইনি খাতা থা।'

স্বপ্নেন্দু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাল ওকে কেউ খুঁজতে এসেছিল?'

'পুলিশ আয়া থা রাতমে।'

'আর কেউ?'

'হাঁ সাব। এক বাঙালি লেড়কা আয়া থা সাত বাজে।'

অফিসার সচকিত হলেন, 'বাঙালি? কীরকম দেখতে?'

'থোড়াসা দাড়ি হ্যায়।'

স্বপ্নেন্দু চেঁচিয়ে উঠলেন, 'অতীন। নিশ্চয়ই অতীন।'

দারোয়ানের কথামতো ওরা ব্লুবয়-তে উপস্থিত হল। এখন বার একদম ফাঁকা। পুলিশ অফিসারকে দেখে ম্যানেজার এগিয়ে এল, 'ইয়েস স্যার?'

'আপনার এখানে রোজ সন্ধেবেলায় সুনীল প্রধান আসে?'

ম্যানেজার একটু ইতস্তত করে বলল, 'ইয়েস।'

'গতকাল এসেছিল?'

'হ্যাঁ।'

'ওর টেবিলে কোন বেয়ারা ছিল?'

বেয়ারাকে ডেকে আনা হলে সে জানাল সুনীল তার চার বন্ধু-বান্ধবীকে নিয়ে বিকেল থেকে এখানে বসে ড্রিঙ্ক করেছে। হ্যাঁ, একজন বাঙালি ছেলে ওর খোঁজে এসেছিল। তার মুখে দাড়ি আছে। তাকে মনে আছে যে সুনীল প্রধানের এক বান্ধবী তার ড্রিঙ্কস নিয়ে চুমু ছুঁড়ে দিয়েছিল। স্বপ্নেন্দু অবাক হলেন। অতীনকে অপরিচিত মেয়ে চুমু খাচ্ছে? কী কাণ্ড।

বেয়ারা তারপর আর ওদের লক্ষ করেনি বলে জানাল। অফিসার মেয়েটির নাম জেনে হেসে ফেললেন, 'সি ইজ হেডেক অফ হার ফ্যামিলি। দার্জিলিং-এর ছেলেদের নষ্ট করছে। কুড়ি বছর বয়সেই কতবার যে প্রেমিক চেঞ্জ করল কে জানে। ওকে চাপ দিলে মনে হয় কিছু খবর পাওয়া যাবে।'

লায়লাকে বাড়িতেই পাওয়া গেল। স্বপ্নেন্দু দেখলেন মেয়েটির শরীরে যৌবন যেন বিপর্যস্ত। একটা হালকা হাউসকোট পরে আছে। ওর মা কড়াগলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী দরকার আমার মেয়ের সঙ্গে?'

'আমি ওকে কয়েকটা প্রশ্ন করব। সুনীল প্রধান কোথায়?'

লায়লা হাসল, 'আই ডোন্ট নো। কাল রাত্রে আমাদের ছেড়ে ও একা চলে গেছে। আপনারা তো সন্ধে থেকে ওর পেছনে লেগেছেন।'

'আচ্ছা, তুমি জানো?'

'হ্যাঁ। সেটা শুনেই ও ছেলেটাকে নিয়ে ব্লু-বয় থেকে পালিয়েছিল। অবশ্য কিছুক্ষণ বাদেই রাস্তায় আমাদের দেখা হয়েছিল। হি ইজ হিরো।'

'হুম, ছেলেটা কোথায়?'

'দ্যাট বেঙ্গলি বয়? বোনলেস ক্রিয়েচার! আমার সঙ্গে এই বাড়ি অবধি এগিয়ে গেল। আশেপাশের কোনও বাড়িতে উঠেছে সে।'

'তুমি ঠিক বলছ? দাড়িওয়ালা বাঙালি ছেলে?'

'হ্যাঁ। আই অ্যাম স্টিল ফিলিং হিজ বিয়ার্ড। বাট হি ইজ নট এ ম্যান।'

ঠোঁট বেঁকাল লায়লা। আর সঙ্গে-সঙ্গে ওর মা চেঁচিয়ে উঠল, 'ওঃ লায়লা, শাট আপ!'

রাস্তায় নেমে অফিসার বললেন, 'মিস্টিরিয়াস। ওরা এখানে কার বাড়িতে উঠতে পারে? চেনাশোনা হল কী করে?'

ভদ্রলোক স্বপ্নেন্দুদের নিয়ে বাড়ি-বাড়ি ঘুরে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। অনেকগুলো বাড়ির পর একটা দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। হ্যাঁ, এই বর্ণনায় একটি ছেলে অনেক রাত্রে বাড়িতে ঢুকতে চেয়েছিল। কিন্তু সে তাকে ঢুকতে দেয়নি। কারণ ছেলেটি একজন মেমসাহেবের খোঁজ নিচ্ছিল আর বলছিল তার কাছে ছেলেটির আত্মীয়রা আছে। তাড়া খেয়ে ছেলেটির পাশের বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। পাশের বাড়িতে নক করে পুলিশ অফিসার বললেন, 'এখানে কী করে আসবে বুঝতে পারছি না। মিসেস দোরজি খুব রেসপেক্টবল মহিলা।'

মিসেস দোরজি নিজেই নেমে এলেন, 'ইয়েস অফিসার।'

'আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত। গতকাল আপনার এখানে দুটো অল্পবয়সি বাঙালি ছেলেমেয়ে এসেছিল?'

জিনা স্বপ্নেন্দু এবং সুর্মার মাকে দেখলেন, 'হ্যাঁ, এসেছিল।'

স্বপ্নেন্দু উত্তেজিত গলায় প্রশ্ন করলেন, 'এসেছিল! তারা আছে?'

মাথা নাড়লেন জিনা, 'না। তারা আজই কার্শিয়াং চলে গেছে।'

অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কার্শিয়াং-এ কোথায়?'

'আই ডোন্ট নো। কাল বাগডোগরা থেকে ফেরার পথে ওরা আমার কাছে লিফট চাইল। রাত হয়ে গেছে এবং ওরা নিউকামার বলে আমার একটু সফ্‌ট হতে ইচ্ছে করল। ছেলেটি যার ওপর ডিপেন্ড করেছিল তাকে এখানে পায়নি। ফলে আমার এখানে শেল্টার নিয়েছিল ওরা। আজ সকালে ওরা চলে গেছে। হোয়াই, এনিথিং রং?' মিসেস দোরজি জিজ্ঞাসা করলেন!

'হ্যাঁ। ওরা পালিয়ে এসেছে। এঁরা হলেন মেয়েটির মা-বাবা। ওই ছেলেটি সুস্থ নয়। অনেক ধন্যবাদ।' অফিসার উঠে দাঁড়ালেন।

'এক মিনিট!' জিনা এগিয়ে এলেন সুর্মার মায়ের কাছে, 'আমি আপনার কষ্ট বুঝতে পারছি। আপনার মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। শি ইজ গুড গার্ল। কী নরম। এটুকু বলতে পারি এখনও অবধি সে ভালো আছে।'

সুর্মার মা হঠাৎ কেঁদে ফেললেন। তাঁর শরীর কাঁপতে লাগল। স্বপ্নেন্দু নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করলেন, 'যে মেয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে তার জন্য কাঁদছ কেন? চলো।'

মিসেস দোরজি বললেন, 'অফিসার, মে আই গিভ ইউ লিফট?'

'আপনি বেরুবেন?'

'হ্যাঁ।'

ওঁরা মিসেস দোরজির গাড়িতে থানায় ফিরে এলেন। এখন দুপুর পেরিয়ে গেছে। সারাদিন ওঁদের খাওয়া হয়নি। কিন্তু সামান্য ক্ষুধা বোধ করছিলেন না। অফিসারের ধারণা ওরা সুনীলের কাছেই গিয়েছে। সুনীলকে অ্যারেস্ট করে আনতে হবে। এস. পি-র কাছ থেকে ফোর্স নিয়ে যাওয়ার অর্ডারটা আনতে সামান্য দেরি

২৭০ পাঁচটি রহস্য উপন্যাস

স্বপ্নেন্দু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাল ওকে কেউ খুঁজতে এসেছিল?'

'পুলিশ আয়া থা রাতমে।'

'আর কেউ?'

'হাঁ সাব। এক বাঙালি লেড়কা আয়া থা সাত বাজে।'

অফিসার সচকিত হলেন, 'বাঙালি? কীরকম দেখতে?'

'থোড়াসা দাড়ি হ্যায়।'

স্বপ্নেন্দু চেঁচিয়ে উঠলেন, 'অতীন। নিশ্চয়ই অতীন।'

দারোয়ানের কথামতো ওরা ব্লুবয়-তে উপস্থিত হল। এখন বার একদম ফাঁকা। পুলিশ অফিসারকে দেখে ম্যানেজার এগিয়ে এল, 'ইয়েস স্যার?'

'আপনার এখানে রোজ সন্ধেবেলায় সুনীল প্রধান আসে?'

ম্যানেজার একটু ইতস্তত করে বলল, 'ইয়েস।'

'গতকাল এসেছিল?'

'হ্যাঁ।'

'ওর টেবিলে কোন বেয়ারা ছিল?'

বেয়ারাকে ডেকে আনা হলে সে জানাল সুনীল তার চার বন্ধু-বান্ধবীকে নিয়ে বিকেল থেকে এখানে বসে ড্রিঙ্ক করেছে। হ্যাঁ, একজন বাঙালি ছেলে ওর খোঁজে এসেছিল। তার মুখে দাড়ি আছে। তাকে মনে আছে যে সুনীল প্রধানের এক বান্ধবী তার ড্রিঙ্কস নিয়ে চুমু ছুঁড়ে দিয়েছিল। স্বপ্নেন্দু অবাক হলেন। অতীনকে অপরিচিত মেয়ে চুমু খাচ্ছে? কী কাণ্ড।

বেয়ারা তারপর আর ওদের লক্ষ করেনি বলে জানাল। অফিসার মেয়েটির নাম জেনে হেসে ফেললেন, 'সি ইজ হেডেক অফ হার ফ্যামিলি। দার্জিলিং-এর ছেলেদের নষ্ট করছে। কুড়ি বছর বয়সেই কতবার যে প্রেমিক চেঞ্জ করল কে জানে। ওকে চাপ দিলে মনে হয় কিছু খবর পাওয়া যাবে।'

লায়লাকে বাড়িতেই পাওয়া গেল। স্বপ্নেন্দু দেখলেন মেয়েটির শরীরে যৌবন যেন বিপর্যস্ত। একটা হালকা হাউসকোট পরে আছে। ওর মা কড়াগলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী দরকার আমার মেয়ের সঙ্গে?'

'আমি ওকে কয়েকটা প্রশ্ন করব। সুনীল প্রধান কোথায়?'

লায়লা হাসল, 'আই ডোন্ট নো। কাল রাত্রে আমাদের ছেড়ে ও একা চলে গেছে। আপনারা তো সন্ধে থেকে ওর পেছনে লেগেছেন।'

'আচ্ছা, তুমি জানো?'

'হ্যাঁ। সেটা শুনেই ও ছেলেটাকে নিয়ে ব্লু-বয় থেকে পালিয়েছিল। অবশ্য কিছুক্ষণ বাদেই রাস্তায় আমাদের দেখা হয়েছিল। হি ইজ হিরো।'

'হুম, ছেলেটা কোথায়?'

'দ্যাট বেঙ্গলি বয়? বোনলেস ক্রিয়েচার! আমার সঙ্গে এই বাড়ি অবধি এগিয়ে গেল। আশেপাশের কোনও বাড়িতে উঠেছে সে।'

'তুমি ঠিক বলছ? দাড়িওয়ালা বাঙালি ছেলে?'

'হ্যাঁ। আই অ্যাম স্টিল ফিলিং হিজ বিয়ার্ড। বাট হি ইজ নট এ ম্যান।'

উনিশ-বিশ ২৭১

ঠোঁট বেঁকাল লায়লা। আর সঙ্গে-সঙ্গে ওর মা চেঁচিয়ে উঠল, 'ওঃ লায়লা, শাট আপ!'

রাস্তায় নেমে অফিসার বললেন, 'মিস্টিরিয়াস। ওরা এখানে কার বাড়িতে উঠতে পারে? চেনাশোনা হল কী করে?'

ভদ্রলোক স্বপ্নেন্দুদের নিয়ে বাড়ি-বাড়ি ঘুরে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। অনেকগুলো বাড়ির পর একটা দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। হ্যাঁ, এই বর্ণনায় একটি ছেলে অনেক রাত্রে বাড়িতে ঢুকতে চেয়েছিল। কিন্তু সে তাকে ঢুকতে দেয়নি। কারণ ছেলেটি একজন মেমসাহেবের খোঁজ নিচ্ছিল আর বলছিল তার কাছে ছেলেটির আত্মীয়রা আছে। তাড়া খেয়ে ছেলেটির পাশের বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। পাশের বাড়িতে নক করে পুলিশ অফিসার বললেন, 'এখানে কী করে আসবে বুঝতে পারছি না। মিসেস দোরজি খুব রেসপেক্টবল মহিলা।'

মিসেস দোরজি নিজেই নেমে এলেন, 'ইয়েস অফিসার।'

'আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত। গতকাল আপনার এখানে দুটো অল্পবয়সি বাঙালি ছেলেমেয়ে এসেছিল?'

জিনা স্বপ্নেন্দু এবং সুর্মার মাকে দেখলেন, 'হ্যাঁ, এসেছিল।'

স্বপ্নেন্দু উত্তেজিত গলায় প্রশ্ন করলেন, 'এসেছিল! তারা আছে?'

মাথা নাড়লেন জিনা, 'না। তারা আজই কার্শিয়াং চলে গেছে।'

অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কার্শিয়াং-এ কোথায়?'

'আই ডোন্ট নো। কাল বাগডোগরা থেকে ফেরার পথে ওরা আমার কাছে লিফট চাইল। রাত হয়ে গেছে এবং ওরা নিউকামার বলে আমার একটু সফ্‌ট হতে ইচ্ছে করল। ছেলেটি যার ওপর ডিপেন্ড করেছিল তাকে এখানে পায়নি। ফলে আমার এখানে শেল্টার নিয়েছিল ওরা। আজ সকালে ওরা চলে গেছে। হোয়াই, এনিথিং রং?' মিসেস দোরজি জিজ্ঞাসা করলেন!

'হ্যাঁ। ওরা পালিয়ে এসেছে। এঁরা হলেন মেয়েটির মা-বাবা। ওই ছেলেটি সুস্থ নয়। অনেক ধন্যবাদ।' অফিসার উঠে দাঁড়ালেন।

'এক মিনিট!' জিনা এগিয়ে এলেন সুর্মার মায়ের কাছে, 'আমি আপনার কষ্ট বুঝতে পারছি। আপনার মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। শি ইজ গুড গার্ল। কী নরম। এটুকু বলতে পারি এখনও অবধি সে ভালো আছে।'

সুর্মার মা হঠাৎ কেঁদে ফেললেন। তাঁর শরীর কাঁপতে লাগল। স্বপ্নেন্দু নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করলেন, 'যে মেয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে তার জন্য কাঁদছ কেন? চলো।'

মিসেস দোরজি বললেন, 'অফিসার, মে আই গিভ ইউ লিফট?'

'আপনি বেরুবেন?'

'হ্যাঁ।'

ওঁরা মিসেস দোরজির গাড়িতে থানায় ফিরে এলেন। এখন দুপুর পেরিয়ে গেছে। সারাদিন ওঁদের খাওয়া হয়নি। কিন্তু সামান্য ক্ষুধা বোধ করছিলেন না। অফিসারের ধারণা ওরা সুনীলের কাছেই গিয়েছে। সুনীলকে অ্যারেস্ট করে আনতে হবে। এস. পি-র কাছ থেকে ফোর্স নিয়ে যাওয়ার অর্ডারটা আনতে সামান্য দেরি

হবে। ওদের কোনও রেস্টুরেন্টে খেয়ে নিয়ো নিতে বললেন অফিসার। জিনা আর অপেক্ষা করেননি, উনি বুঝতে পারছিলেন কাজটা ঠিক হয়নি। সুনীল মোটেই ভালো ছেলে নয়! তবু ওর কথা এঁদের বলতে পারলেন না। এই টিন-অ্যাডভেঞ্চারটা তিনি কেন জানেন না পছন্দ করে ফেলেছেন। নিজের মেয়ে হলে নিশ্চয়ই বাধা দিতেন, কিন্তু নিজে ওই বয়সে এমন ভেসে পড়তে পারলে হয়তো খুশি হতেন। এই চল্লিশ বছর বয়সে কাউকে বিয়ে করতে যে দ্বিধা আসছে তার ছেলেমেয়েদুটোর তা নেই। নিজের ইচ্ছেটা গোপনে-গোপনে ওদের মধ্যে কি দেখতে পেয়েছেন তিনি? সুর্মার মাকে দেখে তাঁর খুব অস্বস্তি হচ্ছিল তাই পালিয়ে বাঁচলেন। কাজ আছে বলে বিদায় নিয়েছেন। খুব তাড়াতাড়ি দুপুরটা ফুরিয়ে আসছিল দার্জিলিং-এ।

একটু আগে ভাত আর মাংসের ঝোল খেয়েছি আমরা। রান্নাটা মোটেই ভালো নয়। অতীন দেখলাম খুব খেল। আমি সামান্য। খাওয়া-দাওয়ার পর অতীন খাটে শুয়ে পড়লে আমি কী করব বুঝতে পারলাম না। হঠাৎ খেয়াল হল, এই ঘরে আমাকে অতীনের সঙ্গে থাকতে হবে। সঙ্গে-সঙ্গে খুব অস্বস্তি হল, সেই সঙ্গে লজ্জা। আমাদের মধ্যে এমন কোনও সম্পর্ক এখনও গড়ে ওঠেনি যে এভাবে থাকা যায়। স্বামী-স্ত্রী ছাড়া কেউ এরকম থাকে? আমি যদি পাশের ঘরে বুড়ির সঙ্গে থাকি? এই সময় অতীন আমাকে ডাকল, 'এই, তুই কী ভাবছিস?'

'কিছু না।' আমি টেবিলের ওপর পড়ে থাকা একটা ভারী লোহার রড স্পর্শ করলাম।

'দাঁড়িয়ে আছিস কেন? এখানে আয়।'

'কেন?'

'বারে। ওইভাবে সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকবি?'

'আমি তোর সঙ্গে একঘরে থাকতে পারব না!' কথাটা বলেই ফেললাম।

'কেন?' অতীন উঠে বসল।

'বাঃ। থাকা যায়?'

'কেন? থাকা যায় না কেন?'

আমি অবাক হয়ে ওর দিকে তাকালাম। ও কি কিছু বোঝে না? না কোনও ফন্দি করে এই কথা বলছে! বললাম, 'যায় না তাই।'

অতীন নেমে এল। এসে আমার কাঁধে হাত রাখল, 'এই সুর্মি, তুই আমাকে একটুও ভালোবাসিস না? আমি তোর জন্যে প্রাণ দিতে পারি!'

কথাটা শোনামাত্র আমি থরথর করে কেঁপে উঠলাম। ও হঠাৎ আমাকে জড়িয়ে ধরল, 'এই কী হয়েছে তোর? কাঁপছিস কেন?'

আমি বললাম, 'ছেড়ে দে, আঃ।'

ও বলল, 'না ছাড়ব না। আমি তোকে ভালোবাসি, তাই এভাবে বুকে জড়িয়ে ধরব।' ও আমাকে ছাড়ছিল না, কিন্তু বুঝলাম ও হাঁপাচ্ছে। আমি প্রাণপণে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু অতীনের গায়ের জোর যেন অনেক গুণ বেড়ে গেছে। আমরা সারা ঘরে যেন লড়াই করতে লাগলাম। বুঝতে পারলাম অতীনের

মুখ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে, নিশ্বাস গরম। শেষ পর্যন্ত আমরা খাটের ওপর আছড়ে পড়লাম। আমার পিঠে খুব ব্যথা করল আর আমি হেরে গেলাম। অতীন তখনি আমার ঠোঁটে নিজের ঠোঁট রাখল। এই প্রথম কোনও পুরুষ আমাকে চুম্বন করল। অতীন পাগলের মতো আমাকে চুমু খেয়ে যাচ্ছে, ঠোঁটে, গালে, চোখে, গলায়। আমি স্থির হয়ে পড়ে আছি। এবং এই সময় আমার কান্না পেতে লাগল। হঠাৎ অতীন চুমু খাওয়া থামিয়ে বলল, 'সুর্মি, তুই আমাকে চুমু খা। একটু চুমু, প্লিজ। তোকে আমি কী ভীষণ ভালোবাসি।' ও আমার কাছে ভিক্ষে চাওয়ার মতো বলতে লাগল। তারপরেই ওর চোখ পড়ল আমার চোখে। দেখলাম অতীনের ঠোঁট নেমে আসছে। দুহাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে পরম যত্নে ও ঠোঁট দিয়ে আমার চোখের জল শুষে নিল। তারপর আমার গলায় মুখ রেখে পড়ে রইল। কী হল জানি না, এই প্রথম আমি ওকে অস্বীকার করতে পারলাম না। অজান্তেই ওর মাথায় আমার ডান হাতে উঠে এল। আমি চুপচাপ সেই অবস্থায় ওর চুলে বিলি কাটতে লাগলাম। এবং এই প্রথম আমি, কেমন করে জানি না, অতীনকে ভালোবেসে ফেললাম।

এই ঘরে ইলেকট্রিক আলো নেই। আমার পাশে শুয়ে অতীন বলল, 'আজ থেকে তুই আমার বউ। আমার হাতে হাত রেখে প্রতিজ্ঞা কর কোনও অবস্থায় আমাকে ছেড়ে যাবি না।'

আমি ওর হাতে হাত রেখে হাসলাম, 'ঠিক আছে।'

'না ঠিক আছে বললে চলবে না। পুরোটা বল।'

আমি হাসলাম, 'তুই ভীষণ ছেলেমানুষ।'

ওর দুই চোখ তৃপ্তিতে ভরে গেল। আবার চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল আমার পাশে। এখন ঘরে বেশ ঘন ছায়া। সারাটা দুপুর ও আমাকে আদর করেছে। কিন্তু মেয়ে বলে আমি যে কারণে সিঁটিয়ে ছিলাম ও তার ধার দিয়েই গেল না। শুধু চুমু আর স্পর্শেই ওর শান্তি। মাঝে-মাঝে মনে হচ্ছিল ও মোটেই বড় হয়নি। আমার চেয়ে অনেক কম বোঝে। তাই বোধহয় স্বস্তিতে ছিলাম। ক্রমশ আমার মনে হতে লাগল আমি যা বলব ও তাই করবে। একধরনের নিরাপত্তা বোধ এল এই অহঙ্কার থেকে।

এই সময় দরজায় কেউ শব্দ করল। অতীন ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কে রে?'

'বুড়িটা হতে পারে। দ্যাখ না।'

অতীন উঠে দরজা খুলল। একটা বাচ্চা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। বলল, 'আপকো বোলাতা হ্যায়।'

'কৌন?'

'সুনীল।'

আমি খাটে উঠে বসেছিলাম, অতীন বলল, 'কী ব্যাপার কে জানে। তুই ঘরে থাক আমি ঘুরে আসছি।'

'তাড়াতাড়ি আসিস।'

অতীন আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। তারপর ছেলেটার সঙ্গে বেরিয়ে গেল। আমি উঠলাম। অন্যমনস্কভাবে চুলে হাত দিতে গিয়ে মনে পড়ল আমার চিরুনি নেই। অতীনকে

বলতে হবে কয়েকটা জিনিস কিনতে। আমার আর-একটা পোশাক দরকার। এই শার্ট-প্যান্টে কতদিন থাকা যায়!

আমার আজ বেশ ভালো লাগছিল। আমার ভেতরে যে আর-একটা আমি আছে তা আজ প্রথম টের পেলাম। অতীনটা সত্যি ছেলেমানুষ। সত্যি।

বাইরে কারও জুতোর শব্দ হল। তাকিয়ে দেখলাম সুনীল দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। ওর চোখের দৃষ্টি অদ্ভুত। আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'মিস্টার কোথায়?

কথাটা আমার একটুও ভালো লাগল না। তবু জবাব দিলাম, 'আপনার কাছে গেল। একটা ছেলে ডাকতে এসেছিল।'

'কিন্তু আমি অপেক্ষা করে চলে এলাম। তোমাদের আগে ডিস্টার্ব করতে চাইনি। সারাটা দুপুর কেমন এনজয় করলে?'

আমার মাথা গরম হয়ে গেল। আমি কী বলব ওকে? অতীন এখনও আসছে না কেন? সুনীল ভেতরে ঢুকল, 'তুমি দারুণ দেখতে। অতীনকে আমি একটা চাকরি জুটিয়ে দেব। কিন্তু তোমাকে আমার অন্য কাজে দরকার হবে।'

'কী কাজ?'

'নট সো কুইক। ইউ ডোন্ট লাভ হিম, ইজন্ট ইট? তোমাকে একবার দেখেই বুঝতে পেরেছি অতীন তোমাকে জোর করে নিয়ে এসেছে।' ও হাসল, 'আমাকে তোমার কেমন লাগছে?' সুনীল আমার দিকে এগিয়ে আসছিল। আমার খুব ভয় করল। ওর মতলব যে ভালো নয় তা বুঝতে পারছি।

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'আপনি এগিয়ে আসছেন কেন?'

'টু সেভ ইউ ফ্রম পুলিশ। একটা চুমু খাও তো আমাকে। দেখি ওটা মিষ্টি না নোনতা? মাইন্ড ইট, এই কথা অতীনকে বললে আমি তোমাদের পুলিশে ধরিয়ে দেব।' ও চোখ বন্ধ করে আমার দিকে মুখ বাড়িয়ে দিল।

রাগে আমার মাথা ঘুরে গেল। টেবিলের ওপর পড়ে থাকা লোহার রডটা তুলে প্রাণপণে ওর মাথায় আঘাত করতেই সুনীলের দুটো চোখে অবাক বিস্ময়ে ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। আমি দেখলাম ওর শরীরটা যেন খসে পড়ল মাটিতে আর মাথা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হতে লাগল! আমি চিৎকার করতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিলাম। তারপরে অতীনের ব্যাগটা তুলে নিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে এলাম বাইরে। বুড়িকে চোখে পড়ল না, আর তখনই অতীনকে দেখতে পেলাম। দ্রুত ফিরে আসছে। আমাকে দেখে অবাক হয়ে বলল, 'কোথায় যাচ্ছিস?' আমি কথা বলতে পারছিলাম না। দ্রুত ওর হাতে ধরে নিশ্বাস নিলাম। 'তাড়াতাড়ি চল।'

'কোথায়?'

'এখান থেকে পালিয়ে যাব। প্লিজ, পরে কথা হবে।'

'কিন্তু সুনীলকে পেলাম না। ওর সঙ্গে দেখা না করে চলে যাব কেন?'

'পরে, পরে কথা বলব।' আমি ওকে নিয়ে প্রায় দৌড়াচ্ছিলাম। অতীন নিশ্চয়ই খুব অবাক হচ্ছিল। বস্তিটা পেরিয়ে বড় রাস্তায় এসে আমরা গাড়ির শব্দ পেলাম। খুব জোরে আসছে। আমার কী মনে হল জানি না, তাড়াতাড়ি একটা গাছের আড়ালে অতীনকে টেনে নিয়ে দাঁড়ালাম। এখন সন্ধের অন্ধকার নেমে আসছে। পুলিশের দুটো

জিপকে ছুটে যেতে দেখলাম। অতীন ফিসফিসিয়ে বলল, 'ওরা আমাদের জন্যে আসছে নিশ্চয়ই।'

গাড়িদুটো চোখের আড়ালে যেতেই আমরা ছুটতে লাগলাম। রাস্তার লোকজন অবাক হয়ে আমাদের দেখছে। স্টেশনের কাছে এসে অতীন বলল, 'কী করবি? কোথায় যাবি?'

আমি বললাম, 'জানি না।'

সেইসময় একটা ট্রেন স্টেশন থেকে হুইসেল দিতে-দিতে বের হল। ছোট ট্রেনটা আমাদের সামনে দিয়ে এগোচ্ছে। আমরা আর কোনও চিন্তা না করে দৌড়ে ওই ধীরে চলা ট্রেনটায় উঠে পড়লাম।

সুনীলের বাবা পুলিশের কাছে সম্পূর্ণ অস্বীকার করল। না, এরকম কোনও বাঙালি ছেলেমেয়ে আজ তাদের কাছে আসেনি। পুলিশ তন্নতন্ন করে খুঁজল। অনেককে জেরা করল। স্বপ্নেন্দু দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখলেন। অফিসার বলছিলেন, 'মুশকিল কী জানেন, এরা একজন যে কথা বলে আর কেউ তার উলটো বলতে পারে না কিছুতেই। সত্যি কথাটা এদের মুখ থেকে বের করা যায় না।' স্বপ্নেন্দু ভাবছিলেন সুর্মা কী করে এইরকম পরিবেশে আসবে? মেয়েটার এত বছরের সংস্কার, অভ্যাস একদিনেই পালটে গেল।

সন্ধে সাতটা নাগাদ পুলিশ চলে গেলে সুনীলের বাবা খবরটা পেলেন। সেই বুড়ি, একটু আগে সুনীলকে আবিষ্কার করেও পুলিশের ভয়ে কিছু বলেনি। তার ফলে বেশ দেরি হয়ে গেছে। সুনীলকে বাঁচানো গেল না।

মৃতদেহ সামনে নিয়ে সুনীলের বাবা কিছুক্ষণ বসে থাকল। তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না ওই ছেলেমেয়ে দুটো এই হত্যার জন্য দায়ী। কিন্তু এই কথা এখন পুলিশকে জানানো যাবে না। যাদের অস্তিত্বের কথা সে নিজে অস্বীকার করেছে তারাই যে ছেলেকে খুন করতে পারে এখন আর বলা যায় না। সে আটজন বিশ্বাসী লোককে ডাকল। তাদের ওপর দায়িত্ব দিল যেমন করেই হোক ওই বাঙালি ছেলেমেয়ে দুটিকে খুঁজে নিয়ে আসতে। পুলিশ যখন ওদের খুঁজছে তখন তারা কিছুতেই বেশিদূর যেতে পারবে না। নিজের সন্তানের মৃত্যুর বদলা নিয়ে তবে অন্য কথা। দুটো জিপ সঙ্গে-সঙ্গে দুদিকে বেরিয়ে গেল। তন্নতন্ন করে তারা খুঁজতে লাগল শহরের সব অলিগলি। তারপর রাত হলে বেরিয়ে পড়ল একদল দার্জিলিং-এর পথে আর একদল শিলিগুড়ির দিকে। প্রতিটি লোকই নিরুত্তাপ কিন্তু নির্দয়।

কার্শিয়াং থানায় বসে প্রথমে পুলিশ এসব টের পায়নি। দার্জিলিং-এর অফিসার বললেন, 'আমার বিশ্বাস সুনীলের বাবা মিথ্যে কথা বলছে। ওরা এখানেই এসেছিল এবং সুনীল ওদের নিয়ে কোথাও লুকিয়ে আছে। কোথায় যেতে পারে? এক, শিলিগুড়িতে নেমে যেতে পারে। ওখানকার পুলিশকে সতর্ক করে দেওয়া হোক যাতে প্রতিটি হোটেলে সার্চ করে।

স্বপ্নেন্দুর খুব অসহায় লাগছিল! তিনি জানেন তাঁর স্ত্রী মনের জোরে হেঁটে-চলে বেড়াচ্ছেন। এই ছুটোছুটি সহ্য করার মতো শরীর তাঁর নয়। এখন তিনি কী

করবেন। এইসময় একটি লোক এসে খবর দিল সুনীল প্রধানদের দুটো জিপ দার্জিলিং-এর দিকে ছুটে গেল। পানবাহার দোকানের মালিক বলছে যে ছেলেমেয়েদুটো সন্ধের ট্রেনে উঠেছে। এখান থেকে আর একটা খবর কানাঘুষোয় শোনা যাচ্ছে যে সুনীল প্রধান নাকি খুন হয়েছে। ওই জিপ যাচ্ছে বদলা নিতে। সঙ্গে-সঙ্গে সাজ-সাজ পড়ে গেল। দার্জিলিং-এর অফিসার কার্শিয়াং-এর অফিসারকে বললেন সুনীলের ব্যাপারটা সত্যি কি না খবর নিতে।

একটু বাদেই দার্জিলিং-এর উদ্দেশ্যে দুটো জিপ বেরিয়ে এল থানা থেকে। অফিসার প্রথমে স্বপ্নেন্দুদের সঙ্গে নিতে চাইছিলেন না, কিন্তু ওঁর পীড়াপীড়িতে রাজি হলেন। পুলিশের লক্ষ এখন জিপ।

এঁকেবেঁকে ট্রেনটা চলছিল, এই প্রথম ওরা দার্জিলিং-এর টয়ট্রেনে উঠল, অথচ ওদের দুজনেরই মনে হচ্ছিল কেন সেই দার্জিলিং মেইলের মতো এই ট্রেনটা হুহু করে ছুটছে না। ট্রামের চেয়েও অল্প স্পিডে গড়িয়ে-গড়িয়ে পাহাড়ে উঠেছে গাড়িটা। মাঝে-মাঝে যখন আবার পিছিয়ে যাচ্ছে দম নিতে তখন এক ধরনের ভয় এসে জমছে, ওরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কার্শিয়াং থেকে পালাতে চায়।

বাইরে এখন চুরচুরে কুয়াশা। অন্ধকার সেই কুয়াশা মিশে গিয়ে একটা ঘোলাটে সমুদ্র হয়ে গিয়েছে। সুর্মা অতীনের দিকে তাকাল। কার্শিয়াং ছাড়াবার পর থেকেই কেমন চুপ করে গেছে ও। সমস্ত ঘটনা শোনার পর ওর দুটো হাত ধরে শুধু বলেছিল 'তুই ঠিক করেছিস, ঠিক করেছিস।'

কিন্তু তাতে সান্ত্বনা পায়নি সুর্মা। মনের মধ্যে বিঁধে থাকা কাঁটাটা দপদপাচ্ছিল। সে খুন করল শেষ পর্যন্ত! খুনই তো! ছেলেটার মাথা থেকে যেভাবে রক্ত ফিনকি দিয়ে বেরিয়েছে তাতে খুন ছাড়া কী হতে পারে! ও যদি সুনীলকে বুঝিয়ে বলত তাহলে সুনীল কি শান্ত হতো না! হঠাৎ সমস্ত শরীরে কনকনে বাতাস লাগল যেন। ও অতীনের হাত চেপে ধরল, 'এই অতীন, খুন করলে ফাঁসি হয়, না রে?'

অতীন তাকাল, 'কী বাজে বকছিস!' হঠাৎ তার মাথার ভেতরে ঝিমি-ঝিমি শব্দ শুরু হল।

'সত্যি করে বল না। খুন করলে ফাঁসি হয়?'

'তুই খুন করেছিস কে বলল? সুনীল তো বেঁচেও যেতে পারে। তাছাড়া কী প্রমাণ আছে যে তুই খুন করেছিস? কে দেখেছে? পুলিশ যদি আমাদের ধরে তবেই তো এসব কথা উঠবে। সে আমি ম্যানেজ করে নেব।'

'কী করে?'

'মিথ্যে কথা বলে। তুই তো জানিস আমি খুব সুন্দর মিথ্যে কথা বলি।' সুর্মা ওর দিকে তাকাল। ওর খুব কান্না পাচ্ছিল। ও মনে-মনে চাইছিল সুনীল যেন কোনও বিপদে না পড়ে।

ঠিক তখনই একটা জিপের হেডলাইটের আলো এসে পড়ল ট্রেনের গায়ে। কুয়াশার জন্যে দেখা যায়নি; আচমকা বাঁক পেরিয়ে জিপটা ট্রেনের ঠিক পাশে চলে এল। অতীন প্রথমে লক্ষ করেনি কিন্তু তিনটে লোক জিপ থেকে মুখ বের করে যেভাবে তাকাচ্ছে

তাতে সতর্ক হল। জিপটা সাঁ করে এগিয়ে যেতে ট্রেনটা থেমে গিয়ে খুব জোরে-জোরে হুইস্‌ল দিতে লাগল। অতীন মুখ বের করে দেখল ট্রেনের আলোয় জিপটাকে দেখা যাচ্ছে, ঠিক লাইনের ওপর দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে ওটাকে। টপাটপ কয়েকটা লোক নেমে এল টর্চ হাতে। এসে প্রথম কামরায় উঠে গেল। একটু বাদেই তারা নেমে এসে আবার দ্বিতীয় কামরায় উঠল।

অতীনের মাথার ভেতরটা টলে উঠল। পুলিশ! নিশ্চয়ই তাদের খুঁজতে এসেছে। না, কিছুতেই ধরা দেবে না ওরা! ও চট করে উঠে দাঁড়িয়ে সুর্মার হাত ধরে টানল, 'চল, পালাই, পুলিশ!' মাথার যন্ত্রণাটাকে আমল দিল না সে।

সুর্মাও লক্ষ করেছিল, ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলল, 'কী হবে?'

'কিছু হবে না। এই পাহাড়ে কেউ আমাদের খুঁজে বের করতে পারবে না। চল, আর কথা বলার সময় নেই।' কামরায় অন্য যাত্রীদের অবাক করে চোখের সামনে দিয়ে ওরা লাফিয়ে পাশের রাস্তায় নামল। তারপর এক দৌড়ে উল্টোদিকের পাহাড়ের গায়ে চলে এল।

হয়তো আগে এই পথে ঝরনার জল গড়িয়ে আসত, কিন্তু এখন তার শুকনো দাগ ছাড়া কিছু নেই। অতীন সুর্মার হাত ধরে দ্রুত ওপরে উঠছিল। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না প্রায়, সুর্মা একবার আছাড় খেতে-খেতে বেঁচে গেল। ওরা যখন বেশ কিছুটা ওপরে উঠে গেছে তখনই জিপটা ঘুরে এসে ঠিক ওদের নিচে দাঁড়াল। অতীন বুঝল ওদের পালানোটা ধরা পড়ে গেছে। এখনই ওরা পিছু ধাওয়া করবে। অনেক নিচে মানুষের চিৎকার শোনা যাচ্ছে।

অতীন সামনে তাকাতেই দেখল আকাশের মেঘ কেটে যাচ্ছে আর সেখানে একটা পানসে চাঁদ। তার ফিকে আলোয় চারধার সাদা। হঠাৎ ওর চারপাশে কেউ থাকল না। সেই যন্ত্রণাটা ফিরে এল মাথায়। আচমকা নিজের চুল খিমচে ধরে চিৎকার করে উঠল সে।

সুর্মা আর পারছিল না। এর মধ্যেই ওর পা থেকে রক্ত ঝরছিল। অতীনের চিৎকারে চমকে উঠে চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে, চিৎকার করছিস কেন?'

অথচ অতীন জবাব দিল না। দ্রুত ছুটে গেল ওপরে। সেখানে পাহাড়টা আচমকা শেষ হয়ে কেমন সমান হয়ে গিয়েছে। সেই মসৃণ পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে অতীন আকাশের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত শব্দ করতে শুরু করল। সুর্মা বুঝতে পারছিল না অতীনের কী হয়েছে, এরকম আচরণ করছে কেন! সে মরিয়া হয়ে ছুটে এল ওপরে। ঠিক সেই সময় দুটো জিপ হেডলাইট জ্বালিয়ে এসে দাঁড়াল নিচে। সুর্মার কানে বোধহয় গুলির শব্দ এল। কিন্তু সেটিকে মন দেবার সময় ছিল না ওর। দুহাতে অতীনকে আঁকড়ে ধরে সে চিৎকার করে উঠল, 'অতীন, তুই এমন করছিস কেন? কী হয়েছে, বল?'

অতীন প্রচণ্ড শক্তিতে ওকে ঠেলে মাটিতে ফেলে দিল। তারপর বিকৃত মুখে আকাশের দিকে তাকিয়ে ককিয়ে উঠল, 'আই লাভ ইউ সুর্মা।'

সুর্মা ছিটকে পড়েছিল পাথরের ওপর। অতীন যে তাকে এভাবে জোরে ঠেলে দেবে ভাবতে পারেনি। তার পায়ে যন্ত্রণা হচ্ছিল। তবু সে উঠে দাঁড়াল তার দুহাত বাড়িয়ে কেঁদে উঠল, 'অতীন, তোর কী হয়েছে, এমন করছিস কেন?'

অতীন ঘুরে দাঁড়াল। তার ঘোলাটে চোখ সুর্মা দেখতে পেল না আবছা চাঁদের আলোয়। নিজের চুল মুঠোয় ধরে অতীন চিৎকার করল, 'আই লাভ ইউ সুর্মা।'

সুর্মা ছুটে গেল অতীনের কাছে। দুহাতে জড়িয়ে ধরল ওকে, তারপর হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল, 'অতীন, তোকে আমি ভালোবাসি। বিশ্বাস কর, এখন আমি তোকে ভালবাসি।'

অতীন আলিঙ্গনে ছটফট করছিল। তার মুখ এখনও আকাশের দিকে। সমস্ত শরীর উত্তপ্ত। সে বিড়বিড় করছিল, 'আই লাভ ইউ সুর্মা।'

সুর্মার সমস্ত শরীর যেন পাথর হয়ে গেল। ও হঠাৎ আবিষ্কার করল তার দুহাতের শক্ত আলিঙ্গনে আবদ্ধ থেকেও অতীন যেন তার কাছে নেই। সেই বদ্ধ উন্মাদ শরীরটার বুকে মাথা ঠুকতে-ঠুকতে ও প্রার্থনার ভঙ্গিতে বলতে লাগল, 'অতীন, কথা বল, আমি তোকে ভালোবেসেছি রে। অতীন, কথা বল।'

অনেক নিচে অন্ধকার রাস্তায় দুজন পুলিশের সঙ্গে দাঁড়ানো স্বপ্নেন্দু কিংবা সুর্মার মা এদের দেখতে পাচ্ছিলেন না। কিন্তু সুর্মা ঘাড় ফেরালে হয়তো আবছা দেখতে পেত ওদের। উঠে আসা পুলিশের দল এর মধ্যেই বদলা নিতে আসা লোকগুলোকে কবজা করে ধীরে-ধীরে এগিয়ে আসছিল ওপরে।

ওরা হঠাৎ দেখতে পেল পাহাড়ের একেবারে চুড়োয়, যার ওপাশে অতলান্ত খাদ, সেখানে উন্মত্ত একটি তরুণকে দুহাতে আঁকড়ে একটি প্রায় তরুণী কাঁদছে। উন্মাদ চিৎকার করে উঠল আচমকা, 'সুনীলকে আমিই মেরেছি, আমি, আই লাভ ইউ সুর্মা।' এবার মেয়েটি যেন প্রচণ্ড বিস্ময়ে ধীরে-ধীরে মাটিতে ভেঙে পড়ে হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল। তরুণটি তখনও সম্রাটের মতো চিৎকার করছিল, 'আই লাভ ইউ সুর্মা।' খোলা আকাশে শব্দগুলো যেন তার সাম্রাজ্য বিস্তার করছিল।

বিষণ্ণ

মিনিবাস থেকে নেমে জায়গাটা মোটেই পছন্দ হল না ভাস্করের। বাঁ-দিকটা মিনি বড়বাজার, সামনে গাড়ির জট-পাকানো আবহাওয়া। ডানদিকে তাকালে একটা খেলার মাঠ দেখা যায় বটে তবে সেটা অযত্নে রাখা। খানিকটা নিচে পাহাড় কেটে বড় মাঠ তৈরি যিনি করেছিলেন তাঁর চেষ্টাকে শ্রদ্ধা জানানোর বাসনা এখনকার কারও নেই। চারপাশের বাড়িঘর দোকানপাটও খুব পুরোনো চেহারার।

অথচ সেবক ব্রিজ পেরিয়ে ডানদিকে কালিঝোরা বাংলোকে রেখে উঠে আসবার সময় থেকেই মন প্রফুল্ল হচ্ছিল। এদিকে কখনওই আসা হয়নি ভাস্করের। ডানদিকে খরস্রোতা তিস্তা আর চমৎকার স্নিগ্ধ পাহাড় দেখতে-দেখতে বারংবার মনে হচ্ছিল দার্জিলিংয়ের পথের চেয়ে এর চেহারা-চরিত্র আলাদা। অথচ বাস-টার্মিনাসে নামার পর তার মন খারাপ হয়ে গেল। একটা ঘিঞ্জি এলাকা ছাড়া কিছু ভাবা যাচ্ছে না।

কিন্তু শীত পড়েছে জব্বর। এখন কলকাতায় ঘাম ঝরছে আর এখানে মনে হচ্ছে হাফ স্লিভের বদলে পুরো হাতা কিছু থাকলে ভালো হতো। আর বিকেল তিনটেয় যদি এই অবস্থা হয় তা হলে সন্ধের পর ঘরের বাইরে পা দেওয়া যাবে বলে মনে হয় না।

মিনিবাসের ছাদ থেকে মালপত্র নামানো হলে ভাস্কর তার সুটকেস তুলে নিল। তিনটে লোক ছুটে এসেছিল মাল বইবার জন্যে, কিন্তু ভাস্কর তাদের হঠিয়ে দিল। ভাস্কর জানে সে বিরক্তিভরে কিছু বললে যারা জ্বালাতন করতে আসে তারা সব সরে যায়। হয়তো তার চেহারা এবং কণ্ঠস্বরে এমন একটা ব্যাপার আছে কোনও দালাল বা পাণ্ডা তাকে ঘাঁটাতে চায় না।

ভাস্কর লম্বায় ঠিক ছয় ফুট। শরীরে সামান্য মেদের প্রলেপ থাকায় লাবণ্য আছে, ব্যায়ামবীরদের মতো কাঠ-কাঠ ভাবটা নেই। কিন্তু তার চওড়া বুক, সরু কোমর এবং সুগঠিত হাত দেখলে বোঝা যায় শুধু ঈশ্বরের দান নয়, ওই শরীর-নির্মাণের পেছনে অধ্যবসায় আছে। মজার ব্যাপার, ঝামেলাবাজ মানুষেরা তাকে দেখেই বুঝতে পারে, সুবিধে হবে না।

সুটকেসটা ভারী কিন্তু অসুবিধে হচ্ছিল না ভাস্করের। তিনটে জায়গায় সে উঠতে পারে। সার্কিট হাউস, ট্যুরিস্ট লজ অথবা—। না। অন্য কোথাও তাকে উঠতে হবে আজ। সে যে এসেছে এখানে তা যত কম লোক জানতে পারে তত ভালো। শহরটাকে ভালো করে দেখে-শুনে তারপর আত্মপ্রকাশ করা যাবে।

বাজারের গায়েই সাইনবোর্ডটা নজরে এল, 'কাঞ্চনজঙ্ঘা লজ।

এখানেই ওঠা যাক। ভাস্কর স্থির করল একটা অ্যাটাচড্ বাথ আর পরিষ্কার বিছানা যদি থাকে তা হলে এই হোটেলেই আজকের রাতটা কাটানো যাক। সিঁড়ি ভেঙে ঘরে ঢুকতে সে কাউন্টারের গায়ে অলস ভঙ্গিতে বসে থাকা এক বৃদ্ধাকে দেখতে পেল। বৃদ্ধার

শরীরে টিবেটিয়ান পোশাক। ওকে দেখে যে হাসি ওর ঠোঁটে ফুটল তা শুধু মায়েদের মুখেই দেখা যায়।

ভাস্কর জিগ্যেস করল, সিঙ্গল রুম, অ্যাটাচড্ বাথ, খালি আছে?

বৃদ্ধা ধীরে-ধীরে মাথা নাড়ল। তারপর হিন্দিতে বলল পঞ্চাশ টাকা করে লাগবে। একদিনের ভাড়া অ্যাডভান্স। খারাপ মেয়েছেলে ভাড়া করে এনে রাত্রে শোওয়া চলবে না। ব্যস।

ভাস্করের চোখে কৌতুক চলকে উঠল, ব্যাপারটা নতুন শুনছি। আমি যাকে আনছি সে খারাপ না ভালো তা তুমি বুঝবে কী করে?

আমি ঠিক বুঝতে পারি।

এই নিয়ম এখানকার অন্য হোটেলে চালু আছে?

মাথা খারাপ। তা হলে ওরা ব্যবসা করে খাবে কী করে?

তুমি ব্যবসা করতে চাও না?

আমার পেট ভরে গেলে হল। আমি আর আমার নাতনি, দুটো মাত্র পেট, তার জন্যে নোংরা ঘাঁটব কেন?

খাতায় নিজের নাম সই করার আগে যে দ্বিধা ছিল তা কাটিয়ে উঠল সে এক পলকেই। মিথ্যে কথা লেখার কী দরকার। এই মুহূর্তে এই শহরে কেউ তাকে চিনবে না। চাবি নিয়ে সে দোতলার যে ঘরটায় উঠে এল সেটা মোটেই বড় নয়। এই হোটেলকে শ্যাবি বলার যথেষ্ট কারণ আছে। এবং সম্ভবত সে ছাড়া অধিকাংশ বোর্ডারই হয় টিবেটিয়ান, নয় সিকিমিজ। একটা অপরিচ্ছন্ন গন্ধ করিডোরে পাক দিলেও ঘরের বিছানাপত্র মোটামুটি ছিমছাম। বাথরুমের দরজাটা খুলে ভাস্করের মনে হয় এইটেয় বোধহয় হোটেলের শ্রেষ্ঠ ঘর। নইলে এই চেহারার হোটেলের বাথরুমের অবস্থা এতটা ভদ্র হতো না। শুধু ওপরের জানলাটা বেশ নড়বড়ে। জোরে হাওয়া দিলেই বোধহয় খুলে পড়বে। ভাস্কর আবার ঘরে ফিরে এল। তারপর জুতোসুদ্ধ বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। এই শহরের অনেক প্রশংসা শুনেছে সে এতকাল। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় পর্যন্ত নানা প্রশংসাবাক্য লেখা হয়েছে। নিশ্চয়ই এই বাজার এলাকাই সমস্ত শহর নয়।

ঠিক এই সময় বন্ধ দরজায় জোর আঘাত শুরু হল। কেউ অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে দমাদম কয়েকটা লাথিও কষিয়ে দিল ওপাশের কাঠে। ভাস্কর উঠল। তারপর আচমকা দরজার পাল্লা হাট করে খুলে দিতেই একটা লোক হুড়মুড়িয়ে ভেতরে ঢুকে টেবিলে প্রচণ্ড ধাক্কা খেল ব্যালেন্স হারিয়ে ফেলার জন্যে। লোকটার হাতে কয়েকটা প্যাকেট ছিল, সেগুলো ছিটকে গেল এদিক-ওদিক।

ততক্ষণে ধাতস্থ হয়েছে লোকটা, ঘরটা দেখতে দেখতে বলল, সরি। আমি ভেবেছিলাম আমার রুম। রুমমেট মেয়েছেলে নিয়ে ফুর্তি করছে বলে দরজা খুলছে না। শালা মালের ঘোরে ঘর বদলে ফেলেছি। মার্জনা করবেন দাদা। দুটো হাত জোড় করল লোকটা।

প্রচণ্ড ক্রোধ শরীরে জন্ম নিয়েছিল, অনেক কষ্ট সংবরণ করল ভাস্কর। লোকটা রোগা, শরীর ভর্তি গরম জামা সত্ত্বেও সেটা বোঝা যায়, এই বিকেলেই মাঙ্কি ক্যাপ সেঁটেছে মাথায় এবং ভালো রকম মদ পেটে পড়েছে ওর। এই অবস্থায় ঘর পালটে ফেলা অসম্ভব

নয়। সে চাপা গলায় বলল, বসুন।

বসব? রং নাম্বার হয়ে যাওয়ার পরও বসব?

রং নাম্বার?

ঘরের নম্বর। পাশাপাশি, অন্য ঘর হলে ছাতু হয়ে যেতাম এতক্ষণে, আপনি তবু বসতে বলছেন। সব মাইরি হেভি চেহারার টিবেটিয়ান বোর্ডার। শুধু আমার রুমমেট বাঙালি, অত্যন্ত নোংরা লোক।

পড়ে যাওয়া প্যাকেটগুলো তুলে লোকটার হাতে ধরিয়ে দিয়ে ভাস্কর জিজ্ঞাসা করল, আপনার বন্ধু?

না-না। এখানে এসে আলাপ। আমি আজ রুম চেঞ্জ করব বলে ঠিক করেছিলাম। আর পারা যাচ্ছে না।

কেন? ভাস্করের মজা লাগছিল ওর কথা বলার ধরন দেখে। একটু খেঁকুরে, কিন্তু মনে হচ্ছে সরল।

আরে মশাই রোজ ঘরে ঢুকে দেখি আমার বিছানায় মাথার ক্লিপ, চুলের ফিতে পড়ে আছে। কাকে কী বলব? চেপে যেতাম। কাল রাত্রে শুতে গিয়ে নাকে সুড়সুড়ি লাগল। হাত দিয়ে দেখলাম ইয়া লম্বা একটা চুল তাতে আবার সুবাসিত তেলের গন্ধ। আর পারলাম না। বলে ফেললাম। তিনি বললেন তাঁর শিষ্য-শিষ্যারা আসেন, বসার জায়গা কম বলে আমার খাটটাকে ব্যবহার করেন। আমি যেন কিছু মনে না করি। বুঝুন। কথাগুলো একটানা বলে সোজা হয়ে বসতেই একটা হেঁচকি উঠল।

ভাস্কর হাসল, হোটেলের মালকিনকে জানান। তিনি বলছেন বাজে মেয়েদের এখানে ঢোকা নিষেধ। তাহলে এরা আসছে কী করে?

বাজে মেয়ে নয়তো। শিষ্যা। পঞ্চাশ-বছরের গুরুদেব হোটেলে বসে আছেন আর শিষ্যারা আসছে একের পর এক। না, চলি দেখি ঘর খালি হল কি না। ভদ্রলোক উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে ভাস্কর তাকে বাধা দিল, আর-একটু বসুন। কী করেন আপনি? মানে আপনার পরিচয় এখনও জানা হয়নি।

শাজাহান সেন। স্রেফ বেড়াতে এসেছি এখানে। চাকরি করি একটা মার্চেন্ট ফার্মে। একান্নবর্তী পরিবার। সেখানে বাস করে মাল খাবার সুযোগ পাই না। মা জীবিতা আছেন, খুব কনজারভেটিভ পরিবার। বছরে দশ দিনের জন্যে ছিটকে বেরিয়ে এই জায়গায় এসে চুটিয়ে মাল খেয়ে যাই। এখানে মাল খাওয়ার ওপর কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই। মশাই-এর নাম? পুনর্বার হেঁচকিটা এবার উঠল।

ভাস্কর চ্যাটার্জি। সেলস্-এ কাজ করি। কিন্তু শাজাহানবাবু আপনার নামের সঙ্গে সেন উপাধি একটু গোলমেলে লাগছে না?

মোটেই না। আমার মায়ের প্রিয় কবিতা ছিল রবীন্দ্রনাথের শাজাহান। আমি হিন্দু-মুসলিম ব্যাপারের উর্ধ্বে। মায়ের প্রিয় কবিতার নামে আমার নামকরণ।

শাজাহান সামান্য টলছিল। সে যে মদ্যপান করেছে একটা কিছুতেই বোঝাতে চাইছিল না। যদিও ওর কথা জড়ানো নয়, তবু বুঝতে অসুবিধে হয় না।

ভাস্করের ভালো লাগছিল লোকটাকে। বলল, চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসছি। নইলে আবার কার ঘরে ধাক্কা দিয়ে বিপদে পড়বেন। শাজাহান ঘাড় ঘুরিয়ে

ভাস্করকে দেখল, আপনি মানুষটা তো দেখছি বেশ ভালো। বেশ, চলুন।

শাজাহানকে ধরতে হল না। ওর পায়ে এখনও বেশ শক্তি আছে। আসলে ভাস্করের খুব ইচ্ছে করছিল গুরুদেবটিকে দেখতে। সুযোগটাকে কাজে লাগাল সে।

শাজাহানবাবুর ঘরের দরজা বন্ধ। ভাস্কর বাইরে থেকে খুব ভদ্রভাবে আওয়াজ করল। কিন্তু ভেতর থেকে কোনও সাড়া এল না।

শাজাহান চাপা গলায় বলল, কেসটা বুঝতে পারছেন. আমার ঘর অথচ আমাকে তীর্থের কাকের মতো বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

তৃতীয়বার আঘাতের পর দরজা খুলল। অত্যন্ত বিরক্ত ভঙ্গিতে একটা গুঁটকো চেহারার লোক ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, কী ইয়ার্কি হচ্ছে? যে-ই যায় সেই একবার দরজায় শব্দ করে। গুরুদেব একটু শান্তিতে সাধনা করবেন তার উপায় নেই। ও আপনি? তা আপনার এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসার কী প্রয়োজন পড়ল? বললাম না, দূরবিন দাঁড়া পর্যন্ত বেড়িয়ে আসুন।

সন্ধে হয়ে এসেছে যে। তারপর মাইরি ঠান্ডাটাও। বাইরে ঘুরতে পারলাম না। শাজাহানের কণ্ঠস্বর হঠাৎ একদম পালটে গেল যেন। মিনমিন করছে।

আসুন।

শাজাহান ভেতরে পা বাড়ানো মাত্র দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। ভাস্কর বুঝতে পারছিল না কী করবে। সে শাজাহানের সঙ্গে এসেছে এখানে। ঘরটার অর্ধেক অধিকার শাজাহানের। অতএব সে ওর অতিথি হিসেবে ঢুকতেই পারে ঘরে। কিন্তু লোকটা এখানে আসা মাত্র অমন পালটে গেল কেন? যেন খুব ভয় পাচ্ছিল সামান্য প্রতিবাদ করতে। তা ছাড়া, লোকটা তাকে দেখা সত্ত্বেও মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিল। ব্যাপারটা অত্যন্ত অপমানজনক হলেও ভাস্কর মত পালটাল। ঠিক এখনই ঘরে ঢোকা উচিত হবে না। শাজাহানবাবুর সঙ্গে যখন আলাপ হয়েছে তখন যে-কোনও সময় ওর খোঁজে হাজির হওয়া যাবে।

নিজের ঘরে তালা দিয়ে বেরিয়ে এল ভাস্কর। কাউন্টারে সেই বৃদ্ধার হাতে এখন জপের মালা। মালা ঘোরাতে-ঘোরাতেও ভদ্রমহিলা যে আড়চোখে তাকে দেখে নিলেন তা টের পেল সে।

পাহাড়ি শহরগুলোর একটা চরিত্রগত মিল আছে। বিকেলের ছায়া ঘন হলেই চারপাশ কেমন যেন রহস্যময় বলে মনে হয়। একটা অদ্ভুত মায়াবী কিন্তু গা-ছমছমে ভাব প্রতিটি পথের বাঁকে ওত পেতে থাকে। বাজার এলাকা এবং বাসস্ট্যান্ড গায়ে-গায়ে। সেটা পেরিয়ে ওপরের রাস্তায় উঠে আসতেই মন ভালো হয়ে গেল ভাস্করের। চমৎকার সুন্দর সাজানো রাস্তার দুপাশে দোকান। এই দোকানগুলো নিশ্চয়ই ট্যুরিস্টদের জন্যে। রাস্তাটায় একটা কুটো পড়ে নেই। সামান্য এগোতেই একটা তেমাথা পেল সে। তেমাথার পাহাড়ের গায়ে সুন্দর একটা ম্যাপ এঁকে শহরের কোথায় কী আছে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ভাস্কর ম্যাপটার সামনে দাঁড়াল। দূরবিন দাঁড়া নামের জায়গাটা এখান থেকে অনেক দূরে। অথচ সেখানেই শাজাহানকে পাঠাচ্ছিল লোকটা। নির্ঘাৎ ওদের সময় প্রয়োজন ছিল। শাজাহানকে ওরা এখনই ঘরে রাখতে চাইছিল না। তারপরই ভাস্করের খেয়াল হল,

শাজাহান বলেছিল সে ছাড়া আর একজন ওই ঘরে থাকে, যে নাকি গুরুদেব। তাহলে ওই সিড়িঙ্গি-মার্কা লোকটা কে? ওটাকে তো কখনওই গুরুদেব বলে মনে হল না। ম্যাপটার দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে হেসে ফেলল ভাস্কর। খামোকা সে শাজাহানকে নিয়ে চিন্তা করে যাচ্ছে। এই জন্যে তো সে এখানে আসেনি। শাজাহানের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে সামান্য আগে। ওকে একটু বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়ে যাচ্ছে।

ম্যাপের ওপর কয়েকবার চোখ বোলাবার পর শহরটা মাথায় বসে গেল।

কয়েক পা হাঁটাহাঁটি করা মাত্র সন্ধে নামল অসাড়ে। বোঝা গেল আশেপাশের দোকানে আলো জ্বলে ওঠায়। এই রাস্তার প্রতিটি দোকান চমৎকার সাজানো এবং টিবেটিয়ান বা সিকিমিজ সেলসম্যান কাউন্টারে। দোকানপাটের এলাকাটা পার হতেই চোখ জুড়িয়ে গেল ভাস্করের। এই শহরটাকে কেন এত সুন্দর বলা হয় তা মুহূর্তেই পরিষ্কার হয়ে গেল। এ-পাহাড় থেকে সে-পাহাড় যেখানেই শহরটা গড়িয়েছে সেখানেই টুকরো-টুকরো আলোর হীরে জ্বলছে। আর কী নয়ন ভোলানো ড্যালি। এই আবছা আলোয় আরও মায়াবী মনে হচ্ছে।

ব্যাপারটা মাথায় রেখে হাঁটতে লাগল ভাস্কর। দুপাশে লম্বা-লম্বা দেওদার গাছ। অন্য পাহাড়ি শহরের সঙ্গে এর পার্থক্য এটাও। প্রচুর গাছ দুপাশে দাঁড়িয়ে আছে গার্ড অফ অনার দেওয়ার ভঙ্গিতে।

ক্রমশ পথ আরও নির্জন হয়ে গেল। এবং নিচের জঙ্গলের মাথায় একটা প্রায় গোল চাঁদ আবদারের ভঙ্গিতে উঠে বসল। পায়ের তলায় চাঁদ, কবি হলে বোধহয় এমনটা বলা যেতে পারত।

রাস্তার নাম ক্রিন হার্ট রোড। নির্মল হৃদয় সরণি। চমৎকার রাস্তাই। এদিকের বাড়িগুলোও লাগোয়া নয়, একটার সঙ্গে আর-একটার ফারাক বেশ। এর গেট থেকে মূল বাড়ির প্রভেদ অনেকটা। প্রত্যেকটা বাড়ির গেটে ইংরেজিতে লেখা হয়েছে কুকুর থেকে সাবধান। এই রাস্তায় সেই বাড়ির মালকিন থাকেন কিন্তু কোন বাড়ি তা ঠাওর করা যাচ্ছে না। রাস্তায় লোক নেই যে প্রশ্ন করে জেনে নেওয়া যাবে তার কাম্য বাড়ি কোনটি। গেটে কোনও নম্বর নেই। ঠিক এই সময় পেছনে মোটরবাইকের আওয়াজ উঠল। ভাস্কর স্বস্তি পেল। যদি এই শহরের বাসিন্দা হন, নিশ্চয়ই হবেন নইলে সন্ধের পর এমন অঞ্চলে বাইক চালাতেন না। ভাস্কর দেখল নিচের রাস্তা বেয়ে এঁকে-বেঁকে মোটরবাইকটা ওপরে উঠে আসতে আসতে থেমে গেল। চালক একটা গেটের সামনে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে যেন আচমকাই মিলিয়ে গেল।

ভাস্কর ধীরে-ধীরে ফিরে এল মোটরবাইকটার কাছে। খুব দামি এবং শক্তিশালী বাইক। না হলে এই পাহাড়ে এত স্বচ্ছন্দে ছুটতে পারত না। ঠিক তখনই গেট পেরিয়ে বাগান আর বাগান পেরিয়ে সুন্দর বাড়িটার একটা ঘরে আলো জ্বলে উঠল। ভাস্করের কেমন যেন অনুভূতিতে এল, এইটেই সেই বাড়ি। কিংবা বাড়িটি যদি অন্য কারও হয় তাহলে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে হদিশ নিয়ে আশা যায় মহিলার বাড়ি কোনটি।

গেট খুলে ভেতরে ঢুকল ভাস্কর। চমৎকার গন্ধ ছড়াচ্ছে বাগানের ফুলগুলো। কিন্তু ভেতরে পা দেওয়া মাত্র একটা অদ্ভুত শিরশিরে নির্জনতা চেপে ধরল। ঝি-ঝি ডাকছে বিশাল গাছগুলো থেকে। পাহাড়ি এই গাছগুলোর একটা চরিত্র আছে। ঝি-ঝিগুলো তাদের

সঙ্গে দিব্যি মানিয়ে নেয়। ভাস্কর খালি বারান্দায় পা রাখতে যাচ্ছে তখনই গলাটা ভেসে এল। হিসহিসে তীক্ষ্ণ গলা, যাতে ঘেন্না এবং জ্বালা স্পষ্ট, আবার কী দরকার? তোমাকে আমি বলে দিয়েছিলাম এখানে না আসতে।

মহিলার বয়স অনুমান করা মুশকিল কণ্ঠস্বর থেকে। কিন্তু বেশ কর্তৃত্ব আছে স্বরে। ভাস্কর বারান্দা থেকে পা নামিয়ে নিল। একটা রহস্যের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। সে ধীরে-ধীরে ঘুরে জানলার পাশে এসে দাঁড়াল। জানলাটা বন্ধ। কাচের ভেতরে পর্দা আছে। এখান থেকে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু কথাগুলো শুনতে পাচ্ছিল সে। ছেলেটি, সম্ভবত যে প্রবেশ করেছে বাইক থেকে নেমে, বলল, কিন্তু আমার যে না এসে উপায় নেই।

উপায় নেই মানে? কী বলতে চাও? মহিলাকণ্ঠ চিৎকার করে উঠল। শীতল গলায় ছেলেটি বলল, গলা নামিয়ে কথা বলো। চিৎকার করে কেউ কথা বললে আমার সহ্য হয় না। তারপর হঠাৎ একটু হাসি জড়ানো সেই গলায়, তোমায় না দেখে থাকতে পারি না।

মিথ্যে কথা। একশো ভাগ মিথ্যে। তুমি টাকার ধান্দায় এসেছ।

টাকা। ছেলেটি আবার হাসল, হ্যাঁ, সেটাকেও ভালোবাসি। তোমাকে তো নিয়ে যেতে পারব না বাইকে চাপিয়ে, ওটাকে পারব, দাও।

আমি আর টাকা দিতে পারব না।

দিতে হবে।

সেরকম কোনও কথা ছিল না।

ছেলেটি হাসল, রাগ করলে তোমাকে খুব সুন্দর দেখায়। বিশেষ করে তোমার গজ দাঁতটা। বিউটিফুল।

মেয়েটি বলল, আমি রাগ করতে যাব কোন দুঃখে?

ছেলেটি বলল, সত্যি রাগ করোনি। তাহলে দুটো হুইস্কি খাওয়াও।

মেয়েটি বলল, আগে বলো তুমি ব্ল্যাকমেইল করতে আসোনি?

ছেলেটি জানাল, সে-সব কথা পরে হবে। আগে হুইস্কি।

মেয়েটি বলল, ঠিক আছে।

ভাস্কর আর অপেক্ষা করল না। খুব সতর্ক পায়ে সে বাগান ছেড়ে রাস্তায় উঠে এল। কয়েক পা হাঁটতেই এক বৃদ্ধ দম্পতিকে সে এগিয়ে আসতে দেখল বাজারের দিক থেকে। বৃদ্ধের হাতে ছড়ি, বৃদ্ধা তাঁর কনুই আঁকড়ে ধরে ধীরে-ধীরে উঠে আসছেন। কাছাকাছি হতে ভাস্কর দেখল এঁরা বাঙালি নন। চেহারায় বিদেশি কিংবা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মনে হয়। তবে এই এলাকার বাসিন্দা তা বৃদ্ধের হাতে বাজারের ব্যাগ দেখে বোঝা যাচ্ছে। ভাস্কর ওঁদের সামনে দাঁড়িয়ে বিনীত গলায় জিজ্ঞাসা করল, এটাই ক্রিন হার্ট রোড, তাই না?

ইয়েস। বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে মাথা নাড়তেই বৃদ্ধা হাত ছেড়ে রুমালে মুখ মুছলেন। এই ঠান্ডায় যেন ওঁর মুখে ঘাম জমছিল।

মিসেস জুলি শেরিংয়ের বাড়িটা কোথায় বলতে পারেন? বৃদ্ধ একটু বিব্রত চোখে বৃদ্ধার দিকে তাকাতে বৃদ্ধা জানালেন, দ্যাট টিবেটিয়ান লেডি।

আই সি। বৃদ্ধর এবার মনে পড়ল, তুমি অনেকটা এগিয়ে এসেছ মাই বয়। ওই যে রাস্তাটা যেখানে বাঁক নিয়েছে তার গায়েই দেখবে শেরিংদের গেট। বাঁ-দিকের নিচের কটেজ। ওটা আগে ছিল মিস্টার হ্যারল্ড টমসনের। মাই ওল্ড ফ্রেন্ড। টমসন অস্ট্রেলিয়ায় চলে যাওয়ার সময় শেরিংদের বিক্রি করে গেল। টমসন ছিল বিরাট পুলিশ অফিসার আর শেরিংরা নাকি মদের দোকান চালায়। তাও কাস্ত্রি-লিকার।

ও জন, তুমি বড্ড বেশি কথা বলছ। বৃদ্ধা চাপা গলায় শাসন করতে বৃদ্ধ যেন সতর্ক হলেন, নাইস টু মিট য়ু জেন্টলম্যান, গুড নাইট। ভাস্করকে ছাড়িয়ে টুকটুক করে ওঁরা উঠে গেলেন ওপরে।

না। আর কোনও সন্দেহ নেই। সে জুলি শেরিংয়ের বাড়িতেই ঢুকে পড়েছিল। চটপটে পায়ে সে পা চালাল শহরের দিকে। এর মধ্যে জম্পেশ অন্ধকার নামতে শুরু করেছে। আজ আর কোনও কাজ নয়। তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে টেনে ঘুম। প্রথম দিনেই একটা নাটক শুনতে পাবে এমনটা কে আশা করেছিল।

সেই সুন্দর রাস্তায় এখনও দোকানপাট খোলা। তবে পথে তেমন মানুষজন নেই। আলো জ্বলছে তবে দার্জিলিংয়ের মতো এখানে ট্যুরিস্টদের ভিড় নেই। ভাস্করের মনে পড়ল তার হোটেলে খাওয়ার ব্যবস্থা নেই। বাইরে যদি খেতে হয় তাহলে এখানকার কোনও রেস্তোরাঁতে খেতে যাওয়াই ভালো। ঘড়িতে এখন আটটাও বাজেনি। হঠাৎ তার সেই কাস্ত্রি-লিকার শপের কথা মনে পড়ল। আজ একবার সেখানে গেলে কেমন হয়? যদিও একটু আগে ঠিক করেছিল আজ আর কোনও কাজ নয়, তবু তাকে এখন দোকানটা টানছে, ওই নাটকটা শোনার জন্যেই হয়তো। সে একটা পানের দোকানদারকে সিগারেট কেনার অছিলায় জিগ্যেস করে জানতে পারল, আজ এই শহরে ড্রাই-ডে। সমস্ত মদের দোকান বন্ধ।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে হোটেলের দিকে ফিরছিল ভাস্কর। রাস্তাটা অন্ধকার। সিঁড়ি ভেঙে-ভেঙে নামতে হয়। খানিকটা অন্যমনস্ক ছিল সে। তিন লক্ষ টাকার ইনসুরেন্স ক্লেইম করেছেন জুলি শেরিং। লোকাল অফিস সেটাকে ফরোয়ার্ড করেছে কলকাতার অফিসে। মিস্টার শেরিং ভারতবর্ষে এসেছিলেন বাষট্টি সালে। চীন যখন তিব্বত দখল করল তখন যেসব টিবেটিয়ান এদেশে পালিয়ে আসেন নানারকম সঞ্চয় নিয়ে, মিস্টার শেরিং তাদের মধ্যে একজন। প্রথমে আশ্রিত, তারপর ভারতবর্ষের নাগরিকত্ব পেয়ে যান ভদ্রলোক। এই শহরে এসে টিবেটিয়ান দেশি মদের একটা ভালো দোকান খুলে বসেন। আর খোলামাত্র ব্যবসাটা জমে উঠল তাঁর। এ সবই সম্ভব, ঠিক। কিন্তু সেই মানুষটা মরে গেলেই তিন লক্ষ টাকা ইনসুরেন্স কোম্পানির কাছে ক্লেইম পাঠানো হবে এবং কোম্পানি তা মেনে নেবে, এটা যেন একটু বেশি রকমের বাড়াবাড়ি। ব্যাপারটা তিরিশ হাজার হলে কোম্পানি গায়ে মাখত না। কিন্তু তিন লাখ বলেই কর্তাদের টনক নড়েছে। আর প্রিমিয়াম দেওয়া হয়েছে বড়জোর চারটে।

ফলে কোম্পানি একটা নতুন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই বিশাল পাহাড়ি অঞ্চলে যে সমস্ত ইনসুরেন্স ক্লেইমে রহস্যের গন্ধ থাকবে সেগুলোর সত্যতা যাচাই করা দরকার। এবং এই উদ্দেশেই ভাস্করকে এখানে পাঠানো। ভাস্কর কোম্পানির গোয়েন্দা বিভাগের খুব নামকরা অফিসার। সন্দেহজনক দাবির কেস এই অঞ্চল থেকে গেছে পাঁচটি।

প্রত্যেকটির সুরাহা করে ফিরতে কত সময় লাগবে কেউ জানে না। হয়তো ছয় মাস, কিংবা এক বছর। তবে ভাস্কর যে এখানে আসছে তা কোম্পানির লোকাল অফিস জানে না। সে নিজেই চায়নি ওরা আগে থেকে জেনে যাক। বলা যায় না, হয়তো সর্ষের মধ্যেই ভূত বিচরণ করছেন।

দিনেরবেলায় বাস-স্ট্যান্ডে যেরকম অভদ্র-ব্যস্ততা থাকে, এখন এ সন্ধে পেরোনো সময়টায় তা নেই। কিছু মিনিবাস দাঁড়িয়ে আছে বটে, সেগুলোর আলো নেভানো এবং লোকজন নেই। এখনও শহরটাকে ভালো করে দেখা হয়নি কিন্তু অনুমানেই বলা যায় এই জায়গাটা চোর বদমাশ গুন্ডাদের আরামের। কারণ এখানেই পাঁচ মিশালি নিম্নবিত্ত মানুষেরা হল্লা করে কথা বলতে পারে। এখানে কোনও রুচি বা শোভনতা ভ্রূ কুঁচকে থাকে না। একটা পান-সিগারেটের দোকানের সামনে এসে দাঁড়াতেই ভাস্কর দেখতে পেল একটি অল্পবয়সি নেপালি ছেলে তাকে লক্ষ করছে। এই কি পেছন-পেছন আসছিল? অন্ধকারে পায়ের আওয়াজটাকে ঠিক পাত্তা দেয়নি সে।

চট করে পানের দোকান ছেড়ে দিয়ে ভাস্কর রাস্তার ধারের রেলিংয়ে এসে দাঁড়াল। এখান থেকে নিচের খেলার মাঠটাকে নিঃসঙ্গ দেখাচ্ছে। এবং তখনই ভাস্কর টের পেল ছেলেটি তার দিকে এগিয়ে আসছে শব্দহীন পায়ে। আসুক। আসতে দাও। ভাস্কর তার শরীরের মাস্‌ল একটুও শক্ত করল না। যেন অত্যন্ত তন্ময় হয়ে সে আর্ট দেখছে। ঠিক তখনই কোমরে একটা ধারালো এবং তীক্ষ্ণ কিছু স্পর্শ করল এবং সেইসঙ্গে চাপা গলায় একটা হুমকি, জেবমে যো হ্যায় নিকালো, নেহি তো খতম হো যায়েগা।

ভাস্কর হাসল। শব্দহীন। ছেলেটি নেহাতই নভিস। না হলে ওর আক্রমণটা একটু অন্য ধরনের হতো। সে ঠিক করল জবাব দেবে না। শুধু ওই তীক্ষ্ণ কিছুর উপস্থিতিটাই তার অস্বস্তি বাড়াচ্ছিল। ছেলেটি এবার চাপা হুঙ্কার দিল, নিকালো!

চকিতে ভাস্করের ডান গোড়ালি পেছনে উঠে গেল ততটাই, যতটা ছেলেটির তলপেটে আঘাত করা যায়। সঙ্গে সঙ্গে কঁক্ করে একটা শব্দ হল। এবং চকিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে ভাস্কর বাঁ-হাতের পাশ দিয়ে দ্বিতীয় আঘাত করল ছেলেটির ধারাল ছুরি-ধরা হাতে। সঙ্গে-সঙ্গে ছুরিটা উড়ে গিয়ে পড়ল খানিকটা দূরের চাতালে। ছেলেটি তখন দাঁড়িয়ে টলছে। ওর দুটো পা এক জায়গায় নেই। ভাস্করের আফসোস হল এই দ্বিতীয় আঘাতটা করার কোনও দরকার ছিল না। ছুরিটা হাতের মুঠো থেকে এমনিই খসে পড়ত।

ভাস্কর বাঁ-হাত বাড়িয়ে ছেলেটির জামার কলার ধরল, তোর নাম কী?

ছেলেটি তখনও কথা বলার অবস্থায় ফিরে আসেনি। ভাস্কর ওকে এমন একটা ঝাঁকুনি দিল যে কিছু শব্দ ছিটকে এল মুখ থেকে। তা থেকে অন্তত এটুকু বোঝা গেল সে ক্ষমা চাইছে।

ভাস্কর ওকে ধরে নিয়ে গেল পানের দোকানের সামনে। দোকানদার এতক্ষণ বোবা চোখে দেখছিল। এখন মাথা নামিয়ে কাজের ভান করতে লাগল। ভাস্কর লোকটাকে জিগ্যেস করে, একে তুমি চেনো?

ওদের দিকে না তাকিয়ে পানওয়ালা ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলল। কিন্তু তার মুখ দেখে বোঝা গেল আর বেশি কিছু বলতে সে নারাজ। ভাস্কর এবার ছেলেটিকে বলল, তুই কি এইসব করে বেড়াস?

ছেলেটি ততক্ষণে বোধহয় খানিকটা আত্মবিশ্বাস ফিরে পাচ্ছিল। খানিকটা জেদের ভঙ্গিতে সে ঘাড় নাড়ল, হ্যাঁ।

চাকরি-বাকরি করিস না?

কোই মুঝে নোকরি নেহি দেতা।

জেলে গেছিস?

হ্যাঁ, তিনবার।

ভাস্কর এক মুহূর্ত চিন্তা করে নিল। তারপর ওর জামাটা ছেড়ে দিল, যা ছুরিটা কুড়িয়ে নে। আমি ওই কাঞ্চনজঙ্ঘা লজে আছি। কাল খুব ভোরে আমার সঙ্গে দেখা করিস। তোর উপকার হবে।

ভাস্কর আর দাঁড়াল না। তবে সে অনুভব করছিল ছেলেটি তখনও সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছে। হয়তো হতভম্ব হয়ে গেছে। এরকম শিক্ষাপ্রাপ্তি ওর বোধহয় এই প্রথম।

কাঞ্চনজঙ্ঘা লজের রিসেপশনিস্টের ডেস্কটা এখন খালি। একজন বৃদ্ধ টিবেটিয়ান উল্টোদিকের চেয়ারে বসেছিলেন। তাঁর হাতের মালা ঘুরছে। নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াতে সেই বৃদ্ধার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। একটা প্লেটে অদ্ভুত ধরনের খাবার নিয়ে তিনি বৃদ্ধের দিকে এগিয়ে আসছিলেন। ভাস্কর তাঁকে দেখে মাথাটা সামান্য দোলাল। বৃদ্ধা আড়চোখে তাকে দেখে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ালেন, মুখে কিছু বললেন না। ভাস্কর সিদ্ধান্ত নিল এই টিবেটিয়ানরা নিশ্চয়ই কম কথা বলে আর যা বিদঘুটে গন্ধ এখানে, কাল সকাল হলেই হোটেল পালটাতে হবে।

শাজাহান সেনের ঘরের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল সে। লোকটার খবর নেওয়া দরকার। তখন যেভাবে ঘরে ঢুকেছিল সেটা সুবিধের নয়। সে দরজায় নক্ করল। ভেতর থেকে কোনও উত্তর এল না। আরও দুবার নক্ করার পর সে জোরে দরজাটাকে ঠেলতেই সেটা খুলে গেল। এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না ভাস্কর। বাঁ-দিক, ডানদিকে চোখ বুলিয়ে সে দেখে নিল করিডোরে কেউ আছে কি না, তারপর সামান্য নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরের ভেতর পা বাড়াল। সুন্দর ধূপের গন্ধ পাক খাচ্ছে ঘরে। এবং শাজাহান সেন উপুড় হয়ে পড়ে আছে তার খাটে। এছাড়া ঘরে আর কেউ নেই। ভাস্কর এগিয়ে গিয়েই বুঝতে পারল শাজাহান বেঘোরে ঘুমুচ্ছে। এবং এই ঘুম স্বাভাবিক নয়। সে মৃদু গলায় ডেকেও সাড়া পায়নি। অথচ শাজাহানের পিঠ নিঃশ্বাসের তালে দুলছে। দুবার আলতো করে চড় মারল সে শাজাহানের গালে। কিন্তু কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। ভাস্কর আর অপেক্ষা না করে দ্রুত বেরিয়ে এল। তারপর দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে নিজের ঘরের তালা খুলল। আজ সন্ধে থেকে একটার পর একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটছে। ঠান্ডা মাথায় সবকিছু তলিয়ে দেখতে হবে। পাশের ঘরে যে নাটক চলছে তা জুলি শেরিং-এর ঘটনাটার চেয়ে কম চমকপ্রদ নয়।

সকালটা এল টাটকা রোদ নিয়ে। কাচের জানলার বাইরে ঝকঝকে নীল আকাশ পাহাড়ের ওপর উপুড় হয়ে রয়েছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে ভাস্কর বেল টিপল। এরা খাবার না দিক, চা অন্তত দিতে পারে।

মিনিটখানেক বাদে একটি টিবেটিয়ান বালক দরজায় এসে দাঁড়াতে ভাস্কর হুকুমটা

জানাল। ছেলেটা একটুও না হেসে চলে গেল। এবং তখনই দরজায় এল শাজাহান সেন, গুড মর্নিং। কেমন আছেন?

গুড মর্নিং। আসুন। কেমন আছেন? ভাস্কর স্বাভাবিক গলায় বলল।

আছি। ভাবছি আজই ফিরে যাব।

সেকি? কেন?

ওই ঘরে যা চলছে তারপর আর এখানে থাকা যায় না।

কী চলছে?

বলা নিষেধ।

অন্য হোটেলে যান।

অন্য হোটেলে গেলে আমায় শেষ করে ফেলে দেবে বলে শাসিয়েছে।

ভাস্কর এবার লোকটিকে ভালো করে দেখল। আপাত চোখে সরল বলেই মনে হয়। সে নিচু গলায় প্রশ্ন করল, ব্যাপারটা আমাকে খুলে বলবেন? হয়তো আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি।

কোনও লাভ হবে না।

এই সময় চা নিয়ে ঢুকল ছেলেটি। শাজাহানকে এই ঘরে দেখে যেন একটু অবাক হল সে। তবে মুখে কিছু না বলে সে বেরিয়ে গেল। শাজাহান বলল, এইটে আর এক চিজ। চায়ে মুখ দেবেন না। শরীর গুলিয়ে উঠবে।

কেন?

টিবেটিয়ান চা। হতকুচ্ছিত খেতে। বিশ্বাস না হয় চুমুক দিয়ে দেখুন। চায়ের দিকে তাকিয়ে ভাস্করের মনে হয় কথাটা সত্যি। সে উঠে দাঁড়াল, আপনার হাতে কোনও কাজ আছে?

না। এখানে তো কাজ করার জন্যে আসিনি। দুপুরের বাস ধরব। ততক্ষণ আমি ফ্রি। কেন, কিছু করতে হবে?

চলুন একটু বেড়িয়ে আসি। জায়গাটা আপনার চেনা। ভালো খাবারের দোকান কোথায় আছে দেখিয়ে দিন। শাজাহানের আপত্তি ছিল না। দরজায় তালা দিয়ে ভাস্কর বলল, আপনার ঘরে তালা দেবেন না?

শাজাহান মাথা নাড়ল, আমার রুমমেট ঘুমুচ্ছেন। দশটাকা বেশি দিলে তখন আপনার সিঙ্গল রুমটা পেয়ে যেতাম। কিপ্টেমি করে যে কী ভুল করেছি! বাইরে বেরিয়ে এসে ভাস্কর জিগ্যেস করল, কাল রাত্রে খাওয়া-দাওয়া করেছিলেন?

খাওয়া-দাওয়া? কাল রাত্রে? আচমকা প্রশ্নে ঘাবড়ে গেল শাজাহান, হঠাৎ এইরকম প্রশ্ন করছেন কেন? আমি কি খুব বেশি মাল খেয়েছিলাম কাল রাত্রে? আমার না বেশি মাল খেলে খাবার খেতে ইচ্ছে করে না।

আপনি কাল রাত্রে বেশি মদ খাননি। আর যখন ঘরে ঢুকেছিলেন তখন তো সন্ধে। নিশ্চয়ই গুরুদেবের সামনে মদ খাননি।

না। না। এইবার মনে পড়ছে। তাই বলি, এখন এত খিদে পাচ্ছে কেন? না, কাল রাত্রে কিছু খেয়েছি বলে মনে হচ্ছে না। চলুন, ওই দোকানটায় চমৎকার চা করে। দেখছেন কেমন গরম-গরম জিলিপি ভাজছে। আহা, চোখ জুড়িয়ে যায়।

সকালবেলায় মিষ্টি খাওয়া ধাতে নেই ভাস্করের। সে চা এবং একটা বিস্কুট খেল। শাজাহান গোটা ছয়েক জিলিপি শেষ করে তৃপ্তির ঢেকুর তুলে বলল, স্টমাকটা একদম খালি হয়েছিল, প্রাণ জুড়োল।

ভাস্কর ঠাট্টা করে বলল, আপনি দেখছি অদ্ভুত মানুষ। রাত্রে মদ খান, ভোরে জিলিপি।

সিওর। আমার ডায়াবেটিস নেই, ব্লাডসুগার নেই, আমি খাব না কেন?

পাহাড় ভাঙতে-ভাঙতে ভাস্কর জিগ্যেস করল, কাল রাত্রে ঠিক কী হয়েছিল বলুন তো শাজাহানবাবু। আপনার হঠাৎ নেশা হয়ে গেল কী করে? যখন ঢুকলেন তখন তো সামান্যই ড্রিঙ্ক করেছিলেন। তাতে বেঘোর হবার কথা নয়! ভাস্কর একটু উস্কে দিতে চাইল।

কী হয়েছিল সত্যি আমার মনে নেই। ঘরে ঢুকে দেখলাম গুরুদেব শব-সাধনা করছেন। আমি ঢুকে পড়েছি বলে শিষ্যমহারাজ খুব বিরক্ত হয়ে বললেন, এভাবে হুটপাট ঢুকে পড়বেন না। গুরুদেবের অর্চনার বিঘ্ন হলে সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে। গুরুদেব সেই অবস্থায় বললেন, বাক্ সংযম কর বৎস। বরং ওকে প্রসাদ পাইয়ে দাও।

শিষ্যমহারাজ আমাকে মন্ত্রঃপুত কারণবারি পান করতে দিলেন। আমি দেখলাম নেশাটা জলো হয়ে এসেছিল তাই সেটাকে জমাট করতে মেরে দিলাম পুরোটা। ব্যস, আর কিছু খেয়াল নেই। শাজাহান বিবৃতি শেষ করল।

ভাস্কর খানিকটা অবাক গলায় জিগ্যেস করল, শব-সাধনা করছিলেন বললেন না? শব, মানে ডেডবডি এল কী করে ওই ঘরে? আর এইসব তো শুনেছি তান্ত্রিকরা করে থাকেন।

শাজাহান ঠোঁটে একটা আওয়াজ করল, ডেডবডি হতে যাবে কেন, একটি মেয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকে আর গুরুদেব তার পিঠে পদ্মাসনে বসে ধ্যান করেন। মাইরি সব বলব আপনাকে, দেখলে সহ্য করা যায় না।

একটি মেয়ে মানে, রোজ কি একই মেয়ে আসে?

নো, নেভার। প্রত্যেক দিন তো নতুন মুখ দেখি।

ভাস্কর মাথা নাড়ল। লোকটা যে দুনম্বরি তা বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু এই পাহাড়ে ও রোজ একটা করে মেয়ে পাচ্ছে কোত্থেকে? নাঃ আজ যেমন করেই হোক লোকটার সঙ্গে আলাপ করতে হবে। তবে লোকটা যদি এমন ধান্দাবাজ হয় তাহলে ডাবল সিটেড রুম নিতে যাবে কেন? কেন আর-একজন অচেনা মানুষকে রুমমেট হিসেবে সঙ্গে রাখবে? ও তো স্বচ্ছন্দে সিঙ্গল সিটেড রুম নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করতে পারত। এইখানেই খটকা লাগছিল ভাস্করের। শাজাহান লোকটা দু-নম্বরি নয়তো? এইসব কথা বলে তার সঙ্গে অন্য মতলবে ভিড়ছে না তো!

মুখে কিছু প্রকাশ করল না সে। বলল, শাজাহানবাবু, আজকের দিনটা থেকে যান। এতদিন কষ্ট করলেন আর-একটা দিন করলে কোনও অসুবিধে হবে না। বুঝলেন?

শাজাহান মাথা নাড়ল, আমি যে অ্যানাউন্স করে ফেলেছি।

সেটা শুনে গুরুদেব কী বলছেন?

উনি খুব চটে গেলেন। বললেন আমার নাকি ধৈর্য নেই, সংযমশক্তি নেই। আমার

দ্বারা সাধনা হবে না। আমি একটু তন্ত্রসাধনা শিখতে চেয়েছিলাম তাই উনি খেপে গেলেন আমি চলে যাব শুনে।

আপনার হঠাৎ ওসব শেখার ইচ্ছে হল কেন?

মানে, এই আর কী? রোজ মশাই ভৈরবী দেখতে-দেখতে—।

হো-হো করে হেসে উঠল ভাস্কর। যাক এতক্ষণে শাজাহানের মতলবটা বোঝা গেল। শাজাহান বেশ সংকুচিত হচ্ছিল, বলল, না-না, এটা ঠাট্টার বিষয় নয়। আমি একটা বইতে পড়েছিলাম টিবেটে তন্ত্রের প্রচার ছিল।

হাসি থেমে গেল ভাস্করের। টিবেটে? হ্যাঁ, তিব্বতে তো শাক্ততন্ত্র প্রবেশ করেছিল। বুদ্ধের মন্দিরে শাক্তদের অনেক প্রতীক আছে। কিন্তু তার সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক মশাই?

বাঃ, এই গুরুদেব তো অরিজিন্যাল টিবেটিয়ান।

টিবেটিয়ান? হতভম্ব হয়ে গেল এবার ভাস্কর।

ইয়েস অরিজিন্যাল। যেহেতু উনি বুদ্ধের মতাবলম্বী নন তাই ওঁর জাতভাইরা তাঁকে এড়িয়ে চলে। তবে চমৎকার বাংলা বলতে পারেন। শিষ্যমহারাজ বলেন, গুরুদেব নাকি পৃথিবীর যে কোনও ভাষায় কথা বলতে পারেন। যোগীরা একটা স্টেজে চলে গেলে বোধহয় ওইসব ক্ষমতা অর্জন করেন। তবে শিষ্যমহারাজ বাঙালি, একটু খেঁকুরে টাইপের। লোকাল লোক।

কোথায় থাকেন?

জিগ্যেস করিনি।

সমস্ত ব্যাপারটাই দুর্বোধ্য মনে হচ্ছিল ভাস্করের কাছে। ওরা হাঁটতে-হাঁটতে অনেকটা ওপরে উঠে এসেছিল। এবার শাজাহান জিগ্যেস করল, এদিকে কোথায় যাচ্ছেন?

এমনি, উদ্দেশ্যবিহীন বেড়ানো আর কী!

শাজাহান নিজের ঘড়ি দেখল, নটা বেজেছে। এখন একটু খাওয়া যায়।

কী খাবেন?

সলজ্জ মুখ করল শাজাহান। তারপর শরীরটা বেঁকিয়ে বলল, যে জন্যে এই পাহাড়ে একা-একা ছুটে আসি। এখানে একটা শস্তার বার আছে।

এই সাতসকালেই মদ খাবেন?

সাতসকাল কোথায়? নটা বেজে গেছে!

টিবেটিয়ান মদ? ভাস্করের চোখ ছোট হল।

না, না। এই বাঙালির লিভার ওসব সহ্য করতে পারে না। আমি পুরো ইংলিশ।

তাহলে আজ থেকে যাচ্ছেন?

বলছেন যখন, আর-একদিন মাল খাওয়া যাক।

শাজাহানকে ছেড়ে উলটো পথ ধরল ভাস্কর। ম্যাল রোডে আসামাত্র সে মোটরবাইকটাকে দেখতে পেল। তার আরোহী চোখে সানগ্লাস সেঁটে সিটের ওপর স্টাইলে বসে একটি লোকের সঙ্গে কথা বলছে। লোকটি বৃদ্ধ নেপালি। ছেলেটির কথায় বারবার মাথা নাড়ল লোকটি। তারপর আচমকা স্টার্ট দিয়ে মোটরবাইকটাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল ছেলেটি ডানদিকের রাস্তায়। সেই সময় ভাস্কর ছেলেটিকে দেখতে পেল। দুই পকেটে হাত ঢুকিয়ে তাকে দেখছে। ভাস্কর চিনতে পারল। এই ছোকরাই গতরাত্রে ছিনতাই করতে

এসেছিল। সে ইশারায় ওকে কাছে ডাকতে ছেলেটি এপাশ ওপাশ দেখে এগিয়ে এল, আপকো হোটেলমে গিয়া থা।

ভাস্করের মনে পড়ল ওকে সে দেখা করতে বলেছিল।

সে মাথা নেড়ে জিগ্যেস করল, তোর নাম কী?

পদম বাহাদুর।

তুই ছুরি দেখিয়ে রোজ কত টাকা কামাস?

দশ-বিশ-পঞ্চাশ, কভি-কভি একদম নিল।

এখন কী করছিস?

কুছ নেহি।

তুই এই শহরের সবকিছু জানিস?

হলুদ দাঁত বের করে হাসল পদম। তারপর ডানহাত সামান্য বাড়িয়ে বলল, এই হাতটাকে যেমন চিনি তার চেয়ে কম নয়।

তুই চাকরি চাস?

ফুঃ, কেউ আমাকে চাকরি দেবে না। সবাই জানে আমি কী করি। নিরাসক্ত মুখে কথাগুলো শোনাল পদম।

ভাস্কর হাসল, তুই যদি কথা দিস আর কখনও ছিনতাই করবি না তাহলে আমি তোর জন্যে চেষ্টা করতে পারি। তার আগে বলতো এখানে দিশি মদ কোথায় পাওয়া যায়?

এবার যেন ছেলেটি স্বাভাবিক হল, অনেক রকমের দিশি মদ এখানে পাওয়া যায়। আপনি কোনটা চাইছেন বললে আমি এনে দিতে পারি। হাঁড়িয়া, চোলাই, পচাই আউর তিব্বতিরা যে মাল খায় তারও একটা বড় দোকান হয়েছে এখানে। তবে সেটাকে সাহেব দিশি মদ বলবেন কি না জানি না। বহুৎ খারাপ গন্ধ আর তেমনি কড়া, কলজে জ্বালিয়ে দেয়।

ভাস্কর হাসল, এইরকম মদই আমার পছন্দ। দোকানটা কোথায়, তুই আমাকে সেখানে নিয়ে চল।

পদম বাহাদুর ইতস্তত করছিল, আপনি ওখানে যাবেন না সাহেব। আমরাই যেতে চাই না। আসলে ওই দোকানের খদ্দের সব তিব্বতি। মাল খেলে ওদের মেজাজ খুব চড়া থাকে।

তোর চেয়েও?

মানে?

তোকে যদি আমি কব্জা করতে পারি তো ওদের পারব না? তাহলে বল তোর চেয়ে বড় শের এই শহরে আছে! ভাস্কর ইচ্ছে করে গলার স্বরে ব্যঙ্গ মিশিয়ে দিল।

সঙ্গে-সঙ্গে ছেলেটি মুখ ভ্যাটকাল। তারপর দুই কাঁধ নাচিয়ে চলল, চলুন। তবে গোলমাল হলে আমাকে দোষ দেবেন না। আমি যে কোনও নেপালির সঙ্গে টক্কর দিতে পারি কিন্তু তিব্বতিদের হালচাল বুঝতে পারি না। ঠিক হ্যায়—।

পদম আগে-আগে হাঁটছিল। রাস্তাটা ঢালু, বাঁদিকে নামছে। পদমের হাঁটা-চলার মধ্যে এক ধরনের বিদেশি ভাব আছে। অথবা বিলিতি ছবির প্রভাবও হতে পারে। অবশ্য

এই শহরে বিদেশি ছবির চেয়ে হিন্দির পোস্টারই বেশি চোখে পড়ছে। তা ওদের নায়ক-নায়িকারাও তো আন্তর্জাতিক।

এখন সবে সকাল শেষ হয়েছে। নিচের রাস্তাটায় বেশ ভিড়। দোকানপাট আছে তবে ওপরের ম্যাল রোডের মতো অত সাজানো নয়। কিন্তু ব্যবসাপত্র বেশ জমজমাট তা তাকালেই ধরা যায়। গলির মধ্যে ঢুকতে হল না। বড় রাস্তা থেকে একটা কাঠের সাঁকো সোজা থেমেছে একটা কাঠের বারান্দায়। বাড়িটার ওপর ইংরেজি এবং সম্ভবত টিবেটিয়ানে লেখা রয়েছে। দ্বিতীয়টি বোঝার সামর্থ্য ভাস্করের নেই। প্রথমটির সরল অর্থ খুশমেজাজি পানশালা।

পদম বলল, আমি ভেতরে যাব না।

কেন? ভাস্কর অবাক হল।

পদম উত্তর দিল না। মাথা নামিয়ে এমন ভঙ্গিতে দাঁড়াল যার অর্থ সে আর এ বিষয়ে কথা বলতে ইচ্ছুক নয়। ভাস্কর আর জোর করল না। সে সাঁকোর ওপর পা রাখল। বেশ মজবুত সাঁকোর দুপাশে কাঠের রেলিং। বারান্দাটা ফাঁকা। কিন্তু সেখানেও কয়েকটা খালি বেঞ্চি বোঝাচ্ছে ভেতরের ভিড় বেশি হলে ওগুলোর প্রয়োজন হয়। সে দরজায় দাঁড়ানো মাত্র একটা বিদঘুটে গন্ধ নাকে এল। তীব্র এবং শরীরগোলানো গন্ধটায় অ্যালকোহল মিশে রয়েছে। ঘর না বলে হলঘর বলাই ঠিক। এই সময় তেমন ভিড় নেই। ভাস্কর গুনে দেখল মাত্র পাঁচজন পান করছে। এরা প্রত্যেকেই তিব্বতের মানুষ। কাউন্টারে যে লোকটি পরিবেশন করছে তার চেহারা বিশাল। অনুমানে বোঝা যায় তিন-চারজন সাধারণ মানুষকে সে অবহেলায় ছুড়ে ফেলতে পারে। ভাস্করকে দরজায় দাঁড়াতে দেখে লোকটা তার চেরা এবং প্রায় বোজা চোখ সমেত মাথাটা নাড়াল।

ভাস্কর ভাব-জমানোর হাসি হাসল কিন্তু লোকটির কোনও প্রতিক্রিয়া হল না। ততক্ষণে ভেতরে পা দিয়েছে ভাস্কর। হলঘরটির একটা বিশেষত্ব আছে। প্রতিটি টেবিলের সঙ্গে মাত্র একটি চেয়ার সাঁটা। অর্থাৎ তোমাকে পান করতে হবে একা-একা। আড্ডা মেরে পাঁচজন মিলে খাওয়া এখানে চলবে না। যে পাঁচজন খাচ্ছে তারা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো এবং নির্বাক।

ভাস্কর অনেক খালি টেবিলের একটায় বসল। চেয়ার মোটেই আরামদায়ক নয়। এই ব্যবস্থা নিশ্চয়ই একজন মানুষ যেন অযথা সময় এখানে না কাটায় সেই কারণে। সে কাউন্টারের দিকে তাকিয়ে দেখল স্বাস্থ্যবান লোকটি অবাক চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখাচোখি হতেই সে ইঙ্গিত করল কাউন্টারের কাছে এগিয়ে যেতে। ভাস্কর একটু সময় নিল। লোকটার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে সে খুব বিরক্ত হচ্ছে। ভাস্কর এবার ইঙ্গিত করল লোকটাকে কাছে আসতে। দশ সেকেন্ড তাকে দেখল লোকটা। তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিজের কাজে মন দিল। ভাবখানা এমন, চুলোয় যাও।

সাতসকালে মদ্যপান করার বিন্দুমাত্র বাসনা ছিল না। জায়গাটা তার দেখতে আসাই উদ্দেশ্য। এই পানশালার মালিক ছিলেন মিস্টার শেরিং। তিনি মারা গিয়েছেন। সকালবেলার খদ্দের দেখে অবশ্য ঠাওর করা যায় না এই পানশালায় বিক্রি কত! তবে তিন লক্ষ টাকার জীবন-বীমা সাধারণ আয়ের মানুষ করে না। কাউন্টারের পেছনে কয়েকটা

ঘর আছে। সেগুলোয় কারা থাকে? একটি মানুষ তার জীবনের নিরাপত্তা বা তার পরিবারকে বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে বীমা করতেই পারে। কিন্তু ভাস্কর শুধু দেখবে মিস্টার শেরিঙের মৃত্যুতে কোনও অস্বাভাবিক ব্যাপার নেই।

শেষপর্যন্ত সোজা পায়ে ভাস্কর হেঁটে গেল কাউন্টারে। তারপর সামান্য হেসে বলল, গিভ মি সাম টিবেটিয়ান ব্রেকফাস্ট।

নো ব্রেকফাস্ট! অনলি ড্রিংকস্‌। লোকটা চেরা চোখে তাকাল।

ইজ ইট টিবেটিয়ান?

ইয়েস। ভেরি গুড। অনলি ইন দিস শপ।

আই সি। ঠিক হ্যায়। আই লাইক টিবেটিয়ান ড্রিংক। তবে এখন নয়। আজ বিকেলে আসব। গুডবাই। কথাটা শেষ করে ঘুরে দাঁড়াতেই ভাস্কর দেখল একটা গাড়ি এসে কাঠের সাঁকোর সামনে দাঁড়াল। ড্রাইভার দ্রুত নেমে দরজা খুলে দিতেই জুলি শেরিং গাড়ি থেকে নামলেন। সঙ্গে-সঙ্গে কাউন্টারের লোকটা চঞ্চল হয়ে বাইরে বেরিয়ে দরজায় ছুটে গেল। ভাস্কর চট করে বাঁদিকে সরে গেল যাতে ভদ্রমহিলার সামনা-সামনি না পড়তে হয়। ভদ্রমহিলা যথেষ্ট লম্বা, ছিপছিপে শরীর দুখায় ঢাকা সত্ত্বেও বোঝা যায় ওঁর যৌবনে বেশি রকমের বাড়াবাড়ি। কিন্তু মাথা সোজা করে যখন চোখ নীল চশমায় ঢেকে হেঁটে এল তখন ভাস্কর ব্যক্তিত্ব শব্দটা মনে করতে পারল। লম্বাটে কিন্তু সুশ্রী মুখ। টিবেটিয়ানরা যেরকম ফর্সা হয় মহিলা তার চাইতে একটু বেশি। বয়স অনুমান করা মুশকিল। পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হলে বিশ্বাসযোগ্য। কিন্তু ভাস্কর জানে মিস্টার শেরিংয়ের একটি কুড়ি বছরের মেয়ে রয়েছে যে তিব্বতেই থেকে গিয়েছিল বাষট্টি সালে ভারতে পালিয়ে আসবার সময়। সেই মেয়ের মা যে এত অল্পবয়সি তা ভাবতেও বিস্ময় লাগে। কোনও-কোনও চিত্রাভিনেত্রী নাকি বাহান্নতে বত্রিশে থেমে থাকেন। এই মহিলা সেই কৌশলটি আয়ত্ত করেছেন।

জুলি শেরিং মদ্যপায়ীদের দিকে তাকালেন না। গর্বিত পদক্ষেপে হলঘরটা পেরিয়ে ঢুকে গেলেন কাউন্টারের পাশ দিয়ে ভেতরের ঘরে। আর স্বাস্থ্যবান লোকটি বশংবদের মতো ওর পেছন-পেছন দরজা পর্যন্ত পৌঁছে বিনীত ভঙ্গিতে আবার কাউন্টারে ফিরে এল। ভাস্কর আর দাঁড়াল না।

জুলি শেরিং নিয়মিত এই পানশালায় তদারকিতে আসেন। অর্থাৎ কর্মচারীদের ওপর দায়িত্ব চাপানোর মহিলা নয়। ওর হাঁটার ধরন, মুখের গড়ন এবং গাম্ভীর্য বলে দেয় এই মহিলা মোটেই সাধারণ রমণী নয়। বাইরে বেরিয়ে এসে ঠান্ডা বাতাস নিল সে বুক ভরে। ঘরের মধ্যে এই সময়টুকু থেকেই যেন নেশা হয়ে যাচ্ছিল। এই মদ সত্যিই তীব্র।

জুলি শেরিংয়ের সঙ্গে আজ কথা বলা যেতে পারত। সে যে উদ্দেশ্যে এসেছে তাতে কথা বলার সম্পূর্ণ অধিকার তার আছে। কিন্তু না, আর একটু অপেক্ষা করা যাক। নদীর জল, মাটি, শ্যাওলা ইত্যাদি দেখার পর স্নানে নামাই ভালো।

রাস্তায় নামতেই পদম এগিয়ে এল, পিয়া সাব?

ভাস্কর সত্যি কথা বলতে গিয়েও মত পালটালো। সে নীরবে এমন ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল যার অর্থ দুটোই হতে পারে। পদমের চোখ বিস্ফারিত হল, আপনার খাওয়া অভ্যেস

ছিল নিশ্চয়ই। ওই যে লোকটা কাউন্টারে দাঁড়িয়ে থাকে ও বহুৎ বদমাশ। একা তিনটে লোককে শুইয়ে দিতে পারে। আর ওই যে মেমসাহেব এই মাত্র ঢুকলেন তিনি হলেন এখন দোকানের মালকিন। খুব ঘাঘু চিজ।

খবর পাওয়া যাচ্ছে। খুশি হচ্ছিল ভাস্কর। কিন্তু সেটাকে প্রকাশ না করে খানিকটা বিরক্তি প্রকাশ করল, একজন ভদ্রমহিলা সম্পর্কে অভদ্র-ভাষায় কথা বলছ কেন?

ভদ্রমহিলা? ও যদি তুড়ি মারে তাহলে যে কোনও লোকের লাশ পড়ে যাবে। তিব্বতিরা পর্যন্ত ওকে এড়িয়ে চলে। ওর ডান হাত হল ওই কাউন্টারের লোকটা। ওই বারে মাতালরা ঝামেলা করতে সাহস করে না। ওর স্বামী যখন মারা গেল তখন অনেকেই সন্দেহ করেছিল মৃত্যুটা সাদা কি না!

সাদা কি না মানে? ভাস্কর সতর্ক হল কিন্তু ভঙ্গিতে প্রকাশ করল না।

মানে মানুষরা বলে বুড়ো স্বামীকে হয়তো ওর পছন্দ হয়নি।

কীভাবে মারা গেল লোকটা? উল্টোপথে হাঁটতে-হাঁটতে প্রশ্ন করল ভাস্কর। মিস্টার শেরিংয়ের মৃত্যুর বিশদ বিবরণ যে ফাইলে আছে সেটি সে পড়েছে। পুলিশ মৃত্যুর পেছনে কোনও অস্বাভাবিকত্ব লক্ষ করেনি। যে ডাক্তার সার্টিফিকেট দিয়েছেন, তিনিও বলেছেন মৃত্যুটা স্বাভাবিক। মিস্টার শেরিং কিছুদিন থেকেই বিভিন্ন অসুখে ভুগছিলেন। তাঁর মৃত্যু হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে। অনেক মানুষের সামনে ওই কাউন্টারের ওপর লুটিয়ে পড়েছিলেন তিনি বুকের যন্ত্রণায়। এই অবধি কোনও গোলমাল নেই। গোলমাল ছিল কি না সেটা জানতেই তার এই শহরে আসা। অতএব এই ছেলেটি যদি কিছু তথ্য দিয়ে দেয়, গুজব যত বানানোই হয় একটা সত্যের বীজ থাকে সুদূর নেপথ্যে।

মদ খেয়ে। পদম হাসল, এ শালা তিব্বতি মদ কলিজা পুড়িয়ে দেয়। খুব মদ খেত লোকটা। কেউ-কেউ বলে ওই মদে কিছু মিশিয়ে দিত মেয়েটা। আবার কেউ বলে মদ খেত বটে কিন্তু তার চেয়ে আর-একটা নেশা ছিল বুড়োর।

কী নেশা? ভাস্কর হতাশ হচ্ছিল। ছেলেটার কথাগুলো সাধারণ গপ্পোবাজ অলস মানুষের বানানো। তার মধ্যে সত্যতা হয়তো আদৌ নেই এবং এ থেকে কোনও সিদ্ধান্তে আসা যায় না।

ছোবল খেত লোকটা। সাপের ছোবল।

দূর। ছোবল খেলে তো মরে যাবে। এই নেশা সম্পর্কে বিস্তারিত জানা সত্ত্বেও অজ্ঞ সাজল ভাস্কর।

হ্যাঁ যাবে, আপনি-আমি মারা যাব। কিন্তু যাদের অভ্যেস আছে তারা ঠিক থাকে। তবে সে-সব সাপ খুব ছোট-ছোট। বিষ সবে জমছে। একটা কৌটোতে আটকে রাখা হয়। কৌটোর ওপরে ছোট্ট ফুটো থাকে। ছোবল খাওয়ার আগে খুব জোর কৌটোকে নাড়ালে সাপটা রেগে যায়। তখন সেই ফুটোতে জিভ রাখলে সাপ ছোবল মারবেই। অত ছোট ফুটো, ছোট সাপ, বিষে তাই মানুষ মরে না কিন্তু জব্বর নেশা হয়ে যায়। সারাদিন পড়ে থাকে নেতিয়ে। আমেরিকাতে শুনেছি সাহেবরা ইঞ্জেকশনে ওই বিষ ঢুকিয়ে শরীরে নেয়। মানুষ বড় আজব জিনিস সাহেব। খুব বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়ল পদম।

মনে-মনে তারিফ করল ভাস্কর। সাপের বিষ নেবার পদ্ধতিটা ও সঠিক না

জানলেও কায়দাটার আন্দাজ আছে। মিস্টার শেরিং যে ওই নেশা করতেন তার প্রমাণ চাই। সে জিগ্যেস করল, তুই সাপের বিষ কাউকে নিতে দেখেছিস? চোখের সামনে?

মাথা নাড়ল পদম, নাঃ। সাপকে আমার খুব ভয় করে। তবে নামচে বস্তিতে একজন তিব্বতি থাকে যে নাকি ওই ছোট-ছোট সাপ ধরে বিষের কারবার করে। হয়তো ওই মাল দিত বুড়োটাকে।

নামচে বস্তি এখানে আছে?

হ্যাঁ। এখান থেকে মাইল দেড়েক হেঁটে গেলেই নামচে বস্তি।

তুই আমাকে সেই লোকটার কাছে নিয়ে যেতে পারবি?

কেন? এই প্রথম যেন সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল পদম বাহাদুর।

আমি সাপ কিনব। মদ খেয়ে কোনও কাজ দিচ্ছে না।

সাহেব, এটা ঠিক নয়। আপনি তিব্বতি মাল খেলেন তবু মনে হচ্ছে যেন চা খেয়ে এলেন। তার মানে মদ হেরে গেছে। কিন্তু সাপের বিষ যেসব মানুষ নেয় তারা শুনেছি মানুষ থাকে না।

ভাস্কর হাসল। ছেলেটা সত্যিকারের ছিনতাইবাজ নয়। জেল খাটলেও নয়। কিংবা ওসব হলেও মনের আনাচে-কানাচে কিছু নরম ব্যাপার আছে। মানুষের ভেতর আর-একটা নরম মানুষ না থাকলে অন্যের সত্য উপলব্ধি করা যায় না। সে নিচু গলায় বলল, তোর সঙ্গে আমার একটা বন্দোবস্ত দরকার।

পদম বেশ ঘাবড়ে গিয়ে তাকাল।

ভাস্কর বলল, তুই তোর অভ্যেস ছাড়লে চাকরির ব্যবস্থা করব বলেছি। এছাড়া আমার সঙ্গে যে ক'দিন ঘুরবি তার জন্যে আলাদা টাকা পাবি। রাজি?

পদম হাসল, হেসে মাথা নাড়ল।

ম্যাল রোড ধরে ওরা হাঁটছিল। এই সময় সেই মোটরবাইকওয়ালাকে নিচে নেমে যেতে দেখল ভাস্কর। সে জিগ্যেস করল, লোকটাকে চিনিস?

ঘাড় নাড়ল পদম, খুব ভালো ব্যাডমিন্টন খেলে। সরকারি চাকরি করে। এখানকার মেয়েরা ওর জন্যে পাগল।

ক্রমশ ওরা এগিয়ে এল ক্লিন হার্ট রোডে। এখন এই রাস্তায় মোটামুটি লোক চলাচল করছে। তবে জায়গাটা যেহেতু বড়লোকদের তাই আজেবাজে মানুষজন নেই। ভাস্কর চটপট চারপাশে তাকিয়ে নিল। তারপর পদমকে বলল, তুই এই রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবি। আমি ওই বাংলোর ভেতর যাব। কেউ গেট খুলে ঢুকতে দেখলেই সিটি বাজাবি। সিটি বাজাতে পারিস?

পদমের মুখ উজ্জ্বল হল, সে ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলল। ভাস্কর বুঝল অপরাধ জগতের সঙ্গে জড়িত কোনও মানুষ একজন সঙ্গী পেলে সুখী হয়। পদম এতক্ষণে তাকে ওইরকম কিছু ভাবছে।

জায়গাটা সামান্য নির্জন হওয়া মাত্র ছোট পাঁচিল ডিঙিয়ে ভাস্কর ভেতরে ঢুকে পড়ল। দুপাশে ফুলের বাগান এবং লম্বা গাছের সারি। এই মুহূর্তে জুলি শেরিং বাড়িতে নেই। তার সাকরেদ স্বাস্থ্যবান মানুষটিও কাউন্টার সামলাচ্ছে। রাত্রে যে মোটরবাইকওয়ালা জুলিকে দেখছিল সেও নিচে নেমে গেছে। এখন এই মুহূর্তে বাড়িতে আর কে-কে

থাকতে পারে? এই বাড়ির ভেতরটা জুলির অজান্তে একবার ভালো করে দেখতে চায়। খুব বুদ্ধিমান মানুষও কখনও-কখনও বোকার চেয়ে সাধারণ ভুল করে বসে। এক্ষেত্রে সেরকম কিছুর সন্ধান পাওয়া গেলেও যেতে পারে। মাথা নিচু করে ঢালু বাগান দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল ভাস্কর যতটা সম্ভব ওই অবস্থায় যাওয়া যায়। হঠাৎ মাটির দিকে চোখ পড়তে ও কোনওক্রমে গতি সামলাতে গিয়ে বসে পড়ল। তার চোখের সামনে তিনটে নগ্ন তার ছয় ইঞ্চির ফারাকে লাইন করে চলে গেছে বাড়িটাকে পাক খেয়ে। একটু অনামনস্ক, একটু বেশি গতি থাকলে ওই তারের সঙ্গে পায়ের সম্পর্ক হতোই। এই তার কীসের? সামান্য ঝুঁকে ভাস্করের সন্দেহ হল খুব, ওই তারের ভেতর দিয়ে বৈদ্যুতিক প্রবাহ চলছে। পকেট থেকে একটা ছোট্ট স্ক্রু-ড্রাইভার জাতীয় জিনিস বের করল সে। যার হাতলটা কাঠের কিন্তু ডগাটা লোহার। সাবধানে সেই ডগাটা একটা তারে ছোঁয়ানো মাত্র ভাস্করের ঠোঁটে হাসি ফুটল। বাঃ, চমৎকার। ওই তিনটে তারে পা পড়লে সে হয়তো মারা যেত না কিন্তু অজ্ঞান হয়ে আটতে থাকতে হতো যতক্ষণ না কেউ এসে তাকে উদ্ধার করে। নিজের অনুপস্থিতিতে বাড়িটাকে সুরক্ষিত করার চমৎকার ব্যবস্থা করে গেছেন জুলি শেরিং।

পেছনে সরে এসে ভাস্কর লাফ দিল যতটা উঁচু দিয়ে সম্ভব, যাতে সে তিনটে তারের পরিধি ছাড়িয়ে অনেকটা দূরে চলে আসতে পারে। এবং তখনই সে একটা চাপা শিস শুনতে পেল। শিস দিতে-দিতে কেউ বাড়িটার ডানদিক দিয়ে উঠে আসছে। চকিতে সে বাড়িটার বাঁ-দিকের একটা আড়ালে চলে এল। তার মনে পড়ল গতকাল যখন সে গেট খুলে এই বাড়ির বারান্দা পর্যন্ত উঠে এসেছিল আর কেউ তাকে বাধা দেয়নি এবং কোনও বৈদ্যুতিক তার পায়ের তলায় পড়েনি। সে ব্যাপারটা তো ওই মোটরবাইকওয়ালার ক্ষেত্রেও ঘটেছিল। অর্থাৎ এই সাবধানতা অবলম্বন করা হয় জুলি শেরিং যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান তখনই। এবং তখনই ভাস্কর শিস দিতে-দিতে আসা লোকটিকে দেখতে পেল। ছুব্বা জাতীয় পোশাকে দুটো হাত ঢুকিয়ে এক স্বাস্থ্যবান প্রৌঢ় বাড়ির চারপাশে চোখ বোলাল। এবং তারপর বেশ উদাস ভঙ্গিতে এগিয়ে আসতে লাগল এপাশে। ভাস্কর নিশ্চিন্ত হল। লোকটা মোটেই সতর্ক নয়।

মিনিটখানেক বাদে অজ্ঞান মানুষটিকে টেনে নিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে শুইয়ে দিল ভাস্কর। এই বাড়ি খালি ভেবেছিল সে। অথচ একটি লোককে দেখা গেল। একাধিক আছে কি না তা বোঝা যাচ্ছে না। ভাস্কর সতর্ক পায়ে এগিয়ে এল। এদিকটা বেশ ঢালু। লোকটাকে অজ্ঞান করতে একটু বেশি শক্তি ব্যয় করতে হয়েছে। আচমকা আঘাত করার সময় লোকটার ঘাড়ে বেশি শক্তি প্রয়োগ করা ঠিক হয়নি। অন্তত ঘণ্টাখানেকের মধ্যে চেতনা ফিরবে না এটা সে নিশ্চিত।

বাড়ির পেছনে চলে এল সে। বাংলোটা খুব বড় নয়। বড়জোর গোটাচারেক ঘর এবং একটা হল থাকতে পরে। বাড়ির পেছনে একটুকরো লন পেরিয়ে আউট হাউস গোছের রয়েছে। তার একটা দরজা খোলা। বোঝা যাচ্ছে প্রৌঢ় লোকটি ওই ঘর থেকে বেরিয়ে টহল দিতে বেরিয়েছিল।

অভ্যস্ত হাতে জানলাটা খুলে ফেলল। এতদিন হয়ে গেল তবু এইরকম সময়ে মনে একটা গ্লানি জন্মায়। সন্তর্পণে সে ভেতরের কার্পেটে পা দিতেই মনে হয় কোথাও

মৃদুস্বরে একটা বাজনা বাজছে। তার মানে এই বাংলোয় মানুষ আছে। ভাস্কর সতর্ক চোখে তাকাল। এইটি বোধহয় স্টোর রুম। প্রচুর জিনিসপত্র স্তূপ করা রয়েছে। সে ধীরে-ধীরে দ্বিতীয় ঘরটিতে ঢুকল। এটা শোওয়ার ঘর বোঝা যাচ্ছে। পরিপাটি বিছানা। এটা মেয়েলি গন্ধ ঘর জুড়ে। সে ওয়ার্ড্রোবের দিকে এগিয়ে গেল অগুণতি মেয়েলি পোশাক। এটা নিশ্চয়ই জুলি শেরিংয়ের ঘর। এই টিবেটিয়ান মহিলার যা পোশাক আছে তা কোনও আধুনিক আমেরিকানদের লজ্জিত করবে। ওয়ার্ড্রোবের নিচে দুটো ভারী সুটকেস। ওদুটো খোলার সময় এখন নেই। তিন নম্বর ঘরটাতে ঢুকল সে। এটি কি স্টাডি রুম? প্রচুর বইপত্র সাজানো দেওয়ালে। ভাস্কর একটু অন্যমনস্ক হয়ে বইগুলো দেখছিল। এনসাইক্লোপিডিয়ার সারি। হঠাৎ মাঝখান থেকে একটা বই তুলে নিতেই ওর শরীর শক্ত হল। একটা ছোট্ট নব রয়েছে দেওয়ালে। গোপন কিছু লুকোবার জন্যেই এত বই-এর প্রদর্শনী। নবটা ধীরে-ধীরে ঘোরাতেই পায়ের তলার কাঠের মেঝে নড়তে লাগল। ভাস্কর দেখল কার্পেটের একটা জায়গা যেন সামান্য নিচু হয়ে ঝুলছে। দ্রুত সেখানকার কার্পেট সরিয়ে নিতে সে সুন্দর একটা গর্ত দেখতে পেল। তিন ফুট বাই চার ফুট গর্তের মধ্যে দুটো কাঠের বাক্স। সে ছোট বাক্সটা তুলে চাপ দিতেই ডালাটা খুলে গেল। একটা ইনজেকশনের সিরিঞ্জ এবং তার পাশে ছোট শিশিতে সামান্য তরল পদার্থ। ভাস্কর চোখের সামনে বস্তুটাকে ধরল। কাচের আড়ালে সাদা তরল পদার্থটি কী হতে পারে তা সে ঠাওর করতে পারছিল না। এইভাবে গোপনে কেন সিরিঞ্জে এই বস্তুটি লুকিয়ে রাখা হবে? শিশির জিনিসটি যে ওষুধ নয় তা টের পাওয়া যাচ্ছে কারণ শিশির গায়ে কোনও লেবেল নেই। বাক্স সমেত ওদুটোকে সে পকেটে চালান করে দ্বিতীয় বাক্সে হাত দিতে গিয়েই চমকে উঠল। তার শরীর শক্ত হয়ে উঠল। তার অনুভূতির প্রতিটি পর্দায় প্রতিফলিত হচ্ছিল পেছনে কারও উপস্থিতি। সে ধরা পড়ে গিয়েছে। যে এসেছে সে কোনও কথা বলছে না। ভাস্কর ধীরে-ধীরে হাত সরিয়ে নিল। তারপর বিদ্যুৎ গতিতে লাফিয়ে উঠে যখন মুখোমুখি হল তখন তার হাতে ০.৩৮ রিভলভার। সে দেখল দরজায় দাঁড়িয়ে একটি ষোলো-সতেরো বছরের মেয়ে তার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে আছে। মেয়েটির চোখে এতক্ষণ বিস্ময় ছিল, অস্ত্র তাকে ভীত করল। মুখে হাত চাপা দিয়ে সে একটা চাপা আর্তনাদ করে উঠল। ভাস্কর ততক্ষণে ওটা পকেটে চালান করে দিয়েছে। তারপর দ্রুত নব ঘুরিয়ে কার্পেটটাকে সমান করে দিয়ে মেয়েটির সামনে এসে দাঁড়াল, সরি। আমি সত্যি দুঃখিত। কিন্তু এ ছাড়া আমার অন্য কোনও উপায় ছিল না।

মেয়েটি তখনও ভীত এবং সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ভাস্কর কথাগুলো বলেছিল ইংরেজিতে। কিন্তু তার একটি শব্দ মেয়েটি বুঝেছে কি না তাতে তার সন্দেহ হল। সে এবার হিন্দিতে কথাগুলো বলল। মেয়েটির মুখে সামান্য স্বাভাবিকতা ফিরে এল। ভাস্কর দুটো হাত যুক্ত করে হিন্দিতেই বলল, আমাকে ক্ষমা করো। আমি তোমার কোনও ক্ষতি করতে চাই না। অবশ্যই এটা চীনা কিংবা তিব্বতের ভাষা। অর্থাৎ মেয়েটি ইংরেজি জানে না এবং হিন্দি সামান্য বুঝলেও বলতে পারে না।

অতএব ভাস্কর পৃথিবীর আদিম ভাষার সাহায্য নিল। দুটো হাতের এবং ঠোঁটের সাহায্যে নির্বাক কথা বলার চেষ্টা করল সে। বোঝাতে চাইল, আর মেয়েটির কোনও

ভয় নেই। সে কোনও ক্ষতি করবে না। বিশেষ প্রয়োজনে তাকে এখানে আসতে হয়েছিল। মেয়েটি ইংরেজি বুঝবে না ভেবে সে পকেট থেকে তার আইডেন্টিটি কার্ড বের করে মেয়েটির সামনে ধরল। মেয়েটি এতক্ষণ একাগ্র হয়ে ভাস্করের অঙ্গভঙ্গি বুঝবার চেষ্টা করছিল। এবার কার্ডটাকে দেখে হাত বাড়িয়ে সেটাকে নিল। কার্ড খুলতেই ভাস্করের উজ্জ্বল ছবি। ছবির নিচের দিকে অফিসের স্ট্যাম্প রয়েছে। মেয়েটি ছবি এবং মানুষের মধ্যে দু-তিনবার দৃষ্টি বদল করল। তারপর তার ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি ফুটল। তাই দেখে ভাস্কর খুব সরল হাসির চেষ্টা করল। মেয়েরা বলে থাকে যে ভাস্করের হাসিতে একটা মুখোশ আছে। তিনটে খুন করে এসেও ওই হাসি হাসলে মনে হয় সারল্য একেই বলে।

মেয়েটি এবার পেছন ফিরল। তার ঘর থেকে ভেসে আসা বাজনা থেমে গেছে সেটা এতক্ষণে খেয়ালে এল। সে দ্রুত নিজের ঘরের দিকে যাচ্ছিল।

ভাস্কর বুঝতে পারছিল না সে কী করবে? এই মুহূর্তে তার এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া উচিত। মেয়েটি তার ভাষা ইচ্ছে করে না বোঝার ভান করছে কি না তা সে জানে না। তাছাড়া সে যে এসেছে তার একটা সাক্ষি রয়ে গেল। যদি মেয়েটি ইংরেজি পড়তে পারে তাহলে কার্ডে তার নাম জেনে নিয়েছে। সেটা বিরাট ভুল হয়ে গেল। আসলে মেয়েটির চোখ-মুখ এমন নিষ্পাপ সুন্দর যে ওর বিশ্বাস পাওয়ার জন্যেই কার্ডটি বের করে দেখিয়েছিল যে সে সাধারণ চোর-বদমাশ নয়। ব্যাপারটা হিতে বিপরীত হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া, ভাস্কর যেন নিজের কাছেই স্বীকার করল, এমন সুন্দরী যুবতী মেয়ে সে আর কখনও দ্যাখেনি। কী অদ্ভুত জাদু আছে মেয়েটির নীল চোখে। আপেলের মতো লাল গাল, ঈষৎ চাপা নাক অথচ সেটাই গোলাপি ঠোঁটের ওপর অদ্ভুত মায়াবী হয়ে আকর্ষণ বাড়িয়েছে। নিশ্চয়ই এই মেয়ে এদেশে বেশি দিন আসেনি। জুলি শেরিংয়ের মেয়ের তো তিব্বতে থাকার কথা। আর ক্রেইমে বলা নেই মেয়েটি এই দেশে চলে এসেছে কি না। কিন্তু আসতে ভিসা-পাশপোর্টের প্রয়োজন। এদেশে চিরকাল থেকে যেতে চাইলে নাগরিকত্ব দরকার। ভাস্করের সন্দেহ হল মেয়েটি কোনও বৈধ ছাড়পত্র ছাড়াই এই দেশে এসেছে। এবং সেই কারণেই জুলি শেরিং ওকে প্রকাশ্যে বের করেননি। এই জন্যেই মেয়েটি তার নিজের ভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় কথা বলতে কিংবা বুঝতে পারে না। কিন্তু জুলি শেরিংয়ের মেয়ের বয়স তো কুড়ি, অথচ একে দেখে ষোলো-সতেরোর বেশি কিছুতেই মনে হয় না। ভাস্কর মাথা নাড়ল, মেয়েদের বয়স বুঝতে চাওয়া তাদের মনের চেয়েও কষ্টকর।

চলে যাওয়া উচিত অথচ মেয়েটি তাকে টানছে। এবং সেই মুহূর্তে পাশের ঘরে বাজনা বেজে উঠল। ভাস্কর কয়েক পা এগিয়ে মেয়েটির দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। রেকর্ড-প্লেয়ারে একটা রেকর্ড চাপিয়ে মেয়েটি ওর দিকে অপাঙ্গে তাকাতেই ভাস্করের বুকের ভেতর পাক দিয়ে উঠল। সে হাসল, মেয়েটিও হাসল। এবার পরিষ্কার ঝকঝকে পাহাড়ি হাসি। সে হাত বাড়াল, অনেকটা করমর্দন করার ভঙ্গিতে। মেয়েটি একটু দ্বিধা করে তার আঙুল স্পর্শ করা মাত্র বাইরে তীব্র সিটি বেজে উঠল।

চকিতে চেতনা ফিরে পেল ভাস্কর। সে ইশারায় মেয়েটিকে বোঝাল পরে দেখা হবে, তারপর দ্রুত ঘরগুলো পেরিয়ে জানলাটার কাছে চলে এল। এক লাফে সেটা ডিঙিয়ে

বাইরে নামবার আগে সে দেখতে পেল মেয়েটি পেছন-পেছন এসে তাকে পরম বিস্ময়ে চলে যেতে দেখছে।

বাগানে নেমেই সতর্ক হল ভাস্কর। পদম যখন সিটি বাজিয়েছে তখন কেউ না কেউ এ বাড়িতে ঢুকেছে। সে চারপাশে নজর বুলিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে চলে আসতেই খেয়াল হল সেখানেই প্রৌঢ়টির অচেতন শরীর পড়ে আছে। বোধহয় প্রৌঢ়ের শরীরে তখন সাড় ফিরে আসছিল। ওর পেছনে সময় নষ্ট করার মতো সময় আর নেই। কারণ গেট খুলে একটা গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে নিরাপদ দূরত্বে। গাড়ির ড্রাইভার একজন টিবেটিয়ান নিচে নেমে চিৎকার করে কাউকে ডাকল। তারপর সাড়া না পেয়ে গাড়ির দিকে মুখ বাড়িয়ে কিছু জানাল। এইবার পেছনের দরজা খুলে গেল। ভাস্কর দেখল জুলি শেরিং মাটিতে নেমে বাড়িটার দিকে এক পলক তাকালেন। তারপর চাপা গলায় ড্রাইভারকে হুকুম করতেই সে একটু পিছু হটে দৌড়ে অনেকখানি লাফ দিয়ে বৈদ্যুতিক তারের সীমানা পেরিয়ে এ পাশে চলে এল। ভাস্কর আবার দেখল জুলি শেরিংকে। শক্ত-সমর্থ মহিলা যে একদা মেয়ের মতই সুন্দরী ছিলেন তার প্রমাণ এখনও তার শরীরে। সে আর অপেক্ষা করল না। যতটা সম্ভব নিচু হয়ে সে তারের সীমানা লাফিয়ে প্রায় হামাগুড়ি দেওয়ার ভঙ্গিতে উঠে এল পাঁচিলের গায়ে। পাঁচিল টপকাবার সময় যদি জুলি শেরিং এদিকে তাকান তাহলে সে হয় ধরা পড়ে যাবে। এখানে কোনও আড়াল নেই। ভেতরে তখন একটি বিশেষ নাম ধরে চিৎকার, চেঁচামেচি চলছে। বোধহয় অচেতন প্রৌঢ়কে খুঁজছে ড্রাইভার। ঠিক তখনই বাইরের দরজা খুলে বেরিয়ে এল মেয়েটি। আর তাকে দেখতে পেয়েই ক্ষিপ্ত হলেন জুলি শেরিং। চিৎকার করে বললেন, গো ইনসাইড। তারপরেই নিজের ভাষায় অনর্গল কিছু বলতেই মেয়েটি ঈষৎ ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে ভেতরে চলে গেল। এই সুযোগ হারাল না ভাস্কর। জুলি শেরিংয়ের উত্তেজনার সুযোগ নিয়ে সে পাঁচিল টপকে রাস্তায় উঠে এল। এবং সোজা হয়ে দাঁড়াতেই পদমের মুখোমুখি হল। দাঁত বার করে হাসছে পদম। ইশারায় তাকে সঙ্গে আসতে বলে দ্রুত পা চালাল ভাস্কর। হিল হার্ট রোড ছাড়িয়ে আসার পর ভাস্করের মনে হল এবার একটু খাওয়া যাক। সকাল থেকে অনেক উত্তেজনা হয়েছে।

মোটামুটি একটা ভালো রেস্তোরাঁ দেখে সে পদম বাহাদুরকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে চিকেন রোস্ট আর টোস্টের অর্ডার দিল। পদম এখন তার সামনে বসে পিটপিটিয়ে হাসছে।

সাহেব, একটা কথা বলব?

মাথা নাড়ল ভাস্কর।

পদম বলল, আপনি আমার চেয়ে অনেক বড় ওস্তাদ। একটা চিড়িয়া পর্যন্ত ওই বাড়িতে ঢুকতে সাহস পায় না আর আপনি—। কথাটা শেষ করল না পদম কিন্তু ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল যে ভাস্কর তার চেয়ে অনেক বড়দরের অপরাধী। ভাস্করের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। তার ইচ্ছে করছিল এক চড়ে ছেলেটার হাসি ভোঁতা করে দেয়। তার আফসোস হচ্ছিল এই ছিনতাইবাজকে সাক্ষি রাখার জন্যে। কিন্তু সে নিজেকে শান্ত করল। পদম বাহাদুরকে তার এখন প্রতি পদে প্রয়োজন হবে। অনেক চেষ্টায় সে হাসির ভান করল। তারপর পকেট থেকে তার আইডেন্টিটি কার্ড বের করে পদমের

সামনে মেলে ধরল। সঙ্গে-সঙ্গে মুখ চোখ পাল্টে গেল পদমের। মাপ কিজিয়ে সাব। আমি বুঝতে পারিনি। আর কখনও ভুল হবে না। বারংবার কথাগুলো বলে সে নিজের গালে নিজেই চড় মারল, সাহেব যে বড় অফিসার তা বুঝতে পারিসনি শালা, তুই আবার আদমি চিনে ছুরি তুলবি?

ভাস্কর গম্ভীর গলায় বলল, ওটা আর কখনও যেন না হয়। আবার বলছি, এতদিন যা করেছিস সে-সব কথা একদম ভুলে যা।

ঠিক হ্যায় সাহেব। আর বলব না। বিনীত ভঙ্গিতে জানাল পদম।

খাওয়া-দাওয়ার পর পদমের চেহারা পাল্টে গেল। সে বোধহয় জীবনে ওই রেস্তোরাঁয় ঢুকে অত দামি খাবার খায়নি। ফুর্তিতে চটপটে গলায় জিজ্ঞাসা করল, এবার কী করতে হবে সাহেব?

নামচে বস্তিতে চল। রোস্টেড মুরগি কিনে একটা প্যাকেটে ভরল ভাস্কর।

হুকুমটা যে মোটেই পছন্দ হল না তা পদমের মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল। খানিকটা অনিচ্ছায় সে একবার ভাস্করের দিকে তাকিয়ে হাঁটা শুরু করল। অল্প সময়ের মধ্যেই ওরা শহরের ব্যস্ততা ছাড়িয়ে এল। রাস্তা বেশ নির্জন। গরিব পাহাড়ি মানুষেরা সাংসারিক কাজ করছে দু-পাশের কাঠের বাড়িতে। ভাস্কর খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটছিল। নীল চোখের মেয়েটি তাকে প্রবল আকর্ষণ করছিল। সেই সঙ্গে জুলি শেরিংয়ের গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ানোর ভঙ্গি বুঝিয়ে দিয়েছিল সে ওই মেয়ের মা। জুলি কিছুতেই মেয়েকে বাড়ির বাইরে আসতে দেবে না। আর সেই নিষেধ শোনা মাত্র মেয়ের মুখে-চোখে যে ক্রোধ প্রকাশ পেয়েছিল তা থেকে অন্তত এটুকু বোঝা যায় যে মা-মেয়ের সম্পর্ক ভালো নয়। মেয়েটি কি মাকে বলবে একটা লোক গোপনে বাড়িতে ঢুকে লুকোনো নব ঘুরিয়েছে? বলে দেওয়া স্বাভাবিক। অবশ্য মায়ের প্রতি বিতৃষ্ণা যদি বেশি হয় তাহলে অন্য কথা। ভাস্কর নিশ্চিত হতে পারছিল না মেয়েটি জুলি শেরিংকে তার কথা জানাবে কি না! জানলাটা সে ভাঙেনি। কায়দা করে ছিটকিনি খুলেছিল মাত্র। খুব সতর্ক চোখে পরীক্ষা না করলে বোঝা যাবে না দাগটা। অবশ্য সেই প্রৌঢ় মানুষটি সাক্ষি দেবে ওই বাড়িতে আগন্তুক ঢুকেছিল। যারা নিজের বাড়ি বৈদ্যুতিক তার ঘিরে রাখে বাইরের মানুষের দৃষ্টি থেকে আড়াল করার জন্যে তারা অচেতন প্রৌঢ়টিকে আবিষ্কার করার পর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবেই। হয়তো মেয়েটি বাধ্য হবে সমস্ত কথা বলতে। আবার সেটা নাও হতে পারে। ভাস্কর অনিশ্চয়তায় দুলছিল। শুধু বারবার তার মনে পড়ছিল মেয়েটি যখন তার আঙুল স্পর্শ করেছিল তখন অদ্ভুত একটা সুখের অনুভূতি ছড়িয়ে পড়েছিল শরীরে। কিন্তু তাকে দেখে মেয়েটি চিৎকার করেনি কেন? চোর বা ডাকাত বলে ভয় পায়নি কেন? শঙ্কিত হয়েছিল ঠিকই কিন্তু শেষে একটু-একটু করে সহজও তো হয়ে আসছিল। রহস্য উদ্ধার করতে পারছিল না ভাস্কর।

কতটা পথ হেঁটে এসেছে খেয়াল ছিল না, এখন মুখ ফিরিয়ে দেখল শহরটা অনেক ওপরে। পাহাড়ি পথে নামবার সময় দূরত্ব টের পাওয়া যায় না। এই সময় একটা বাঁকে দাঁড়িয়ে পদম আঙুল তুলে দেখাল, ওইটে হল নামচে বস্তি।

এদিকে জনবসতি বেশি নেই। অনেকটা ফাঁকা পাহাড় আর জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে

বস্তিটাকে দেখা যাচ্ছে। পঁচিশ-ত্রিশ ঘর বাসিন্দা সেখানে রয়েছে। অবশ্য রাস্তা পিচের এবং পরিষ্কার।

দূরত্বটা অতিক্রম করতে বেশি সময় লাগল না। পদম এখন বেশ স্মার্ট হয়ে গিয়েছে। তার সঙ্গে কথা বলছে কম। কিন্তু সমানে শিস দিয়ে চলেছে আগে-আগে। বস্তিতে পৌঁছে ভাস্কর বুঝল এদের অবস্থা খুবই সঙ্গীন। কর্মঠ মানুষজন তেমন চোখে পড়ল না। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এবং শিশুরা ওদের অবাক চোখে দেখছিল। পদম মানুষগুলোকে একদম পাত্তা না দিয়ে শেষপ্রান্তে চলে এল। সেখানে বস্তি থেকে খানিকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে একটা কাঠের দোতলা জীর্ণ বাড়ি দাঁড়িয়ে। সেটার দিকে আঙুল তুলে পদম নিচু গলায় বলল, ওই বাড়িটায় বুড়ো থাকে। যাওয়ার আগে আর-একবার ভাববেন সাহেব। তিব্বতি বুড়োটাকে মাঝে-মাঝে শয়তান ভর করে। তখন ওর চোখের সামনে গেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

নীরবে মাথা নাড়ল ভাস্কর। তারপর প্যাকেটটা হাতে ঝুলিয়ে সে এগিয়ে গেল কাঠের বাড়িটার দিকে। সে লক্ষ করল বস্তির বাচ্চা এবং বৃদ্ধারা বেশ দূরে দাঁড়িয়ে তাকে লক্ষ করে যাচ্ছে।

কাঠের দোতলাটায় ঘর, নিচে শুধু গোটা-আটেক বিম যার ওপর বাড়িটা দাঁড়িয়ে। জরাজীর্ণ সিঁড়ি বেয়ে ওপরের বারান্দায় উঠে ভাস্কর ডাকল, কোই হ্যায়?

হুম্। একটা চাপা হুঙ্কারের মতো আওয়াজ ভেসে এল দুটো ঘরের কোনো একটা থেকে। তারপর অদ্ভুত একটা বাজনা বেজে উঠল। ডুম ডুম ডুমাং, ডুম ডুম ডুমাং। এবং সেইসঙ্গে অদ্ভুত গলায় অবোধ্য ভাষায় মন্ত্র উচ্চারণের মতো কিছু শব্দ। ভাস্কর মুখ ঘুরিয়ে দেখল পদম তো বটেই বস্তির উৎসুক দর্শকরা আওয়াজ হওয়া মাত্র ত্রস্তে অনেক দূরে সরে গেল। সামান্য ইতস্তত করে সে কয়েক পা এগিয়ে প্রথম ঘরটার দরজার সামনে দাঁড়াতেই একটা গর্জন ছিটকে এল। ব্যাপারটা এমন আচমকা যে ভাস্করের নিশ্বাস এক পলকের জন্যে থমকে গিয়েছিল। ঘরের ভেতরটায় প্রায় অন্ধকার। খোলা দরজা দিয়ে যেটুকু আলো যাচ্ছে তাতেই মানুষটিকে দেখতে পেল। ওরকম তীব্র জ্বলন্ত চোখ এর আগে কখনও দেখেনি ভাস্কর। তিব্বতি পোশাক পরা এক বৃদ্ধ বাবু হয়ে বসে দু-তিন ফুট লম্বা তেল চুকচুকে একটা কিছু নাচিয়ে যাচ্ছে সামনে। লোকটির মাথায় বিশ্রী ধরনের জটা। ভাস্কর একটু সামলে নিয়ে হাসবার চেষ্টা করল। তারপর হিন্দিতে বলল, আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

সঙ্গে-সঙ্গে হাতের সঞ্চালন থেমে গেল। লোকটি বলল, কী চাও?

কথা না বললে কী করে বোঝাব? ভাস্কর আর-একটু এগিয়ে আসতেই লোকটি চিৎকার করে উঠল, তফাত যাও। নইলে তোমার মাথায় গোখরো ছোবল মারবে।

হকচকিয়ে এক পা পিছিয়ে গেল ভাস্কর। সঙ্গে-সঙ্গে হেসে উঠল লোকটা সশব্দে, সবাই ভয় পায়। হঁ-হঁ বাবা, নাগকে ভয় পায় না এমন কোনও জীব পয়দা হয়নি। ওই যে দেখো অতবড় চেহারার জীব হাতি, সে পর্যন্ত নাগকে চটায় না। তুমি তো কোন ছার?

ততক্ষণে ভাস্কর বুঝেছে গোখরোর ব্যাপারটা অভিনয় মাত্র। সে এবার খাবারের প্যাকেটটা এগিয়ে ধরল, আপনার জন্যে এনেছিলাম।

কী আছে ওতে?

দামি দোকানের খাবার।

দেখি। ছুড়ে দাও ওখান থেকে।

একটু বিরক্ত হয়ে প্যাকেট ছুড়তেই লুফে নিল লোকটা। তারপর তড়িঘড়ি বাঁধন খুলে মুরগির ঠ্যাং বের করে শিশুর মতো হাসল। ভাস্কর দেখল লোকটি ডানহাতে ঠ্যাংটা ধরে হাঘরের মতো চিবিয়ে যাচ্ছে। যেন কোনওকালে সে এইসব খাবার খায়নি বা অনেকদিন হয়তো একেবারেই অভুক্ত আছে।

খাওয়া শেষ হলে লোকটা তৃপ্ত মুখে জিজ্ঞাসা করল, কী চাই?

ভেতরে আসব?

আসতে পারো। তবে হ্যাঁ, আমাকে ঘুষ দিয়ে যে কাজ হাসিল করবে সেটি হচ্ছে না। আমি সহজে ভুলি না। লোকটি মাথা নাড়ল।

সতর্ক ভঙ্গিতে ঘরে ঢুকল ভাস্কর। আশেপাশে সাপের কোনও চিহ্ন নেই। মাথার ওপর একটা ঝুলজমা সিলিং। একটা ভাঙা টুল দেখতে পেয়ে সেটাকে টেনে নিয়ে বসল ভাস্কর।

মতলব কী?

আমার যে মতলব আছে তা জানলেন কী করে?

এখানে তো মতলব ছাড়া কেউ আসে না। প্রাণ বাঁচানোর জন্যে সাপের বিষ চাই, মানুষ মারার জন্যে বিষ চাই, নেশা করার জন্যে সাপের কৌটো দরকার— হাজির হও এখানে। সব শালা ধান্দাবাজ। তোমার ধান্দাটা কী বলে ফেল। লোকটা তার আলখাল্লার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে তেল চুকচুকে সত্যিকারের সাপ বের করে এনে আদর করতে লাগল।

আপনি সাপের বিষ চেনেন?

অ্যাঁ? তুমি কোনও মাকে জিগ্যেস করছ বুকের দুধ দেখেছে কি না! কী আজব বাত। আমি বিষ চিনব না কি তুমি চিনবে? তোমার কী চাই?

ভাস্কর হাসল, আপনিই বলুন তো কী চাই?

হঠাৎ প্রচণ্ড খেপে গেল লোকটা, আমাকে মুরগি খাইয়ে কিনে নিয়েছ? খেলা হচ্ছে আমার সঙ্গে। কথা শেষ করে শিস দিল লোকটা। সঙ্গে তার হাতের সাপটা তড়াক করে খাড়া হয়ে ফনা তুলল। যদিও ভাস্কর বেশ দূরত্বে বসেছিল তবু তার শরীরে একটা শীতল স্রোত বয়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে লোকটা জিগ্যেস করল, ধান্দাটা কী সত্যি করে বলো। নইলে ও তোমায় ছাড়বে না।

ওটাকে শান্ত হতে বলুন আগে নইলে কথা বলা যাবে না।

মানে?

আমাকে ভয় দেখিয়ে তাড়াতে পারবেন না।

লোকটা এবার অদ্ভুত চোখে ভাস্করকে দেখল। তারপর ঠোঁটে একটা শব্দ করতেই সাপটা গুটিয়ে এল। সেটাকে আবার তুলে নিয়ে লোকটা বলল, শাবাশ। হিম্মতবাজ মানুষের সঙ্গে কথা বলার আরাম আছে। এখানে যারা আসে তাদের মধ্যে জুলি ছাড়া আর কারও এমন হিম্মত নেই।

নাড়া খেল ভাস্কর। বাঃ, চমৎকার।

সে নিচু গলায় বলল, ছোট সাপ রাখেন?

ছোট সাপ?

ছোবল খাওয়ার সাপ?

তুমি তো নেশা করো না।

কী করে বুঝলেন?

তোমাকে দেখে।

অন্যের জন্যে দরকার।

যার দরকার তাকেই আসতে বলো।

আপনার সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে চাই। মিস্টার শেরিংকে চিনতেন? যার মদের দোকান ছিল।

বুড়ো শেরিং? হ্যাঁ, লোকটা নেশা করতো বটে। তারপর হঠাৎ সুর পাল্টে জিগ্যেস করল, তার কথা তুমি জানলে কী করে? তোমার সঙ্গে আলাপ ছিল?

হ্যাঁ। বুড়ো শেরিং আপনার কথা বলেছিল আমাকে। মদ খেলে আমার নেশা হয় না, বমি হয়ে যায়। বুড়ো বলেছিল তাই আপনার কাছে আসতে। মিথ্যে কথা বলতে গলা কাঁপল না ভাস্করের।

লোকটা মাথা নাড়ল। তারপর উঠে দাঁড়াতে আরও দুটো সাপ ওর শরীর থেকে নেমে আসনের ওপর কুণ্ডলী পাকিয়ে রইল। লোকটা এতক্ষণ সাপের সঙ্গে বাস করছিল? পাশের দরজা খুলে লোকটা ভাস্করকে ডাকল। ভাস্কর কাছে যেতেই বলল, ওই ঘরে তিরিশটা কালনাগিনী ছিল এক সময়। এখন মাত্র পাঁচটা আছে। আর কৌটোয় ধরা সাপ আছে পনেরোটা। ওগুলো আমাকে বাঁচিয়ে রাখে। লোকেরা নিজেদের ধান্দায় আমার কাছে এসে কিনে নিয়ে যায়। তুমি যখন বুড়ো শেরিংয়ের বন্ধু তখন তোমায় বলি, বুড়ো লোকটা ভালো ছিল। অন্তত আমার কাছে। অনেক টাকা খেয়েছি ওর কাছে সাপ বিক্রি করে।

ফিরে এসে নিজের জায়গায় বসে ভাস্কর বলল, জুলি শেরিং কি রোজ আপনার কাছে আসে?

রোজ? রোজ কেউ আমার কাছে আসে না। জুলিকে পাঠিয়েছিল বুড়ো শেরিং। দুবার এসেছিল সে।

বুড়ো বলত ছোবলে তার কাজ হয় না। তাই ইঞ্জেকশন দিয়ে বিষ ঢোকানোর কথা বলত হাতের শিরায়। আমি রাজি হতাম না। এসব কথা তোমাকে আমি বলছি কেন? হঠাৎ সচেতন হল বৃদ্ধ। তারপর সন্দেহের চোখে তাকাল।

ততক্ষণে পকেট থেকে কাঠের বাক্স বের করে শিশিটা সামনে ধরেছে ভাস্কর, এটা কোন সাপের বিষ?

দেখি? চকচক করে উঠল লোকটার চোখ।

ভাস্কর একটু দোনামনা করল। তারপর শিশিটা বৃদ্ধ লোকটার হাতে তুলে দিল। লোকটা চোখের সামনে শিশিটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল। তারপর বলল, এটা কোনও সাপের বিষ নয়।

চমকে উঠল ভাস্কর, কী বলছেন? ঠিক করে বলুন?

লোকটা মাথা নাড়ল, আমাকে বিষ চিনিও না। আমি এই শিশিটাকে চিনি। এতে করেই কেউটের বিষ নিয়ে গিয়েছিল জুলি শেরিং। কিন্তু এখন এতে যা আছে তা সাপের বিষ নয়। বলতে-বলতে ছিপি খুলে সাবধানে ঘ্রাণ নিল লোকটা। তারপর দ্রুত মাথা নেড়ে বলল, না কক্ষনও না। এ সাপের বিষ নয়, ওষুধ। শিশিটা বন্ধ করে ছুড়ে দিল লোকটা ভাস্করের হাতে। লুফে নিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। যে রোজ সাপের ছোবল খায় তাকে কেউটে কামড়ালে মরবে?

মাথা নাড়ল বুড়ো, একদিন অজ্ঞান হয়ে থাকতে পারে। হয়তো দুদিন। কিন্তু রোজ যার শরীরে বিষ ঢুকছে তার কলজে শক্ত হয়ে যায়।

পার্স খুলে দশটা টাকা বের করল ভাস্কর। তারপর বলল, অনেক ধন্যবাদ। যদি কখনও দরকার হয় আবার দেখা হবে।

টাকাটা ছুড়ে দিয়ে সে বেরিয়ে এল বাইরে।

ভাস্করকে স্বচ্ছন্দে হেঁটে আসতে দেখে পদম বাহাদুর এগিয়ে এল, তিনশো টাকা দাম নিল সাহেব?

তিনশো?

ওই যে কৌটোর সাপ কিনতে গেলেন তার দাম।

আমি সাপ কিনিনি পদম। কারণ আমার ওই নেশা নেই।

কথাটা শুনে হকচকিয়ে গেল ছেলেটা। সাহেব এসেছিল সাপ কিনতে ছোবল খেয়ে নেশা করবে বলে। যাওয়ার সময় বলছে সেই নেশা নেই। সে ভাস্করের পাশে হাঁটতে-হাঁটতে উশখুশ করছিল। সাহেবকে এখন তার আরও রহস্যময় লাগছে। তবে সে এটুকু বুঝতে পেরেছে এই মানুষটি বেশ ক্ষমতাবান। এর সঙ্গে লেগে থাকলে আখেরে কিছু হওয়ার সম্ভাবনা আছে। লোকটার গায়ে যে শক্তি আছে এতে তার নিজের কোনও সন্দেহ নেই। সঙ্গে আবার ছবিওয়ালা কার্ড আছে যা একমাত্র পুলিশদের থাকে। বড়-বড় পুলিশদের। পদম সেটা শুনেছে।

দুপুরে স্নান করে মিনিট তিরিশ শুয়েছিল ভাস্কর। বুড়ো শেরিং সাপের ছোবলের নেশা করত। তাতে তার তৃপ্তি হতো না। সে ইঞ্জেকশনে সাপের বিষ ভরে নেশা শুরু করেছিল। এই উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছিল বউ জুলিকে সেটা বুড়ো তিব্বতির কাছে থেকে সংগ্রহ করে আনতে। জুলি দুবার গিয়েছে, বুড়োর কথায় জানা গেল। ধরা যাক, প্রথমবার সে ঠিক বিষ এনেছিল। কিন্তু দ্বিতীয়বার বিষ এনে তার জায়গায় যে জিনিসটা শিশিতে ঢেলেছিল সেটা জানতে আর কয়েক ঘণ্টা লাগবে। শহরে ফিরে ভাস্কর একটা ল্যাবরেটরিতে জমা দিয়ে এসেছে সেটাকে পরীক্ষার জন্যে নিজের পরিচয়পত্র দেখিয়ে। যদি ওই জিনিসের কোনও পরিমাণ বুড়ো শেরিংয়ের শরীরে কোনও ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে তাহলে ব্যাপারটায় কোনো অন্ধকার থাকে না।

সকালের ব্রেকফাস্ট বেশ ভারী হয়ে যাওয়ায় মনে হয়েছিল দুপুরের খাওয়ার তেমন দরকার হবে না। কিন্তু এতটা পথ ওঠানামা করার পর এখন বেশ খিদে পাচ্ছে। কাল এখানে আসার পর থেকে সে লোকাল অফিসের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ করেনি। ওদের না জানিয়ে যতটা এগিয়ে যাওয়া যায় ততটাই ভালো। কারণ জুলি শেরিংকে সাহায্য

করতে ওখানে কেউ নিবেদিত প্রাণ হয়ে আছে কি না কে জানে। কিন্তু আজ না হোক, আগামী কালই একবার যাওয়া উচিত। হেড-অফিসকে সে বলেনি এতটা গোপনে কাজ করবে। কে জানত, জুলি শেরিং বাড়ির চারপাশে ইলেকট্রিক তার ছড়িয়ে রাখে। ব্যাপারটা কী করে পুলিশের অনুমতি পেল তাই বিস্ময়ের।

ব্যাপারটা জিগ্যেস করবে সে অনিল মিত্রকে। অনিল এই শহরের পুলিশের বড়কর্তা। একসময়ে ওরা খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল। ভাস্কর ভেবেছিল তার উপস্থিতির কথা অনিলকেও জানাবে না। কিন্তু ল্যাবরেটরি যদি রিপোর্ট দেয় ওই শিশির ওষুধ গোলমেলে তাহলে হয়তো প্রয়োজন হবে।

এছাড়া আর-একটি ব্যাপার ঘটেছে। তার অনুপস্থিতিতে কেউ এই ঘরে ঢুকেছিল। তার সুটকেস হাতড়েছে কেউ। ইচ্ছে করেই সে ওটায় চাবি দিয়ে যায়নি। টাকা-পয়সা বা অন্য দরকারি জিনিস সে চিরকাল সঙ্গেই রাখে। অতএব অনুসন্ধানকারী কোনও কিছুর তল্লাশ পায়নি। কিন্তু প্রশ্নটা হল, কে এসেছিল? জুলি শেরিংয়ের পক্ষে কিছুতেই জানা সম্ভব নয় তার অস্তিত্বের কথা। তাহলে?

এই সময় দরজায় শব্দ হল। ভাস্কর সতর্ক হয়ে উঠে দরজা খুলে দিতেই শাজাহানবাবুকে দেখতে পেল। নেশায় চুর হয়ে আছে ভদ্রলোক। দুটো পা স্থির থাকছে না। তাকে দেখে বলল, সরি। আবার নম্বর ভুল করে ফেলেছি। আপনি কিছু মনে করবেন না ভাই।

আপনি খুব বেশি নেশা করেছেন।

করতাম না। আপনি বললেন থেকে যেতে। আমি দেখলাম যখন চান্স পাওয়া গেল তখন মনের সুখে খেয়ে নিই। কলকাতায় গেলে তো আর মদ খেতে পাব না স্ত্রীর জ্বালায়। হাসতে চেষ্টা করল ভদ্রলোক। ভাস্কর ওর হাত ধরল, চলুন আপনার ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসি। বাধ্য ছেলের মতো শাজাহান ওর সঙ্গে হেঁটে এল। দরজা বন্ধ ছিল। ভাস্কর কয়েকবার আওয়াজ করার পর প্রৌঢ় এবং স্থূলকায় এক ভদ্রলোক দরজা খুললেন। তার চুলগুলো ঘাড় অবধি নেমেছে। গায়ের রঙ ধবধবে ফর্সা। বেশ দুধে ঘিয়ে মানুষ তা এক নজরেই বোঝা যায়। কপালে সিঁদুরের টিপ কিন্তু শরীরে ফিনফিনে পাঞ্জাবির ওপর শাল আর লুঙ্গি করে পরা সিল্কের একটা কাপড়।

শাজাহান সেই অবস্থায় বলল, গুরুদেব। খুব বড় তান্ত্রিক।

আইয়া! আয়েন, ঘরে আয়েন। আপনার কথা এঁর লগে অনেক শুনছি। উদার গলায় আহ্বান জানালেন ভদ্রলোক।

ঘরে ঢুকে শাজাহান নিজের বিছানায় লুটিয়ে পড়ল। এবং তখনই ভাস্করের চোখে পড়ল একজন মধ্যবয়সি সুদর্শনা মহিলা সামান্য আড়ষ্ট ভঙ্গিতে চেয়ারে বসে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। গুরুদেব ডাকলেন, ঘরে আয়েন, একটু আলাপ করি।

ভাস্কর এগিয়ে এসে একটা চেয়ারে বসল। ভদ্রলোকের পাশ ঘেঁষে হাঁটার সময় সে বিলিতি সুবাস পেয়েছে। মানুষটি শৌখিন সেটা বোঝা যাচ্ছে বিছানায় পড়া মাত্র কোনও মানুষের নাক ডাকে শাজাহানকে না দেখলে বিশ্বাস করা মুশকিল। সেদিকে তাকিয়ে গুরুদেব বললেন, নন-ডিস্টার্বিং এলিমেন্ট। আপনার নিশ্চয়ই মনে হয় কেন আমি

সিঙ্গল রুম না নিয়ে এর সঙ্গে শেয়ার করে আছি। তার কারণ আমার অনেকটা স্পেস চাই। সিঙ্গল রুম বড্ড ছোট। আর অন্য হোটেলে গেলে বাঙালিদের উপদ্রব বেশি। আমি একটু সাধনা করি, শিষ্য-শিষ্যারা আসে। ওরা অবশ্য আমাকে ওদের বাড়িতে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু আমি মশাই কোনও গৃহীর কাছে থাকতে চাই না।

আচমকা ছিমছাম বাংলায় কথা বলা শুরু করলেন গুরুদেব। প্রাথমিক পূর্ববঙ্গীয় টান উধাও হয়ে গেল।

আমার ঘরে কী খুঁজতে গিয়েছিলেন? আচমকা প্রশ্ন করল ভাস্কর।

আপনার আইডেন্টিটি। নির্বিকার মুখে জানালেন গুরুদেব।

এতটা আশা করেনি ভাস্কর। লোকটি অত্যন্ত ঘোড়েল কিংবা শয়তান।

আপনি নিশ্চয়ই বলবেন আপনার অনুপস্থিতিতে কাজটা করা অন্যায়। একশোবার অন্যায়। কিন্তু পাশের ঘরে একজন বাঙালি টিকটিকি বাস করলে সেটা কার ভালো লাগে মশাই।

আপনার ব্যবসা কী?

সেটা নাই জানলেন। কারণ আপনি তো আমার উদ্দেশ্যে আসেননি।

আমি কী উদ্দেশ্যে এসেছি সেটা আপনি জানেন?

ঠিকঠাক জানি না। তবে আপনি যখন একটা মদের দোকানে ঢুকে মদ না খেয়ে বেরিয়ে আসেন এবং সেই দোকানের মালিকের বাড়িতে চোরের মতো ঢোকেন তখন এটা পরিষ্কার যে আমার সঙ্গে আপনার কোনও সম্পর্ক নেই। বিগলিত হাসলেন গুরুদেব।

তীব্র চোখে তাকাল ভাস্কর, আপনি কে?

আমি একজন ধর্মপ্রাণ মানুষ। তবে হ্যাঁ, আপনার ঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা অন্যায় হয়ে গেল এজন্যে আবার দুঃখ প্রকাশ করছি। এখন বলুন তো, আমি আপনার কী সেবা করতে পারি? গুরুদেব ফিরে গেলেন নিজের আসনে। তারপর গাঁট হয়ে বসলেন।

সেবা?

অতিথি নারায়ণ, তার সেবা করব না?

ভাস্কর লোকটির চোখের দিকে তাকাচ্ছিল। একটা লোক তার ঘরে ঢুকেছিল চোরের মতো জানতে পেরেও সে উত্তেজিত হচ্ছে না। লোকটার নিশ্চয়ই কিছু ক্ষমতা আছে। এবং ওর চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বললে সেই ক্ষমতায় আক্রান্ত হতে হয়। সে মহিলার দিকে তাকাল। সেই থেকে ভদ্রমহিলা একই ভঙ্গিতে বসে আছেন। এবং তখনই মনে হয় উনি ঠিক চেতনায় নেই। সে বলল, আপনাকে আমি বুঝেছি। আপনার ব্যবসাটাও।

আমার চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলছেন না কেন?

আমি নির্বোধ নই বলে।

হুম্।

যদিও আপনি জানেন আমি আপনার উদ্দেশ্যে এখানে আসিনি কিন্তু মানুষকে সম্মোহিত করে আপনার কী লাভ সেটা জানতে পারি?

কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। তারপর গুরুদেব বললেন, নাঃ, আপনি বুদ্ধিমান। আর

বুদ্ধিমানের সঙ্গে মিত্রতা করতে আমি ভালোবাসি। তবে শুনুন। আমি আজ পর্যন্ত কোনও মানুষের ক্ষতি করিনি। তবে অত্যন্ত প্রয়োজনে চাপ দিয়ে টাকা নিই যাতে একটু ভালোভাবে থাকতে পারি। টাকা নিই তারই কাছে যার সেটা দেবার ক্ষমতা থাকে। আচ্ছা, আপনাকে একটা উদাহরণ দেখাই—। বলতে-বলতে গুরুদেব উঠে মহিলার সামনে বসলেন, কমলাদেবী, আপনি খুব ভদ্রমহিলা, আপনার স্বামী কি আপনাতে আসক্ত?

মহিলা খুব ধীরে-ধীরে মাথা নেড়ে বললেন, আগে ছিল, এখন না।

ওঁর ব্ল্যাক মানি আছে?

অনেক। মহিলা জবাব দিলে যেন বহুদূর থেকে স্বর ভেসে এল।

এবার গুরুদেব ভাস্করের দিকে তাকিয়ে হেসে নিজের আসনে ফিরে গিয়ে বললেন, এখন ইচ্ছে করলে আমি ওঁর কাছ থেকে অনেক গোপন তথ্য জেনে নিতে পারি যা পরে আমার টাকা উপায়ে সাহায্য করবে। কোনও পুলিশের বাপের সাধ্য নেই আমাকে ধরে। আসলে আমি প্রকাশ্যে কোনও ক্রাইম করছি না। তাই না? গুরুদেব মধুর হাসলেন, আমার এখানে শিষ্যরা আসে বলে হোটেলের মালকিনের কোনও আপত্তি নেই কেন তা বুঝলেন? এখন এই অবস্থায় যদি শুনি পাশের ঘরে এমন কেউ এসেছে যার গতিবিধি সন্দেহজনক তা হলে অস্বস্তি হয় কি না বলুন? তাই মন স্থির করতে একটু নেড়ে-চেড়ে দেখলাম আপনার জিনিসপত্র। আগেই ক্ষমা চেয়েছি, আবার চাইছি। এবার আপনি আসুন কারণ ভদ্রমহিলার চেতনা ফিরে আসার সময় হয়েছে। আমি দশ-বারো মিনিটের বেশি আচ্ছন্ন রাখতে পারি না কাউকে।

ভাস্কর উঠে দাঁড়াল। তারপর বলল, আপনি চালিয়ে যান। আপনার কোনও অপরাধ যদি আমার চোখে প্রমাণ সমেত ধরা না পড়ে তা হলে তাতে আমার আপাতত কোনো মাথা ব্যথা নেই। তবে প্রয়োজনে হয়তো আপনাকে আমার দরকার হতে পারে। সেই সময় কি সাহায্য পেতে পারি?

আবার বিগলিত হলেন গুরুদেব, অবশ্যই। আমি আর আটচল্লিশ ঘণ্টা এখানে আছি। তার মধ্যে প্রয়োজন হলে জানাবেন।

তৃপ্তি করে দুপুরের খাওয়া যখন শেষ করল ভাস্কর, তখন এই পাহাড়ি শহরে রোদ নেই, আকাশে হালকা মেঘ উড়ছে এবং ঘড়ির কাঁটা তিনটের ঘরে। রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে সে সোজা ল্যাবরেটরিতে চলে এল।

রিপোর্ট দেখে চমকে উঠল সে। বৃদ্ধ সাপুড়ের কথাই ঠিক। ওটা কোনও সাপের বিষ নয়। তীব্র দুটো অ্যাসিড মিশিয়ে রাখা হয়েছে শিশিতে। সেটা ধমনীতে প্রবেশ করার কয়েক মিনিটের মধ্যে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়াকলাপ বন্ধ হয়ে যাবে। এই মিশ্রণের সঙ্গে শঙ্খচূড়ের বিষের খুব সূক্ষ্ম সাদৃশ্য আছে। শরীরে বেশিক্ষণ থাকলে পোস্টমর্টেমে দুটোকে গুলিয়ে ফেলার একটা সম্ভাবনা থেকে যায়। তবে অ্যাসিড এবং সাপের বিষের মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান তা বিশেষজ্ঞ মাত্রেই চোখে পড়বে। কিন্তু এখানে যে একটা কৌশল ছিল তা পরিষ্কার।

রাস্তায় নেমে মন স্থির করতে দুদণ্ড সময় নিল ভাস্কর। মিস্টার শেরিংয়ের শরীরে যদি এই বিষ মিশিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে তা হলে ওই সিরিঞ্জ এবং শিশিটি কেন নষ্ট

করে ফেলা হল না? কেন সেটা সঞ্চয় করে রাখলেন বাড়ির মালকিন? কেউ কি নিজের অপরাধ প্রমাণ করার ব্যবস্থা জিইয়ে রাখে? হঠাৎ ভাস্করের মাথায় আর একটা প্রশ্ন ঢুকল। ওই সিরিঞ্জেই কি এই শিশির মিশ্রণ ব্যবহার করা হয়েছিল? এটা জানতে পারা অবশ্য এমন কিছু অসুবিধের নয় যদি না খুব সুপটু হাতে ওটাকে বিশুদ্ধ করা হয়।

কাঁধ ঝাঁকালো ভাস্কর। অনেক হয়েছে। এর মধ্যে সে এই সত্যে পৌঁচেছে যে মিস্টার শেরিং প্রচণ্ড নেশা করতেন। মদ-গাঁজায় তার শানাত না বলে ছোট সাপের ছোবল নিতেন। শেষ দিকে তাতেও আরাম না হওয়ায় সাপের বিষ ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে শরীরে নেওয়া শুরু করেন। এই সুযোগটিকে কাজে লাগাল কেউ। সাপের বিষের বদলে অ্যাসিডের মিশ্রণ দেওয়া হয়েছিল মিস্টার শেরিংকে। কী স্বার্থ ছিল তার? বুড়ো সাপুড়ের কথা অনুযায়ী জুলি শেরিং দুবার সাপের বিষ আনতে গিয়েছিল। সহজ ধারণায় জুলিকেই এর জন্যে দায়ী করা উচিত। এবং সেটার পিছনে যথেষ্ট যুক্তি আছে। দুজনের বয়সের পার্থক্য তো ছিলই। হয়তো অবৈধ প্রেমও এটা করতে সাহায্য করেছে। তা ছাড়া, বৈদ্যুতিক তারের বেড়া, স্বাস্থ্যবান প্রহরী, মেয়েকে লুকিয়ে রাখার ঘটনাগুলো প্রমাণ করছে ভদ্রমহিলা সোজা চরিত্রের মানুষ নন।

কিন্তু তাহলে জুলি শেরিং এই বস্তুগুলো কেন রেখে দেবেন বাড়িতে? আর ওই মোটরবাইক চালিয়ে ছোকরাটাই বা কে? সে-ই কি জুলির প্রেমিক? এত সহজে সব কিছুর সমাধান হয়ে যাচ্ছে, মন মানতে চাইছিল না। সে হাতঘড়ি দেখল। আর মিনিট পাঁচেকের মধ্যে গুরুদেবটির সেই মানচিত্র আঁকা দেওয়ালের সামনে আসার কথা। লোকটা অপরাধ করছে ঠিকই কিন্তু এমন অপরাধ তার আওতার মধ্যে পড়ে না। সম্মোহন করে শেষের কথা জেনে নিয়ে পরে চাপ দিয়ে টাকা আদায় করা অবশ্যই আদালত ক্ষমা করবে না কিন্তু আপাতত তার এ নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। সে পুলিশে চাকরি করে না। তাকে যা করতে বলা হয়েছে সেটা করতে এসেই একেবারে সমুদ্রের মাঝখানে ডুব দিয়ে ফেলেছে। আগে এটা সমাধান হোক।

যদিও গুরুদেব কথা দিয়েছিলেন কিন্তু ভাস্করের সন্দেহ ছিল পরিচয় প্রকাশিত হওয়ার পর ভদ্রলোক হাওয়া হয়ে যেতে পারেন। কিন্তু ঠিক সময়ে ওঁকে হাজির হতে দেখে ভালো লাগল তার। পাঁচ ফুটের মধ্যে থাকলে সে কখনওই লোকটার চোখের দিকে তাকাবে না বলে ঠিক করেছে। মুখোমুখি হতেই গুরুদেব বললেন, বলুন, আপনার কোনও সেবায় আমি লাগতে পারি?

ভাস্কর উদাস চোখে হাসল। তারপর বলল, আপনি তো একটার পর একটা অপরাধ করে যাচ্ছেন। আজ একটা ভালো কাজ করুন।

কী কাজ? গুরুদেবের গলার স্বর বেশ চিন্তিত।

এই শহরের সমস্ত মহিলাকে আপনি চেনেন?

ওই যাঃ। এমন কথা বললেন যেন আমি—! না মশাই, তা চিনি না।

জুলি শেরিং বলে কাউকে চেনেন?

এক মুহূর্ত চিন্তা করলেন গুরুদেব। তারপর বললেন উঁহু। আমি আছি টিবেটিয়ান হোটেলে। শেরিং যখন তখন মনে হচ্ছে টিবেটিয়ান। ওই লাইনে নেই। আমার সব শিষ্য বাঙালি, মাড়োয়ারি।

ভালোই হল। আপনি আমার সঙ্গে এই ভদ্রমহিলার বাড়িতে যাবেন। ধরে নিন আপনি শুনেছেন যে স্বামীর মৃত্যুর পর জুলি ওই বাড়ি বিক্রি করবে। আপনি ওখানে একটা আশ্রম খুলতে চান। তাই দরাদরি করতে এসেছেন। আর আমি আপনার শিষ্য, সঙ্গে এসেছি।

যাচ্চলে! খামোকা মিথ্যে বলতে যাব কেন?

একটা ভালো কাজ করতে। আমি দেখতে চাই আপনার সম্মোহনের ক্ষমতা কতটুকু! এই একটি কাজ করলে আপনার সঙ্গে সন্ধি হতে পারে। বেশি কিছু জানতে চাইবেন না। শুধু আমার প্রশংসা করে যাবেন।

সম্মোহন করার পর কী করতে হবে?

আপনি চলে আসবেন। আর দ্বিতীয়বার যাবেন না। মেয়েটি খুব মারাত্মক। সমস্ত বাড়ি ইলেকট্রিক তারে ঘিরে রাখে। এবং আটচল্লিশ ঘণ্টা নয়, আগামীকালই এই শহর থেকে চলে যাবেন কারণ জুলির কর্মচারীরা মারাত্মক।

কিছুক্ষণ বাদানুবাদের পর প্রায় নিমরাজি হয়ে গুরুদেব সঙ্গী হলেন। ভাস্করকে আর-একবার তার পরিচয়পত্র দেখাতে হয়েছিল। ভদ্রলোক যতই তড়পান না কেন ভাস্কর বুঝতে পারছিল তাকে দেখার পর ওর মনে একটা ভয় কাজ করছে।

ক্লিন হার্ট রোডে এখন বেশ লোক চলাচল করছে। দিনটা এখনও মরে যায়নি বটে তবে পৃথিবীতে আর রোদ নেই। গুরুদেব কয়েকবার ওর চোখের দিকে তাকাবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু ভাস্কর সেই সুযোগ দেয়নি। নির্দিষ্ট বাড়িটির সামনে এসে ওরা দাঁড়াল। বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছে না জুলি শেরিং আছেন কি না। আজকের ঘটনার কী প্রতিক্রিয়া হয়েছে তাও তো জানা নেই। ঝট করে ঢুকে গেলে বৈদ্যুতিক তারটা খুঁজতে হবে। কাল রাত্রে সে যখন ঢুকেছিল তখন যদি তারে বিদ্যুৎ থাকত তাহলেই হয়ে গিয়েছিল। এটা থেকে বোঝা গেছে জুলি বাড়িতে থাকলে তারটা নিষ্ক্রিয় থাকে।

গুরুদেবকে সাবধানে পা ফেলতে বলে গেট খুলে ভেতরে ঢুকল ভাস্কর। সেই চটপটে লোকটাকে এখন বেশ নার্ভাস দেখাচ্ছে। ঠিক যেখানটায় জুলির গাড়ি থেমেছিল সেখানে দাঁড়িয়ে সে চিৎকার করে ডাকল, কেউ আছেন? বাড়িতে কেউ আছেন?

নিঃশব্দে দরজা খুলে গেল। ভাস্কর সবিস্ময়ে দেখল জুলি দাঁড়িয়ে আছেন দরজার মাঝখানে, ছবির মতো। অভিব্যক্তিতে কিছুটা বিস্ময়, অনেকটাই বিরক্তি। স্পষ্ট ইংরেজিতে উচ্চারণ করলেন, কী চাই?

ভাস্কর বলল, নমস্কার, আমার গুরুদেব আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।

গুরুদেব? এবার জুলির বিস্ময় যেন বেড়ে গেল।

উনি পৃথিবীবিখ্যাত যোগী আনন্দস্বামী। এই শহরে একটা যোগাশ্রম খুলতে চান। সেই ব্যাপারেই— আপনি ওঁর নাম শোনেননি? যতটা সম্ভব অভিনয় করার চেষ্টা করল ভাস্কর। যদিও কপালের টিপ ছাড়া গুরুদেবকে মোটেই যোগী বলে মনে হচ্ছে না। অবশ্য যোগীরা টিপ পরে কি না সেটাও তার জানা নেই।

এক মুহূর্ত দ্বিধা করলেন জুলি শেরিং। তারপর খানিকটা নিরাসক্ত গলায় বললেন,

যদিও যোগীদের সম্পর্কে আমার কোনও আগ্রহ নেই তবু আপনারা খানিকক্ষণ বসতে পারেন।

সতর্ক পায়ে প্রথমে হেঁটে গেল ভাস্কর। না, পায়ে কোনও বিদ্যুতের স্পর্শ নেই। ওকে দরজার কাছে পৌঁছতে দেখে হাঁটা শুরু করলেন গুরুদেব।

জুলি শেরিং ততক্ষণ ঘরে ঢুকে আলো জ্বেলেছেন। এখন বাইরে ঠান্ডা বাড়ছে। তা সত্ত্বেও জুলির শরীরে এখন লাল রঙের ম্যাক্সি যার কোমর চাপা। মহিলার বয়স আন্দাজ করা মুশকিল কিন্তু যৌবন যে অচঞ্চল তা বুঝিয়ে দেওয়ার একটা চেষ্টা আছে। ধবধবে সাদা সোফায় এমন ভঙ্গিতে বসল ভাস্কর যাতে গুরুদেব এবং জুলি মুখোমুখি বসতে পারে। জুলি শেরিং যে তাকে দেখছে সেটা বুঝতে পেরে ভাস্কর সরল ভাবভঙ্গি করার চেষ্টা করল। গুরুদেব বসলেন। জুলি ঘরের কোণে একটা বুদ্ধমূর্তির পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, কী চাই বলুন।

ভাস্কর দেখল গুরুদেব নিচের কার্পেট দেখছেন। যদিও জুলি যে দূরত্বে দাঁড়িয়ে সেটা সম্মোহনের সীমায় নয় কিন্তু ওঁকে এত লাজুক দেখাচ্ছে কেন? সে বলল, আমরা খবর পেয়েছি আপনি আপনার স্বামীর মৃত্যুর পর এই বাড়ি বিক্রি করে দিতে চান। গুরুদেবের ইচ্ছে এইটে কিনে নিয়ে যোগ-সেন্টার খোলেন।

কে খবর দিল? খুব শীতল গলা জুলি শেরিংয়ের।

একজন দালাল।

আমি কোনও দালালকে চিনি না। আমার স্বামীর মৃত্যুর পর এই বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার বিন্দুমাত্র বাসনা আমার নেই। আপনাদের আর কিছু জানার বা বলার আছে?

ভাস্কর বিপাকে পড়ল। সে গুরুদেবকে বলল, গুরুদেব, আপনি কিছু বলুন। উনি বলছেন দালাল আমাদের ভুল সংবাদ দিয়েছে।

গুরুদেব মুখ তুললেন। তারপর উল্টোদিকের দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে কাঁপা গলায় প্রশ্ন করলেন, ওই বুদ্ধমূর্তি কোত্থেকে এনেছেন?

আমি জানি না। কারণ এটা শেরিং পরিবারে কয়েক বছর ধরে আছে।

খুব জীবন্ত। খু-উব। গুরুদেব অন্যদিকে দৃষ্টি রাখছিলেন।

এটা বিক্রির জন্য নয়। এনি থিং মোর?

নাঃ। গুরুদেব উঠে দাঁড়ালেন।

ভাস্কর বিপাকে পড়ল। যে জন্যে লোকটাকে সঙ্গে আনা তা কাজেই লাগল না। ওরকম চটপটে লোকটার পরিবর্তনের কারণ ধরতে পারছে না সে। তবু কথা বানানোর জন্যে বলল, আমাদের গুরুদেব অতীত এবং ভবিষ্যত বলতে পারেন। আপনার যদি তেমন কিছু জানার আগ্রহ থাকে—।

তাই নাকি! অদ্ভুত হাসি খেলে গেল জুলির মুখে, আমার ওসবে মোটেই বিশ্বাস নেই, আমি বর্তমান নিয়েই ভাবি।

ভাস্কর ইতস্তত করল। তারপর বলল, এখানে, মানে আপনার বাড়ির গেট পেরিয়েই গুরুদেব বলছিলেন এই মহিলা খুব দুশ্চিন্তায় আছেন। তাই আপনাকে সাহায্য করতে চেয়েছিলাম।

মহিলা একটুও না নড়ে কাঁধ ঝাঁকালেন। ভাস্কর দেখল গুরুদেব একবারও মহিলার

দিকে তাকাচ্ছেন না। তার খুব রাগ হচ্ছিল। লোকটা নির্ঘাৎ তাকেও ভাঁওতা দিয়েছে। ওসব সম্মোহন-টম্মোহন বাজে কথা। স্রেফ ফোর টুয়েন্টি। এই বাড়ি থেকে একবার বেরিয়ে গেলে আবার ঢোকা মুশকিল হবে। কিন্তু এ ছাড়া আর কী উপায়!

পেছনের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। বড় রাস্তায় উঠেই গুরুদেব হাত জোড় করলেন, মাপ করুন ভাই। আমি হেরে গেলাম।

হেরে গেলেন মানে?

মানে, যেই ওই মেয়েছেলেটার দিকে তাকাতে গিয়েছি অমনি চোখ পড়ে গেছে বুদ্ধদেবের চোখে। মাইরি কী বলব, বুদ্ধদেবের চোখে অমন জ্যোতি যে আমার সব শক্তি ভোঁতা হয়ে গেল। মেয়েছেলেটা নড়ছিল না ওখান থেকে যে বুদ্ধদেবকে এড়িয়ে সম্মোহিত করব। আপনাকেও বলতে পারছি না ব্যাপারটা। তবে হ্যাঁ, খানদানী চিজ। একে ক্লায়েন্ট করতে পারলে মোটা কামানো যাবে। তবে হ্যাঁ, ওই বুদ্ধমূর্তি—। খুব আফসোসের গলায় বললেন গুরুদেব। ব্যাপারটাকে একদম উড়িয়ে দিতে পারল না ভাস্কর। এ গল্প তো জানা, ক্রুশ সামনে থাকলে ড্রাকুলারা পালিয়ে যায়। এটাও সেরকম হতে পারত।

ঠিক সেই সময় মোটরবাইকটাকে উঠে আসতে দেখল সে। ছেলেটা একটা চামড়ার জ্যাকেট গায়ে চাপিয়েছে। ভাস্কর গুরুদেবকে বলল, এটাকে বধ করুন তো। বলেই রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাত নাড়তে লাগল। বাঁক ঘুরে এসে ছেলেটি এই দৃশ্য দেখে চিৎকার করে উঠল, কী চাই? সে তখন স্পিড কমিয়েছে মাত্র, চলা থামায়নি।

আপনার জন্যে জরুরি খবর আছে।

এবার অনেকটা হতভম্ব হয়ে ছেলেটি ইঞ্জিন বন্ধ করল, কে আপনারা? কী খবর? কে দিয়েছে?

গুরুদেব বললেন, একসঙ্গে তিনটে প্রশ্ন। উত্তর দিচ্ছি। আমার দিকে তাকাও। হ্যাঁ, চমৎকার। এই রকম চোখাচোখি। বাঃ উত্তর পাচ্ছ? তিন-তিনটে প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছ?

ভাস্কর অবাক হয়ে দেখল ছেলেটি সুবোধ বালকের মতো ঘাড় নাড়ল, হ্যাঁ।

বাঃ। কী নাম তোমার?

এ. কে. প্রধান।

কী কাজ করো?

এখানকার ইন্সুরেন্স অফিসের ইনচার্জ।

বাঃ। কোনও দুশ্চিন্তা আছে?

হ্যাঁ। হেড অফিস যদি জুলিদের কেসটা অ্যাপ্রুভ না করে তাহলে ও আমাকে বিয়ে করবে না। আমি বিপদে পড়ে যাব। ছেলেটা মমির মতো দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। ভাস্কর নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। ম্যাজিক অনেক দেখেছে সে, কিন্তু এমন দেখেনি। সে অন্যদিকে চোখ রেখে প্রশ্ন করল, ওর এই অবস্থা কতক্ষণ থাকবে? আপনার কোনও ডোজ আছে?

তা আছে। এর ক্ষেত্রে অন্তত একঘণ্টা।

তাহলে আপনি কেটে পড়ুন।

অ্যাঁ!

যা বলছি শুনুন।

না, মানে এর কাছে থেকে অনেক মশলা পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে।

সেটা আপনার দরকারে লাগবে না। আমি প্রশ্ন করলে উত্তর দেবে? জিজ্ঞেস করেই সে ছেলেটির দিকে প্রশ্ন ছুড়ল, কত বছর চাকরি হয়েছে তোমার?

বারো বছর। তেমনি পুতুলের মতো উত্তর দিল ছেলেটি।

ভাস্কর এবার ইশারা করল গুরুদেবকে চলে যেতে। ভদ্রলোকের মোটেই যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি স্থান ত্যাগ করলেন।

ছেলেটিকে প্রশ্ন করল ভাস্কর, জুলি কত টাকা ক্লেইম করেছে?

তিন লাখ।

ওর মেয়েকে দেখেছ?

না। মেয়ে নেই।

মিস্টার শেরিং কি জুলিকে ভালোবাসত?

হ্যাঁ। জুলি ভালোবাসত না। জুলি ভালোবাসে আমাকে।

ও। কিন্তু জুলির একটা মেয়ে আছে সতেরো-আঠারো বয়স তার। ওই বাড়িতেই আছে। তুমি জানো না?

জানি না।

মিস্টার শেরিংকে কে হত্যা করেছে?

হত্যা করেনি কেউ! সাপের বিষ ইনজেক্ট করেছিল নিজেই। তাতেই মারা গেছে। এটা অবশ্য আত্মহত্যা হতে পারে। জুলি ধরেছিল বলে ডাক্তার এটাকে হার্টফেল বলে চালিয়েছে। আমিও তাই চেয়েছিলাম।

কোন ডাক্তার? কোথায় থাকে?

পাশেই। হিল কটেজে। ডক্টর এস. কে. রায়।

ঠিক তখনই একটা গাড়ির শব্দ পেল ভাস্কর। সে তাড়াতাড়ি বলল, আজ সকালে তুমি জুলির বাড়িতে গিয়েছিলে। বুঝেছ? বলে দ্রুত রাস্তার পাশে একটা বিশাল পাথরের আড়ালে চলে এল। আর তখনি জুলি শেরিংয়ের গাড়িটা বাঁক ঘুরে হর্ন বাজাল। ভাস্কর সন্তর্পণে দেখল ব্রেক চেপে গাড়ি থামিয়ে জুলি মাটিতে নেমে অবাক হয়ে প্রধানকে দেখছেন। এই যে একটা গাড়ি এল তাতেও কোনও সম্বিত আসেনি প্রধানের। তেমনি শূন্য চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।

মুহূর্তেই ছুটে গেলেন জুলি তার কাছে, প্রধান, ডার্লিং, কী হয়েছে?

কে?

ও গড! আমাকে চিনতে পারছ না? আমি জুলি। তোমাকে খুব অ্যাবনর্মাল দেখাচ্ছে। কী হল তোমার? উদ্বিগ্ন হলেন জুলি।

ও জুলি। আমি তোমার বাড়িতে গিয়েছিলাম আজ সকালে। তোমার একটা মেয়ে আছে। মেয়েটার বয়স সতেরো-আঠারো। নামতা পড়ার মতো কথাগুলো বলে যেতেই ঠাস করে চড় মারলেন জুলি প্রধানের গালে। তারপর উন্মাদিনীর মতো ধাক্কা দিয়ে বললেন, ইউ, ইউ। তুমি আজ আমার বাড়িতে চোরের মতো ঢুকেছিলে? আমার গার্ডকে অজ্ঞান করে আমার মেয়েকে ভুলিয়েছ তুমি?

সত্যিকারের একটা পুতুল হয়ে গেছে প্রধান। জুলির ধাক্কা তাকে ছিটকে নিয়ে

গেল রাস্তার ওপাশে একটা পাথরের ওপর। পাথরটা হয়তো নড়বড়ে ছিল। প্রধানের আঘাত সেটা সহ্য করতে না পেরে কাত হয়ে পড়ল একপাশে। আর প্রধানের শরীরটা বেটাল হয়ে গড়িয়ে গেল নিচে। চিৎকার করে ছুটে গেলেন জুলি পাথরটার কাছে। তারপর অনেকটা ঝুঁকে নিচের দিকে তাকালেন এবং তৎক্ষণাৎ ফিরে দাঁড়ালেন। ব্যাপারটা ভাস্করের কাছে এমন আকস্মিক যে সে কী করবে বুঝতে পারছিল না। সে যেদিকে রয়েছে ঠিক তার উল্টোদিকে ঘটেছে ওটা। জুলি শেরিংয়ের মুখ সাদা, ভূত দেখার আতঙ্ক তার চোখে। পরমুহূর্তে তিনি ছুটে গেলেন গাড়িতে। তারপর মোটরবাইকটাকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল ঝড়ের গতিতে নিচের দিকে। যেন জায়গাটা ছেড়ে যেতে পারলে বেঁচে যান।

এইবার দৌড়ে এল ভাস্কর। পাথরটা যেখানে বেটাল হয়েছিল সেখানে এসে দেখল নিচে, বেশ নিচে ঢালু উপত্যকায় জঙ্গল ছড়িয়ে। প্রধানের শরীরটা সেই জঙ্গলে ঢুকে গেছে। শুধু তার দুটো পা দৃশ্যমান। কোনওরকমে নিচে নামল ভাস্কর। প্রধানের শরীরটা স্পর্শ না করে বুঝল এখনও প্রাণ আছে। মাথার কাছাকাছি কোথাও আঘাত জব্বর হওয়ায় রক্তপাত হচ্ছে। ছেলেটা এখনও অচেতন।

এই মুহূর্তে প্রধানকে তুলে নিয়ে ওপরে ওঠা তার একার পক্ষে অসম্ভব। সে আর দাঁড়াল না। ওপরে উঠে আসতেই দেখতে পেল কালকের সেই বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা ফিরছেন। বৃদ্ধা বৃদ্ধকে কিছু বলতেই তিনি গলা তুললেন, হেই জেন্টলম্যান, গুড ইভনিং। তুমি কি এখনও বাড়িটা খুঁজে পাওনি?

ভাস্করের মনে পড়ল। বুড়ো কালকের কথা মনে রেখেছেন। সে বলল, হ্যাঁ পেয়েছি। সেখান থেকেই আসছি।

এই সময় পরিত্যক্ত মোটরবাইকটা ওঁদের চোখে পড়ল। বৃদ্ধ বললেন, এটা কার বাইক? কাউকে তো দেখছি না।

বৃদ্ধা বললেন, মনে হচ্ছে সেই ছোকরাটার, যে জুলির বাড়িতে প্রায়ই আসে! দ্যাট নটোরিয়াস চ্যাপ। লেটস গো।

ওরা হাঁটা শুরু করতেই ভাস্কর জিজ্ঞাসা করল, মাপ করবেন, এখানে কারও বাড়িতে টেলিফোন আছে?

আছে, ডাক্তার রায়ের বাড়িতে আছে। হিল কটেজ।

খুব দূরে?

না। ওইতো, জুলি শেরিংয়ের নেক্সট ডোর নেবার।

ভাস্কর দেখল এখান থেকে হেঁটে শহরে পৌঁছে পুলিশ কিংবা হাসপাতালে খবর দিতে যে সময় লাগবে তাতে রাত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। অতক্ষণ প্রধানের শরীর ওইভাবে পড়ে থাকলে বাঁচার সুযোগ থাকবে কি না সন্দেহ। বরং একজন ডাক্তারের বাড়ি থেকে টেলিফোন করতে পারলে হাসপাতাল খুব দ্রুত ব্যবস্থা নিতে পারে।

বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ডাক্তার রায়ের বাড়িটা তাকে দেখিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। গেট খুলে কম্পাউন্ডে ঢুকতে-ঢুকতে ভাস্করের খেয়াল হল প্রধানের কথা। এই ডাক্তারই মিস্টার শেরিংয়ের ডেথ-সার্টিফিকেট লিখেছেন জুলির চাপে। যদিও প্রতিবেশী তবু গাছপালার জন্যে জুলির বাড়ি এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না। এই মানুষটির কথার ওপরে অনেক

কিছু নির্ভর করছে।

ডাক্তার সাহেব যে বাড়িতেই থাকবেন এতটা আশা করেনি ভাস্কর। সে সোজা নিজের পরিচয়পত্র দেখিয়ে বলল, একটা টেলিফোন করতে চাই, খুব জরুরি। অনুমতি দেবেন?

ডাক্তার পরিচয়পত্রটি দেখার পর সন্দেহের চোখে তাকিয়েছিলেন, অনুরোধ শুনে সহজ হলেন, অবশ্যই। ওই কোণে রয়েছে।

পরপর দুটো টেলিফোন করল ভাস্কর। প্রথমটা হাসপাতালে। দ্বিতীয়টা লোকাল থানায়। দু'জায়গায় জানাল গ্রিন হার্ট রোডের বাঁকে একটা মোটরবাইক পড়ে আছে। তার পাশে খাদের দিকে উঁকি মারলে নিচে একটি মানুষের শরীর দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে এখনও জীবিত। যদি দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হয় তাহলে বেঁচে যেতে পারে। দু'জায়গা থেকেই প্রশ্ন করা হল তার পরিচয় কী? জবাব না দিয়ে টেলিফোনের লাইন কেটে দিল সে।

ডাক্তার রায় ইনফরমেশনগুলো শুনছিলেন। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বললেন, আমাদের রাস্তায় অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে? কোথায়?

ভাস্কর তাঁকে থামাল, আপনি বসুন। পুলিশ আর হাসপাতাল তাদের দায়িত্ব বুঝবে। আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।

আমার সঙ্গে? আমি কী করেছি?

যদি বলি এই অ্যাক্সিডেন্টের সঙ্গে আপনিও জড়িত!

কী আজেবাজে কথা বলছেন? আমি আজ সারাদিন বাড়ি থেকে বের হইনি। তাছাড়া কার অ্যাক্সিডেন্ট হল তাও জানি না। কে আপনি?

আমার পরিচয় তো একটু আগেই দেখতে পেয়েছেন। আমরা অনেক কিছু করি না জেনে যা অন্য ঘটনাকে ডেকে আনে। মিস্টার শেরিংয়ের মৃত্যুটাকে কি আপনার নর্মাল ডেথ মনে হয়েছিল? ঈষৎ ঝুঁকে একটা সোফায় বসল ভাস্কর। ইঙ্গিতে ডাক্তারকেও বসতে বলল।

হতবাক হয়ে গেলেন কয়েক মুহূর্ত। শেষ পর্যন্ত নিজেকে সামলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আমাকে এই প্রশ্ন কেন?

কারণ আপনি সার্টিফিকেট লিখেছিলেন। ডাক্তার রায়, আপনার সম্পর্কে আমার কোনও অসদ্ভাব নেই। আমি শুধু আলোচনা করতে চাই এই পরিচয়পত্রের জোরে। বসুন। ভাস্কর আবার কার্ডটা বের করল।

কার্ডটার দিকে আর-একবার তাকিয়ে ডাক্তার রায় বিপরীত সোফায় বসলেন। ভাস্কর জিজ্ঞেস করল, এটাকে স্বাভাবিক মৃত্যু বলে মনে হল কেন?

কারণ ওটা মিস্টার শেরিংয়ের কাছে অস্বাভাবিক নয়। ওঁর হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। হার্ট অ্যাটাক। ডাক্তার রায় চেষ্টা করছেন স্বাভাবিক হতে।

কিন্তু কেন হার্ট অ্যাটাক হল? সাপের বিষে?

আই সি! আপনি দেখছি সবই জানেন। তাহলে আপনাকে আমি খুলেই বলি। মিস্টার শেরিং আমার পেশেন্ট ছিলেন না। পেশেন্ট ছিলেন মিসেস শেরিং। ওঁর প্রায়ই মাথার যন্ত্রণা হয়। মিস্টার শেরিং নেশা করতেন। ওঁদের কোনও দাম্পত্য জীবন ছিল

না। মদ-গাঁজা ছাড়িয়ে ভদ্রলোক শুনতাম সাপের ছোবল নিতেন। শেষ পর্যন্ত সেটাও খুব কাজে আসত না। তখন মিসেস শেরিং ওঁকে নিয়ে এলেন আমার কাছে। এসব শুনে আমি পরামর্শ দিলাম নেশা ছাড়ার জন্যে। কিন্তু তখন উনি এমন স্টেজে চলে গেছেন যে নেশা না করলে বাঁচবেন না। আমার কাছে শেরিং এলেন কী করে ইঞ্জেকশন নিতে হয় জানতে। আমি ওঁর পরীক্ষা করিয়েছিলাম। কোনও বিষাক্ত সাপের বিষ ওঁকে কাহিল করতে পারবে কি না সন্দেহ ছিল। তবে আমি নিষেধ করেছিলাম। ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে বিষ শরীরে নেওয়াতে আমার আপত্তি ছিল, অত্যন্ত অন্যায় ব্যাপার—

ডাক্তারকে থামিয়ে ভাস্কর প্রশ্ন করল, জুলি আপত্তি করেনি?

আমার আড়ালে করেছে কি না জানি না, তবে বলেছিল কোনও মানুষ যদি ওই নেশা করে আরাম পায় তো সে কী করতে পারে। আমি ওর কষ্টটা বুঝতে পেরেছিলাম। যাক, মিস্টার শেরিং নিয়মিত বিষ শরীরে নিতে লাগলেন ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে। কিন্তু প্রায় মাসখানেক বাদে একদিন ওঁর দোকানের ভেতরের ঘরে ইঞ্জেকশন নিয়ে কাউন্টারে বেরিয়ে আসতেই হার্ট অ্যাটাক হল। বিষ তিনি স্ব-ইচ্ছায় নিতেন। তাই কেউ তাঁকে হত্যা করেনি। তিনি বিষ নিয়মিত না নিলেই অসুস্থ হয়ে পড়তেন। এবং আত্মহত্যা করার বিন্দুমাত্র বাসনা ছিল না। ওই পদ্ধতিতে বিষ নিয়ে মাসখানেক বহাল তবিয়তে ছিলেন। তাই এটাকে আমি আত্মহত্যাও বলতে পারি না।

কেন? এই বিষ তো শেষ পর্যন্ত মরণ ডাকতে পারে জেনেও তিনি নিতেন।

সিগারেট খেলে ক্যান্সার হতে পারে জেনেও মানুষ সিগারেট খায়। তার জন্যে কি আপনি বলবেন সে আত্মহত্যা করছে? দার্শনিকভাবে হয়তো বলা যায়, কিন্তু আইনত? হত্যা কিংবা আত্মহত্যা যখন নয় তখন আমার পক্ষে নর্মাল ডেথ সার্টিফিকেট দিতে বাধা ছিল না।

কিন্তু আপনি ইতস্তত করেছিলেন। জুলি শেরিং আপনাকে চাপ দিয়েছিল সেটা লিখতে, তাই না?

অবাক হলেন ডাক্তার রায়, কে বলেছে আপনাকে?

ব্যাপারটা অস্বীকার করতে পারেন?

ধীরে-ধীরে মাথা নাড়লেন ডাক্তার রায়, এটা খেলে আমার ক্ষতি হলেও হতে পারে, আর এটা খেলে আমার ক্ষতি আজ নয় কাল হবেই—এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে। তাই আমি সামান্য দ্বিধায় ছিলাম, আত্মহত্যা লিখব কি না। কিন্তু জুলি আমাকে বোঝাল যে মিস্টার শেরিং মরতে চাননি। তিনি ইঞ্জেকশন নিয়ে কাস্টমারদের দেখাশোনা করার জন্যে বাইরে এসেছিলেন। এই সময় হয়তো বিষ ওঁর হৃদযন্ত্র স্তব্ধ করে বা—

কোনও বিষের প্রতিক্রিয়া নয়। মিস্টার শেরিংয়ের বয়স হয়েছিল। হার্ট অ্যাটাক হওয়ার যে-কোনও কারণ থাকতে পারে। ডাক্তার রায় জানালেন।

কিন্তু ধরুন, সেইদিন মিস্টার শেরিংয়ের সাপের বিষের শিশিতে যদি কেউ অন্য কিছু তীব্রতম বিষ ঢেলে রাখে এবং শেরিং সেটাকেই সাপের বিষ ভেবে শরীরে ইনজেক্ট করেছিলেন, এরকম সম্ভাবনার কথা আপনার মাথায় এল না কেন? ওঁর বডি পোস্টমর্টেম না করে দাহ করতে দিলেন? কেটে-কেটে প্রশ্নগুলো করার সময় ভাস্কর বুঝতে পারছিল

ভদ্রলোক সত্যি নির্দোষ। কোনও মানুষের মাথায় দ্বিতীয় চিন্তা প্রবেশ করলে যে প্রতিক্রিয়া হয় সেটাই দেখছে সে।

মিস্টার রায় হতভম্ব হয়ে জিগ্যেস করলেন, এ আপনি কী বলছেন? কে খুন করবে ওই বৃদ্ধকে। তিনি তো কারও কাজে, বিশেষ করে মিসেস শেরিংয়ের কোনও ব্যাপারে বাধা দিতেন না। না-না, এ হতে পারে না।

কিন্তু আপনার মনে দ্বিধা এসেছিল ডেথ সার্টিফিকেট লেখার সময়।

স্বাভাবিক। আসতই না, যদি লোকটার নেশার অভ্যেস না থাকত। কিন্তু জুলি বলল, পোস্টমর্টেম মানেই ওর নেশার কথা জানাজানি হয়ে যাওয়া। তাছাড়া এটা হত্যা বা আত্মহত্যা না হলেও ওই কারণেই নাকি সে কিছু টাকা পাবে না ইন্সুরেন্স কোম্পানি থেকে। ব্যাপারটা সমর্থন করেছিল প্রধান। আমি ভাবলাম বিধবা মেয়েটা কেন বিনা দোষে বঞ্চিত হবে।

ডাক্তার রায়ের কথা শেষ হওয়া মাত্র ভাস্কর উঠে দাঁড়াল। তারপর বলল, আপনি মনে হয় নির্দোষ। তবে সেটা প্রমাণিত হবে যদি আমি আপনার কাছে এসেছিলাম এই সংবাদ তৃতীয় ব্যক্তি না জানে।

বিস্মিত মানুষটিকে পেছনে রেখে ভাস্কর বাইরে এসে দেখল মৃদু ঠান্ডা বাতাস বইছে। সন্ধে হয়ে এল বলে। আর দু-পা হাঁটতে না হাঁটতেই পথের আলোগুলো জ্বলে উঠল। দুর্ঘটনার জায়গায় এসে দেখল মোটর বাইকটা রয়েছে। পুলিশের একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। কয়েকজন পুলিশ কিছু খোঁজাখুঁজি করছে টর্চ জ্বেলে। ওরা নিশ্চয়ই প্রধানের শরীরটাকে এতক্ষণে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছে। এবং তখনই ওর খেয়াল হল প্রধানকে বাঁচাতে হবে। যে করেই হোক। দুর্ঘটনার জন্যে যদি ও না মারা যায় তাহলে ওকে আজ-কালের মধ্যে মেরে ফেলার চেষ্টা হবেই। জুলি শেরিং কোনও প্রমাণ রাখতে চাইবে না। এবং তখনই সে অনিল মিত্রকে দেখতে পেল। দুজন পুলিশের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে নিচে থেকে উঠে আসছে।

ভাস্করকে দেখে চমকে উঠল অনিল মিত্র। তারপর চিৎকার করে বলল, হোয়াট এ সারপ্রাইজ। তুমি এখানে?

এই তো। কেমন আছ? ভাস্কর হাসল।

ছিলাম ভালোই। এইমাত্র একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। আবার ঠিক এটাকে অ্যাক্সিডেন্ট বলতেও মন চাইছে না। লোকটা আমাদের পরিচিত। মোটর বাইকটাকে মাঝ রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখে নিচের ওই ঝোপে পড়েছিল। ভঙ্গি দেখে বোঝাই যায় আত্মহত্যা করতে চায়নি। কোনও গাড়ির সঙ্গে ক্র্যাশ হলে মোটরবাইকটা নিটোল থাকত না। নিজের মোটরবাইকটাকে ওখানে দাঁড় করিয়ে ছেলেটা কী করে ওই খাদে গিয়ে পড়ল সেটাই বুঝতে পারছি না।

রহস্যজনক ব্যাপার। ও বেঁচে আছে?

হ্যাঁ। মাথায় চোট লাগায় বেহুঁশ হয়ে আছে। হসপিটালাইজড করা হয়েছে।

ওখানে গার্ড রাখো যদি ছেলেটিকে বাঁচাতে চাও।

মানে?

যদি এটা হত্যাকাণ্ড হয় তাহলে হত্যাকারী চাইবে না ও বেঁচে থাকুক। কে ধরা

পড়তে চায় বলো?

অনিল মিত্র চিন্তা করল একটু, তুমি ভালোই বলেছ! ছেলেটার স্টেটমেন্ট নেওয়া যায়নি এখনও। এখানে তো কোনও ক্লুও পেলাম না। কাল সকালে আর একবার আসব। বাই দ্য বাই, উঠেছ কোথায়?

কাঞ্চনজঙ্ঘা লজ।

যাচ্চলে। ওটা তো টিবেটিয়ানদের। খাওয়াদাওয়ার অসুবিধে। কী ব্যাপার?

কোনও ব্যাপারই নয়।

অনিল মিত্র ওকে হোটেল পর্যন্ত লিফট দিল। বাজারের গায়ে ওর গাড়ি থেকে নামিয়ে বারবার বলল সোজা ওর কোয়ার্টার্সে চলে আসতে। ভাস্কর কোনও কথা জানায়নি। দেখা যাক, আর-একটু দেখা যাক। এমনকী একজন বাঙালি যে টেলিফোন খবরটা দিয়েছিল কিন্তু পরিচয় জানায়নি— তাকে নিয়েও দুশ্চিন্তা অনিল মিত্রের।

অনিলের জিপটা চলে যাওয়া মাত্র ভাস্করের মনে হল এবার একটু ভারী বয়সের পোশাক পরা দরকার। সে হোটেলের দিকে কয়েক পা এগিয়ে আসতেই সামনে দাঁড়াল পদম বাহাদুর, সেলাম সাহেব।

ভাস্কর হাসল, এতক্ষণ কোথায় ছিলি?

আরে বাপ! আপনাকে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি তামাম শহরে। এখন দেখছি খোদ এস-পি সাহেবের জিপ থেকে নামছেন। ওই জিপ দেখতে পেলে আমরা ত্রিসীমানায় আসি না। এস-পি সাহেব আপনাকে যখন নামাতে এসেছিল তখন আপনি আরও ভারী অফিসার। হুকুম করুন সাব এখন আমাকে কী করতে হবে? পদম সোজা হয়ে দাঁড়াল।

তুই এখানে একটু অপেক্ষা কর। আমি হোটেল থেকে ঘুরে আসি।

নিজের ঘরের দরজা খুলতে গিয়ে ভাস্কর শুনল পাশের ঘরের দরজাটা খুলে গেল। তারপর টলায়মান পায়ে শাজাহান যেন এগিয়ে এল, কী ব্যাপার স্যার?

গুরুদেব হাওয়া হয়ে গেলেন?

হ্যাঁ বিকেলে বেরিয়েছিলেন। ফিরে এসে মালপত্র নিয়ে উধাও।

হোটেল চেঞ্জ করেননি তো?

না-না। আমি নিজে ওঁকে লাস্ট বাসে তুলে দিয়েছি। আর হ্যাঁ, এই চিঠিটা আপনাকে দিতে বলে গিয়েছিলেন। শাজাহানের কাঁপা হাত থেকে খামটা নিয়ে ছিঁড়ল ভাস্কর। সাদা কাগজে গোটা অক্ষরে লেখা রয়েছে, মহিলা মারাত্মক। চোখের সামনে যা দেখলাম তারপর আর এই শহরে থাকা আমার পক্ষে সেফ নয়। উদোর পিণ্ডি চিরকালই বুধোর ঘাড়ে পড়ে। মুচকি হেসে চিঠিটা পকেটে রেখে দরজা খুলল সে। শাজাহানকে কোনও কথা বলার সুযোগ দিল না ভাস্কর। অত্যন্ত বুদ্ধিমানের মতো কাজ করেছেন গুরুদেব। স্থান ত্যাগ করেও তিনি হোটেলে ফিরে আসেননি। কোনও আড়ালে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন, নাটকটা দেখার পর মনে হয়েছে ছেলেটির পড়ে যাওয়ার পেছনে সম্মোহন কাজ করেছে। আর ঝুঁকি নিতে চাননি ভদ্রলোক। ভালোই হল। লোকটা যা করত সেটার দ্বিতীয় অংশে অপরাধ ছিল। চাপ দিয়ে টাকা আদায় করা আইনের চোখে অন্যায়। কিন্তু সম্মোহনের প্রভাবে যদি কেউ ভেতরের কথা বলে দেয় তাহলে আইনের কিছু করার আছে কি না বলা শক্ত। তবে লোকটা ঠিক সময়ে বিদায় নিয়েছে।

জামাকাপড় পাল্টে বাইরে এল। তার আগ্নেয় অস্ত্রটিতে ছটি গুলি আছে। ঈশ্বর করুন, এগুলোর একটাও যেন তাদের স্থান ত্যাগ না করে। এখন ভাস্করের পরনে র‍্যাংলারের জিনিস, স্কিন টাইট চামড়ার জ্যাকেট, মাথায় ঠান্ডা থেকে বাঁচবার জন্যে বারান্দা দেওয়া টুপি। শাজাহান সেনের সঙ্গে সে ইচ্ছে করেই দেখা করল না। ফালতু কিছু সময় নষ্ট হবে। বাড়ি থেকে পালিয়ে লোকটা এখানে আসে শুধু মদ্যপান করতে। মানবচরিত্র বুঝতে চাওয়া ঈশ্বরেরও অসাধ্য!

পদম বাহাদুর চটপট চলে এল, সেলাম সাহাব। ভাস্কর বুঝতে পারছিল ওর চোখ খুব উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। যেন হিন্দি ছবির কোনও নায়ককে সে চোখের সামনে দেখছে। ভাস্কর বলল, সেই মদের দোকানে যাব। তোর সঙ্গে ছুরিটা আছে তো?

জি সাব! যেন একটা কাজের ইঙ্গিত পেল পদম।

পদমকে পায়ের গোড়ালিতে নিয়ে ভাস্কর ম্যাল রোডে যখন উঠে এল তখন বড় দোকানগুলোয় ঝকঝকে আলো জ্বলছে। উল্টো রাস্তা দিয়ে নামতে-নামতে পদম বলল, সাহেব আমাকে কি ভেতরে ঢুকতে হবে? ভাস্কর মাথা নাড়ল।

কিন্তু সাহেব, আমি তিব্বতিদের মদ সহ্য করতে পারি না।

করতে হবে না।

অর্থ ধরতে পারল পদম। ভাস্করের সঙ্গে হাঁটার তাল রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছিল সে। এই পথে আলো আছে। কিন্তু সাতটা বাজতে না বাজতেই চারধার কেমন নিঝুম হয়ে গেছে। পাশের বাড়িগুলোয় কোনও শব্দ নেই। এই শহরে রাত আসে সন্ধের ঘাড়ে চেপে। এবং এলেই মানুষজন ঝিমিয়ে পড়ে।

খুশ মেজাজী পানশালার সামনে এসে পদমের পা থেমে গেল। ভাস্কর বলল, কী হল?

আমাকে ভেতরে যেতেই হবে সাব?

ছেলেটার মুখের দিকে চেয়ে মায়া হল ভাস্করের। সে জিগ্যেস করল, তোর মতন মস্তান ভেতরে ঢুকতে ভয় পাচ্ছে কেন?

একটা গোলমাল হয়েছিল তিন মাস আগে ওখানে। তারপর ওদের বারম্যান জোহাং বলে দিয়েছিল আমি যেন ভেতরে আর না ঢুকি। ও শালা ঠান্ডা মাথায় খুন করতে পারে।

ঠিক আছে। আমার বন্দুকের আওয়াজ শুনলেই তুই চলে আসবি। আমি খুব বিপদে না পড়লে আওয়াজ করব না।

ভাস্কর আর দাঁড়াল না। মিসেস শেরিংয়ের গাড়িটাকে দেখা যাচ্ছে। রাস্তার একটা ধারে পার্ক করা আছে। ভেতরে আলো জ্বলছে। ফাঁকা বারান্দায় পা দিয়ে দরজাটা ঠেলতেই তীব্র মদের গন্ধ নাকে এল। সোজা ভেতরে ঢুকতেই স্প্রিং-এর চাপে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। এখন প্রায় প্রতিটি টেবিল ভর্তি। প্রত্যেক টেবিলে একজন করে বসে পান করছে। একটা বাজনা বাজছে রেকর্ডে। যারা খাচ্ছে তারা কোনও কথা বলছে না। কাউন্টারের দিকে তাকাল সে। সকালের সেই স্বাস্থ্যবান লোকটি নেই। তার বদলে যে খদ্দেরদের দেখছে তাকে চিনতে পারল ভাস্কর। আজ সকালেই সে অজ্ঞান করে রেখেছিল। তার মানে শেরিংদের বাড়ির প্রহরী বদল হয়েছে। আরও শক্তিশালী এবং বিশ্বাসী লোক ওখানে

গিয়েছে পানশালা ছেড়ে।

বসার জায়গা না পেয়ে সে সামনে পা বাড়াতে বারম্যান মুখ তুলে তাকাল। লোকটার পক্ষে তাকে চেনা মোটেই সম্ভব হবে না। কারণ সে ওকে পেছন থেকে আঘাত করেছিল। কাউন্টারে পৌঁছে সে মেজাজে বলল, এ কেমন বার যেখানে বসার জায়গা পাওয়া যায় না! আমি কি দাঁড়িয়ে খাব? লোকটা তার চেরা চোখে দেখল, এরা সব রেগুলার কাস্টমার। দাঁড়িয়ে খেতে না ইচ্ছে হলে চলে যেতে পারেন।

আমি তো চলে যেতে আসিনি।

লোকটা একটু অবাক হয়ে ভাস্করকে দেখল। ভাস্কর বলল, ভেতরে তো অনেক ঘর দেখছি। তার একটায় চেয়ার নিয়ে বসতে পারি।

ওখানে বসার জায়গা নেই। খেতে হলে এখানেই, নইলে কেটে পড়ো। ঝামেলাবাজ লোকদের জন্যে আমার অন্য ব্যবস্থা আছে।

তাই নাকি? আমি ওই ঘরটায় বসব। ইঙ্গিতে কাউন্টারের পেছনের একটা ঘর দেখাল ভাস্কর।

কী? মেমসাহেবের ঘরে? চটপটে হাতে লোকটা কাউন্টারের নিচ থেকে একটা রবার জড়ানো রড বের করতেই ভেতর থেকে জুলি শেরিং বেরিয়ে এলেন, হোয়াটস দ্য প্রব্লেম?

বারম্যান কিছু বলার আগেই ভাস্কর বলল, আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।

হু দ্য হেল য়ু আর?

ভাস্কর আশ্বস্ত হল। যাক ভদ্রমহিলা হয়তো টুপি এবং স্থানের জন্যেই তাকে এখনও চিনে উঠতে পারেননি।

আপনার স্বামীর ইনসুরেন্স-এর ব্যাপারে কয়েকটা প্রশ্ন ছিল।

ইনসুরেন্স?

ভাস্কর পকেট থেকে আইডেন্টিটি কার্ডটা বের করে খুলে মহিলাকে দেখাল। এক মুহূর্ত দ্বিধা। তারপর জুলি শেরিং মাথা নেড়ে বললেন, ভেতরে আসুন। তারপরেই তিব্বতি ভাষায় কিছু নির্দেশ বারম্যানকে দিয়ে ভেতরের ঘরে চলে গেল। বারম্যান তখনও তীব্র চোখে ভাস্করকে দেখছে। ভাস্কর আর ইতস্তত না করে কাউন্টারের সুইংডোর খুলে ভেতরে পা দিল।

দরজায় এসে দাঁড়াতেই সে দেখল একটা বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপাশে বসে আছেন জুলি। তাকে দেখামাত্র উলটোদিকের একটা বেয়ারা ইশারা করে বলল, বসুন।

ভাস্কর দেখল ঘরে আর-একটা দরজা আছে। আসবাব বলতে ওই টেবিল আর কয়েকটা চেয়ার। দেওয়ালে এক টিবেটিয়ান বৃদ্ধের ছবি। সম্ভবত উনিই মিস্টার শেরিং। পাকানো জীর্ণ শরীর।

আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো!

এই টুপি এবং চামড়ার জ্যাকেট বিভ্রান্তি এনেছে। সে ধীরে টুপিটা খুলে টেবিলে রাখতেই জুলি চমকে উঠলেন, আরে আপনিই আজ বিকেলে একজন গুরুদেবকে সঙ্গে নিয়ে আমার বাড়িতে এসেছিলেন না?

ঠিকই।

আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। কোন পরিচয়টা সত্যি?

ওটা প্রমাণ করা মুশকিল হবে। আর এই আইডেন্টিটি কার্ড সম্পর্কে কোনও সন্দেহ থাকা উচিত নয় নিশ্চয়ই?

তখন প্রশ্ন করলেন না কেন?

তখন শুধু আপনাকে দেখতে গিয়েছিলাম। শুনুন, হেড-অফিস আমাকে পাঠিয়েছে। মিস্টার শেরিংয়ের নর্মাল মৃত্যুর খবর থাকা সত্ত্বেও হেড-অফিস নিজের লোক দিয়ে যাচাই করে নিতে চায়। কারণ টাকার অঙ্কটা মোটেই কম নয়। ভাস্কর অত্যন্ত তৎপর গলায় কথাগুলো বলে চোখের দিকে তাকাল।

ধীরে-ধীরে মাথা নাড়লেন জুলি, বুঝলাম। আমার স্বামীর অত্যন্ত স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। এখানে এক হলঘর মানুষ দেখেছে তিনি বুকের যন্ত্রণায় ঢলে পড়েছেন। কেউ তাঁকে আঘাত করেনি। ডাক্তার পরীক্ষা করে সেইরকম সার্টিফিকেট দিয়েছে। এখন আপনার কোম্পানি আমাকে টাকাটা দিতে বাধ্য। যদি তা না দেয় তা হলে আমি কেস করব।

কেসে আপনি জিতবেন কী হারবেন সেটা আমার ওপর নির্ভর করছে। কথাটা বলে উঠে দাঁড়াল ভাস্কর। তারপর দরজা পর্যন্ত গিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, প্রধান আমাকে একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন সে এখন কোথায়?

মুহূর্তেই জুলির মুখ মোমের মতো সাদা হয়ে গেল, কোথায়?

হাসপাতালে। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষছে।

প্রধান কী বলেছে আপনাকে? নির্লিপ্ত গলায় কথা বলতে পারছিলেন না জুলি।

আজ সকালে সে আপনার বাড়িতে গিয়েছিল।

ইয়েস। হি ইজ এ চিট্। থিফ। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন জুলি।

হতে পারে। কিন্তু আপনার বাড়িতে আর-একজনের অস্তিত্ব সে জানিয়েছে।

দাঁড়ান। ভাস্করের চোখের দিকে তাকিয়ে হেসে কাঁধ নাচালেন জুলি। তারপর বললেন, আমাকে ভয় দেখিয়ে কেউ পার পায়নি কিন্তু।

ভয় দেখাতে যাব কেন?

বেশ, কাল সকাল ন'টায় আমার ওখানে আসুন। ব্রেকফাস্ট করবেন। হঠাৎ জুলি প্রসন্ন মুখে নিমন্ত্রণ করলেন।

ঠিক আছে। তবে দয়া করে ইলেকট্রিক অফ করতে ভুলবেন না। প্রধান এই তথ্যটাও জানিয়েছে। নমস্কার।

লম্বা পা ফেলে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে কাউন্টারে দাঁড়াল। তারপর মদ্যপানরত মানুষগুলোর দিকে একবার তাকিয়ে সে হলঘর পেরিয়ে দরজা খুলে বাইরে এসে পদম বাহাদুরকে খুঁজল। কাঠের সাঁকোটা পার হয়ে আসামাত্র পদম শিস বাজিয়ে অস্তিত্ব জানাল।

পদমকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটছিল ভাস্কর। এখন অবধি যা অঙ্ক পাওয়া গিয়েছে তাতে বুঝতে অসুবিধে হয় না মিস্টার শেরিংকে কেউ খুন করেছে। এবং এই কেউটির মুখোশ খুলে পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভাস্করের মনে একটা খুঁতখুঁত ভাব থেকেই যাচ্ছিল। জুলি শেরিং জানেন এটা হত্যাকাণ্ড প্রমাণিত হলে সন্দেহটা তাঁর ওপরেই

প্রথম পড়বে। এবং সেটা জেনেও কেন তিনি বিষের শিশি এবং সিরিঞ্জ রেখে দিলেন বাড়িতে? হোক না লুকোনো জায়গায়, কিন্তু নষ্ট করলেন না কেন? দ্বিতীয়ত, বাড়িতে নিজের মেয়েকে অত্যন্ত গোপনে রেখে দিয়েছেন যা তাঁর আপাত-বন্ধু প্রধানও জানত না। যদি সত্যি তিনি প্রধানের সঙ্গে জড়িত থাকতেন তা হলে এই সত্য একদিন না একদিন ফাঁস করতেই হতো।

ঠিক এই সময় একটা গাড়ির শব্দ পাওয়া গেল। গাড়িটা তীব্র গতিতে ওপরে উঠে আসছে। পদম বলল, সরে আসুন সাহেব। আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে ড্রাইভারের মাথার ঠিক নেই। এই বলে সে রাস্তা থেকে এক পা উঁচুতে উঠে দাঁড়াল। ভাস্কর এবার আলোটা দেখতে পেল। এখানে পথ বেশি চওড়া নয়। দুপাশের পাড়াড় নেমে এসে পথটাকে যেতে দিয়েছে। আলোটা এ পাহাড় সে পাহাড় ঝেঁটিয়ে ওপরে উঠে সোজা হল। যেন বিশাল চোখে দুটো হায়না তেড়ে আসছে। ড্রাইভারের হাত কাঁপছে। পদম আবার চেঁচাল, হঠ যাইয়ে সাব।

এবং শেষ মুহূর্তে লাফ দিয়ে ওপরে উঠতেই গাড়িটা তীব্র গতিতে পাহাড়ের যে ধারে ওরা হাঁটছিল সেদিকটা ঘেঁষে তেড়ে এসে না পেরে ছিটকে এগিয়ে গেল সামনে। তখনই দড়াম করে একটা আওয়াজ এবং কাচ ভেঙে পড়ার শব্দ ছড়িয়ে পড়ল রাত্রে নিস্তব্ধতায়। পদমের চাপা গলা শোনা গেল, শালে শুয়ার কি বাচ্চা।

পাথরটা ছুড়েছে পদমই। সেটা গিয়ে সোজা আঘাত হয়েছে গাড়ির পেছনের কাচে। ড্রাইভার বোধহয় এইটে আশা করেনি, থতমত হয়ে ব্রেক কষতেই বোধহয় চেতনায় ফিরে এল। ভাস্কররা দৌড়ে যাওয়ার আগেই সে গাড়ি সমেত উধাও। পদম বলল, পাহাড়ে এইরকম খুবই হয়। মাল খেয়ে সব শালা আমজাদ হয়ে যায়। কিন্তু ইচ্ছে করলে কাল-পরশু এই গাড়িটাকে ধরা যাবে। কাচ পাল্টাতে ওকে গ্যারেজে যেতেই হবে। সাহেব যদি চান তাহলে এই কাজটুকু করতে পারি।

ভাস্কর মাথা নাড়ল, তোর দরকার হবে না। আমি পুলিশকেই বলব। তুই বরং একটা কাজ কর। সামনের বাঁকটা থেকে আড়ালে চলে যাবি। দেখবি কেউ আমার পিছু নিয়েছে কি না! যদি নেয় তাহলে দুপুরে যে হোটেলে খেয়েছিলাম সেখানে এসে আমাকে জানাবি। ঠিক আছে?

একটা কাজের মতো কাজ পেল যেন পদম। বাঁকটা আসামাত্র সে নিমেষের মধ্যেই অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। ভাস্কর পকেটে হাত ঢুকিয়ে একা বড়-বড় পা ফেলে হেঁটে আসছিল। এখন এই শহরটা আপাত চোখে ঘুমন্ত। শীত আরও বাড়ছে। কিন্তু ভাস্কর ভাবছিল, জুলি শেরিং এই ভুলটা করতে গেলেন কেন? নির্জন পথে গাড়ি চাপা দিয়ে কাউকে মারতে যাওয়া সব সময় সফল হবে এই রকম ভাবনা এল কেন মাথায়? এতক্ষণ জুলি সম্পর্কে তার যে দ্বিধাটা জন্মাচ্ছিল সেটা আবার ম্লান হয়ে এল। সঙ্গে-সঙ্গে দ্বিতীয় একটা চিন্তা কাজ করল, হয়তো গাড়িটা জুলি পাঠাননি। যে পাঠিয়েছে সে এখনও পর্দার আড়ালে রয়েছে। এমনও তো হতে পারে।

একসঙ্গে খাওয়া শেষ করে হোটেলে ফিরে এল ভাস্কর। পদমকে সে সকাল আটটায় হোটেলে দেখা করতে বলল। না, পদমের রিপোর্ট অনুযায়ী তাকে কেউ অনুসরণ

করেনি। পদম এ ব্যাপারে খুব নিঃসন্দেহ। তাছাড়া যেসব চোর-বাটপাড়-গুণ্ডা এসব কাজ করে তাদের নাড়িনক্ষত্র পদম জানে। তাদের কাউকেই পদম দ্যাখেনি শুধু সাহেব চলে আসার পর একজন মহিলা গাড়ি নিয়ে উঠে এসেছিল। সেটা সাহেব চলে আসার পনেরো মিনিট পরে। ভাস্কর তাকে দ্যাখেনি। হয়তো সে ততক্ষণে শহরের তেমাথা পেরিয়ে চলে এসেছে।

অতএব এইটুকু ধরে নেওয়া যায় কেউ তার পেছনে আসেনি যখন-তখন আজকের রাত্রের মতো সে নিরাপদ। হোটেলে ঢুকতেই রিসেপশনের সামনের চেয়ারে শাজাহানকে বসে থাকতে দেখল ভাস্কর। ওকে দেখা মাত্র শাজাহানের যেন প্রাণ ফিরে পেল, ওরা আপনার পথ চেয়ে বসে আছে।

ভাস্কর হেসে ফেলল, কোনও মেয়ে যা করে না আপনি তাই করলেন?

ইয়ার্কি না। আমাকে তো আজ থেকে যেতে বললেন। বিকেলে একটু মদের সন্ধানে বেরিয়েছিলাম এসে দেখি গুরুদেব হাওয়া আর তার জায়গায় একটা বিশাল তিব্বতি শুয়ে জপ করছে। উঃ, কী মারাত্মক চাহনি। আর আমার ব্যাগ থেকে মাত্র দশটা টাকা রেখে তিনি সব নিয়ে গিয়েছেন। প্রায় কেঁদে ফেলল শাজাহান।

পুলিশে জানিয়েছেন?

দূর! পুলিশ গুরুদেবের কী করবে?

করবে। কারণ আপনার গুরুদেব যখন হোটেলে ফিরেছেন তখন কোনও বাস নিচে নামে না। আমার মনে হয় না তিনি নিজে একটা গাড়ি ভাড়া করে রাত্রের পাহাড়ি পথে নামবেন। অর্থাৎ এই শহরে খুঁজলেই তাকে পাওয়া যাবে। আচ্ছা, চলুন আমি আপনার সঙ্গে যাচ্ছি।

শাজাহানকে নিয়ে বেরিয়ে এল ভাস্কর। বেচারার অবস্থা খুব কাহিল। কাল সকালে হোটেল থেকে বেরুবারও উপায় নেই। বিল মেটানোর পয়সা নেই। এরপর গাড়ি ভাড়া আছে। লোকটার ওপর প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল ভাস্করের। সম্মোহন করে টাকা আদায় করে খুশি হয়নি, এই ছ্যাঁচড়ামো পর্যন্ত করলে।

অনিল মিত্র সব ব্যাপারটা শুনে জিগ্যেস করলে, এই রকম একটা লোক তোমার হোটেলে ছিল বিকেলে বললে না কেন?

তখন তুমি একটা প্রব্লেম নিয়ে ছিলে আর আমারও মাথায় আসেনি। বাট আই অ্যাম সিওর ও এই শহরে এখনও পর্যন্ত আছে।

তুমি লোকটার যে বিবরণ দিলে তাকে আমি কিছুক্ষণ আগে হাসপাতালে দেখেছি। যদি আমার ভুল না হয়ে থাকে—। অনিল মিত্রকে চিন্তিত দেখাল।

হাসপাতালে? ভাস্কর অবাক হল।

হ্যাঁ। আজ একটা কেস পেয়েছি। পাহাড় থেকে ফেলে দিয়েছে— ওহো, তুমি তো জানো, সেই স্পটেই দেখা হল। তোমাদের বিবরণমাফিক লোকটি হাসপাতালে গিয়ে অনুরোধ করেছিল সে পেশেন্টকে একবার দেখতে চায়। ওর জ্ঞান তখনও ফেরেনি বলে দেখতে দেওয়া হয়নি। ও যখন গিয়েছিল তখন আমি হাসপাতালে ছিলাম। বাই দ্য বাই, ছেলেটির পরিচয় তুমি জানো? অনিল মিত্র সরাসরি প্রশ্ন করল।

ভাস্কর এত তাড়াতাড়ি নিজেকে প্রকাশ করতে চায়নি। অথচ সোজাসুজি মিথ্যে কথা বলতেও খারাপ লাগছিল, তুমি তো বলেছিলে চেনা মানুষ।

হ্যাঁ। এই শহরের একজন নামকরা রোমিও। কাজ করে ভালো। ইনফ্যাক্ট তোমাদের কলিগ বলতে পারো।

কলিগ? যতটা সম্ভব বিস্ময় দেখাল ভাস্কর।

হ্যাঁ। তোমাদের ইন্সুরেন্স ডিপার্টমেন্টের স্থানীয় এক কর্তা ওই ছোকরা। সম্প্রতি এক বিধবা টিবেটিয়ান মহিলার সঙ্গে মাখামাখি হচ্ছিল। মহিলা একটু রহস্যময়ী।

রহস্যময়ী এই কারণে যে তিনি বাইরের কারও সঙ্গে মেশেন না। স্বামী বেঁচে থাকলেও ওঁদের মদের দোকান আর বাড়ি ছাড়া মাঝে-মাঝে গাড়ি নিয়ে নির্জন পাহাড়ে একা বসে থাকেন। সো শি ইজ টিবেটিয়ান কিন্তু তাঁকে দেখলে মনে হবে শি ইজ ফ্রম হলিউড।

হাসল অনিল।

ফেরার পথে হাসপাতালে এল ওরা। না এখনও প্রধানের জ্ঞান ফেরেনি। হেড-ইনজুরি। ডাক্তার বলছেন বাহাত্তর ঘণ্টা না গেলে কোনও ভবিষ্যৎবাণী করা সম্ভব নয়। ভাস্কর দেখল যে ব্লকে প্রধান রয়েছে তার বারান্দায় দুটো সেপাই পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে। যারা বুদ্ধিমান তাদের পক্ষে ওদের কাঠের পুতুল বানিয়ে দেওয়া অসম্ভব নয়। প্রধানের প্রাণনাশের চেষ্টা হলে আটকাবে কে? তবে ও বেঁচে থাকলেও বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে কোনও সাহায্যে আসবে না। বাহাত্তর ঘণ্টা অনেক দীর্ঘ সময়। যা করার এর মধ্যেই করতে হবে।

থানা-পুলিশ করে শাজাহান সেন একটু ভরসা পেয়েছিল। ভাস্কর অনিল মিত্রকে দিইয়ে বলিয়েছে লোকটাকে আগামীকালই খুঁজে বের করা হবে। তাছাড়া ওর কাছে যদি টাকা নাও পাওয়া যায় তাহলে পুলিশের অয়্যারলেসের মাধ্যমে শাজাহানের বাড়িতে খবর দেওয়া যাবে টাকা পাঠিয়ে দিতে। দু-তিনদিন আরও থেকে যেতে হবে সেক্ষেত্রে। ভালোই হবে এতে। কারণ শাজাহান স্বীকার করল এতবার সে এসেছে কখনই দ্রষ্টব্য জায়গাগুলো দেখা হয়নি। মদ খেতে-খেতেই তার সময় গিয়েছে। এখন যে দুদিন অপেক্ষা করতে হবে তাতে তো মদ খাবার পয়সা থাকবে না, সুযোগটা কাজে লাগানো যাবে। তবে ওই টিবেটিয়ান রুমমেটকে নিয়ে থাকা— এটাই প্রধান সমস্যা।

শাজাহানকে হোটেলে পাঠিয়ে ভাস্কর রাস্তা পালটাল। ওর কেবলই মনে হচ্ছিল গুরুদেব জুলি শেরিংয়ের বাড়িতে যাবেন। ব্ল্যাকমেল করা যার নেশা সে এই সুযোগ ছাড়বে না। আরও কিছু খবরের জন্যে প্রধানকে কথা বলাতে চেয়েছিল নিশ্চয়ই। লোকটা জেনেছে ইন্সুরেন্সটা যদি হেড অফিস অনুমোদন না করে তাহলে জুলি প্রধানকে বিয়ে করবে না। এর মানে ব্যাপারটায় কিছু ভাঁওতা আছে। আর জুলি যে ফেলে দিয়েছে ছেলেটিকে সেটাও লোকটা কোনও আড়ালে থেকে চাক্ষুষ করতে পারে। অতএব নিশ্চয়ই এতক্ষণে লোভের সাপ ফণা তুলেছে। পৃথিবীর যে কোনও নেশার চেয়ে যা মারাত্মক।

পথ নির্জন। ঠান্ডাটা বাড়ছে শুরু করে। রাস্তার আলোগুলোকে কুয়াশায় ডাইনির চোখের মতো দেখাচ্ছে। দু-পকেটে ভাস্করের হাত, এক হাতে রিভলভারের স্পর্শ। পদমটাকে ছেড়ে না দিয়ে সঙ্গে আনলে ভালো হতো।

প্রধানের কাণ্ডটা যেখানে ঘটেছিল সেখানে এখন কোনও চিহ্ন পর্যন্ত নেই। এই শহরে বোধহয় রাত ঘনালে গাড়ি করেও মানুষ বের হতে চায় না। বাঁক ঘুরতেই জুলির বাড়িটা চোখে পড়ল। ছবির মতো চুপচাপ। কোথাও কোনও আলো জ্বলছে না। গুরুদেব যদি এসে থাকেন তাহলে তো এতক্ষণে আলো জ্বলা উচিত ছিল। কারণ জুলির গাড়িটা বাড়ির সামনে দেখা যাচ্ছে। নিজেকে আড়ালে রেখে প্রায় আধঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকল ভাস্কর। না, বাড়িটায় কোনও মানুষ জেগে আছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। আর থাকলেও গুরুদেব নেই। জুলি শেরিং আলো নিভিয়ে গুরুদেবের সঙ্গে কথা বলার পাত্রী নয়।

ঘুম ভাঙল একটু দেরিতে এবং দরজায় শব্দ হওয়ায়। ভাস্কর খানিকটা সময় নিয়ে দরজা খুলতে দেখল একজন সেপাই দাঁড়িয়ে আছে খাম হাতে। ওর নাম জিগ্যেস করে খামটা দিয়ে চলে গেল সে। খানিকটা অবাক হয়ে সে চিঠিটা বের করল। অনিল মিত্র জানিয়েছে লোকটির হদিশ পাওয়া গিয়েছে। সে উঠেছে একটা প্রাইভেট গেস্ট হাউসে। তবে জিনিসপত্র রেখে সন্ধে নাগাদ সেই-যে বেরিয়েছে এখনও ফেরেনি। ফিরলেই ওকে ধরে ফেলা যাবে। আর হ্যাঁ, প্রধানকে বাঁচানো যায়নি। কাল রাত তিনটে নাগাদ অজ্ঞান অবস্থায় সে মারা গিয়েছে। পোস্ট-মর্টেমের জন্যে বডি রেখে দেওয়া হয়েছে।

ঠোঁট কামড়াল ভাস্কর। একজন সাক্ষি চলে গেল। মৃত্যুটা কি আঘাত-জনিত না নতুন কোনও প্রচেষ্টায় সেটা চিঠিতে বোঝা যাচ্ছে না। আর এই গুরুদেবটি কোথায় গেলেন জিনিসপত্র ফেলে। ওর এক সিড়িঙ্গে শিষ্য ছিল, সে-ই বা কোথায়? ঘড়ি দেখল ভাস্কর। সর্বনাশ। ন-টা বাজতে আর বেশি দেরি নেই। এই পাহাড়ি শহরগুলোর আবহাওয়া বড্ড সময় আড়াল করে রাখে। আর রোদ নেই। সকালটা শুরু হয়েই যেন সন্ধে হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই মাথার ওপর বড্ড বেশি মেঘের চলাফেরা চলছে এখন।

ঠিক পাঁচ মিনিট আগে জুলি শেরিংয়ের বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে গেল ভাস্কর। পদম বাহাদুর তার পেছনে। ও ঠিক সময়ে সঙ্গ নিয়েছে। শাজাহানবাবু বেরিয়েছে পর্যটনে। পদমকে যা বোঝাবার এতটা পথ চলার সময় বুঝিয়ে দিয়েছে ভাস্কর। জুলি শেরিংয়ের বাড়িটা চোখে পড়া মাত্র সে পাহাড়ের আড়ালে চলে গেল এমন একটা জায়গা খুঁজে নিতে যেখান থেকে দেখা এবং শোনার দুটো কাজই চমৎকার চলে।

সাদা পুলওভার এবং স্টোন-ওয়াশ প্যান্টে নিজের চেহারাটা যে আরও খুলেছে এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ ছিল ভাস্কর। হোটেলের বুড়িটা তো বটেই এই পদমটা পর্যন্ত তার দিকে ঘুরে-ঘুরে তাকিয়েছে। কী দেখছে জিগ্যেস করায় বলেছিল, সাহেব, অনেক নাম-করা ফিল্মস্টার এখানে আসে শুটিং-এর জন্যে, তারাও তোমার কাছে এখন হার মেনে যাবে।

ভাস্কর সুপুরুষ। তবে কিছু-কিছু পোশাক তাকে আরও আকর্ষণীয় করে এ তথ্য তার জানা। একজন সুন্দরী মহিলার কাছে আসতে হলে নিজের চেহারা খোলতাই করাই উচিত। এবং তখনই ওর সেই মেয়েটিকে মনে পড়ল। কাল থেকে প্রায়ই ওকে মনে পড়ছে। এভাবে কোনও মেয়ে তাকে কখনও টানেনি। কিন্তু জুলি যদি হত্যাকারী হয় বা মেয়েটির যদি এদেশে আসার ভিসা না থাকে তাহলে সে কী করতে পারে? ভাস্কর

প্রার্থনা করছিল ওই দুটোই যেন বেঠিক হয়।

গেট খুলে ভেতরে ঢুকল সে। বেশ ঘন ছায়া বাগানে। সকাল ন'টায় মেঘ নেমে এসেছে মাথার ওপরে। বৈদ্যুতিক তারের জায়গাটায় এসে সে সতর্ক হল। সেই সময় দরজা খুলে গেল। এবং ভাস্করের সমস্ত শরীরে আর এক রকমের বিদ্যুৎ প্রবাহিত হল। জুলি শেরিং দরজা খুলে আশ্চর্য রকমের মিষ্টি হাসি হাসলেন তার দিকে চেয়ে। মহিলার বয়স বোঝাই যাচ্ছে না। অতিরিক্ত রকমের ছোট একটা লাল শর্টস্ আর দুধেল গেঞ্জি ওঁর পরনে। পায়ে ঘাসের চটি। চোখে নীল হরিণচোখো চশমা। মাথার চুল ফুলে-ফেঁপে মেঘ হয়ে দুলছে। যদিও মেঘের জন্যে ঠান্ডা আজ কম কিন্তু এত ছোট প্যান্ট পরার মতো আবহাওয়া নয়। তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জুলি হাসলেন আবার, হা-ই!

ভাস্কর পা ফেলল। লুকনো তারে যদি বিদ্যুৎ থাকত তাহলে জুলি নিশ্চয়ই ওকে ডাকতেন না। এগিয়ে যেতে সে বলল, হ্যালো!

ঘরের ভেতরে ঢুকে জুলি বললেন, আপনার দেখছি চমৎকার সময়জ্ঞান। এখন ঠিক নটা।

ভাস্কর জুলির দিকে না তাকিয়ে সোফায় বসতে যাচ্ছিল। এই মহিলার বয়স সে জানে, কিন্তু দেখছে তার সঙ্গে কিছুতেই মেলে না। সব মেয়ের শরীরে চুম্বক থাকে না। ঈশ্বর কাউকে-কাউকে সেটা দীর্ঘকালের জন্যে লিজ দিয়ে দেন। জুলি সেইরকম। আজকের এই পোশাক, উন্মুক্ত দীর্ঘ উরু এবং পায়ের গোছ যা কিনা শঙ্খের চেয়ে সুন্দর, না দেখলে সে এর হদিশ পেত না। এই মহিলার কী করে অত বড় মেয়ে থাকতে পারে?

সোফায় বসার আগেই জুলি বাধা দিলেন, ওঃ নো! আজকের এমন আবহাওয়ায় এই বন্ধ ঘরে আমার দম বন্ধ হয়ে আসবে। আমার সঙ্গে অন্য একটা ঘরে আসা হোক। সেখানে অন্তত অবাঞ্ছিত অতিথিরা আমাদের বিরক্ত করতে আসবে না। প্লিজ। বলার ভঙ্গিতে এমন একটা আদুরে ভঙ্গি আনলেন জুলি যে ভাস্কর নিজের হৃদ্‌স্পন্দন অনুভব করল। কিন্তু অন্য ঘর কেন? সেই গুন্ডা টাইপের বারম্যানটা কি কাছে-পিঠে ওৎ পেতে আছে। সে পকেটে হাত ঢুকিয়ে উঠে দাঁড়াল। রিভলভারের স্পর্শ তাকে অনেকটা নিরাপত্তাবোধ ফিরিয়ে দিল। জুলি শেরিং তখন চলতে শুরু করেছেন। টাইট খাটো লাল শর্টস তাঁর ভারী নিতম্বকে শাসন করার নিষ্ফল চেষ্টা চালাচ্ছিল। এই দৃশ্যের সামনে পৃথিবীর সেরা সন্ন্যাসীকেও সমস্যায় পড়তে হবে। কেন যে সেকালে মুনিঋষিদের মতিভ্রম হতো আজ বোঝা গেল।

জুলি তাকে যে ঘরটায় নিয়ে এলেন তার তিনদিকে কাচের দেওয়াল, ছাদেও স্বচ্ছ কাচের টালি। দেওয়ালের কাছে এমন একটা ঘষা ভাব আছে যা দেখলেই ভাস্কর বুঝল বাইরে থেকে ভেতরটা দেখা যাবে না, সে স্পষ্ট বাগান এবং আকাশের মেঘ দেখতে পেল। এখানে বেতের হেলানো রঙিন চেয়ার যাতে নরম কুশন দেওয়া। তার একটায় জুলি বসলে মুখোমুখি বসল ভাস্কর। আশ্চর্য, চারদিক বন্ধ মনে হচ্ছে তা সত্ত্বেও একটা হিমেল বাতাস পাক খাচ্ছে এই ঘরে। সত্যি, জুলি এই পোশাকে সামনে না বসলে দম বন্ধ হওয়ার কোনও কারণ নেই।

দুটো পা আড়াআড়ি ভাঁজ করে জুলি বললেন, দুঃখের খবরটা নিশ্চয়ই শুনেছেন? প্রধান মারা গেছে।

চমকে তাকাল ভাস্কর। এই সংবাদ জুলি পেয়ে গেছেন?

জুলি হাসলেন, আজ সকালে আমি ফুল দিতে গিয়েছিলাম। বেচারা। যাক্ ব্রেকফাস্ট আনতে বলি?

একটু পরে। ভাস্কর কোনও রকমে উচ্চারণ করল।

আপনাকে আজ খুব হ্যান্ডসাম দেখাচ্ছে। রিয়েলি, অনেককাল পরে আমি একজন সুপুরুষ দেখলাম। আশঙ্কা করছি আপনার বান্ধবীর সংখ্যা আপনি নিজেও জানেন না। ঠোঁটে আলতো হাসি জুলি।

ভাস্কর বুঝতে পারছিল ক্রমশ তার ওপর প্রভুত্ব কায়েম করে যাচ্ছে জুলি। এ আর-এক সম্মোহন। এখনই কাজের কথায় আসা উচিত। সে বলল, মিসেস শেরিং—!

বলো জুলি। নামটা মিষ্টি নয়?

ওয়েল, জুলি। আমার কোম্পানি মনে করে মিস্টার শেরিংয়ের মৃত্যু স্বাভাবিকভাবে হয়নি। প্রধান আমাকে সে তথ্য দিয়েছে—।

সে তথ্য আর কাজে লাগবে না। হি ইজ ডেড। আচমকা উত্তেজিত হয়ে উঠে বসলেন জুলি, আপনার কী জিজ্ঞাস্য আছে তাই বলুন।

হাসল ভাস্কর। জুলি যত উত্তেজিত হবেন তত ভালো। সে প্রশ্ন করল, কোনও সাধারণ মানুষ তার বাড়ির চারপাশে ইলেকট্রিক অয়ার লুকিয়ে রাখে না। আপনি কেন রেখেছেন?

তার সঙ্গে মিস্টার শেরিংয়ের মৃত্যুর কী সম্পর্ক?

আমি আসছি সে প্রসঙ্গে। জবাব দিন।

এইটে আপনার এক্তিয়ারের বাইরে। কিন্তু আপনাকে আমার ভালো লেগেছে। সুতরাং আমি কথা বলছি। যেভাবে উত্তেজিত হয়েছিলেন প্রায় সেই ভাবেই শান্ত হয়ে গেলেন জুলি, আমার বাড়িতে একজোড়া বুদ্ধ মূর্তি আছে। যেটাকে আপনি বাইরের ঘরে দেখেছেন সেটা নকল। আসলটি ভিতরে। ওই মূর্তিটির ওপর অনেক টিবেটিয়ান এবং আমেরিকানদের লোভ আছে। এর আগে কয়েকবার চেষ্টা হয়েছিল মূর্তিটি চুরি করার। স্রেফ সিকিউরিটির জন্যে ওই অয়ার লাগিয়েছি। এবং এটা পুলিশের অনুমতি নিয়ে।

পুলিশ আপনাকে অনুমতি দিয়েছে!

হ্যাঁ, রাত এগারোটা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত।

কিন্তু প্রধান বলেছে সকালেও, আপনি বাড়ি না থাকলে ওটা চালু থাকে।

হয়তো ভুলে অফ্ করা হয়নি।

আপনার মেয়ের লিগ্যাল পেপারস আছে এদেশে থাকার?

আমার মেয়ে? এখানে আমার মেয়েকে আপনি কোথায় পেলেন?

এই বাড়িতে একটি তরুণী নেই? চোখে চোখ রাখার চেষ্টা করল ভাস্কর কিন্তু চশমার দেওয়াল কী করে ডিঙোবে সে?

আমি ছাড়া এখানে কোনও মহিলা থাকে না। অবশ্য আমি জানি না আপনি আমাকে তরুণী বলতে চাইবেন কি না? মদির হাসি হঠাৎ ঝরনার মতো ছিটকে উঠল।

মিথ্যে কথা বলছে। ভাস্কর নিজের মনে বলল। সে যে চাক্ষুষ করে গেছে সেটা

তো ইনি জানেন ⋯ সে হাসল, কথাটা কি সত্যি?

প্রধান আপনাকে ভুল তথ্য দিয়েছে।

আমি যদি বাড়িটা ঘুরে দেখতে চাই?

স্বচ্ছন্দে। ঠোঁট কামড়ালেন জুলি।

একটু অবাক হল ভাস্কর। এতটা আত্মবিশ্বাস নিয়ে কী করে কথাটা বললেন জুলি? মেয়েটি যদি এই বাড়িতে থাকে? হঠাৎ তার মনে হল, ওকে এখানে থেকে গত রাত্রে সরিয়ে দেওয়া হয়নি তো? না, খুঁজতে চাওয়া বোকামি হবে। সে হেসে বলল, বিশ্বাস করলাম।

খুশি হলেন জুলি, বিশ্বাসই দুটো মানুষকে কাছে আনে। আপনার নামটা পড়েছি। কিন্তু কোথায় থাকেন তা জানি না।

কলকাতায়।

ওহ্! কী করে থাকেন? চিৎকার গোলমাল! বিবাহিত? প্রসঙ্গান্তরে দ্রুত চলে যাওয়ার দক্ষতা দেখে ভালো লাগল ভাস্করের, নাঃ। এখনও সময় করে উঠতে পারিনি। মিস্টার শেরিং কোন সাপের বিষ পছন্দ করতেন?

মুহূর্তেই আবার রক্ত জমল মুখে, সেটা মিস্টার শেরিং জবাব দিতে পারতেন। আমি ওঁর স্ত্রী, তার মানে এই নয় আমাকে সব খবর জানতে হবে।

ঠিকই। মাথা নাড়ল ভাস্কর, যদি আপনি নামচে বস্তিতে সেই বুড়ো সাপুড়ের কাছে বিষ আনতে না যেতেন তাহলে আপনার কথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ থাকত। তাই না?

এবার স্প্রিং-এর মতো লাফিয়ে উঠে বেশ জোরে হেসে উঠলেন মহিলা। তারপর একেবারে ভাস্করের সামনে দাঁড়িয়ে ঈষৎ ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে দিলেন, বুদ্ধিমান মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে আমার চিরকাল ভালো লাগে। যত দেখছি, যত শুনছি তত আমার ভালো লাগাটা বাড়ছে। হাত মেলান, সব কথা বলছি।

ভাস্কর চোখ তুলতেই ঝুঁকে পড়া জুলির গেঞ্জিকে হাঁসফাস করতে দেখল। সম্মোহিতের মতো সে হাতে হাত মেলাতেই জুলি সোজা হয়ে বললেন, গুড। শুনুন, আমার স্বামী নেশা করতেন। প্রথমে মদ। তারপর গাঁজা। তারপর পাউডার। আমাদের বয়সের পার্থক্য ছিল বটে কিন্তু এই নেশার জন্যে আমাদের দাম্পত্য জীবন বলতে কিছু ছিল না। শেষপর্যন্ত ছোট সাপের ছোবল নিতেন। তাতেও নেশা ফিকে হয়ে গেলে শঙ্খচূড় সাপের বিষ ইনজেকশনের মাধ্যমে শরীরে নিতেন। কিন্তু উনি মারা গেছেন স্রেফ হার্ট-অ্যাটাকে। দু-বার উনি আমাকে বাধ্য করেছিলেন সেই সাপুড়ের কাছে যেতে। কিন্তু এসব আপনি ওঁর মৃত্যুর কারণ হিসেবে আদালতে প্রমাণ করতে পারবেন না। ডাক্তার যে ডেথ-সার্টিফিকেট দিয়েছেন তাতে এসবের উল্লেখ নেই।

ভাস্কর মাথা নাড়ল। সব ঠিক। শুধু শেষ সত্যটি বললেন না মহিলা। জুলি এগিয়ে এলেন এবার। একটা হাত আলতো করে তুলে দিলেন ভাস্করের কাঁধে, বিশ্বাস করুন আমাকে। এই দেশে এসে এখন আমি একা। ওই টাকাটা আমাকে নিরাপত্তা দেবে। আপনি আমার কথাও ভাবুন।

কী ভাবতে হবে বলুন?

আপনি আমার পাশে দাঁড়ান।

তারপর?

আপনাকে আমার ভালো লেগেছে।

আমারও। বলে উঠে দাঁড়াল ভাস্কর। সঙ্গে-সঙ্গে অত্যন্ত খুশিতে তার একটা হাত তুলে নিয়ে তাতে নিজের গালে চেপে ধরে চোখ বন্ধ করে একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলতেই ভাস্কর বলে উঠল, কেউ আসছে।

আসুক।

আমরা বোধ হয় বড্ড তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাচ্ছি। ঝড়ে কিছুই নড়ে না।

উঁহু, আমি ওসব থিওরিতে বিশ্বাস করি না। যখন হওয়ার হয় তখন যে-কোনও ভাবেই তা হতে পারে। জুলির চোখ বন্ধ তখনও।

সেই সময় পেছনের দরজার দিকে চোখ যেতেই মনে হল কিছু একটা সরে গেল সেখান থেকে। তাদের কেউ লক্ষ করছে? একটা শব্দ হচ্ছিল যেন তখন থেকে এক নাগাড়ে। সে তাকাতেই শব্দটা থেমে গেল। এবার যেন শরীরে সাড় ফিরে পেল ভাস্কর। বেচারা প্রধান বোধহয় এই ভাবেই ভুল করেছিল।

সে ধীরে-ধীরে হাতটা ছাড়িয়ে নিল, আমি এবার বাড়িটা ঘুরে দেখতে চাই। আপত্তি নেই তো এখন?

নিশ্চয়ই না। কিন্তু এখনও কি অবিশ্বাসের কারণ আছে?

আমার চোখ এবং কানের মধ্যে কোনও ফারাক রাখতে চাই না। আসুন। খানিকটা অনিচ্ছায় জুলি তাকে পেছনের দরজায় নিয়ে এল। তারপর একটার পর একটা ঘর। কোথাও মানুষের চিহ্ন নেই। জুলির শোয়ার ঘরে এসে ভাস্কর বলল, মিস্টার শেরিংয়ের জিনিসপত্র এখানে দেখছি না কেন? মনে হয় ভদ্রলোক এই বাড়িতেই থাকতেন না।

বাজুতে চিমটি কাটলেন আলতো করে জুলি, আমার শোয়ার ঘরে ও কেন থাকবে? বলেছি না আমাদের দাম্পত্য জীবন ছিল না।

বাড়িতে কেউ নেই?

এ প্রশ্ন কেন?

কাউকে দেখছি না। অথচ তখন বললেন ব্রেকফাস্ট আনতে বলব? কাকে আনতে বলতেন?

ও। আমাদের ওপাশে একটা আউটহাউস আছে। এখন এই বাংলোয় আমি— আমরা একা। একটা চোখ ঈষৎ কাঁপল জুলির।

আমি একবার মিস্টার শেরিংয়ের ঘরে যাব।

ওঃ ভাস্কর! বিলিভ মি প্লিজ। এসো।

প্রায় টানতে-টানতে চতুর্থ ঘরে নিয়ে গেল জুলি তাকে। এই সেই ঘর। দেওয়াল ভর্তি বই। তলায় কার্পেট। সে জিগ্যেস করল, এইসব বই কে পড়তেন? মিস্টার শেরিং?

না। বাড়িটা ছিল হ্যারল্ড টমসন নামে একজনের। সে আমাদের এটা বিক্রি করে চলে গেছে অস্ট্রেলিয়ায়। বইগুলো নিয়ে যায়নি। মিস্টার শেরিং এখানেই শুতেন যখন বাড়িতে থাকতেন।

ওই বইগুলো তিনি পড়তেন না?

যে লোকটা চব্বিশ ঘণ্টা নেশায় ডুবে থাকত তার বই পড়ার সময় কোথায়? আর আমি অত পুরোনো মোটা বইতে ইন্টারেস্টেড নই।

আপনাদের সেই দ্বিতীয় বুদ্ধমূর্তি কোথায়? দেখলাম না তো!

আমার ঘরে একটা সুটকেসে রাখা হয়েছে। আমি বাইরে রাখতে সাহস পাই না। মিস্টার শেরিং ওইটে আমার হাতে তুলে দিয়ে বলেছিল এই মূর্তির ইজ্জত রেখো আর এই বাড়ি বিক্রি করো না।

নিয়ে আসুন মূর্তিটা। হুকুমের ভঙ্গিতে কথাগুলো বলল ভাস্কর। এই বাড়ি বিক্রি করো না। কথাটার মধ্যে কোনও তাৎপর্য ছিল, না জুলি বানিয়ে বললেন। জুলি দুটো মিথ্যে বলছেন। এক, কাল অন্য মেয়ে এখানে ছিল, দুই আজ এই বাড়িতে আর কেউ আছে যার অস্তিত্ব তার অনুভূতিতে সে টের পাচ্ছে। জুলি খানিকটা বিরক্ত হয়ে পাশের ঘরে চলে গেছেন মূর্তিটা আনতে। হঠাৎ ভাস্করের মনে এল, জুলি কি এই ঘরে যে লুকনো গর্ত আছে তার হদিশ জানে না? সে একটা বাক্স ওখান থেকে নিয়েছে কিন্তু আর একটা কাঠের বাক্স গর্তে ছিল। তাতে কী আছে? ঠিক তখনই জুলি সামনে এসে দাঁড়ালেন। ঠিক দরজার ফ্রেমে। ওঁর হাতে চমৎকার এক বুদ্ধমূর্তি। কালো পাথরের খোদাই করা, নিখুঁত। জুলি বললেন, এইটে আমাদের পারিবারিক সম্পদ। এর ওপর লোভ অনেকের। বিশ্বাস হল? ভাস্কর এগিয়ে গিয়ে মূর্তিটি স্পর্শ করতে যেতেই জুলি এক পা পিছিয়ে গেলেন, নাঃ। এই পরিবারের বাইরের কারও একে স্পর্শ করার অধিকার নেই। ওঁর গলার স্বরে প্রতিরোধ।

ঝুঁকে দেখতে লাগল ভাস্কর। স্পর্শ না করে যতটা দেখা যায়। এবং ঠিক তখনই জুলির শরীরের পাশ দিয়ে ওপাশের ঘরের দেওয়ালটা চোখে পড়ল। দেওয়ালের গা জুড়ে বিশাল পর্দা। পর্দার তলায় দুটো চামড়ার জুতো। একটা জুতো সামান্য নড়ল। ভাস্কর অনেক চেষ্টায় নিজের ভাবান্তর প্রকাশ করল না। ছায়াটার হদিশ পাওয়া গেল। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, এই মূর্তির দাম কত?

অন্তত তিন লক্ষ ডলার। কিংবা তারও বেশি হতে পারে।

তিন লক্ষ ডলার? আমি এইরকম একটা মূর্তির খবর জানি যা দশ লাখ ডলারে বিক্রি হয়েছিল লস-এঞ্জেলসের এক নিলামে। এটা বিক্রি করলেই তো আপনি বড়লোক। ইনসুরেন্সের ওই টাকা তো এর কাছে সামান্য। তাই না?

এটা বিক্রি করা অসম্ভব। কিন্তু ওই টাকাটা আমার চাই। আর সেই ব্যাপারে আপনি আমাকে সাহায্য করবেন। যাই, এটাকে রেখে আসি। জুলি পেছন ফিরে এগিয়ে যেতেই ভাস্কর আবার জোড়া জুতোর দিকে তাকাল। পর্দার আড়ালে জুতোজোড়া সরে-সরে যাচ্ছে। ভাস্কর যতটা সম্ভব নিজেকে আড়াল করে দাঁড়াল দরজার পাশে। আর সেই সময় টিবেটিয়ানটির মুখ বেরিয়ে এল পর্দার ফাঁক দিয়ে। উঁকি মেরে সে এই দরজার দিকে একবার দেখে চোখের পলকে ঢুকে গেল জুলির ঘরে। লোকটা যে গেল কিন্তু এতটুকু শব্দ হল না। এই লোকটিকেই সে দেখেছিল প্রথমদিন পানশালার কাউন্টারে। সেই সময় জুলি ফিরে এলেন নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে।

ভাস্কর প্রশ্ন করল, আচ্ছা, ওই মূর্তিটার কথা আপনার পরিচারকরা জানে? ওর দামের কথা?

না। দামের কথাও জানে না। তবে জানে ড্রইংরুমের মূর্তিটাই মূল্যবান।

ওরাও তো এটা চুরি করতে পারে!

না। ওরা বিশ্বস্ত। তা ছাড়া, ওরা জানে না আমি কোথায় রেখেছি মূর্তিটাকে। হাসলেন জুলি।

ঠিক নয়। এই মুহূর্তে আপনার ঘরে একজন ঢুকেছে। যাকে আপনি পাহারা দেওয়ার কাজে আপনার পানশালা থেকে আনিয়েছেন। জুলি আপনি আমার কাছে মিথ্যে কথা বলছেন।

ঠোঁট কামড়ালেন জুলি। তারপর বলল, এ থেকে প্রমাণ হয় না আমার স্বামীর মৃত্যু অস্বাভাবিক।

কিন্তু ওই মূর্তি এই মুহূর্তে চুরি হয়ে যেতে পারে জুলি!

নাঃ। বলেই জুলি দৌড়ালেন। কিন্তু দু-পা যেতে না যেতেই থমকে দাঁড়ালেন। বুটজোড়া এবার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। তার এক হাতে কালো পিস্তল। অন্য হাতে কাগজে মোড়া প্যাকেট।

জুলি চিৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়তেই সে বিদ্যুৎগতিতে সরে দাঁড়াল। তারপর পিস্তলটা ভাস্করের দিকে উঁচিয়ে ধীরে-ধীরে দ্বিতীয় দরজার দিকে এগিয়ে গেল। জুলি মরিয়া হয়ে তেড়ে আসছিলেন কিন্তু তার আগেই লোকটা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

জুলি এবার চিৎকার করে উঠলেন, বিশ্বাসঘাতক! ওকে আমার আনাই ভুল হয়েছিল। হাউ-হাউ করে কেঁদে হাঁটু মুড়ে বসে পড়লেন। খুব অসহায় দেখাচ্ছিল এই মুহূর্তে। কয়েক পলক ওর দিকে তাকিয়ে ভাস্কর চটপট মিস্টার শেরিংয়ের ঘরে চলে এল। তারপর শেলফ থেকে সেই বইটা সরিয়ে বোতাম টিপতেই পায়ের তলার কার্পেট ঝুলে পড়ল। দ্রুত হাতে কার্পেট সরাতেই সে দ্বিতীয় বাক্সটাকে দেখতে পেল গর্তের মধ্যে। সন্তর্পণে গর্তটা থেকে বাক্স তুলতেই মনে হল ওটা খুব হালকা। ঢাকনা খুলে মাথা নাড়ল সে। বাক্সটা খালি।

ঠিক সেই মুহূর্তে দরজায় অস্ফুট শব্দ হল। ভাস্কর ঘাড় ঘুড়িয়ে দেখল জুলি অবাক চোখে তাকিয়ে আছেন। ওঁর চোখে এখনও জল।

ওটা কী? ওখানে গর্ত কীভাবে এল? ছুটে এলেন জুলি। ওঁর চোখে বিস্ময়? ভাস্করের হাত থেকে বাক্সটা টেনে নিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, এই বাক্স কোত্থেকে এল?

তুমি জানতে না এই গর্তের কথা?

না। জানতাম না। এই ঘরে আমি আসতাম না।

মিথ্যে কথা।

বিশ্বাস করো। আমি এর কিছুই বুঝতে পারছি না। জুলি চিৎকার করে উঠলেন, কিন্তু এই বাক্সটাকে আমি চিনি। এতেই ওই বুদ্ধমূর্তিটা ছিল। ও জানত। নিশ্চয়ই জানত। কিন্তু আমাকে মূর্তিটা দিয়ে ও এখানে বাক্সটা রাখতে গেল কেন? নিজেকেই প্রশ্ন করলেন জুলি।

এই প্রথম বিশ্বাস করলেন তিনি।

ভাস্কর জুলির কাঁধে হাত রাখল, তোমার মেয়ে এখন কোথায়? মিথ্যে কথা বললে নিজেরই ক্ষতি হবে।

দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠলেন জুলি। অনেক কষ্টে নিজেকে ফিরে পেলেন, ঘুমে।

কাল রাত্রে ওকে পাঠিয়ে দিয়েছ?

হ্যাঁ।

গুরুদেব কোথায়?

আবার তাকালেন জুলি। ইতস্তত করলেন। ভাস্কর বলল, সত্যি কথা বললে আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি।

অজ্ঞান হয়ে আছে। লোকটা আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে এসেছিল।

কী বলেছিল?

বলেছিল, ও দেখেছে আমি প্রধানকে খুন করেছি। কিন্তু বিশ্বাস করো আমি তা করতে চাইনি! আমি সামান্য ঠেলেছিলাম কিন্তু ও পুতুলের মতো খাদে চলে গেল।

আমি দেখেছি।

তুমি দেখেছ? এই প্রথম স্বস্তি পেলেন জুলি, তাহলে বলো আমি খুন করতে চেয়েছিলাম কি না?

না। কিন্তু আর-একটা কথা বলো। মিস্টার শেরিং ইঞ্জেকশন নিয়েছিলেন কোথায়? পানশালায় না এখানে?

ওর দুটো সিরিঞ্জ ছিল। একটাতে সব সময় বিষ ভরা থাকত। প্রয়োজন হলেই নিত। ওই বিষের ভয়ে আমরা তটস্থ থাকতাম। শেষ দিকে বলত সাপের বিষ ইঞ্জেকশন করেও নাকি বেশিক্ষণ আরাম হচ্ছে না। ও নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই গর্ত কোত্থেকে এল? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না। কিন্তু আমি ওই বিশ্বাসঘাতকটাকে ছাড়ব না। ওকে আমি খুন করবই। আমাদের পারিবারিক বুদ্ধমূর্তি ওটা। হিংস্র ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করল জুলি, তুমি ওকে যেতে দিলে কেন?

ও কোথাও যায়নি। সাধারণ গলায় জানাল ভাস্কর।

মানে?

তার আগে বলো গুরুদেবের অজ্ঞান শরীরটা কোথায় আছে?

ঘুমে! যে বাড়িতে আমার মেয়ে আছে। ও ওকে পাহারা দিচ্ছে।

জ্ঞান ফিরে এলে তোমার মেয়ে পারবে সামলাতে?

ওর শরীর বাঁধা আছে শক্ত করে। উঠতে পারবে না।

কিন্তু—।

এসো। জুলির হাত ধরে বেরিয়ে এল ভাস্কর। সঙ্গে-সঙ্গে চমকে উঠলেন জুলি। লনে পুলিশ গিজগিজ করছে। অনিল মিত্র ওদের দেখে এগিয়ে এল, লোকটাকে ধরেছি। বুদ্ধমূর্তি নিয়ে পালাচ্ছিল।

থ্যাঙ্ক ইউ। হাত বাড়িয়ে বুদ্ধমূর্তিটা গ্রহণ করল ভাস্কর।

কিন্তু আমি কিছুই বুঝতে পারছি না—অনিল মিত্র বলল।

ঘুম কি তোমার জুরিসডিকশনে?

হ্যাঁ। কেন?

তাহলে আমাদের পেছনে-পেছনে চলে এসো। ওখানে গিয়ে কিছু ইন্টারেস্টিং তথ্য দেব। এসো জুলি, তোমার গাড়িটা নাও। পুলিশের গাড়ি নিয়ে প্রথমে যাওয়া ঠিক হবে না। তাড়া দিল ভাস্কর।

না! জুলি শক্ত হয়ে দাঁড়ালেন।

ভাস্কর চট করে অনিল মিত্রকে দেখে নিল। অনিল যেন এখনই কোনও গন্ধ না পায়। তারপর চাপা গলায় বলল, তুমি আমাকে বিশ্বাস করো। আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই। আমার সঙ্গে চলো।

নিতান্ত অনিচ্ছায় জুলি তাঁর গাড়িতে উঠলেন, পাশে ভাস্কর। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ভাস্কর বলল, অনিল তোমরা এমনভাবে ফলো করো যাতে কেউ বুঝতে না পারে। যে বাড়িতে আমরা ঢুকব সেটা কভার করে অপেক্ষা করবে আধঘণ্টা। আমি না বের হলে চার্জ করবে।

বাট হোয়াই? অনিল মিত্র চেঁচিয়ে জিগ্যেস করল আবার।

এসো বলছি। গাড়িটা যখন বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসছে তখন পদম বাহাদুরকে নজরে এল। খুব উৎসাহ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, পুলিশ দেখে এগোচ্ছে না। হাত নাড়ল ভাস্কর, হোটেলে থাকিস। এখনই ফিরছি।

কথাটা পছন্দ হল না পদমের। সে বোধহয় আরও উত্তেজনা চাইছিল। কিন্তু ছেলেটাকে যা-যা বলেছিল তা মান্য করেছে। অনিল মিত্রকে খবর দিয়ে না আনলে লোকটি গ্রেপ্তার হতো না।

বুদ্ধমূর্তিটা মাঝখানে সিটের ওপর, জুলির হাতে স্টিয়ারিং। বললেন, আমি জানি তুমি আমাকে ধরিয়ে দেবে প্রধানের খুনের কেসে। কিন্তু তা যদি আমি হতে না দিই?

কীরকম? কৌতুক করে বলল ভাস্কর।

যদি এই গাড়িটা নিয়ে খাদে ঝাঁপ দিই?

চমকে উঠল ভাস্কর। এখন তাদের ডান দিকে বিশাল খাদ, বাঁ-দিকে পাহাড়। সে আড়চোখে জুলির দিকে তাকাল। জুলির নগ্ন পা, সতেজ বুক আর আকর্ষণ করছে না। তরল একটা হিমস্রোত নেমে এল। তার মনে হল ও যা বলছে তা অবহেলায় করতে পারে। তা হলে কিছু করার উপায় থাকবে না। সে নির্লিপ্ত হওয়ার চেষ্টা করল। এখন প্রার্থনার সুরে কথা বললে জুলির জেদ চেপে যাবে। একটা কাণ্ড ঘটাতে দ্বিধা করবে না কারণ গাড়ির নিয়ন্ত্রণ ওর হাতে। ভাস্কর বলল, তোমাদের পারিবারিক বুদ্ধমূর্তিটা বেহাত হয়ে যাবে তাহলে।

মানে? চমকে উঠে পাশের মূর্তিটার দিকে তাকাল।

আমার যতদূর বিশ্বাস এই মূর্তি জাল।

জাল?

হ্যাঁ। আসল মূর্তি ছিল ওই গর্তের দ্বিতীয় বাক্সে। এটা আমার অনুমান। তুমি বললে বাক্সটায় মূর্তি ছিল। অথচ মিস্টার শেরিং তোমাকে বাক্সটা না দিয়ে লুকিয়ে রাখলেন গোপন জায়গায়। এটা বিশ্বাস করতে পারছি না।

তুমি কি বলতে চাও এটা—। মূর্তিটায় হাত দিলেন জুলি।

প্লিজ অপেক্ষা করো জুলি।

বাড়িটা ছবির মতো একটা পাহাড়ের মাথায়। পথে আসার সময় ওরা লক্ষ করেছিল পুলিশের গাড়ি বেশ দূরত্ব রেখে আসছে। বাড়িটার সামনে গাড়িটা দাঁড় করাতেই ভাস্কর লাফিয়ে নামল। জুলি নামতেই সে বলল, পিছনদিকে কোনও দরজা আছে?

হ্যাঁ।

বাড়িতে আর কে-কে আছে?

ওরা দুজন ছাড়া কেউ নেই।

তুমি সামনের দরজায় নক করো। কথাটা বলে দ্রুত পায়ে ভাস্কর পেছনের দরজায় হানা দিল। সেটা ভেতর থেকে বন্ধ। কিন্তু এপাশে একটা জানলার পাল্লা খোলা। কিন্তু তার গায়ে মোটা গ্রিল। অতএব ভাস্করকে আবার সামনে চলে আসতে হল।

জুলি নেই। দরজাটা খোলা।

খুব সন্তর্পণে ঘরে ঢুকল ভাস্কর। আর তখনই ভেতরের ঘরে আওয়াজ হল। কাল রাত্রে আমাকে খুব মারা হয়েছিল না? মেয়েকে পাহারায় রাখা হয়েছিল। সঙ্গে-সঙ্গে একটা থাপ্পড়ের শব্দ এবং জুলির আর্তনাদ। লোকটি চাপা গলায় বলল, গাড়িতে আর কেউ ছিল? আমার দিকে তাকাও।

হ্যাঁ।

কে?

ভাস্কর।

ঠিক তখনই পা চালাল ভাস্কর। সতর্ক ভঙ্গিতে অথচ অত্যন্ত দ্রুত পায়ে সে দূরত্বটা অতিক্রম করল, মাথায় ওপরে হাত তুলুন। নইলে খুলি উড়ে যাবে।

চট করে ফিরে দাঁড়াবার চেষ্টা করল গুরুদেব কিন্তু ধমকে উঠল ভাস্কর। একদম চালাকি করার চেষ্টা করবেন না। গুরুদেব যেন কী করা যায় ঠাওর করতে পারছে না। আর সময় নষ্ট করল না ভাস্কর। রিভলবারের বাঁট দিয়ে আধা জোরে আঘাত করল সে গুরুদেবের মাথায়। সঙ্গে-সঙ্গে কাটা কলাগাছের মতো লুটিয়ে পড়ল গুরুদেব। ততক্ষণে জুলি ছুটে গিয়েছে পাশের ঘরে। গিয়ে চিৎকার করে উঠল।

ভাস্কর বুঝল গুরুদেবের সম্বিত ফিরতে অন্তত মিনিট দশেক সময় লাগবে। সে একটা কাপড়ে টুকরোয় ওর চোখ দুটো বাঁধল। তারপর ধীরে-ধীরে পাশের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। পাথরের মতো বসে আছে একটি সতেরো বছরের মেয়ে। চোখ নড়ছে না। শরীর শক্ত। আর তাকে দুহাতে ধরে ঝাঁকিয়ে জুলি বললেন, কথা বল, তুই এমন করছিস কেন? কী হয়েছে তোর? কথা বল?

তোমার মেয়ে?

হ্যাঁ। যা ইচ্ছে করো তুমি, ও আমার মেয়ে।

আমি কিছুই করতে চাই না। তবে কিছুক্ষণ ওকে ডেকে কোনও লাভ হবে না। ও এখন সম্মোহিত। তারপর ওর চোখের সামনে চোখ রেখে সে জিজ্ঞাসা করল, বুদ্ধমূর্তিটা কোথায়?

পাশের ঘরে। খাটের তলায়। বিড়-বিড় করে বলল মেয়েটি। তার ঠোঁট যেন কাঁপল না।

দৌড়ে পাশের ঘরে ঢুকল ভাস্কর। তারপর বুদ্ধমূর্তিটা সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল জুলির কাছে। মেয়ের পাশে হাঁটু গেড়ে অসহায় ভঙ্গিতে বসে আছে সে। এই কয়েক মিনিটেই তাকে খুব বয়স্কা দেখাচ্ছে। বুদ্ধমূর্তির দিকে অবাক চোখে তাকাল সে।

ভাস্কর বলল, এই মূর্তি মিস্টার শেরিং ওই গর্তের বাক্সে রেখেছিলেন লুকিয়ে। এক বাড়িতে থেকে তুমি যে তা জানতে না এটা আমি বিশ্বাস করি। তোমার মেয়ে দেখেছিল এটাকে। তাই এখানে চলে আসার সময় ও লুকিয়ে নিয়ে এসেছিল। কারণ বৌদ্ধ এবং এই পরিবারের মানুষ হিসেবে ওর নিশ্চয়ই লোভ হয়েছিল মূর্তিটার ওপর। ওর কোনও দোষ নেই। বাইরে যেটা ছিল তোমার কাছে, সেটা জাল। ওই গর্তে আর-একটা বাক্স ছিল। তাতে ছিল দুটো অ্যাসিডের মিশ্রণ আর একটা একদম অব্যবহৃত সিরিঞ্জ। তোমার কথাই সত্যি। মিস্টার শেরিং গোপনে অ্যাসিড নেওয়ার ঝুঁকি নিচ্ছিলেন শরীরে। ইঞ্জেকশনে অ্যাসিড পুরে বাকিটা গর্তে রেখে উনি পানশালায় গিয়েছিলেন। বাকিটা তোমরা জানো। না জুলি, তুমি মিস্টার শেরিংকে খুন করোনি। তুমি চাওনি প্রধান নিহত হোক। আইন দিয়ে জোর করে তোমাকে বাঁধা যায় হয়তো, কিন্তু আমি সেটা চাই না। কিন্তু তুমি স্বামীর ইন্সুরেন্সের টাকা চেয়ো না। ওটা তো জেনে-শুনেই আত্মহত্যা। ঝুঁকি নেওয়া, যদি না মরি তা হলে ভালো লাগবে—এইরকম। তোমার দোকান আছে, আর এই বুদ্ধমূর্তিটা রইল। মেয়ের জন্যে কাগজপত্র ঠিক করে নিও। আমি চলি। ওই লোকটার ব্যবস্থা পুলিশ করবে।

দুটো পাথরের মূর্তিকে ঘরে রেখে বাইরের ঘরে এল ভাস্কর। গুরুদেব তখনও বেহুঁশ। ভারী পায়ে সে আকাশের নিচে আসতেই দেখল অনিল মিত্র এগিয়ে আসছে বাহিনী নিয়ে। ক্লান্ত গলায় ভাস্কর বলল, ভেতরে যাও। ওখানে তোমার আসামী আছে। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাঁটতে শুরু করল।